সিগমা ফোর্স
দ্য লাস্ট ওরাকল
জেমস রলিন্স
রূপান্তর: আদনান আহমেদ রিজন

ওয়াশিংটন ডি.সি.তে কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সের কোলে মাথা রেখে মারা গেলেন এক ভিখারিসদৃশ মানুষ। মৃত্যুর কারণ, আততায়ীর বন্দুক থেকে ছুটে আসা বুলেট। তবে সবচেয়ে বড় রহস্যের জন্ম দিল মৃত্যুর সময় লোকটার হাতে থাকা প্রাচীন একটা কয়েন। এই কয়েনের সাথে যে সম্পর্ক আছে হাজার বছরের পুরনো কিংবদন্তীর এক চরিত্র– ডেলফির ওরাকলের।

বিশেষ প্রতিভাধর প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষমতাকে পুঁজি করে দুনিয়ায় প্রলয় ডেকে আনতে চলেছে দুই ম্যানিয়াক, সাথে জুটেছে পাগলাটে কিছু বিজ্ঞানী। তারা কি সফল হতে পারবে? রাশিয়ান ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাথে কী সম্পর্ক এই ব্যাপারটার?

ভূগর্ভস্থ রাশিয়ান ফ্যাসিলিটিতে জ্ঞান ফিরে পেল স্মৃতিভ্রষ্ট, বিকলাঙ্গ এক মানুষ। তিনজন প্রতিভাধর প্রতিবন্ধী শিশুকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল সে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়ে বড় দায়িত্ব চেপে বসেছে ঘাড়ে, আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে পৃথিবীকে। রক্ষা করতে হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন।

প্রাচীন গ্রীক মন্দির থেকে আধুনিক পারমাণবিক কেন্দ্র পর্যন্ত, ভারতের বস্তি থেকে রাশিয়ার ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত, দুজন মানুষকে ছুটতে হচ্ছে এমন এক রহস্য সমাধানের জন্য, যার উৎপত্তি হয়েছে ইতিহাসের প্রথম ভবিষ্যতদ্রষ্টা, ওরাকল অফ ডেলফির আমলে।

প্রশ্ন একটাই, অতীত কি পারবে ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে?

ISBN 978 984 92437 4 8
9 789849 243748

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

সিগমা ৫

দ্য লাস্ট ওরাকল

মূলঃ জেমস রলিন্স

রূপান্তর আদনান আহমেদ রিজন

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরন : আদনান আহমেদ রিজন
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪২০ টাকা

The Last Oracle By James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 420 Tk. U.S. : 10 $ only
ISBN : 978 984 92937 4 8

ভূমিকা

অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে আমার প্রথম অনুবাদ। পরম করুণাময়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জেমস রলিন্স-থ্রিলারপ্রেমীদের কাছে সুপরিচিত একটি নাম। স্ট্যান্ড অ্যালোন উপন্যাসগুলোর পাশাপাশি সিগমা ফোর্স-এর বইগুলো দিয়ে বিশ্বজোড়া পাঠকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সিগমা ফোর্স-এর কোনও বই দিয়ে অনুবাদক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করতে পারাটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত হওয়ার পাশাপাশি বেশ আনন্দের বিষয়ও বটে।

আমার অনুবাদকরূপে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সবার আগে যার নাম আসবে তিনি নিজেও স্বনামধন্য অনুবাদক-লেখক মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাই। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। তখন সবেমাত্র অনুবাদে হাত দিয়েছি, টুকটাক দু-একটা গল্পের কাজ করেছি। একদিন আড্ডার মাঝেই বলে উঠলেন, সিগমা ফোর্সের একটা বই পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখ আগে। ভালো লাগলে কাজ শুরু করো। সেই থেকেই শুরু।

একে তো প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, সেই সাথে বইয়ের বিশাল কলেবর, আর লেখকের নামটাই ভয় ধরিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইতিহাস আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন টার্ম মিলিয়ে যাত্রাটা খুব একটা সুখকর ছিল না।

সময়ে-অসময়ে প্রচুর বিরক্ত করেছি ফুয়াদ ভাইকে। তিনিও নিজের বইয়ের কাজ, পেশাগত কাজ ইত্যাদি ফেলে সাহায্য করে গিয়েছেন যতটুকু সম্ভব। ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না তাকে। কিছু কিছু মানুষের কাছে চিরঋণী থাকাতেই আনন্দ।

এরপর আসে আদী প্রকাশনের কর্ণধার সাজিদ রহমান ভাইয়ের কথা। ধীরে ধীরে নতুন লেখক, অনুবাদকদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছেন সদালাপী, বন্ধুবৎসল এই মানুষটা। বিশেষ ধন্যবাদ তাকে।

ধন্যবাদ পাবেন রাফসান রেজা রিয়াদ ভাই, ওয়াসি আহমেদ রাফি ভাই, শুভঙ্কর শুভ দাদা, মারুফ হোসেন আর আশিকুর রহমান বিশাল। কাজটা করার সময় আমাকে পদে পদে সাহায্য, সাহস যুগিয়ে গিয়েছেন তারা।

সবসময় অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য ধন্যবাদের দাবীদার সালমা হাসান আপা। এছাড়াও বিশেষ ধন্যবাদ পাবে সানজিদা আফরিন। ওর প্রতিনিয়ত তাগাদা না থাকলে বইয়ের কাজ কবে নাগাদ শেষ হতো, আদৌ শেষ হতো কী না আল্লাহ মালুম।

সবশেষে ধন্যবাদ সেই সব পাঠকদের, যারা আমার উপর আস্থা রেখে বইটি হাতে তুলে নিয়েছেন।

যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বৈজ্ঞানিক টার্মগুলোর সাবলীল অনুবাদ করার, কাহিনিকে গতিশীল রাখার। কতটুকু পেরেছি তার বিচার পাঠকদের হাতে। আশা করি, অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটিগুলো সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। শুভকামনা রইল।

আদনান আহমেদ রিজন
ঢাকা, ২০১৬

NATIONAL MALL—Washington, D.C.
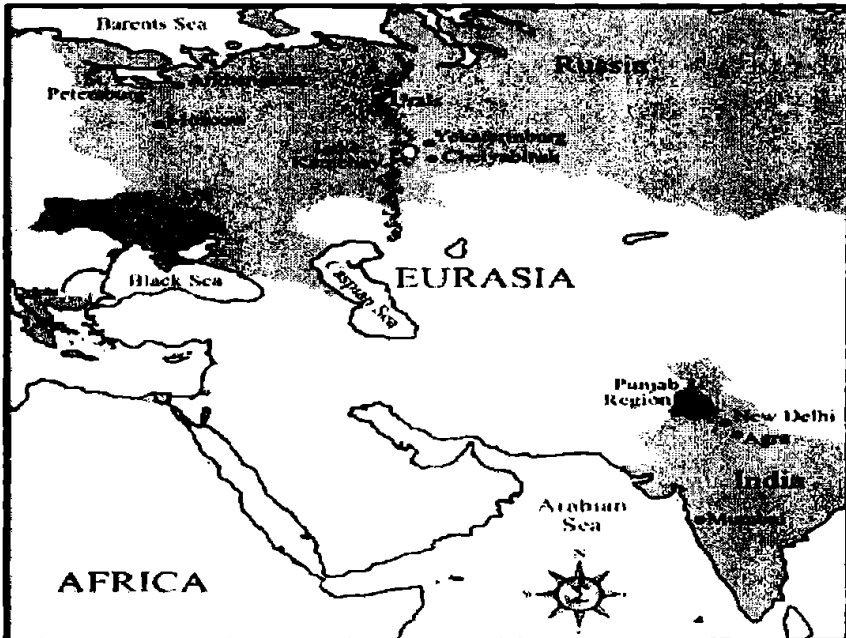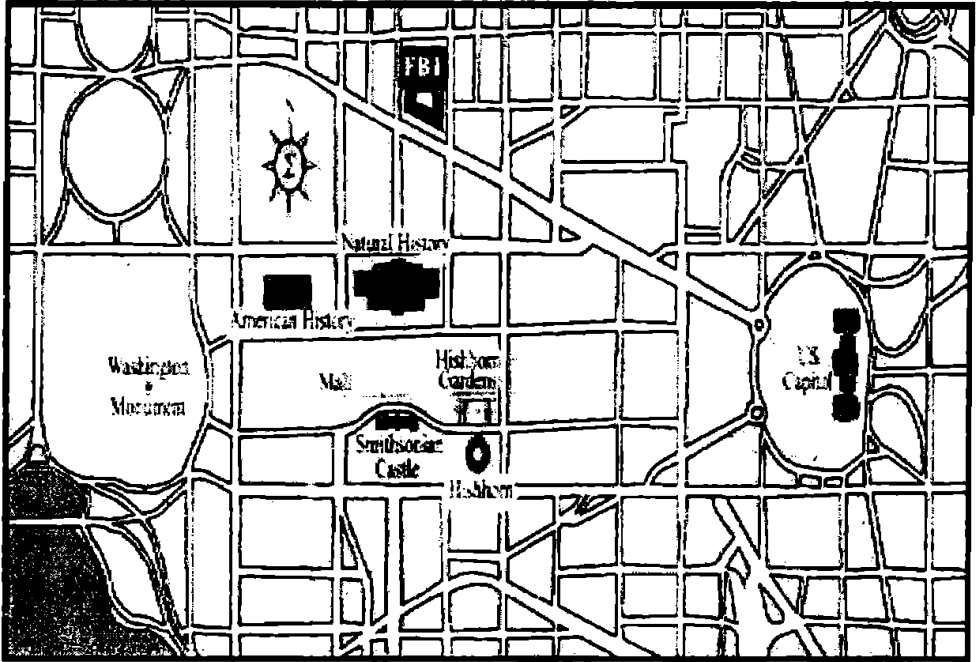
ইতিহাসের পাতা থেকে

মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ বরগুলো আসে উন্মাদনার রূপ নিয়ে,যা নিজেই এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ।

-সক্রেটিস, ডেলফির দৈববাণী প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন দেবদেবীর পাশাপাশি, প্রাচীন গ্রীকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দৈববাণীতেও। ছাগলের অন্ত্র দেখে, পূজার বেদির ধোঁয়ায় অথবা অস্থি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে, এমন মানুষদের খুব সম্মান করত তারা। তবে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসন আসীন ছিলেন মাত্র একজন-ডেলফির ওরাকল।

প্রায় দু-হাজার বছর ধরে, পার্নাসাস পর্বতের ঢালে অবস্থিত দেবতা অ্যাপোলোর মন্দিরে সুরক্ষিত অবস্থায় বাস করে আসছিলেন একদল নারী। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক প্রজন্মে একজন ওরাকলের পদে অভিষিক্ত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী প্রচারের ভার নিতেন। ওরাকলকে 'পাইথিয়া' নামে নামে সম্বোধন করা হতো। দৈববাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে ঘোরে চলে যেতেন তিনি, আর উত্তর দিতেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সব প্রশ্নের।

তিনি কি ভণ্ড ছিলেন? নাকি সত্যিই অধিকারী ছিলেন এমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতার?

সত্যটা হয়তো কখনওই জানা যাবে না। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত-প্রাচীন পৃথিবীর শক্তিশালী সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত পাইথিয়ার ভবিষ্যৎবাণী অনেকবারই পাল্টে দিয়েছিল মানব ইতিহাসের গতিপথ।

পাইথিয়ার ইতিহাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রহস্য আর পুরাণের চাদরে ঢাকা, তবে পরবর্তীতে উন্মোচিত হয়েছে এক আশ্চর্যজনক সত্য। ২০০১ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ আর ভূগোলবিদেরা পার্নাসাস পর্বতের নিচে টেকটোনিক প্লেটের এক অদ্ভুত বিন্যাস আবিষ্কার করেন। এই বিন্যাসের কারনে ভূগর্ভ থেকে উদ্গীরণ হতো ইথিলিনসহ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন গ্যাস। এই গ্যাসগুলো মানব মস্তিস্ককে এক ধরণের ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায়, দেখায় বিভিন্ন বিভ্রম।

ঠিক যেমনটি বর্ণিত আছে ইতিহাসের পাতায়।

আর এভাবেই বিজ্ঞানের সাহায্যে সুরাহা হয় পাইথিয়ার গোপন রহস্যের। তবে তারপরও কথা থেকেই যায়।

সত্যিই কি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন তিনি? নাকি পুরোটাই ছিল এক প্রকার উন্মাদনা?

হে মানবজাতি নিজেকে জানো। তবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর ঈশ্বরের সব দুয়ার খুলে যাবে তোমাদের সামনে।

- ডেলফির মন্দিরের দেয়ালে খোদাইকৃত।

৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
পার্নাসাস পর্বত
গ্রীস

খুনের নেশায় বুঁদ হয়ে এগিয়ে আসছে সৈন্যরা।

ভোরের আলো ফোটেনি এখনও। মৃদু হাওয়া বইছে। সাদা লিনেনের পাতলা রোব পরে মন্দিরের উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী। কাঁপছেন তিনি, তবে ঠাণ্ডায় নয়।

এক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন পাহাড়ের ঢালের দিকে। আগুনের নদীর মতো ধেয়ে আসছে অগণিত মশাল। পাথর বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে আসছে দেবতা অ্যাপোলোর পবিত্র মন্দিরের দিকে। বর্মের সাথে তলোয়ার বাড়ি খাওয়ার ঝনঝন শব্দ পাঁচশো রোমান সৈন্যের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে। আধ-ভাঙা স্মৃতিস্তম্ভ আর শূন্য কোষাগারের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। আশেপাশের দাহ্য সবকিছুই দাউদাউ করে জ্বলছে এখন।

ধ্বংসস্তুপের উপর নৃত্যরত অগ্নিশিখা অতীতের সোনালি দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যেন–স্বর্ণ আর মনিমুক্তা ভরা কোষাগার, দক্ষ কারিগরদের হাতে বানানো মুর্তি, ওরাকলের দৈববাণী শুনতে জমায়েত হওয়া লোকজন।

তবে এখন আর সেসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই।

গত শতাব্দীতে পারস্যের আক্রমণ, থ্রেসিয়ানদের লুটতরাজ আর সবচেয়ে বড় কারণ, অবহেলাই-ডেলফির কদর কমিয়ে দিয়েছে। হাতেগোনা কয়েকজন এখন দৈববাণী শুনতে আসে। স্ত্রীর প্রসবের সময় সম্পর্কে জানতে আসে কোনও মেষপালক অথবা সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে কোনও নাবিক।

বিদায়ঘন্টা বাজছে ডেলফির ওরাকলের। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত ভবিষ্যৎবাণী করে চলেছেন তিনি। তার পর আর কেউ পাইথিয়া নাম গ্রহণ করবে না।

তিনিই ডেলফির সর্বশেষ ওরাকল।

তবে এই বিদায়বেলায়ও ঘাড়ে চেপেছে এক গুরুদায়িত্ব।

আকাশের পূর্বদিকে তাকালেন পাইথিয়া। আলোর আবছা আভাস দেখা যাচ্ছে।

ওহ ভোরের দেবী, আবীরের আভাময়ী ইওস, তাড়াতাড়ি দেবতা অ্যাপোলোকে তার চার ঘোড়ায় টানা সূর্য রথে চড়তে সাহায্য করুন।

পাইথিয়ার বোনদের মধ্যে একজন মন্দির থেকে বেরিয়ে পেছনে এসে দাঁড়াল। "মহামান্যা, আমাদের সাথে চলুন," কাতর স্বরে বলল তরুণী। "এখনো সময় আছে। বাকিদের সাথে আমরাও গুহায় পালিয়ে যেতে পারব।"

তরুণীর কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করলেন পাইথিয়া। গত কয়েক রাতে অন্য নারীরা সুরক্ষার আশায় ডাইওনিসাসের গুহায় পালিয়েছে। কিন্তু পাইথিয়ার পক্ষে তা সম্ভব নয়। একটা কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে।

"মহামান্যা, এই শেষ দৈববাণী করার আর সময় নেই এখন।"

"আমাকে যে করতেই হবে..."

"তবে এখনই করুন, নইলে যে সময় শেষ হয়ে যাবে!"

মুখ ফেরালেন পাইথিয়া। "সপ্তম দিনের ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এটাই নিয়ম।"

গতকাল সূর্যাস্তের পর থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন পাইথিয়া। ক্যাস্টিলিয়ার রুপালি ঝর্ণায় গোসল করেছেন, পান করেছেন ক্যাসোটিস ঝর্ণার পানি আর মন্দিরের বাইরের কালো পাথরের বেদিতে তেজপাতাও পুড়িয়েছেন। ঠিক হাজার বছর আগের প্রথম পাইথিয়ার মতো, সুচারুভাবেই প্রতিটা নিয়ম পালন করেছেন তিনি।

তবে আত্মশুদ্ধিতে এবার ওরাকল একা নন।

সাথে রয়েছে বারো বছর বয়সী এক মেয়ে।

কী ছোট্ট একটা মানুষ আর কী অদ্ভুত তার আচরণ!

বৃদ্ধা পরিচারিকারা শরীর পরিষ্কার করে দেয়ার সময় বাচ্চাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ঝর্ণার পানিতে। কোনও কথাই বলেনি। একটা হাত বাড়িয়ে রেখেছিল শুধু, মুঠো একবার খুলছিল, আবার বন্ধ করছিল। যেন অদৃশ্য কোনও বস্তু ধরার চেষ্টা করছে। কোন দেবতা বাচ্চাটাকে এতোখানি কষ্ট দিচ্ছেন? সেই সাথে আশীর্বাদও? অ্যাপোলো হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবুও মাসখানেক আগে বলা বাচ্চাটার কথাগুলো শুধুমাত্র দেবতাদের পক্ষ থেকেই আসা সম্ভব। এমন কিছু কথা, যা ছড়িয়ে গেছে দাবানলের মতো...আর এখন ধেয়ে আসছে ডেলফির দিকে।

বাচ্চাটাকে যদি কখনওই এখানে আনা না হতো!

ডেলফির এই পতনে পাইথিয়া নাখোশ নন। তার এক পূর্বসূরী একটা দৈববাণী করেছিলেন, যেটা কালের পরিক্রমায় ভুলে গেছে সকলেই। কিন্তু বর্তমান পাইথিয়া ভোলেননি।

সম্রাট অগাস্টাস তার সেই পূর্বসূরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওরাকল এতো নীরব হয়ে গেলেন কেন?"

পাইথিয়ার সেই বোন উত্তর দিয়েছিলেন, "হে আশীর্বাদপুস্ট জাতির শাসনকর্তা, এক ইহুদি ছেলে, ধীরে ধীরে আমাকে এখান থেকে বিতাড়িত করবে..."

কথাগুলো সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। খ্রিষ্টের অনুসারী দিয়ে গোটা সাম্রাজ্য এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে ওরাকলের আগের সেই সোনালী দিনগুলো ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

তারপরই ঘটল ঘটনাটা! একমাস আগে এক বিস্ময়কর মেয়েকে নিয়ে আসা হয় পাইথিয়ার কাছে।

অগ্নিশিখা থেকে নজর সরিয়ে তিনি মেয়েটার দিকে তাকালেন।

বাচ্চা মেয়েটা এতিম, কায়োস শহরে থাকত। এ ধরণের শিশুদেরই মানুষ বোঝা ভাবে। যুগ যুগ ধরে তাই এমন মানুষদেরই মন্দিরে পাঠানো হয় বোঝাটা ওরাকলদের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য। তবে তাদের বেশিরভাগকেই ফিরিয়ে দেয়া হতো। শুধুমাত্র দেখতে শুনতে ভালো, দৃষ্টিশক্তি সবল আর পবিত্র মেয়েগুলোকেই রেখে দেয়া হতো। নিচু মানের কাউকে দেবতা অ্যাপোলো কখনও নিজের দৈবকথক হিসেবে গ্রহণ করেন না।

তাই এই মেয়েটাকে যখন উলঙ্গ করে মন্দিরের সিঁড়িতে হাজির করা হলো, প্রথমে ভালো করে নজরই দেননি পাইথিয়া। মেয়েটার পুরো শরীর ছিল নোংরা,ঘন কালো চুলগুলো জট পাকানো, গায়ে বসন্তের দাগ। কিন্তু পাইথিয়া বুঝতে পারেন মেয়েটার মাঝে অস্বাভাবিক কিছু আছে। অদ্ভুতভঙ্গিতে সামনে পেছনে দুলছিল ও। যেন অচেনা কোনও জগতকে চোখের সামনে ভেসে থাকতে দেখছে।

মেয়েটাকে নিয়ে আসা লোকদের দাবী, সে দেবতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। না দেখেই নাকি কোন গাছে জলপাইয়ের সংখ্যা বলে দিতে পারে, স্পর্শ করেই বলে দিতে পারে কখন একটা ভেড়ার বাচ্চা হবে!

গল্পগুলো শুনে পাইথিয়ার আগ্রহ জন্মায়। মেয়েটাকে কাছে ডাকেন তিনি। তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে মেয়েটি। এমনভাবে হাঁটছিল, যেন পায়ের সাথে ভূমির কোনও সংস্পর্শ নেই,বাতাসে ভেসে এগোচ্ছে! পাইথিয়া ওকে ধরে সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপটায় বসিয়ে দেন।

"নাম কী তোমার?" শুকনো হাড় জিরজিরে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেন পাইথিয়া।

"ওর নাম এনথিয়া," নিচ থেকে এক লোক উত্তর দেয়।

পাইথিয়ার নজর মেয়েটার দিকেই নিবদ্ধ। "এনথিয়া, তুমি কী জানো তোমাকে কেন এখানে আনা হয়েছে?"

"তোমার ঘর শুন্য," মেঝের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে মেয়েটি।

"যাক...অন্তত কথা বলতে পারো।"

মন্দিরের ভেতরে তাকান পাইথিয়া। ঘরের মাঝখানে বেদির উপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ঘরটা সত্যিই খালি। তবে ফিসফিস করে বলা মেয়েটার কথায় মনে হয়েছে হয়তো অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে। হয়তো এভাবেই কথা বলে ও। কী অদ্ভুত বলার ভঙ্গি! যেন এই পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও তার একটা অংশ বিরাজ করছে অন্য কোনও জগতে।

নিষ্পাপ চোখ তুলে তাকায় মেয়েটা। তবে ওর মুখ দিয়ে বেরোনো কথাগুলোকে নিষ্পাপ বলা চলে না কোনভাবেই।

"বুড়িয়ে গেছ তুমি। মৃত্যু তোমার দ্বারপ্রান্তে।"

মেয়েটাকে নিয়ে আসা লোকদের মধ্যে একজন মেয়েটাকে শাসানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পাইথিয়া কথা চালিয়ে যান। "প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে, এনথিয়া। এটাই জগতের নিয়ম।"

মাথা নাড়ায় মেয়েটা। "ইহুদি ছেলেটা মরবে না।"

ওর অদ্ভুত দৃষ্টি যেন পাইথিয়াকে ভেদ করছিল। বোঝা যাচ্ছিল, খৃষ্ট আর ক্রুশ সম্পর্কে মেয়েটাকে ভালো করেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেমন এক অদ্ভুত ঘোর লাগা ভাব ছিল তার কথাগুলোতে।

ইহুদি ছেলে...

কথাটা পাইথিয়াকে তার পূর্বসূরীর ভবিষ্যৎবাণী মনে করিয়ে দিয়েছিল।

"কিন্তু আরেকজন আসবে।" বলতে থাকে মেয়েটা। "আরেকটা ছেলে।"

"আরেকটা ছেলে?" মেয়েটার উপর ঝুঁকে তাকান পাইথিয়া। "কে? কোথা থেকে?"

"আমার স্বপ্ন থেকে।" কব্জির উল্টো পিঠ দিয়ে কান চুলকায় মেয়েটা।

পাইথিয়া বুঝে পারেন মেয়েটার ভেতর এখনও না বলা অনেক কথা রয়ে গিয়েছে। "কে সেই ছেলে?" জিজ্ঞেস করেন তিনি।

বাচ্চাটার পরের কথাগুলো শুনে নিচের লোকগুলো শিউরে ওঠে। ধর্মনিন্দা আঁচ করতে দেরি হয়নি তাদের।

"ইহুদি ছেলেটার ভাই সে।" বলতে বলতে পাইথিয়ার কাপড়ের এক কোনা আঁকড়ে ধরে মেয়েটা। "সে আমার স্বপ্নে আসে। সব কিছু জ্বালিয়ে দেবে সে। কিছুই রেহাই পাবে না। এমন কী রোমও না।"

এরপর গত একমাস ধরে পাইথিয়া এই নিয়তি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করে গেছেন। মেয়েটাকেও ভগিনীসংঘের একজন করে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকেই মেয়েটা যেন নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছে। কোন কথাই বের করা যায়নি ওর মুখ দিয়ে। তবে জানার আরও একটা পথ খোলা আছে।

যদি মেয়েটা আসলেই দেবতাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে থাকে, তবে অ্যাপোলোর পবিত্র নিঃশ্বাস–তার দৈববাষ্প অবশ্যই মেয়েটার অদ্ভুত আচরণের আড়ালে থাকা রহস্য উন্মোচন করতে পারবে।

কিন্তু ততটুকু সময় কি পাওয়া যাবে?

কনুইতে একটা স্পর্শ তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। "মহামান্যা, সূর্য..." সংঘের এক মেয়ে তাড়া দিল।

পূর্ব দিগন্তে তাকালেন পাইথিয়া। আলোর ছটায় ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আকাশ। মন্দিরের নিচ থেকে ভেসে আসছে রোমান সৈন্যদের কোলাহল।

মেয়েটির কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। দাবানলের এতো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মেয়েটির বলা কথাগুলো, এমনকি সম্রাটের কানেও পৌঁছে যায়। শয়তানের দাসী আখ্যা দিয়ে মেয়েটাকে সম্রাটের সামনে হাজির করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজি হননি পাইথিয়া। দেবতারাই মন্দিরে তার কাছে বাচ্চাটাকে পাঠিয়েছেন। রহস্য পুরোপুরি উন্মোচন না করে তিনি মেয়েটাকে যেতে দিতে পারেন না।

ভোরের প্রথম সূর্যালোকে আলোকিত হয়েছে পূর্বাকাশ।

সপ্তম মাসের সপ্তম দিন উপস্থিত।

অপেক্ষার দিন শেষ।

মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করলেন পাইথিয়া। "এস, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি। এখানেও আগুন স্বাগতম জানাল তাকে। তবে এই আগুন যেন উষ্ণতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছড়াচ্ছে-পবিত্রতা। দুজন বয়স্ক মহিলা পাশে বসে আগুনটাকে উস্কে দিচ্ছেন। পাইথিয়া তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা ঝাঁকিয়ে আগুনটা পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলেন।

ঘরের অন্যপ্রান্ত দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে, পবিত্র কক্ষে। শুধুমাত্র ওরাকল ও তার সেবিকাদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন পাইথিয়া। শেষ ধাপ অতিক্রম করার পর তার পায়ের নিচে শক্ত চুনা পাথরের মেঝে ঠেকলো। ছোট গুহায় পৌছে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা। অনেক আগে এক মেষপালক গুহাটা আবিষ্কার করে। গুহাটায় পা রাখতেই অ্যাপোলোর দৈববাষ্পের মিষ্টি গন্ধ নাকে এল তার।

কী করুণ! আর মাত্র একটা সূর্যোদয় পর্যন্তই বাকি এই আশীর্বাদের মেয়াদ।

মেয়েটাকে গুহায় অপেক্ষারত অবস্থায় দেখতে পেলেন পাইথিয়া। পরনে শরীরের তুলনায় বড় মাপের সাদা আলখেল্লা। একটা ব্রোঞ্জের তেপায়ার পাশে পা ভাঁজ করে বসে আছে। তেপায়ার উপর রাখা আছে পবিত্র ওম্ফালোস, কোমর সমান উঁচু গম্বুজাকৃতি একটা পাথর যা পুরো মহাবিশ্বের কেন্দ্র রূপে প্রচলিত।

এগুলো ছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে গুহায়। তিন পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বসার আসন। পাথরের মেঝের একটা ফাটলের উপর বসানো। নিচ থেকে উঠে আসা অ্যাপোলোর দৈববাষ্প পাইথিয়ার নাকে ধাক্কা মারল। অনেকটা বাদামের সুগন্ধের মতো, তার অনেক দিনের চেনা।

দেবতার স্বর্গীয় নিঃশ্বাস।

"সময় হয়ে গেছে," সাথে নেমে আসা তরুণীর উদ্দেশ্যে বললেন পাইথিয়া। "বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

ওম্ফালোসটা পাশ কাটিয়ে নিজের তেপায়া আসনে গিয়ে বসলেন তিনি। অনুভব করলেন, অ্যাপোলোর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে তার সারা দেহে। "তাড়াতাড়ি করো।"

বাচ্চাটাকে এনে তার কোলে বসিয়ে দিল তরুণী। মায়ের মতোই মমতা নিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরলেন পাইথিয়া। কিন্তু তার এই আদরে সাড়া দিল না মেয়েটা।

ইতিমধ্যে ভূগর্ভ থেকে আসা বাষ্প পাইথিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। শিহরণ খেলে যাচ্ছে পুরো শরীর জুড়ে। অ্যাপোলোর নিঃশ্বাস প্রবেশ করছে তার ভেতর। গরম বাষ্প ভেতরে যেতেই জ্বালা করে উঠল শ্বাসনালী। ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল দৃষ্টি।

কিন্তু বাচ্চা মেয়েটার পক্ষে এই ধকল সহ্য করা কঠিন।

ওর মাথাটা পেছনদিকে হেলে পড়ল। চোখ উল্টে গিয়েছে ইতিমধ্যে। অ্যাপোলোর নিঃশ্বাস মেয়েটা বেশিক্ষণ সইতে পারবে না। যা প্রশ্ন করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

"বাছা," বলে উঠলেন পাইথিয়া, "ছেলেটা সম্পর্কে আরও বলো আমাকে। যে ধ্বংসযজ্ঞ তুমি স্বপ্নে দেখ তা সম্পর্কে জানাও। কোথা থেকে আবির্ভূত হবে সে?"

কেঁপে উঠল ছোট ঠোঁট দুটো। "আমার মধ্যে থেকে," ফিসফিস করে বলল ও। ছোট ছোট আঙুলগুলো চেপে ধরল পাইথিয়ার হাত।

এরপর এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগল মেয়েটা, "তোমার ঘর শূন্য। শুকিয়ে গেছে তোমার জলধারা। দৈববাণীর এক নতুন ধারা বইবে এবার।"

উত্তেজনায় মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরলেন পাইথিয়া। দীর্ঘ সময় ধরে ধুঁকছে এই মন্দির। "এক নতুন ঝর্ণা ধারা!" পাইথিয়ার কণ্ঠে আশার সুর, "এখানে? ডেলফিতে?"

"না..."

পাইথিয়ারের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। "তাহলে কোথায়? এই ধারার উৎপত্তি কোথায়?"

মেয়েটার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল কিন্তু কোনও শব্দ বেরিয়ে এল না।

ওকে ঝাঁকি দিলেন পাইথিয়া... "কোথায়?"

মেয়েটা ওর হাড় জিরজিরে হাতের একটা নিজের পেটের উপর রাখল। সাথে সাথে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল পাইথিয়ার চোখের সামনে। একটা রুপালি জলের ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে মেয়েটার গর্ভ থেকে। এক নতুন ঝর্ণাধারা। কিন্তু এই দৈবদর্শন কি আসলেই অ্যাপোলোর আশীর্বাদ? নাকি শুধুই তার ভ্রম?

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘোর কেটে গেল তার। উপর থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে একটা অবয়ব নেমে এল। আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছিলেন যারা, এ তাদেরই একজন। একহাতে নিজের কাঁধ চেপে ধরে রেখেছেন মহিলা। রক্তে লাল হয়ে আছে হাতের উল্টো পিঠ। একটা তীরের গোড়ার অংশ বেরিয়ে আছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

"দেরি হয়ে গেছে," চেঁচিয়ে উঠেই হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন বৃদ্ধা। "রোমানরা..."

কথাগুলো পাইথিয়ার কানে গেলেও তার ঘোর এখনও পুরোপুরি কাটেনি। দৈব ক্ষমতার এক নতুন দিগন্ত, মেয়েটার গর্ভ থেকে সঞ্চারিত ঝর্ণাধারা এখনো চোখে ভাসছে তার। সেই সাথে রোমানদের মশালের পোড়া গন্ধও নাকে আসছে। রক্ত আর ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেল তার ধ্যান। রুপালি জলধারা এখন কালচে তরলে রূপ নিচ্ছে। কালো হতে হতে হারিয়ে যেতে লাগল দূর অজানায়।

পাইথিয়ার কোলে বসেই হঠাত কুঁকড়ে উঠল মেয়েটা। ঘোরে আচ্ছন্ন সেও। পাইথিয়ার দর্শন শেষ হয়নি এখনও। কালো স্রোতধারাকে একটা আকৃতি নিতে দেখছেন তিনি... একটা ছেলের অবয়ব। কাঠামোটার পেছনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়েটার কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার।

ইহুদি ছেলেটার ভাই... সব কিছু জ্বালিয়ে দেবে সে।

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পাইথিয়া। বাচ্চাটা ধ্বংস আর মুক্তি দুইয়েরই বার্তা দিচ্ছে। একে সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেই অনিশ্চয়তার অবসান

ঘটবে,এটাই সবার জন্য মঙ্গল। উপর থেকে ক্রমাগত চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে আসছে। মৃত্যু ছাড়া সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা আছে বলে মনে হয় না।

পরমুহূর্তেই একটু আগে দেখা দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। বাচ্চাটাকে অ্যাপোলো পাঠিয়েছেন...তার কাছে।

এক নতুন ঝর্ণাধারা বইবে।

শেষবারের মতো বড় করে শ্বাস নিলেন তিনি। অ্যাপোলোর নিঃশ্বাস টেনে নিলেন নিজের ভেতর।

কী করব আমি?

হলঘর পেরিয়ে সামনে এগোলেন সেনাপতি। তার উপর নির্দেশ আছে, ধর্ম অবমাননাকারী মেয়েটাকে হত্যা করার। গতকাল রাতে সৈন্যরা মন্দিরের এক মহিলাকে ধরে নিয়েছিল। চাবুকের আঘাত বেশিক্ষণ সইতে পারেনি মহিলা। বলে দিয়েছে, বাচ্চাটা এখনও মন্দিরের ভেতরই আছে। তারপর সৈন্যদের গ্রাসে পরিণত হয় সে।

"মশালগুলো নিয়ে এস," চিৎকার করে উঠলেন সেনাপতি। "প্রতিটা কোনা খুঁজে দেখ।"

হলঘরের পেছনদিকে একটা নড়াচড়া নজরে এল তার। হাতে তলোয়ার তৈরিই আছে।

নিচের সিঁড়ি বেয়ে এক মহিলা উঠে এলেন। চোখে মুখে ঘোরলাগা ভাব, সর্বাঙ্গে জড়তা। সাদা কাপড়ে গোটা শরীর ঢাকা তার। মাথায় লরেল- গুল্মের মুকুট।

সেনাপতি ভালো করেই জানেন তার সামনে কে দাঁড়ানো।

ডেলফির ওরাকল।

বুকের ভেতর দানা বেঁধে ওঠা ভয় চেপে রাখলেন তিনি। সাম্রাজ্যের অনেকের মতো তিনিও প্রাচীন রীতিনীতি বিশ্বাস করেন। এমনকি দেবী মিথরার উদ্দেশ্যে ষাঁড় বলি দিয়ে সেই রক্তে গোসলও করেছেন।

তবুও দিগন্তে আজ নতুন সূর্য। অতীত এখন শুধুই স্মৃতি।

"কার এতো বড় স্পর্ধা যে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে?" গর্জে উঠলেন ওরাকল।

সেনাপতি জানেন সৈন্যরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে এগিয়ে জোরালো গলায় বললেন তিনি, "মেয়েটাকে নিয়ে আসুন।"

"চলে গেছে ও, তোমাদের নাগালের বাইরে।"

সেনাপতি জানেন, তা অসম্ভব। সৈন্যরা গোটা মন্দির ঘিরে রেখেছে। তবুও দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল তাকে। সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

তার বুকে হাত রেখে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন ওরাকল। "নিচের দেবালয় পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।"

"হতে পারে। তবে সম্রাটের জন্য নয়। আর আমি তারই আদেশ অনুসরণ করছি।"

পথ ছাড়লেন না ওরাকল। "কিছুতেই যেতে পারবে না তুমি।"

সেনাপতির কাছে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মোহরাঙ্কিত আদেশ আছে। সম্রাট নিজ ছেলে, আরকাডিয়াসের হাতে করে এটা তাকে পাঠিয়েছেন। আদেশনামায় উল্লিখিত আছে, পুরনো দেবতাদের উচ্ছেদ করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাদের উপাসনালয়গুলো। এমনকি বাদ যাবে না ডেলফিও।

তাকে আরও একটা বাড়তি আদেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্যই পালন করবেন সেটা।

হাতের তলোয়ারটা সজোরে ওরাকলের পেটে ঢুকিয়ে দিলেন সেনাপতি, একেবারে বাঁট পর্যন্ত। অস্ফুটস্বরে গুঙিয়ে উঠলেন ওরাকল। ঢলে পড়লেন সেনাপতির কাঁধের উপর, যেন প্রেমিকা আলিঙ্গন করছে প্রেমিককে। ধাক্কা দিয়ে শরীরটা মেঝেতে ঠেলে ফেললেন সেনাপতি, বুকের বর্ম আর হাতে রক্ত লেগে গিয়েছে তার।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওরাকলের দেহ। পেটের ক্ষত থেকে অবিরাম ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত, এক হাত বাড়িয়ে সেই রক্তস্রোত স্পর্শ করলেন তিনি। "এক নতুন ঝর্ণাধারা..." ফিসফিস করে উঠলেন শেষবারের মতো, যেন কোনও আশার বাণী শোনাচ্ছেন। তারপরই নিথর হয়ে গেল শরীরটা।

লাশটা পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন সেনাপতি। রক্তাক্ত তলোয়ার উঁচিয়ে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন গুহায়। সিঁড়ির ধাপের শেষে তীরবিদ্ধ এক বৃদ্ধার লাশ পড়ে আছে, লাশের সামনে জমাট বেঁধেছে কালো রক্ত। মেঝেতে একটা ফাটলের পাশে উল্টে আছে তিন পাওয়ালা বসার আসন।

পুরো গুহাটা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন সেনাপতি।

অসম্ভব...

গুহাটা শূন্য!

মার্চ ১৯৫৯
কার্পাথিয়ান পর্বতমালা
রোমানিয়া

রাশিয়ান জিআইএস-১৫১ মডেলের একটা ট্রাক থেকে নেমে দাঁড়ালেন মেজর ইউরি রাইভ। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, ফেলে আসা পথ জুড়ে ধুলো উড়ছে। দীর্ঘসময় পর শরীরের ভর পড়ায় পা-জোড়া কাঁপছে। ট্রাকটাকে মনে মনে গালি আর ধন্যবাদ দুটোই দিতে দিতে সবুজ দরজায় হাত দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করলেন তিনি। পাহাড়ের উপর লোকচক্ষুর আড়ালে এই শীতকালীন ক্যাম্পে আসতে বেশ ভালোই ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। পুরো এক সপ্তাহ এই লক্কড়মার্কা গাড়িতে যাত্রা,তাও আবার বানের জলে ডুবে থাকা রাস্তা ধরে! ঝাঁকিতে মাংস থেকে হাড্ডি আলাদা হয়ে যাবার উপক্রম।

ট্রাকের পেছনের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল, মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন ইউরি। ইউনিফর্ম পড়া সৈনিকরা ঝপঝপ শব্দে লাফিয়ে নামছে রাস্তায়। তাদের সাদা কালোয় মেশানো শীতকালীন পোশাক, আশেপাশের তুষার আর জংলী পরিবেশের সাথে খাপ মিশে গেছে একেবারে। সকালের কুয়াশা ভূতের মতো এখনও ঝুলে আছে বাতাসে।

কালাশনিকভ রাইফেল বাগিয়ে পজিশন নিতে লাগল সৈনিকরা। উদ্দেশ্য, পেছন থেকে আক্রমণ এলে তা প্রতিহত করা।

সামনের দিকে নজর দিলেন ইউরি। এই মিশনের সেকেন্ড ইন কমান্ড লেফটেন্যান্ট ডোবরিস্কি তার দিকে এগিয়ে আসছে। শীতকালীন ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরা ইউক্রেনিয়ান লোকটার পুরো মুখ দাগে ভর্তি, নাকটাও ভাঙা। সবসময় গগলস পড়ে থাকায় চোখের চারপাশে গোলাকার দাগ বসে গেছে।

"স্যার, ক্যাম্পটা এখন পুরোপুরি আমাদের কব্জায়।"

"আমরা কি এদেরকেই খুঁজছি?"

শ্রাগ করল ডোবরিস্কি। এর উত্তর মেজর ভালো দিতে পারবেন। ইতিমধ্যেই একটা ভুল ক্যাম্পে আক্রমণ করে বসেছে তারা। পরে দেখা যায়, ক্যাম্পের বাসিন্দারা নিতান্তই পাথর তুলে জীবন চালানো কিছু অর্ধভুক্ত শ্রমিক।

ইউরির ভ্রূ কুঁচকে গেল। কী এক অদ্ভুত রহস্য যেন লুকিয়ে আছে এই পর্বতমালায়! সেই প্রস্তরযুগের ছোঁয়া লেগে আছে এখনও। কুসংস্কার আর দারিদ্র এখানকার গুটিকতক অধিবাসীর নিত্য সঙ্গী। তবে এই বন্ধুর এলাকাই লুকানোর আদর্শ জায়গা হতে পারে।

ধুলোয় তুষার জমে প্যাচপেচে হয়ে থাকা রাস্তাটার দিকে তাকালেন তিনি। সামনে গাছগাছালির ফাঁকে আই.এম.জেড-ইউরাল মোটরসাইকেলের বহর দেখা যাচ্ছে। আগেভাগে এসে পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছে ওগুলো। প্রত্যেকটা মোটর সাইকেলের সাইডকারে একজন করে সশস্ত্র সৈনিক বসা। তাদের দায়িত্ব-কেউ যেন এলাকা ছেড়ে পালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

জায়গাটা নিয়ে গুজবের অন্ত নেই। তবে কেউই কার্পাথিয়ান রোমানিদের সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজী হয়নি, বিশেষ করে তাদের নিয়ে প্রচলিত অশুভ প্রেতাত্মা আর ডাইনী বিষয়ক গালগল্পের ব্যাপারে। পরে অবশ্য বলেছে। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গিয়েছে কয়েকটা ঘরবাড়ি।

তবে এসবে কি কাজ হবে? তাদেরকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে তো?

"এখন কী করব, মেজর?" প্রশ্ন করল ডোবিরিস্কি।

ইউক্রেনিয়ান লোকটার ঠোঁটে তিক্ততার আভাস দেখতে পেলেন তিনি। সোভিয়েত আর্মির মেজর হওয়া সত্ত্বেও ইউরি কোনও সৈন্য নন। উচ্চতায় ডোবিরিস্কির চেয়ে কিছুটা খাটো, গোলগাল মুখ আর পেটে হালকা মেদও আছে তার। লেনিনগ্রাদ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনে তাকে আর্মির সায়েন্টিফিক ব্রাঞ্চের অধীনে সরাসরি এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। মাত্র আটাশ বছর বয়সেই স্টেট

কন্ট্রোল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল রিসার্চ-এর বায়োফিজিক্স ল্যাবরেটরির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি।

"ক্যাপ্টেন মারতোভ কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন ইউরি। সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি সে। সাধারণত তাকে ডোবিরিস্কির আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। সবকিছুতেই তার কড়া নজর।

"ক্যাম্পের প্রবেশমুখে আমাদের জন্য অপক্ষা করছে।"

ডোবিরিস্কিকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলেন ইউরি। কর্দমাক্ত পথের শেষ মাথায় এসে গাছপালায় ঘেরা একটা ক্যাম্পের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "এদের, জিপসিদের... আপনার কথামতোই ধরে আনা হয়েছে।"

এদেরকে খুঁজতেই কি এতো দূর আসা?

সামনে কয়েকটা জিপসি ওয়াগন দাঁড় করিয়ে রাখা। তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। একেকটা চাকা প্রায় ইউরির সমান উঁচু। ওয়াগনগুলোর রঙ জায়গায় জায়গায় ফিকে হয়ে এসেছে,কয়েক জায়গায় উঠেও গেছে।

ক্যাম্পের জানালার ধারে পুরু বরফ জমে আছে। অতীতের ক্যাম্পফায়ারের সাক্ষী হিসেবে মাটিতে কয়েক জায়গায় পোড়া গর্ত দেখা যাচ্ছে। অবশ্য আরেকটু ভেতরের দিকে এখনও দাউদাউ করে জ্বলছে দুটো অগ্নিকুণ্ড। একপাশে কাঠের বেড়ায় বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়ানো। কিছু ছাগল আর ভেড়াও দেখা গেল, ইতস্ততভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা। ছেঁড়া কাপড় পরা মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে সেখানে। জীবিতদের অবস্থাও খুব একটা ভালো বলা যাবে না। ওয়াগন থেকে ধরে এনে জড়ো করা হয়েছে তাদের।

ক্যাম্পের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। লুকিয়ে থাকা শেষ জিপসিটাকেও বের করে আনা হচ্ছে। মুহূর্তেই গর্জে উঠল অটোমেটিক কালাশনিকভ রাইফেল। ভীত মানুষগুলোর দিকে তাকালেন ইউরি। হাঁটুতে ভর দিয়ে নতজানু হয়ে বসে আছে কয়েকজন মহিলা, কাঁদছে নিশ্চুপ। পুরুষদের বেশিরভাগই আহত, রক্তাক্ত।

"বাচ্চাগুলো কোথায়?" জিজ্ঞেস করলেন ইউরি।

"চার্চে আটকে রাখা হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন সাভিনা মারতোভের দিকে তাকালেন ইউরি। ইন্টেলিজেন্স অফিসার হওয়ার পাশাপাশি মিশনের একমাত্র মেয়েও সে-ই। একটা কালো ওভারকোট পড়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াগন আর তাঁবুগুলোর পেছনে মাথা উঁচু করে থাকা একটা দালানের দিকে ইঙ্গিত করল ও। পাথরের তৈরি চার্চটা আশেপাশের পাহাড়ি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে গেছে একেবারে। এটা ছাড়া আশেপাশে আর কোনও স্থাপত্য নজরে পড়ল না ইউরির।

"আমরা আসার আগেই বাচ্চাগুলোকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে," বলে উঠল সাভিনা।

মাথা ঝাঁকাল ডোবিরিস্কি। "লোকগুলো মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে ফেলেছিল সম্ভবত।"

ইউরির সাথে চোখাচোখি হলো সাভিনার। মেয়েটার সবুজ চোখজোড়ায় ভোরের আলো খেলা করছে যেন। দেখে মনে হলো আপন মনে কিছু একটা ভাবছে। ইউরির প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রচুর রিসার্চ পেপার তুলে দিয়েছে সে, যেগুলোর মধ্যে অশউইজ-বার্কেন্যুর, বিশেষ করে 'অ্যাঞ্জেল অফ ডেথ' খ্যাত ডক্টর জোসেফ মিঙ্গেলের ব্যাপারে অনেক তথ্য ছিল।

কাগজগুলো হাতে পাওয়ার পর ইউরির অনেকগুলো রাত দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। একথা অবশ্য প্রায় সবাই জানত যে কয়েদীদের উপর বিভিন্ন ভয়ঙ্কর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন ডক্টর। কিন্তু জিপসিদের উপর, বিশেষ করে গোত্রের বাচ্চাদের উপর কুনজর ছিল লোকটার।

তাকে 'উঙ্খি পিপে' বলে ডাকত বাচ্চারা। তাদের নানা রকম খাবার আর চকলেটের লোভ দেখিয়ে বশে আনতেন, আর কাজ শেষ হলে মেরে ফেলতেন। তবে এক জোড়া জিপসি জমজ মেয়ে খুঁজে পাওয়ার পর সন্তুষ্ট হন তিনি।

সাশা আর মিনা।

আতঙ্কমিশ্রিত আগ্রহ নিয়ে নোটগুলো পড়ে গেছেন ইউরি। মেয়েদুটোর বয়স, পরিবার, অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে রেখেছেন ডক্টর মিঙ্গেল। তাদের পরিবার আর আত্মীয়স্বজনদের উপর অত্যাচার চালাতেন তিনি,আরও তথ্যের আশায়। তারপর মেয়েগুলোর উপর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতেন। গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় হাল ছেড়ে দিতে হয় তাকে। বন্ধ হয়ে যায় তার কাজ। তারপর হৃৎপিণ্ডে ফেনল' প্রবেশ করিয়ে করে মেরে ফেলেন মেয়েদুটোকে।

শেষ দিকে এসে হতাশা গ্রাস করে ডক্টরকে।

ওয়েনইচনূ মের জেইটগ্রেহাট হাটে...

যদি আরেকটু সময় পেতাম...

"আপনি তৈরি তো?" ইউরিকে জিজ্ঞেস করল সাভিনা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ইউরি।

ক্যাম্পের দিকে এগোনো শুরু করল তারা। সাথে ডোবিরিস্কিসহ আরেকজন সৈন্য। রক্তাক্ত একটা লাশ পাশ কাটাতেই সামনে নজরে এল চার্চটা। আগাগোড়া পাথরে তৈরি, একটা জানালা পর্যন্ত নেই। কাঠের একমাত্র দরজাটা বন্ধ। দালানটাকে চার্চ না বলে দুর্গ বললেই বেশি মানাবে।

একটা স্টিলের ব্যাটারিং র‍্যাম' নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। অনুমতির আশায় ইউরির দিকে তাকাল ডোবিরিস্কি, নড করলেন তিনি।

"ভেঙে ফেলো দরজাটা," চাপা কণ্ঠে আদেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

র‍্যাম দিয়ে দরজায় আঘাত করল সৈন্য দুজন। কাঠের গুঁড়ো ছিটকে গেল আশেপাশে। দুটো আঘাতের পরই সশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

সামনে বাড়লেন ইউরি।

কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে, তবুও ভেতরে আবছা অন্ধকার। দুপাশে সারিবদ্ধ বেঞ্চ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মাঝের উঁচু বেদির দিকে। বিভিন্ন বয়সের কিছু বাচ্চা বসে আছে বেঞ্চগুলোতে। কারও মুখেই টুঁ শব্দটুকুও নেই।

বেদির দিকে এগোতে এগোতে বাচ্চাগুলোর উপর চোখ বুলালেন ইউরি। বেশিরভাগ বাচ্চাই বিকলাঙ্গ। কারও মাথা দেহের তুলনায় ছোট, কারও ঠোঁট কাঁটা, কেউ আবার অতিরিক্ত খাটো। একটা ছেলের হাত কনুই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। গা গুলিয়ে উঠল তার। লোকজন খামোকা রোমানি গোত্রকে ভয় পায় না, ভাবলেন তিনি।

"এদের জন্যই যে আমরা এসেছি, তা নিশ্চিত হবার উপায় কী?" সাভিনার গলায় বিতৃষ্ণা।

মিঙ্গেলের নোট থেকে একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন ইউরি। 'দ্য লেয়ার অফ দ্য শোভিহানিস।' জমজদের জন্মস্থানকে ডাইনীদের আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ডক্টর মিঙ্গেল। জায়গাটার অবস্থান একেবারে শুরু থেকেই গোপন করে আসছিল জিপসিরা।

"এরাই কী...?" চাপ দিল সাভিনা।

"জানি না," ইউরি মাথা দোলালেন।

তারপর সামনের বেঞ্চে বসে থাকা একটা মেয়ের দিকে এগোলেন তিনি। চটের তৈরি একটা পুতুল বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। মেয়েটার অবস্থাও জীর্ণ, হাতের পুতুলটার মতোই। তবে অন্যদের মতো বিকলাঙ্গ নয় সে। আবছা আলোয় জ্বলজ্বল করছে নীল চোখজোড়া।

রোমানিদের মাঝে সাধারণত এমনটা দেখা যায় না।

জমজ মেয়ে দুটোর মতো।

মেয়েটার সামনে গিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলেন ইউরি। তবে মনে হলো না, সে তাকে দেখতে পেয়েছে। তার দৃষ্টি যেন ইউরিকে ভেদ করে যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন, কিছু একটা গড়বড় আছে মেয়েটার। হয়তো বিকলাঙ্গতার থেকেও বেশি।

ঘোরের ভেতর থেকেই যেন ইউরির দিকে আঙুল তুলল বাচ্চাটা। "উঙ্খিপিপে," বলে উঠল চিকন কণ্ঠে।

আতঙ্কের একটা শীতল ধারা বয়ে গেল তার গোটা শরীর বেয়ে। *আঙ্কেল পিপে*, ডক্টর মিঙ্গেলকে এই নামেই ডাকত জিপসি বাচ্চারা। তবে এই বাচ্চাগুলো অনেক ছোট। এদের পক্ষে তো এই কথা জানা সম্ভব নয়!

মেয়েটার চোখের দিকে তাকালেন ইউরি। সে কি জানে তার সৈন্যরা বাচ্চাগুলোর সাথে কী করতে চলেছে? মিঙ্গেলের কথাগুলো ইউরির কানে বেজে উঠল, "যদি আরেকটু সময় পেতাম!"

তবে ইউরির হাতে অঢেল সময়। ফ্যাসিলিটির সব কাজ লোকচক্ষুর আড়ালেই চলছে।

সামনে এগিয়ে এল সাভিনা, প্রশ্নের উত্তর এখনও পায়নি সে।

কিন্তু চুপ থাকলেন ইউরি। অবশ্য মেয়েটার চোখে চোখ রাখতেই সত্যিটা জেনে গেছেন তিনি।

সাভিনা তার কনুইতে হাত রাখল। "মেজর?"

মাথা দোলালেন ইউরি। ভালো করেই জানেন আসন্ন ভয়াবহতার ব্যাপারে। এটাও জানেন, পিছিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা খোলা নেই আর।

"আপনি নিশ্চিত?"

আবারও মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তার দৃষ্টি এখনও বাচ্চাটার নীল চোখে নিবদ্ধ। তবে ডোবিরিস্কিকে দেয়া সাভিনার আদেশ ঠিকই কানে এল তার। "সবগুলো বাচ্চাকে ট্রাকে তোল। আর বাকিদের...সরিয়ে দাও।" কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না ইউরি। এটাই তাদের কাজ।

বাচ্চাটা হাত বাড়িয়ে রেখেছে এখনও। "উভিথ পিপে," আবারও বলে উঠল সে।

ছোট ছোট আঙুলগুলো নিজের হাতে নিলেন ইউরি। অস্বীকার করার কিছু নেই আর।

হ্যাঁ...আমিই উভিথ পিপে।

প্রথম
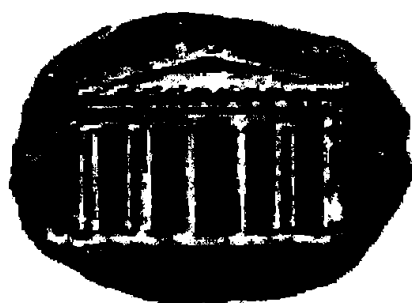
১
বর্তমান সময়
সেপ্টেম্বর ৫, দুপুর ১:৩৮
ওয়াশিংটন ডি.সি

ন্যাশনাল মল পার হচ্ছিলো কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স, মন-মেজাজ এমনিতেই খারাপ। সবেমাত্র একটা ঝামেলা শেষ করে এসেছে, এখন যাচ্ছে আরেকটার উদ্দেশ্যে। তার উপর অন্যান্য দিনের তুলনায় ডিসিতে আজ কাঠাফাটা রোদ, গরমে সিদ্ধ হওয়ার যোগাড়। তেতে আছে রাস্তাঘাট। পরনে সুতি জার্সি, তার উপর নেভি ব্লু রঙের ব্লেজার। মনে হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের ভেতর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

এমন সময় দেখল, হাফ ব্লক দূর থেকে একজন ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। ভিক্ষুকের মতো দেখতে লোকটার পরনে কুঁচকানো জ্যাকেট, গোড়ালি পর্যন্ত গোটানো ঢোলা জিন্স আর পায়ে আর্মি বুট। সামনে এগিয়ে এলে লোকটার থুতনিতে পাক ধরা লালচে দাঁড়িগুলোও নজরে এল ওর। কুতকুতে চোখজোড়া সন্দেহের দৃষ্টিতে ইতিউতি তাকাচ্ছে।

ন্যাশনাল মলের আশেপাশে এমন পোশাক পড়া ভিখিরিদের প্রায়ই দেখা যায়। তার উপর শ্রমিক দিবস গেল ক'টা দিন আগেই। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে গেছে পর্যটকরা, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ বাহিনী অলস সময় কাটাচ্ছে স্থানীয় বারগুলোতে আর পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা মুছে ফেলেছে রাস্তায় পড়ে থাকা সব চিহ্ন। তবে রয়ে গেছে কিছু অভাগা...ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ঘুরছে এদিক সেদিক অথবা উচ্ছিষ্ট ঘাঁটছে ডাস্টবিনগুলোতে।

গ্রে এগোচ্ছিল জেফারসন ড্রাইভের দিকে, গন্তব্য স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেল। আগন্তুককে এড়িয়ে যাবার কোনও প্রবণতা দেখা গেল না ওর মাঝে। বরং বিপদের আশঙ্কায় লোকটার দিকে তাকাল। রাস্তায় ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে গুটিকতক দুষ্কৃতিকারী থাকলেও এদের বেশিরভাগই দুর্ভাগা, নেশাখোর আর শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী। লোকটার উপর থেকে চোখ সরালো না গ্রে। আর তাতেই যেন এগোবার উৎসাহ পেল আগন্তুক।

ভাঁজ পড়া চামড়ায় ডেবে থাকা চোখের তারায় যেন পরিত্রাণ আর আশার আলো দেখতে পেল গ্রে। জোড় কদমে এগোতে লাগল লোকটা, হয়তো ধারনা করছে ধরতে পারার আগেই ক্যাসেলের ভেতর ঢুকে যাবে সামনে থাকা তার একমাত্র অবলম্বন। কেঁপে উঠল পা জোড়া, মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে খুব সম্ভবত।

কাছে এসেই এক হাত বাড়িয়ে ধরল সে।

পুরো দুনিয়া জুড়ে এই ইঙ্গিতের অর্থ একটাই...

দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

ওয়ালেট বের করতে ব্লেজারের ভেতর হাত ঢোকাল গ্রে। অনেকেই অবশ্য ওর এই দান খয়রাতের অভ্যাসটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। অনেকটা ফুটো পাত্রে ঘি দান করার মতো ব্যাপারটা। টাকা দিয়ে এরা আবার মদই গিলবে। কিন্তু সেসবে পাত্তা দেয় না ও। টাকা দিয়ে কি করবে না করবে, তা ভিক্ষুকদের ব্যাপার। একজন মানুষ সাহায্যের জন্য হাত পাতলে, ওর পক্ষে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না কিছুতেই। মানসিক শান্তিরও তো একটা ব্যাপার আছে।

আর পরিমাণও তো খুব একটা বেশি না। মাত্র এক অথবা দুই ডলার।

ওয়ালেটের ভেতর তাকাল গ্রে, সব বিশ ডলারের নোট। মেট্রো স্টেশনের বুথ থেকে কিছুক্ষণ আগেই টাকাগুলো তুলেছে, ভাঙানোর সময় হয়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বের করে আনলো অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মুখের ছাপওয়ালা একটা নোট।

কিছু করার নেই। দানের পরিমাণ মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়ে যেতেই পারে।

লোকটার দিকে নোটটা বাড়িয়ে দিল গ্রে। তখনই নজরে এল, লোকটার বাড়িয়ে দেয়া হাতের তালু খালি নয়। কিছু একটা আছে সেখানে। একটা মলিন কয়েন, আকারে প্রায় এক ডলারের কয়েনের সমান।

ভ্রূ কুঁচকে গের ওর।

এই প্রথম কোনও ভিক্ষুক কিছু দান করছে ওকে!

পরিস্থিতিটা বুঝে ওঠার আগেই ঢলে পড়ে যেতে লাগল বয়স্ক লোকটা, যেন পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে কেউ। চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল গ্রে।

লোকটার ওজন এতো কম হবে তা আশা করেনি, একেবারে পাটকাঠির মতো হালকা। জ্যাকেটের নিচে হাড়গোড় ছাড়া কিছু নেই সম্ভবত। গ্রে-কে আঁকড়ে ধরল সে। গা অতিরিক্ত গরম, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য সংক্রামক রোগের ভয় খেলে গেল গ্রে'র মাথায়। তবে তাই বলে হাতের উপর শুয়ে পড়া লোকটাকে তো আর ফেলে দেয়া সম্ভব না!

পিঠের নিচে হাতটা ভেজা ভেজা ঠেকল। সামনে আনতেই দেখতে পেল, লোকটার তাজা রক্ত লেপ্টে আছে ওর হাতে। সাথে সাথে বিদ্যুতের বেগে কাজ শুরু করল মগজ। লোকটাকে জড়িয়ে ধরেই শরীর গড়িয়ে দিল পাশের ফুটপাতে, স্থির হতে না হতেই এক সেকেন্ড আগে বসে থাকা জায়গার কংক্রিটে দু'বার আলোর ঝলকানি আর সিমেন্টের ছিটকে ওঠা নজরে এল ওর। না থেমে গড়িয়ে চলল গ্রে। ক্যাসেলের ধাতব সাইনের আড়ালে গিয়ে থামল একেবারে। সাইনটা কোমর সমান উঁচু। তাতে লেখা–স্মিথসোনিয়ান ইনফর্মেশন সেন্টার। একেবারে ঠিক জায়গাতেই এসেছি, ভাবল ও। তথ্যই এখন দরকার। কে মারতে চাইছে ওকে?

সাইন পেরিয়ে কয়েক কদম এগোলেই মল। কোমর সমান সাইনটা আপাতত সুরক্ষা দিলেও বেশিক্ষণ এর আড়ালে বসে থাকা যাবে না। ক্যাসেলের প্রবেশমুখ মাত্র কয়েক গজ দূরে। মেরিল্যান্ডের সেনেকা ক্রীক থেকে আনানো লাল বেলেপাথরে নির্মিত-এর মিনারগুলো। একবার কোনোমতে গেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই আর চিন্তা নেই। তবে

এখন মাঝের খোলা জায়গাটুকু পার হওয়া আর স্নাইপারের সামনে নাচানাচি করা একই কথা।

ব্লেজারের নিচের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিলো ও, সিগ সাওয়ার পি টু টু নাইন মডেল। আততায়ীকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, তবে বিপদ কোনদিক থেকে আসে বলা তো যায় না!

গুঙিয়ে উঠল ভিক্ষুক লোকটা। রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে পুরনো জ্যাকেট। লোকটার কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল গ্রে'র। বেচারা এসেছিল কিছু সাহায্যের আশায়, বিনিময়ে পেল বুলেট। ওর বদলে খুন হতে হলো তাকে।

কে মারতে চাইছে গ্রে-কে? কেন?

ওর উরু চেপে ধরল লোকটা। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। রক্তের পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ কোনও অঙ্গে আঘাত করেছে বুলেট। মুঠো খুলে যেতেই কয়েনটা গড়িয়ে পড়ল কংক্রিটে। এতোকিছুর পরও কয়েনটা ছাড়েনি হাত থেকে।

ওর কাঁধে ঢলে পড়ল লোকটার মাথা, মারা গেছে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রের বুক চিরে।

পারলে মাফ করে দেবেন। বাঁচাতে পারলাম না আপনাকে।

একহাতে পকেট থেকে ফোন বের করে আনলো গ্রে, টিপে দিল ইমার্জেন্সি স্পিড ডায়াল বাটন। সাথে সাথেই উত্তর এল।

ঝড়ের বেগে নিজের বিপদের কথা সেন্ট্রাল কমান্ডকে জানাল ও।

"ইতোমধ্যে টিম রওনা হয়ে গেছে," বলে উঠলেন ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো। "ক্যাসেলের বাইরের ক্যামেরা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। অনেক রক্ত ছড়িয়ে আছে। তুমি কি আহত?"

"না," উত্তর দিল ও।

"ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো।"

কল কেটে দিল গ্রে। এখনও পর্যন্ত আর কোনও গুলি হয়নি। আততায়ী পালিয়েছে সম্ভবত। তবুও নড়বার সাহস হলো না ওর, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

সেলফোনটা পকেটে পুরে কয়েনটা তুলে নিলো ও। দেখে যতটা মনে হয় ততটা হালকা নয় অবশ্য। হাত থেকে কয়েনে রক্ত লেগে গেল কিছুটা। কাপড়ে মুছতেই সাথে সাথে পৃষ্ঠে একটা স্থাপনার কাঠামো নজরে এল। অনেকটা গ্রীক বা রোমান মন্দিরের মতো দেখতে, একটা ছাদের ভর মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছয়টা পিলার।

কয়েনটার একেবারে মাঝখানে একটা অক্ষর। গ্রের মনে হলো এটা গ্রীক অক্ষর $\sum$।

সিগমা!

গাণিতিকভাবে সাধারণত সিগমা চিহ্নের মাধ্যমে খণ্ডিতাংশের যোগফলকে বোঝানো হয়। তবে গ্রে'র কাছে সিগমা শুধুই একটা চিহ্ন বা অক্ষর নয়। ও যে সংস্থার হয়ে কাজ করে তার নামও সিগমা। স্পেশাল ফোর্সের প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা ডারপা

(ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টস অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি)-র আওতাধীন একটা সুপ্রশিক্ষিত দল, যার সদস্যরা ফীল্ড প্রজেক্টের পাশাপাশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ক্ষেত্রেও বিশেষ দক্ষ।

ক্যাসেলের কাঠামোর দিকে তাকাল গ্রে, সিগমার প্রধান কার্যালয় এর ভেতরেই অবস্থিত। ক্যাসেলের নীচে লুকিয়ে থাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের এক বাঙ্কারে। পেন্টাগন, হলস অফ গভার্নমেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আর গবেষণাগারের কাছাকাছি থাকতেই এই জায়গাটা বেছে নেয়া হয়েছে।

আবারও কয়েনটার দিকে নেমে এল গ্রের চোখ। আর তখনই নিজের ভুলটা ধরতে পারল ও। অক্ষরটা মোটেই গ্রীক $\sum$ নয়। এটা শুধুই E। ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে লেখা। আতঙ্কে ভুলভাল দেখেছে ওর চোখ। আসলে সিগমা সম্পর্কিত চিন্তাই ওকে বাধ্য করেছে উ কে $\sum$ ভাবতে।

কয়েনটা মুঠোয় পুরলো ও।

কোনও যোগসূত্র না থাকার পরেও, রশিকে সাপ ভাববার ভুলটা এই প্রথম করল না ও। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন অসংখ্য ভিত্তিহীন সূত্রের পেছনে ছুটেছে ও। আশা একটাই, বেঁচে আছে বন্ধু মঙ্ক কক্কালিস। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একেবারেই যেন গায়েব হয়ে গেছে মঙ্ক।

মরীচিকার পেছনে ছুটছ, সাবধান করেছিলেন অবশ্য ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো।

হয়তো তাই।

এমন সময় হঠাৎ খুলে গেল ক্যাসেলের প্রধান গেট। উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল কমব্যাট স্যুট পরা বারোটা অবয়ব।

সাহায্য এসে গেছে, ভাবল গ্রে। কমান্ডোদের চালচলনে সতর্কতা, কিন্তু কোনও গুলি ধেয়ে এল না তাদের দিকে।

দ্রুত এসে গ্রে-কে ঘিরে প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করল তারা। একজন বসে পড়ল ভিক্ষুক লোকটার মাথার কাছে। হাতে প্যারামেডিক ব্যাগ, সাহায্য করতে প্রস্তুত।

"সেসবের আর প্রয়োজন পড়বে না," বলল গ্রে।

লোকটার পালস চেক করল মেডিক। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল ওর কথায়।

মৃত...

উঠে দাঁড়াল গ্রে। ক্যাসেলের গেটে বস পেইন্টার ক্রো-কে দেখে একটু অবাকই হলো। চোখে মুখে চিন্তার আভাস, পদক্ষেপে দৃঢ়তা। বয়সে গ্রের চেয়ে বছর দশেক বড় হলেও এখনও নেকড়ের মতই ক্ষিপ্র। বিপদের তোয়াক্কা না করেই ওর দিকে এগিয়ে এলেন উনি।

দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে এল গ্রের কানে। "স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে খবর দিয়েছি আমি। পুরো মলটাকে ঘিরে ফেলেছে তারা," বললেন উনি। "অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তারপরও ব্যালিস্টিক ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে কোন জায়গা থেকে গুলি হয়েছে তা বের করার। কেউ কি অনুসরণ করছিল তোমাকে?"

মাথা নাড়লো গ্রে। "মনে তো হয় না।"

চারদিকে নজর বুলালেন পেইন্টার। তার চোখে খেলতে থাকা উদ্বিগ্নতা দেখতে পেল গ্রে। কে ওকে খুন করতে চাইল? কেন? তাও একেবারে সিংহের গুহার মুখে? এটা যে একটা সতর্কবার্তা, তা বুঝতে বাকি নেই ওর। সর্বশেষ কম্বোডিয়ার মিশনের পর তো কারও সাথে ঝামেলায় জড়ায়নি সিগমা!

"তোমার বাবা-মার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে," জানালেন পেইন্টার। "এই একটু সাবধানতা অবলম্বন আর কী।"

মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল গ্রে। অবশ্য বুঝতে পেরেছে বাবা-মা এতে নিশ্চয়ই খুশি হননি। মাত্র মাস দুয়েক আগে দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন তারা।

একটু আগের গোলাগুলির কথা ভাবতেই একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল গ্রের মনে, মঙ্ক। বন্ধুর অনুসন্ধানই কী তবে বিপদ ডেকে এনেছে ওর জন্যে? তাহলে হয়তো সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আশা জেগে উঠল মনে।

"ডিরেক্টর, এসবের সাথে কী..."

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন পেইন্টার। হাঁটু ভাঁজ করে মৃত লোকটার পাশে বসে পড়লেন তিনি। ভালো করে তাকালেন মৃতদেহটার দিকে। সরু হয়ে এল চোখজোড়া। আরও চিন্তিত দেখাতে লাগল তাকে।

"কোনও সমস্যা, স্যার?"

"আমার মনে হয় না আততায়ীর টার্গেট তুমি ছিলে গ্রে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "অন্তত মূল টার্গেট না। স্নাইপার হয়তো খুনের সাক্ষী না রাখতে তোমাকে আক্রমণ করেছিল।"

"এতোটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?"

লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "আমি চিনি তাকে," বলে চললেন ডিরেক্টর। তার নাম আর্চিবাল্ড পোক। এমআইটির প্রফেসর, নিউরোলজির।"

মৃত লোকটার পোশাকের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো হজম হলো না গ্রের। তবে পেইন্টার না জেনে কথা বলার লোক নন।

"এই অবস্থা কেন তার?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। "জানি না। বহুদিন ধরেই লোকটার সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না আমার। তবে প্রশ্ন হলো তার এই পরিণতির কারণ কী?"

আবারও লাশটার দিকে নজর গেল গ্রে'র। চিন্তার ঝড় চলছে মাথার ভেতর। এটা জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগল যে আততায়ীর টার্গেট অন্তত ও ছিল না। কিন্তু পেইন্টারের কথা সত্যি হয়ে থাকলে এসবের সাথে মঙ্কের ব্যাপারটার কোনও সম্পর্কই নেই।

রাগ মাথাচাড়া দিল ওর মনে। সেই সাথে দায়িত্ববোধও। লোকটা ওর হাতের উপর মারা গেছে।

"উনি সম্ভবত ক্যাসেলেই আসতে চেয়েছিলেন," বিড়বিড় করে বললেন পেইন্টার। "আমার সাথে দেখা করতে। কিন্তু কেন?"

সাথে সাথে কয়েনের কথাটা মনে পড়ল গ্রের। এখনও হাতের তালুতেই আছে ওটা। মুঠো খুলে হাতটা বাড়িয়ে দিল ও। "এটা দেয়ার জন্য সম্ভবত।"

দুপুর ২:০২

সাইরেনের আওয়াজ কানে যেতেই ধীর পায়ে পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটা শুরু করল লোকটা। পরনে ময়লা ধূসর স্যুট। এক হাতে ট্রাভেলিং ব্যাগ, অন্য হাতে একটা বাচ্চা মেয়ের এক হাত ধরা। একটু আগেই খেলার মাঠ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে নয় বছর বয়সী মেয়েটাকে। ওর কালো চুলগুলো মাথার পেছনে টেনে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। পায়ের চকচকে জুতোজোড়ায় মাঠ থেকে কাদা লেগে গেছে।

"তোমার বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছ, পাপা?" রাশিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে তার কোমল হাতে আলতো চাপ দিল লোকটা। "পেয়েছি...সাশা," জবাব দিল ক্লান্ত স্বরে। "কিন্তু তোমাকে বলেছিলাম ইংরেজীতে কথা বলতে।"

একটু যেন বিরক্ত হলো মেয়েটা। কয়েক সেকেন্ড পরই আবার মুখ খুলল। "তোমাকে দেখে কি তিনি খুশি হয়েছেন?"

প্রশ্নটা শুনে এক পলকের জন্য থমকে গেল লোকটা। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। স্নাইপার রাইফেল... মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেহ।

"হ্যাঁ। কিছুটা বিস্মিতও হয়েছে অবশ্য।"

"এখন কি তাহলে আমরা বাসায় ফিরছি? মার্তা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"ফিরব, খুব তাড়াতাড়ি।"

"কত তাড়াতাড়ি?" মেয়েটার গলায় অধৈর্য্যের আভাস টের পাওয়া গেল। প্রশ্নটা করে কান চুলকাতে লাগল ও। আচমকা রোদ লেগে ওর চুলের ভেতর কিছু একটা চকচক করে উঠল। মেয়েটার হাত ছেড়ে দিল লোকটা, সতর্কতার সাথে কানের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো। তারপর আলতো করে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

"আর মাত্র একটা কাজ বাকি। তারপরই বাড়ি ফিরব আমরা।"

হাঁটতে হাঁটতে টেনথ স্ট্রিটের কাছে চলে এসেছে তারা। বাক্সের এতো দেখতে ইটপাথরে তৈরি একটা দালানের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ডানদিকে। একসারি পতাকা শোভা পাচ্ছে দালানটার সামনে। প্রবেশমুখের দিকে তাকাল লোকটা।

এটাই তার গন্তব্য।

দেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগ্রেশনের প্রধান কার্যালয়।

দুপুর ৩:৪৬

ভাইব্রেশনের শব্দ ভেসে আসছে গ্রের লকার থেকে।

দ্রুত লকার রুমের দিকে এগোল ও। সবেমাত্র গোসল সেরে বেরিয়েছে। আরেকটু হলেই আছাড় খেত মেঝেতে। পরনে কাপড় বলতে শুধু কোমড়ে জড়ানো একটা তোয়ালে। ডিরেক্টর ক্রো-কে গোলাগুলির পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে কার্যালয়ের একেবারে

নিচের লেভেলে নেমে এসেছে ও। জিমে কিছুক্ষণ ঘাম ঝড়িয়ে নিয়ে গোসল করায় শরীরটা বেশ তরতাজা লাগছে এখন। শান্ত হয়েছে মনটাও।

তবে পুরোপুরি নয়।

খুনটার রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই ওর।

লকার খুলে ব্ল্যাকবেরি ফোনটা বের করে আনলো গ্রে, ডিরেক্টর ক্রো নিশ্চয়ই। তবে ততক্ষণে কেটে গেছে কলটা। কল লগ দেখে ভ্রূ কুচকালো ও। ডিরেক্টর না, স্ক্রিনে ভেসে আছেঃ আর.ট্রাইপোল।

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের ক্যাপ্টেন রন.ট্রাইপোল।

ইন্দোনেশিয়ার পুসাত দ্বীপে উদ্ধারকাজের কমান্ডে আছেন উনি। দুর্ঘটনাস্থলে তার তত্ত্বাবধানে নেভির দুটো সাবমার্সিবল কাজ করছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে ডুবে যাওয়া প্রমোদতরী মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ-এর ধ্বংসাবশেষ। উদ্ধারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আজকে রিপোর্ট করার কথা তার।

ওই দ্বীপেই গ্রে'র বন্ধু মঙ্ক কক্কালিসকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। একটা ভারী জালে আটকা পড়ে ডুবে যায় সে। মঙ্কের স্ত্রী ক্যাট ব্রায়ান্টের ভালো বন্ধু ক্যাপ্টেন ট্রাইপোল, সাবেক সহকর্মীও বটে। তিনি কথা দিয়েছিলেন মঙ্কের দেহ খুঁজে দেখবেন। আজ সকালেই গ্রে মেরিল্যান্ডের সুটল্যান্ডে অবস্থিত ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স সেন্টার থেকে ঘুরে এসেছে, যদি কোনও খবর পাওয়া যায় সেই আশায়। কিন্তু খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ওকে। বলা হয়েছে উদ্ধারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

একটা বেঞ্চে বসে নাম্বারটায় কলব্যাক করল গ্রে, রিং হচ্ছে ওপ্রান্তে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লকারটায় নজর পড়ল ওর। ডাক্ট টেপের উপর কালো কালি দিয়ে লকারের প্রাক্তন মালিকের নাম লেখা।

কক্কালিস।

যদিও সবাই জানে যে মারা গেছে মঙ্ক তবুও নামটা সরানোর ইচ্ছা জাগেনি কারও। এ যেন এক ক্ষীণ আশার প্রতীক। বন্ধু হিসেবে এটুকু সম্মান মঙ্কের প্রাপ্য।

ওর চেহারাটা ভেসে উঠল গ্রে'র চোখের সামনে। প্রায় একই সাথে ওরা দুজন যুক্ত হয়েছিল সিগমার সাথে। ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড সায়েন্সে ডিগ্রিধারী মঙ্ক এসেছিল গ্রিন ব্যারেট থেকে। অন্যদিকে গ্রে-কে আনা হয়েছিল লিভেনওর্দ জেল থেকে। আর্মি রেঞ্জার্স-এ থাকাকালীন এক সিনিয়র অফিসারের গায়ে হাত তোলার অপরাধে সাজা হয়েছিল তার। ভালো বন্ধুতে পরিণত হতে খুব একটা সময় লাগেনি ওদের। যদিও একে অপরের সাথে মিল খুব কমই ছিল। মঙ্কের উচ্চতা পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি, মাথায় চুলের বালাই নেই একরত্তি। অন্যদিকে গ্রে লম্বা, হালকা পাতলা গড়নের। কিন্তু আসল পার্থক্য ছিল অন্য জায়গায়। মঙ্কের শান্ত, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাবই গ্রে'র ঔদ্ধত্যকে লাগাম দিয়েছিল। তার সাহায্য না পেলে হয়তো আর্মির মতো সিগমা থেকেও বিদায় নিতে হত গ্রে-কে। একসাথে অনেক মিশনে গিয়েছে ওরা। তার কয়েকটার চিহ্নও রয়ে

গেছে মঙ্কের শরীরে, এমনকি একটা মিশনে গিয়ে হারিয়েছে বাম হাতটাও। পরে লাগিয়ে নিয়েছে প্রস্থেটিক হাত।

জলজ্যান্ত একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যেতে পারে? তা-ও আবার কোনও সূত্র না রেখেই?

ভাবতে ভাবতে কলটা রিসিভ হলো। "ক্যাপ্টেন রন ট্রাইপোল বলছি," জবাব দিল সতর্ক একটা কণ্ঠস্বর।

"ক্যাপ্টেন, আমি গ্রে পিয়ার্স।"

"ওহ, কমান্ডার। একটা খবর জানানোর ছিল আপনাকে।"

ক্যাপ্টেনের গলায় খারাপ কিছুর আভাস পেল গ্রে। "কী হয়েছে?"

"হাতে খুব একটা সময় নেই। একটা মিটিং-এ যেতে হবে। সরাসরিই বলি। আমাকে অনুসন্ধান বন্ধ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।"

"মানে?"

"এখন পর্যন্ত বাইশটা মৃতদেহ উদ্ধার করেছি আমরা। ডেন্টাল রেকর্ড অনুযায়ী আপনার বন্ধু এদের মাঝে নেই।"

"মাত্র বাইশটা? প্রাথমিক ধারনা অনুযায়ী সংখ্যাটা আরও বেশি হওয়ার কথা," গ্রে'র কণ্ঠে হতাশা।

"জানি কমান্ডার। তবে অতিরিক্ত গভীরতা আর চাপের কারনে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব না। লেগুনের তলদেশ অসংখ্য গুহা আর লাভা টিউবে ভর্তি। বেশ বিপদজনক।"

"কিন্তু..."

"কমান্ডার," ক্যাপ্টেনের গলায় দৃঢ়তা ফুটে উঠল। "দুদিন আগে আমাদের এক ডুবুরি মারা গিয়েছে। তারও একটা পরিবার ছিল, দুই সন্তানের বাবা ছিল ও।"

চোখ বন্ধ করল গ্রে, অপরাধবোধে ছেয়ে গেছে মন।

"গুহাগুলোতে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া মানে আমার লোকদের বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া। এই মানুষগুলোর জীবনের কোনও মূল্যই কী নেই? তাদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ হবে কীভাবে!"

চুপ করে রইল গ্রে।

"কমান্ডার, আপনার কাছে কী আর কোনও খবর আছে?"

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। ক্যাপ্টেনের সাহায্যার্থে একটা মেসেজ পাওয়ার কথা বলেছিল ও। মঙ্ক উধাও হবার কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা ওটা। দুর্ঘটনার পর মঙ্কের শরীরের একটা অংশ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, ওর প্রস্থেটিক হাত। ডারপার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীশক্তির এক চমৎকার নিদর্শন। হাতটার ভেতরের ঢোকানো ছিল তারহীন রেডিও ইন্টারফেস। মঙ্কের শেষকৃত্যে হাতটা নেয়ার সময় প্রস্থেটিক আঙুলগুলো দুর্বলভাবে এস.ও.এস. সংকেত দিতে থাকে, মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী সেই সংকেত শুধু গ্রে'র চোখেই ধরা পড়েছিল। তারপরই থেমে যায় আঙুলগুলো। টেকনিশিয়ানরা হাতটা পরীক্ষা করে ওটাকে যান্ত্রিক গোলযোগ বলে এতো দেয়। হাতটার ডিজিটাল লগে

কোনও সিগন্যাল আসার রেকর্ড ছিল না। ভুতুড়ে কারবার একেবারে। তারপরও হাল ছাড়েনি গ্রে, চেষ্টা চালিয়ে গেছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

"কমান্ডার?" ট্রাইপোলের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর।

"না," উত্তর দিল গ্রে। "আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আবার মুখ খুললেন ক্যাপ্টেন। "তাহলে এবার থামার সময় হয়েছে। এতেই সবার ভালো।" কোমল হয়ে এল তার কণ্ঠ। "আর ক্যাটের কী খবর?"

তিক্ত স্মৃতি দোলা দিয়ে গেল গ্রের মনে। ক্যাটকে ব্যাপারটা না জানালেই বোধ হয় ভালো হত। কিন্তু যতই হোক, সে মঙ্কের স্ত্রী। একটা বাচ্চা মেয়েও আছে ওদের, নাম পেনেলোপ। শেষকৃত্যের দিন কালো পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাট, ফুলে লাল হয়েছিল চোখজোড়া। নির্বিকারভাবে গ্রে'র কথাগুলো শুনেছিল সে। কথা শেষ হওয়ার পর লিমোজিনে বসিয়ে রাখা বাচ্চার দিকে তাকিয়েছিল একবার, তারপর আবার গ্রে'র দিকে। একটা কথাও বলেনি। একবার শুধু মাথাটা নেড়েছিল শুধু। জানতো সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ, তাই হয়তো সেই আশায় বুক বাঁধতে রাজী হয়নি। মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়ে মেয়েটা। তাছাড়া মঙ্কের একটা অংশ তো ওর কাছে রয়েছেই, পেনেলোপ। জীবন্ত একেবারে, কোনও মিছে আশা নয়।

মেনে নিয়েছিল গ্রে, একাই চালিয়ে গিয়েছে তদন্ত। সেদিনের পর থেকে আর ক্যাটের সাথে কথা হয়নি ওর। তবে গ্রের মা অবশ্য অনেকগুলো বিকেল কাটিয়েছেন ক্যাট আর ওর বাচ্চার সাথে। উনি অবশ্য এস.ও.এস. সংকেতের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, তবে হয়তো টের পেয়েছিলেন কিছু একটা ঘাপলা আছে।

কিন্তু গ্রে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ।

ওইদিনের ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু অবহেলা করেছিল ক্যাট, কিন্তু আশায় বুক বেঁধেছিল ঠিকই। পারেনি মনকে মানাতে। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছিল ও।

ওর জন্য, মঙ্কের বাচ্চার জন্য, সত্যটা মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল গ্রে।

"সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।"

"আপনি সাধ্যমত করেছেন কমান্ডার। কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় তো নেই। অতীতকে পেছনে ফেলেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়।"

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ও। "আপনার কর্মী মারা যাওয়ার ঘটনায় আমি দুঃখিত, স্যার।"

"আপনার বন্ধুর মৃত্যুতেও আমার সমবেদনা রইল।"

কলটা কেটে দিল গ্রে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেল মঙ্কের লকারটার দিকে। নাম লেখা টেপটায়হাত রাখতেই মৃত্যুর মতো শীতল লোহার স্পর্শ পেল।

ক্ষমা করো আমাকে বন্ধু।

একটানে টেপটা উঠিয়ে ফেলল ও। মরীচিকার পেছনে আর নয়।

বিদায়, মঙ্ক।

বিকেল ৪:০২

বনবন করে ডিরেক্টরের টেবিলের উপর ঘুরছে প্রাচীন কয়েনটা। মন্ত্রমুগ্ধের এতো জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছেন পেইন্টার। দৌড়ে চলেছে মগজ, চেষ্টা করছে রহস্যভেদের। প্রায় আধাঘন্টা আগে ল্যাব থেকে ফেরত দেয়া হয়েছে এটা। সাথে পাঠানো রিপোর্টটা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তিনি।

লেজার ম্যাপিং করা হয়েছে আঙুলের ছাপ বের করার জন্য, ধাতব গঠন নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়েছে ম্যাস স্পেকট্রোমিটার। অসংখ্য ছবিও তোলা হয়েছে স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ দিয়ে।

আস্তে আস্তে কমে এল ঘূর্ণনের গতি, অবশেষে থেমেই গেল। পরিষ্কার এক প্রাচীন চিত্র জ্বলজ্বল করছে কয়েনটার গায়ে। ছয় পিলারের গ্রীক মন্দির, একেবারে মাঝ বরাবর একটা অক্ষর।

E

গ্রীক অক্ষর এপসিলন। অপর দিকে নারীর প্রতিকৃতি, যার নিচে লেখা 'ডিভা ফস্টিনা'।

আচমকা খড়খড় করে উঠল ইন্টারকম। "ডিরেক্টর ক্রো, কমান্ডার পিয়ার্স এসেছেন।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও, ব্রান্ট।"

রিসার্চ রিপোর্টটা হাতে নিতে নিতেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল গ্রে। আঁচড়ানো কালো চুলগুলো এখনও ভেজা, গোসল করে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। পড়নে 'আর্মি' লেখা একটা সবুজ টিশার্ট, কালো জিন্স আর পায়ে বুট। একটা কালো ছায়া যেন ওর মুখে ঝুলে থাকতে দেখলেন পেইন্টার। সাথে নীলচে বাদামি চোখে নতুন প্রত্যয়। কারনটাও অজানা নয়, নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে আসা খবরটা তার কানেও পৌছেছে।

ইশারায় ওকে বসতে বললেন পেইন্টার।

বসতে বসতে টেবিলে রাখা কয়েনটায় নজর পড়ল ওর, কৌতুহল খেলে গেল যেন চোখের তারায়।

"চমৎকার।"

কয়েনটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন পেইন্টার। "জানি তুমি ছুটি চেয়েছ গ্রে। কিন্তু আমি চাই তুমি এই কাজটা নাও।"

কয়েনটায় কোন আগ্রহ দেখাল না গ্রে। "আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি, স্যার?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডিরেক্টর।

"আপনি বলেছিলেন ওই মৃত প্রফেসর এখানেই আসছিলেন। আপনার সাথে দেখা করতে।"

"আর্চিবাল্ড পোক।"

মাথা ঝাঁকালেন পেইন্টার। অনুমান করতে পারছেন প্রশ্নটা সম্পর্কে।

"তবে কি তিনি সিগমা সম্পর্কে জানতেন? যতদুর জানি এ ব্যাপারে জানতে হলে টপ ক্লিয়ারেন্স থাকতে হয়। তবে তিনি জানতেন কীভাবে?"

"জানতেন, কারণ তিনিই সিগমার জনক।" আচমকাই যেন বোমা ফাটালেন পেইন্টার। কথাটা শুনে গ্রের চোখেমুখে ফুটে ওঠা বিস্ময়টুকু উপভোগ করলেন উনি।

নড়েচড়ে বসল গ্রে। হাত তুলে তাকে থামালেন পেইন্টার। "তোমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলে। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কেসটা নিচ্ছো তো?"

"নিচ্ছি। তবে আমার কোলে মারা গেছেন প্রফেসর, তাই আগে কিছু উত্তর জানতে চাই।"

"তুমি নিশ্চিত? হাতে আর কোনও বাড়তি কাজ নেই তো?"

হাহাকার করে উঠল গ্রের বুকের ভেতরটা, সেই সাথে মুখে ফুটে উঠল কাঠিন্য। "আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন।"

"হ্যাঁ, নেভি তাদের উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করেছে।"

লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রের গলা বেয়ে। "সব রকম চেষ্টাই করেছি আমি। আর কোনও পথ খোলা নেই।"

"তুমি কী ভাবছ? মঙ্ক বেঁচে আছে?"

"আমি...আমি জানি না।"

"এই অসমাপ্ত পরিণতি মেনে নিতে পারবে তো?"

"পারতে তো হবেই।"

মাথা ঝাঁকালেন পেইন্টার, উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। "তাহলে চলো, এই কয়েন রহস্যের সমাধান করা যাক।"

কয়েনটা হাতে নিল গ্রে। "এটা সম্পর্কে জানা গেছে কিছু?"

"তা গেছে। কয়েনটা রোমান আমলের। দ্বিতীয় শতাব্দিতে তৈরী। কয়েনের অন্যপাশে একটা নারীর মুর্তি আছে দেখ। উনি রোমান সম্রাট আন্তোনিনাস পিয়াসের স্ত্রী, ফস্টিনা দ্য এল্ডার। অনেক দয়ালু ছিলেন মহিলা। সাম্রাজ্যের এতিম মেয়েদের দেখভাল উনিই করতেন। মহিলাদের অনেক দাতব্যশালায়ও দান খয়রাত করতেন। তার চরিত্রের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। গ্রীসের এক মন্দিরের আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন নারীগোষ্ঠী, সিবিল'স এর ভগ্নীসংঘের প্রতি অসীম আগ্রহ ছিল তার।"

গ্রে কে কয়েনটা উল্টাতে ইশারা করলেন পেইন্টার। "দেখতে পাচ্ছ মন্দিরটা? টেম্পল অফ ডেলফি।"

"ওরাকল অফ ডেলফির সেই ডেলফি নয় তো?"

"হ্যাঁ। ওই নারী পথপ্রদর্শকদের মন্দিরই ওটা।"

ওরাকলদের বিশদ বিবরণও যুক্ত করা আছে কয়েনের সাথে আসা রিপোর্টে। বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে ওই নারীরা হ্যালুসিনোজেনিক ধোঁয়ায় শ্বাস নিয়ে এক ধরণের ঘোরে চলে যেতেন আর উত্তর দিতেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নের। তাদের ওই কথাগুলো নিছক শুধু ভবিষ্যৎবাণীই ছিল না, তৎকালীন পৃথিবীর উপর ওই নারীদের প্রভাব ছিল বিস্তর। কালের পরিক্রমায় ইতিহাসের পদে পদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছেন ওরাকলরা।

মুক্ত করেছিলেন হাজারো দাসকে, পাশ্চাত্যে বুনেছিলেন গণতন্ত্রের বীজ, যোজন যোজন এগিয়ে নিয়ে গেছেন মানব সভ্যতাকে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক দাবী করেন, প্রাচীন গ্রীসকে বর্বরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আধুনিক সভ্যতার আলোতে নিয়ে এসেছিলেন ওরাকলরাই।

"কিন্তু মন্দিরের মাঝে আঁকা ওই অক্ষরটার বিশেষত্ব কী?" জিজ্ঞেস করল গ্রে। "নিশ্চয়ই গ্রীক অক্ষর এপসিলন ওটা?"

"হ্যাঁ। ওটা মন্দিরেরই অংশ। বেশ কিছু খোদাই করা গুপ্ত সংকেত পাওয়া গেছে মন্দিরের ভেতর, *গ্নোথি সিউটোন*, অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায়..."

"নিজেকে জানো," আগেই বলে দিল গ্রে।

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। মনেই ছিল না প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে ভালো দখল আছে গ্রের। লিভেনওর্দ কারাগার থেকে ছাড়িয়ে এনে সিগমায় রিক্রুটের সময় উচ্চতর রসায়ন আর প্রাচীন তাও ধর্মমত নিয়ে পড়াশোনা করছিল ও। ওর অনন্য এই মানসিকতাই নজর কেড়েছিল পেইন্টারের। তবে সুবিধার পাশাপাশি এমন মানসিকতার কিছু অসুবিধাও আছে। অন্যদের সাথে চিন্তাধারা বিশেষ মেলে না গ্রে'র, গত কয়েক সপ্তাহে যা বোঝা গেছে পরিষ্কারভাবেই। অতীত ভুলে বর্তমান কাজে ওকে মনোযোগ দিতে দেখে খুশি হলেন ডিরেক্টর।

"আর ওই এপসিলনের ব্যাপারটা," বলতে থাকলেন পেইন্টার। "মন্দিরের ভেতর দেবালয়ে খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে ওটা।"

"এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে?"

শ্রাগ করলেন পেইন্টার। "জানে না কেউ, গ্রীকরাও জানত না। আমাদের জানা ইতিহাস অনুযায়ী, গ্রীক পণ্ডিত প্লুটার্ক সর্বপ্রথম এই অক্ষরটা জনসম্মুখে আনেন। তবে আধুনিক ইতিহাসবেত্তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে মূলত একটা নয়, বরং দুটো অক্ষর ছিল মন্দিরে। একটা G আর একটা E, একত্রে এগুলো দেবী গাইয়া কে নির্দেশ করে। ডেলফির প্রাচীনতম মন্দির নির্মিতই হয়েছিল দেবী গাইয়ার পূজা দিতে।

"এই অক্ষর যদি এতোটাই রহস্যময় হয়, তাহলে এই কয়েনের উপর ছাপাল কেন?"

ডেস্কের উপর দিয়ে রিপোর্টটা গ্রে'র দিকে ঠেকে দিলেন পেইন্টার। "এটা পড়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। কালের পরিক্রমায় ওরাকলের E হয়ে ওঠেছিল দিব্যতার প্রতীক। অতীতের অনেক চিত্রকর্মেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। নিকোলাস পুসিনের অর্ডিনেশনে, খৃষ্টের মাথার উপর দিয়ে যখন তিনি পিটারের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্বর্গের চাবিকাঠি। মূলত এটা এমন এক মুহূর্তের নিদর্শক, যখন কোনও যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা। হোক সে ডেলফির ওরাকল বা নাজারেথের যীশু।

কাগজটায় চোখ বুলালো গ্রে। "কিন্তু এর সাথে মৃত লোকটার কী সম্পর্ক?" হাতে তুলে নিলো কয়েনটা। "এটা কি এতোই মূল্যবান যার জন্য মানুষ খুন করতে হবে?"

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "মোটেই না। তেমন কোনও দামই নেই এটার।"

"তাহলে?"

এমন সময় বেজে উঠল ইন্টারকম। "বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ডিরেক্টর," স্পীকারে বলে উঠল ক্যাট ব্রান্ট।

"কী হয়েছে?"

"প্যাথলজি ল্যাব থেকে ইমারজেন্সি কল এসেছে। ড. জেনিংস এখনই আপনার সাথে টেলি-কনফারেন্স করতে চান।"

"ঠিক আছে। এক নাম্বার মনিটরে সংযোগ দাও।"

চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে পড়তেই গ্রে-কে বসতে ইশারা করলেন পেইন্টার। মাটির নিচে লুকোনো এই বাংকারে কোনও জানালা না থাকলেও দেয়ালে ঝোলানো তিনটা বিশালাকৃতির প্লাজমা স্ক্রিন আছে। পুরো দুনিয়ার জানালা হিসেবে কাজ করে এগুলো। বামপাশের স্ক্রিনটা চালু হয়ে গেল মুহূর্তেই।

স্ক্রিনে আবির্ভূত হলেন ড. ম্যালকম জেনিংস। ষাট বছর বয়সী এই লোক বর্তমানে সিগমার রিসার্চ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত। তার পরনে সার্জারির সবুজ পোশাক, কপালের উপর উঠিয়ে রেখেছেন মুখ ঢাকার মাস্ক। পেছনে প্যাথলজি ল্যাবের বেশিরভাগ অংশই দেখা যাচ্ছে। সিল করা কংক্রিটের মেঝে, সারি সারি ডিজিটাল স্কেল আর ঘরের একেবারে মাঝখানে একটা টেবিল। চাদরে ঢাকা একটা লাশ শুয়ে আছে সেখানে।

প্রফেসর আর্চিবাল্ড পোক।

সিটি মর্গ থেকে লাশটা ছাড়িয়ে আনতে কয়েকটা ফোনকলই যথেষ্ট ছিল।

ম্যালকম জেনিংস নামকরা ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট। কিন্তু তার মুখের উপর জমে থাকা কালো ছায়াই বলে দিচ্ছে, কিছু একটা ঘাপলা আছে।

"কী হয়েছে, ডক্টর?"

"ল্যাবটা কোয়ারেন্টাইন করতে হয়েছে।"

উত্তরটা কেমন যেন ঠেকল পেইন্টারের কানে। "সংক্রমণের আশংকা আছে?"

"না। তবে...বলার চাইতে, তোমাদেরকে দেখালেই ভালো হবে।" ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গেলেন তিনি। তবে কথা বলে চলেছেন। "দেহটা প্রাথমিক পরীক্ষা করার পরপরই সন্দেহ হয়েছিল আমার। আলামতগুলো স্পষ্ট। চুল পড়া, দাঁত পড়ে যাওয়া, পোড়া চামড়া। গুলি না খেলেও বেশিদিন বাঁচত না লোকটা।"

"খুলে বলুন, ডক্টর জেনিংস।"

আবারও ক্যামেরার সামনে ফিরে এলেন প্যাথলজিস্ট। এবার আগের চেয়ে ভারী অ্যাপ্রন পরে। হাতে একটা লম্বা, কালো যন্ত্র।

মনিটরের দিকে ঘেঁসে এল গ্রে।

লাশটার উপর দিয়ে যন্ত্রটা ঘুরিয়ে আনলেন তিনি। সাথে সাথে কড়কড় শব্দে যেন আপত্তি জানাল ওটা। এতোক্ষণে চিনতে পারলেন পেইন্টার যন্ত্রটাকে। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপে কাজে লাগে-গাইগার কাউন্টার।

ক্যামেরার দিকে তাকালেন প্যাথলজিস্ট।

"লাশটা তেজস্ক্রিয়।"

২
৫ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৫:২৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের সামনের ফুটপাতে নেমে এল গ্রে। ন্যাশনাল মলটা বামে রেখে এগিয়ে চলল সামনে। বিকেলের দুর্ঘটনাস্থলটা ছাড়িয়ে চলে এসেছে। জায়গাটা টেপ দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ, ফরেনসিক বিভাগ কাজ শেষ করে চলে গেলেও পাহাড়ায় রেখে গেছে একজন পুলিশ সদস্যকে।

জেফারসন ড্রাইভ ধরে পুর্বদিকে এগিয়ে চলল গ্রে। ওকে ছায়ার এতো অনুসরণ করছে পাহাড়সমান এক দেহরক্ষী। লোকটার নাম জো কোয়ালস্কি, নেভির সাবেক সদস্য। ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইছে ও। কোনও বাড়তি সুরক্ষা নিতে চায়নি গ্রে, অন্তত এই লোককে তো নয়ই। তারপরও জোর করে গছিয়ে দেয়া হয়েছে।

গলার চামড়ার নিচে, বিশেষ পদ্ধতিতে আটকানো মাইকটা স্পর্শ করল গ্রে। "একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি।"

"অনুসরণ করতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার ক্রো।

"হ্যাঁ। তবে মনে হয় না খুব বেশিদূর এগোনো যাবে। রিডিং খুব দুর্বল।"

এই বুদ্ধিটা আসলে গ্রে'র-ই। গামা স্কাউট পোর্টেবল রেডিয়েশন ডিটেক্টর সম্পর্কে আগেই জানা ছিল ওর। তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়ে যন্ত্রটার হ্যালোজেন ভর্তি গাইগার মুলার টিউব বেশ কার্যকরী। বিশেষ করে প্রফেসরের দেহে পাওয়া স্ট্রনটিয়াম-৯০ আইসোটপের মতো কোনও তেজস্ক্রিয় মৌলের বিশেষ বিকিরণ ধরার কাজে লাগিয়ে দিলে তো কথাই নেই। গ্রে আশা করছিল, ক্যাসেলে আসার পথে তেজস্ক্রিয়তার ধারা ফেলে এসেছেন পোক। দেখা যাচ্ছে, ওর অনুমান ভুল ছিল না।

"যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করো, গ্রে। প্রফেসরের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী। তার মেয়েকে ফোন করেছিলাম আমি, পাইনি।"

ডিটেক্টরের রিডিং খেয়াল করতে করতে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল গ্রে। "ঠিক আছে, স্যার। কিছু পেলেই জানাব আপনাকে।"

আরও আধ ব্লক এগিয়ে গেল ও, তারপর আচমকাই হারিয়ে গেল সিগনাল। ট্রেইলটা ফিরে পাবার জন্য পিছাতে লাগল গ্রে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ধুপ করে ধাক্কা খেল কোয়ালস্কির পেশীবহুল শরীরে।

"চোখের মাথা খেয়েছ নাকি, পিয়ার্স?" ফুঁসে উঠল লোকটা। "সবে মাত্র পালিশ করেছিলাম জুতো জোড়া।"

ঘুরে তার দিকে তাকাল গ্রে। ততক্ষণে বসে পড়ে কোটের হাতা দিয়ে জুতোর সামনের অংশ মোছা শুরু করেছে কোয়ালস্কি। "পুরো তিনশো ডলার গুনতে হয়েছে

এগুলোর জন্য, বুঝলে? ইংল্যান্ড থেকে আনিয়েছি। আমার পায়ের মাপ মিলিয়ে বিশেষভাবে বানাতে হয়েছে।"

চোখ কুচকালো গ্রে। তাকে ওভাবে তাকাতে দেখে হুঁশ হলো কোয়ালস্কির। একটু বেশিই বকে ফেলেছে। পানসে হয়ে গেল লোকটার মুখ। "না মানে... জুতোগুলো আমার খুবই পছন্দের। সুন্দর, তাই না? আর তাছাড়া আমার একটা মেয়ের সাথে আজ দেখা করার কথা ছিল, আসেনি যদিও।"

"থাক। মন খারাপ করো না,"বলল গ্রে। মেয়েটার মাথায় বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

"না না। মন খারাপের কী আছে! দাগ পড়েনি এই অনেক," জবাবে বলল কোয়ালস্কি।

"আসলে আমি মেয়েটার না আসার কথা বলছিলাম।"

"ও আচ্ছা। আমার কী?" শ্রাগ করল ও। "মেয়েটারই ক্ষতি।"

হাসি আটকাতে হাতে ধরা ডিটেক্টরের দিকে নজর দিল গ্রে। একটু নাড়াচাড়া করতেই ডানপাশে আবারও ধরা পড়ল ট্রেইল। ফুটপাত থেকে বাঁক নিয়ে এখন সরে গেছে মলের দিকে।

"এই যে, এদিকে।"

হার্শহর্ন মিউজিয়ামের বিপরীতেই মলের ভাস্কর্য বোঝাই বাগান। প্রফেসরের ট্রেইল অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে চলল সেই বাগানের ভেতর দিয়ে। শ্রমিক দিবস উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান ছিল মলের পাশেই। সেখানে খাটানো তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে এগোনোর সময় পেছন ফিরে বাগানটার দিকে তাকাল গ্রে।

"আড়ালে থাকার চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর।"

"এমনও তো হতে পারে যে তার গরম লাগছিল," ভুরু থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলল কোয়ালস্কি। "তাই ছায়ায় চলছিলেন।"

চারপাশে ঘুরতে লাগল গ্রের সতর্ক চোখ। পশ্চিমে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পেছনে হেলে পড়েছে সূর্য, পূবাকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে ইউএস ক্যাপিটাল বিল্ডিঙের গম্বুজ। থামল না গ্রে। যতই মল থেকে দূরে সরে যেতে লাগল ও, ততই দুর্বল হয়ে এল সিগনাল।

মলের শেষ মাথায় এসে ম্যাডিসন ড্রাইভ ধরে দ্রুত এগোলো ও। ট্রেইল ধরে এসে ঢুকল আরেকটা পার্কে। একটা ঝোপের দিকে এগোতে থাকলে সবল হতে লাগল সিগনাল। পাশেই একটা বেঞ্চ। গ্রে যন্ত্রটা বেঞ্চের সামনে নিতেই লাফিয়ে উঠল কাঁটা।

তবে কি পোক বসেছিলেন এখানে? এজন্যেই তেজস্ক্রিয়তা এতো বেশি?

ঝোপের একটা ডাল সরাতেই সরাসরি মলের একাংশ দেখতে পেল গ্রে। দেখা যাচ্ছে স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলও। নিরাপত্তার জন্যেই কি এখানে লুকিয়েছিলেন প্রফেসর?

ম্যালকমের কথাগুলো মনে পড়ল তার। প্রফেসরের অন্তিমক্ষণ খুব বেশি দূরে ছিল না। এজন্যই নিরুপায় হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু কেন?

"এটা দেখ," ঝোপের পাশ থেকে বলল কোয়ালস্কি। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে আছে ও। ঝোপের তলায় হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে আনলো। একটা বাইনোকুলার।

ডিটেক্টরটা বাইনোকুলারের উপর ধরতেই কাঁটাটা লাফ দিয়ে আরও উপরে উঠে গেল।

"এতো দেখি তেজস্ক্রিয়তার খনি!"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই ফিতা ধরে বাইনোকুলারটা বাড়িয়ে দিল কোয়ালস্কি। "নাও নাও। এটা আমি আর এক মুহূর্তও হাতে রাখতে রাজি নই।"

কোয়ালস্কির অহেতুক ভয় দেখে বিরক্ত হল গ্রে। আতঙ্কিত হওয়ার মতো তেজস্ক্রিয় নয় বাইনোকুলারটা। নিজের হাতে নিল ও ওটাকে। চোখে লাগিয়ে ক্যাসেলের দিকে তাকাল। মুহূর্তেই ক্যাসেলের কাঠামোটা অনেকগুণ বড় হয়ে ধরা দিল তার চোখে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। পোকের সাথে দেখা হওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। তবে কি প্রফেসর ওকে চিনতে পেরেছিলেন? ওকে দেখেই আড়াল থেকে বের হয়েছিলেন?

কোমরে ঝোলানো ব্যাগে বাইনোকুলারটা রেখে দিল গ্রে।

"চলো।"

ঝোপ-ঝাড় পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল ওরা। ট্রেইল ধরে অনুসরণ করতে করতে চলে এল স্মিথসোনিয়ানের বিখ্যাত জাদুঘরগুলোর একটার সামনে। ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টোরি। গোটা দুনিয়ার তাবৎ ভৌগলিক আর নৃতত্ত্বের বিশাল সংগ্রহ ঠাঁই পেয়েছে এখানে। আছে ছোটখাটো প্রাণী থেকে টি-রেক্সের ফসিল পর্যন্ত!

ভেতরে ঢোকার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পুরো জাদুঘরের কাঠামোতে নজর বুলালো গ্রে। জাদুঘরের প্রবেশমুখে ছয়টা দানবীয় পিলারের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক ত্রিকোণাকার পোর্টিকো। তার উপর যেন ঝুলে আছে জাদুঘরের বিশালাকায় গম্বুজটা। মিলটা চোখে ধরা পড়তেই চমকে উঠল ও। প্রফেসরের কয়েনে আঁকা মন্দিরের সাথে আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য আছে জাদুঘরের কাঠামোর।

দুটোর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে?

ভেতরে ঢোকার আগে সেন্ট্রাল কমান্ডকে সব জানানোর সিদ্ধান্ত নিলো গ্রে। ডিরেক্টর ক্রো যেন ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন।

"কিছু পেলে?"

"প্রফেসরের ট্রেইল ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের ভেতরে চলে গেছে," নিচু গলায় উত্তর দিল ও।

"মিউজিয়ামের ভেতর!"

"ভেতরটা খুঁজে দেখছি আমরা। তবে একটা প্রশ্ন, এই জায়গার সাথে কি প্রফেসরের কোনও সম্পর্ক ছিল?"

"আমার জানামতে, না। তবে আরও খোঁজ নিচ্ছি।"

সাথে সাথে পোকের অতীতের ব্যাপারে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। "আরেকটা প্রশ্ন, ডিরেক্টর। একটা বিষয় জানা হয়নি।"

"কী?"

"আপনি বলেছিলেন সিগমার জনক প্রফেসর পোক। এর মানে কী?"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পেইন্টার। তারপর বলা শুরু করলেন, "দ্য জেসনস সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি, গ্রে?"

প্রশ্নটার আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারল না ও। "স্যার?"

"*দ্য জেসনস* একটা বৈজ্ঞানিক থিংক-ট্যাংক, স্নায়ুযুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের একটা সংগঠন। তৎকালীন কিছু নোবেল বিজয়ী একত্রিত হয়ে ওটা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের কাজ ছিল মিলিটারিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া।"

"প্রফেসর পোক কি ওই সংস্থার সদস্য ছিলেন?"

"হ্যাঁ। তো যা বলছিলাম, প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে মিলিটারির কাছে দ্য জেসনস-এর কদর বাড়তে থাকে। প্রতি বছরের গ্রীষ্মে তারা মিলিত হয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করতেন। আর এমনই এক মিটিং এ আর্চিবাল্ড পোক, ডারপার অধীনে এমন এক বিজ্ঞানভিত্তিক গোয়েন্দা দল গঠনের পরামর্শ দেন, যারা মাঠপর্যায়েও কাজ করবে।"

"আর এভাবেই জন্ম হয় সিগমার।"

"হ্যাঁ। তবে আমার মনে হয় না তার মৃত্যুর সাথে এসবের সম্পর্ক আছে। যতদূর জানি, বহু বছর ধরেই জেসনস থেকে দূরে ছিলেন পোক।"

"এমনও তো হতে পারে যে দ্য জেসনস এর কেউ কাজ করত এই জাদুঘরে? হয়তো তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি?"

"হতে পারে। আমি দেখছি বিষয়টা। তবে সময় লাগবে। বিগত অনেক বছর ধরে গা ঢাকা দিয়ে চলছে সংস্থাটি, ভাগ হয়ে গেছে বিভিন্ন প্রজেক্টে। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে যে বর্তমানে একজন জেসনস জানে না অন্যরা কী নিয়ে কাজ করছে। যাই হোক, আমি দেখছি কী করা যায়।"

"ঠিক আছে। আর আমি দেখছি এই ট্রেইল শেষ অবধি কোথায় গিয়ে ঠেকে।"

কল কেটে কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো গ্রে। "চলো, ভেতরে ঢোকা যাক।"

"অবশেষে সূর্যের হাত থেকে নিস্তার মিলতে চলল।" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কোয়ালস্কি।

মনে মনে সায় দিল গ্রে। এই গরমে কিছুটা ত্যক্ত বিরক্ত ও নিজেও। দরজা দিয়ে ঢুকতেই এ.সি.র শীতল বাতাস জুড়িয়ে দিল গা। জাদুঘরটা সবার জন্য উন্মুক্ত, তবুও মেটাল ডিটেক্টর হাতে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের উদ্দেশ্যে কালো আইডি কার্ডটা তুলে ধরল ও। পথ ছেড়ে দিল গার্ড।

মূল হলঘরের বিশালত্ব দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল গ্রের। হলঘরটা তিন তলা, আটকোনাকৃতি। প্রতিটা তলায় অনেকগুলো করে পিলার। আর ওপরে ছড়িয়ে আছে বিশাল গম্বুজ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জানালা দিয়ে বানের জলের এতো ঢুকছে সূর্যের আলো।

হলঘরের একদম মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা আট টনি আফ্রিকান হাতি। জাদুঘরের মাস্কটগুলোর মধ্যে এটা একটা। শুঁড় তুলে আছে আগত দর্শনার্থীদের অভিবাদন

জানানোর ভঙ্গিতে। পোকের পথ অনুসরণ করে হাতিটাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির উদ্দেশ্যে এগোলো গ্রে।

এমন সময় বাম পাশের দেয়ালে একটা ব্যানার চোখে পড়ল ওর। সামনের মাসে একটা প্রদর্শনী আছে, তারই বিজ্ঞাপন। একটা গোলাকার বর্ম শোভা পাচ্ছে ব্যানারটায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বর্মটায় প্রতিফলিত হচ্ছে সাপ বোঝাই একটা মাথা-মেডুসা।

প্রদর্শনীর নামটা চোখে পড়তেই গতি কমে গেল গ্রে'র। পোকের দেওয়া কয়েনটা ভেসে উঠল কল্পনায়। ও এখন নিশ্চিত যে, সঠিক পথেই এগোচ্ছে ওরা।

গ্রীক পুরাণের হারিয়ে যাওয়া যত রহস্য

সন্ধ্যা ৬:৩২

রুমটা অনেকটা স্টেডিয়ামের মতো, চার সারি সিট উঠে গেছে ধাপে ধাপে। বাতিগুলো সব নিভানো এখন। দুটো বাদে বাকি সব চেয়ার খালি। অন্ধকারে বসে আছেন দুজন মানুষ। একটা গোপন মিটিং-এ মিলিত হয়েছেন তারা।

ওয়ান-ওয়ে গ্লাস দিয়ে দুজন তাকিয়ে আছেন একটা শিশুদের খেলাঘরের দিকে। কাঁচের ওপাশের রুমটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সাদা দেয়ালে নীলচে আভা। মনস্তত্ত্ব বলে, নীল রঙ নাকি আকাশের মতোই মনকে প্রশান্তি দেয়। একটা খাট, বাক্সভর্তি খেলনা আর একটা ছোট ডেস্ক নিয়ে এই রুম।

দুজনের মধ্যে বয়স্ক লোকটা মূর্তির মতো সোজা হয়ে বসে আছে চেয়ারে। তার পাশে একটা ছোট ব্যাগে ড্রাগনভ স্নাইপার রাইফেল। অন্যজনের বয়স সাতান্ন ছুঁয়েছে, তার রাশান সঙ্গীর চেয়ে প্রায় বিশ বছরের ছোট। লোকটার পরনে পরিপাটি স্যুট, দৃষ্টি আলোকিত রুমটায় প্লাস্টিক ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে। গত আধঘণ্টা যাবত কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করছে মেয়েটা। সাদা কাগজে সবুজ রঙের ওপর চারকোনা কিছু। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বারবার হাত ঘুরিয়েই যাচ্ছে সে।

"ড. রাইভ," সম্বোধন করল লোকটা। "ড. পোকের কাছে যে জিনিসটা ছিল না, সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?"

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন ড. ইউরি রাইভ। "আমার পুরো জীবন আমি এই প্রজেক্টের পিছনে ঢেলেছি," ধীরে ধীরে বললেন তিনি। "তীরে এসে তরী ডোবানোর কোনও ইচ্ছে নেই আমার।"

"তাহলে গেল কোথায় জিনিসটা? গতকাল রাতে পোক যে হোটেলটায় ছিল, তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে ওখানে। পাওয়া যায়নি কিছুই। জানেনই তো, যার তার হাতে পড়লে কতখানি ঝামেলা সৃষ্টি হবে!"

পাশে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকালেন ইউরি। জন ম্যাপলথোর্প তার নাম, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিভিশন চীফ। বয়স জেঁকে বসেছে চেহারায়, ঝুলে গেছে চোখের নিচের চামড়া। তারপরও চুলে কলপ লাগিয়ে বয়স কমানোর চেষ্টায় কমতি নেই। ভাঁজ পড়েছে ইউরির চামড়ায়ও, কিন্তু জরাগ্রস্ত এই দেহের ভেতর বাস করছে এক

টগবগে তরুণ। আগেকখনওই নিজেকে এতোটা তরুণ, এতোটা সক্ষম মনে হয়নি তার। অবশ্য এর পেছনে অ্যান্ড্রোজেন আর গোথ হরমোন ইনজেকশনের অবদান অনস্বীকার্য।

"পোকের চুরি করা জিনিসটা যে করেই হোক উদ্ধার করতে হবে," চেয়ারের হাতলে তুড়ি বাজাতে বাজতে বললেন ম্যাপলথোর্প।

"বললাম তো ওটা তার কাছে ছিল না," আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন ইউরি। "এত বড় একটা জিনিস লুকিয়ে রাখা খুব সহজ কাজ নয়, এমনকি জ্যাকেটের নীচে লুকালেও না। কপাল ভালো সে কারও সাথে কথা বলার আগেই থামাতে পেরেছিলাম।"

"আপনার কথাই যেন সত্য হয়। নাহলে খারাপি আছে সবার কপালে।" মেয়েটার দিকে ফিরলেন ম্যাপলথোর্প।

"বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এই পিচ্চি মেয়েটাই তার সন্ধান দিয়ে সেই রাশিয়া থেকে এতোদূর নিয়ে এসেছে আমাদের।"

মাথা ঝাঁকালেন ইউরি, গর্ব তার চোখে মুখে। "মেয়েটা আর ওর ভাইয়ের সাহায্যে শেষ বাধাটুকুও অতিক্রমের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি আমরা।"

"ভালো হতো যদি আরেকটু তাড়াতাড়ি করা যেত কাজটা," পাত্তা না দিয়ে বললেন ম্যাপলথোর্প। "শুনুন, বলি আপনাকে, আমার শালার নাতিটাও অটিস্টিক। কিন্তু সেটা আপনার এই মেয়ের মতো কাজের না, পুরোই রদ্দি মাল। জুতোর ফিতেটাও বাঁধতে পারে না নিজে।"

বিতৃষ্ণা নিয়ে আমেরিকান লোকটার দিকে তাকালেন ইউরি। ম্যাপলথোর্পের মতো খুব কম লোকই অটিজম সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে। তবে তিনি নিজে তাদের দলভুক্ত নন। অটিজমকে এক ধরণের অসম্পূর্ণতা বলা যেতে পারে। এক ধরণের মানসিক বিকালঙ্গতা, যার কারণে ভিকটিম মানুষের সঙ্গে সাধারণ ভাবে মিশতে পারে না, যাবতীয় অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত দেরিতে কথা বলতে শেখে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। চারপাশের পরিবেশ আর মানুষদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে তারা, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নিজস্ব জগতে বিচরণ করতে। বস্তুর প্রতি থাকে তাদের বিশেষ আকর্ষণ। তবে কখনও কখনও এই অস্বাভাবিক আচরণও আশীর্বাদ রূপে দেখা দেয়।

খুবই দুর্লভ হলেও সত্যি যে, একজন অটিস্টিক শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন গণিত, সঙ্গীত কিংবা চিত্রকলায়, অসামান্য মেধার পরিচয় দেখাতে সক্ষম। মোট অটিস্টিক শিশুর শতকরা দশ ভাগের মধ্যে এমন বিরল প্রতিভা দেখা যায়। আবার এই দশ ভাগের মধ্যে এমন কিছু শিশুর দেখা মেলে যারা প্রতিভার সংজ্ঞাই পাল্টে দিতে পারে। ইউরির আগ্রহ এই প্রডিজিদের নিয়েই। পুরো বিশ্বে এদের সংখ্যা চল্লিশেরও কম। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এই দুর্লভ প্রতিভাবানদের মধ্যেও হাতেগোনা এমন কয়েকজন থাকে, বাকিরা যাদের তুলনায় কিছুই না।

বংশগতির বিশেষ এক ধারায় এদের জন্ম।

প্রাচীন জিপসি শব্দটা ইউরির মাথায় খেলে গেল।

শোভিহানিস...

পাশ থেকে বলতে থাকলেন ম্যাপলথোর্প। "এখানে আমরা যা করছি, তার এক বিন্দু বিসর্গও জানতে দেওয়া যাবে না কাউকে। যদি বাইরের পৃথিবী কোনভাবে জানতে পারে, তবে আমাদের যা হাল হবে, ন্যুরেমবার্গ নাৎসি ট্রায়ালও তার কাছে নস্যি।"

জবাব দিলেন না ইউরি। এখানে তিনি যা করছেন, তার মর্মার্থ যদি ম্যাপলথোর্প অনুধাবন করতে পারত! দুই জার্মানি একত্রিত হওয়ার পরই শুরু হয় যত ঝামেলা। গবেষণা চালাতে গিয়ে সঙ্কটে পড়েন ইউরি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না আমেরিকার মতিগতি। পুরো এক যুগ লেগে যায় আমেরিকাকে রাজি করার পেছনে। আশা পরিণত হচ্ছিলো দুরাশায়। এমন সময় রাজনীতির আকাশে আসে আমূল পরিবর্তন। বৈশ্বিক সন্ত্রাস নির্মূলে গঠিত হতে থাকে নতুন নতুন সব মিত্র বাহিনী, শত্রু পরিণত হয় বন্ধুতে। সবচেয়ে বড় কথা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আর কোনও সীমারেখা রইল না। এক নতুন যুগ হাজির হলো, নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে। পুরানো প্রবাদ রূপ নিলো বাস্তবে–ফলাফলই আসল, কর্মপদ্ধতি নয়। সে যেকোনও উপায়েই হোক না কেন। সবার মঙ্গল-ই মূলকথা। এই রূঢ় বাস্তবতা আমেরিকানদের বুঝতে দেরি হলেও, ইউরির সরকার অত বোকা ছিল না।

"করছে কী মেয়েটা?" জিজ্ঞেস করলেন ম্যাপলথোর্প।

এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরে এলেন ইউরি। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ইজেলের সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সাশা, হাতে একটা কালো মার্কার। পুরো কাগজ জুড়ে উঠানামা করছে তার হাত। একবার এ কোনায়, তো একটু পরে আরেক কোনায়। কোনও প্যাটার্ন বোঝা যাচ্ছে না।

ঘোঁত করে উঠলেন ম্যাপলথোর্প। "আর আপনি কিনা বলছিলেন এই মেয়ে চিত্রকলায় পারদর্শী!"

"ভুল বলিনি আমি।"

এঁকেই যাচ্ছে সাশা। সবুজের মধ্যে যে চতুর্ভুজ এঁকেছিল, সেটা এখন কালো কালো ছোপে ভরে যাচ্ছে। অন্য হাতটা মূর্তির মতো বাড়িয়ে রেখেছে, যেন অজানা কোনও শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলছে অবিরাম।

অবশেষে নেমে এল তার হাত দুটো। ইজেল থেকে দূরে সরে গেল সে। হাঁটু গেড়ে বসে, দুলতে লাগল সামনে-পেছনে। ঘামে চিকচিক করছে চোখের ভুরু। হাত বাড়িয়ে একটা কাঠের টুকরো টেনে নিল হঠাৎ আঙুলের ফাঁকে। এমনভাবে টুকরোটা ঘুরাতে লাগল যেন কোনও ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করছে।

ছবিটার দিকে মনোযোগ দিলেন ইউরি।

ম্যাপলথোর্প যোগ দিলেন তার সাথে। "কী এটা? যত্তোসব গাঁজাখুরি।"

"নিয়েত।" মুখ ফসকে রাশিয়ান ভাষায় বলে ফেললেন ইউরি।

তড়িঘড়ি করে পাশের রুমে যাওয়ার দরজার দিকে এগোলেন তিনি। পিছু নিলেন ম্যাপলথোর্প। তারা রুমে ঢোকার পরও কোনও ভাবান্তর এল না সাশার মধ্যে। আগের মতোই দুলতে থাকল সে আর আঙুলের ফাঁকে কাঠের টুকরোটা ঘোরাতে লাগল। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে ইউরির জানা আছে, বেশ কিছুক্ষণের জন্য এমন ঘোরের মাঝে থাকবে মেয়েটা।

ইজেল থেকে কাগজটা নামিয়ে নিলেন তিনি।

"করছেন কী?"জিজ্ঞেস করলেন ম্যাপলথোর্প।

ছবিটাকে উল্টো করে ইজেলে ঝুলিয়ে দিলেন ইউরি। সাশা মাঝে মাঝে উল্টো আঁকে। অটিস্টিকদের মধ্যে এটা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীটাকে তারা আর দশজনের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। তাদের জগতে সংখ্যা কথা বলে, শব্দের আছে গন্ধ।

সাশার দিকে ফিরলেন ইউরি। মেয়েটার নীল চোখজোড়া কাঠের টুকরোর ওপর নিবদ্ধ। কিন্তু ম্যাপলথোর্পের মনোযোগ ইজেলের দিকে, চোখজোড়ায় বিস্ময়। "এ যে দেখছি... একটা হাতি।"

তাকালেন ইউরিও। একলাফে তার হৃদপিণ্ডটা গলায় উঠে এল যেন। এই ছবি কোনও ভাবেই সাধারণ একটা ছবি হতে পারে না। মলের ছবি এটা, তা-ও স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের। এমন ছবিই ড. পোকের সন্ধান দিয়েছিল তাদের। তবে সাশার ক্ষমতার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ফাঁদ পাতার জন্য মাত্র দুঘন্টা সময় পেয়েছিলেন তারা।

ঝুঁকে এলেন ম্যাপলথোর্প। "মনে হচ্ছে এই জায়গাটা চিনি আমি। এই তো হপ্তা দুয়েক আগে আমার নাতি-নাতনিদের নিয়ে গেছিলাম ওখানে। ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের হলঘর ওটা।"

ইউরিও ভুরু কুঁচকে তাকালেন। "ন্যাশনাল মলের ওখানের জাদুঘরটা? ওখানেই তো শিকার আজ সারাদিন লুকিয়ে ছিল।"

মাথা ঝাঁকালেন ম্যাপলথোর্প।

চিন্তা বাড়ল ইউরির চোখে-মুখে। তবে কি সাশা টের পেয়েছে কিছু? ড. পোককে নিয়ে ম্যাপলথোর্প যে ভয় পাচ্ছেন, তার সাথে কি কোনও সম্পর্ক আছে এই ছবির?

জানার উপায় একটাই।

"এখুনি ওই জায়গায় আপনার লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করুন," ছবির দিকে ইঙ্গিত করে ম্যাপলথোর্পের উদ্দেশ্যে বললেন ইউরি।

সন্ধ্যা ৬:৪৮

পোকের ট্রেইল অনুসরণ করে একটা সিকিউরিটি দরজার সামনে এসে থামল গ্রে। দরজায় লেখাঃ সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দরজাটা পরখ করে দেখল, ইলেকট্রনিক লক দিয়ে সুরক্ষিত। ম্যাগনেটিক এমপ্লয়ী কার্ড ছাড়া খুলবে না। ভুরু কুচকালো গ্রে। তাহলে পোক কী করে এই দরজা পার হলেন? মাইকটা ধরে সেন্ট্রাল কমান্ডে যোগাযোগ করল ও।

সাথে সাথেই জবাব দিলেন পেইন্টার। "কমান্ডার?"

"স্যার, আপনার সাহায্য লাগবে," সমস্যাটা খুলে বলল গ্রে। "আমাকে দরজার ওপাশে যেতে হবে।"

"একটু অপেক্ষা করো, গ্রে। আমি তোমার আইডি কার্ড আপগ্রেড করে দিচ্ছি। এতে তুমি বিনা বাধায় স্মিথসোনিয়ানে চলাচল করতে পারবে।"

কয়েক মিনিটের নীরবতার পর আবার পেইন্টারের কণ্ঠ ভেসে এল। "এবার চেষ্টা করে দেখ।"

গ্রে ওর আইডি কার্ডটা চেপে ধরতেই খুলে গেল দরজাটা।

"কাজ হয়েছে। আপনাকে বিস্তারিত পরে জানাচ্ছি।" বলে দরজা দিয়ে ঢুকে একটা হলঘরে এসে দাঁড়াল ও। সারি সারি দরজা দেখা যাচ্ছে এখানে। দরজারগুলোর গায়ে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক লেবেল সাঁটানো...এন্টোমোলজি, ইনভার্টিব্রেট জুওলজি, বোটানি, প্যালিওবায়োলজি।

ট্রেইল অনুসরণ করে একটা নামবিহীন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রে। গামা-স্কাউট রিডারটা দরজার হাতলের উপর বুলালো। ততক্ষণে বাড়তে শুরু করেছে যন্ত্রটা। ও খেয়াল করল, আরেকটা মৃদু ট্রেইল চলে গেছে হলওয়ে ধরে। শেষ হয়েছে জাদুঘরের লোডিং ডকগুলোতে। কল্পনায় পোককে হলওয়ে ধরে হাঁটতে দেখল ও।

খুব সম্ভবত প্রফেসর ডক দিয়েই জাদুঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর বেরিয়ে গেছেন সামনে দিয়ে।

পেছন থেকে কাউকে খসানোর জন্যই কি এমন করেছিলেন তিনি?

হাতল ধরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল কোয়ালস্কি। "খোলাই আছে মনে হয়।" তার কথার প্রমাণ দিতেই যেন হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

ধুলো-বালির ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। ভেতরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে দিল গ্রে। একটা স্টোর রুম ভেসে উঠল ওদের সামনে। সারি সারি তাক রুমের পেছন দিকটা দখল করে রেখেছে। এক কোনায় জড়ো হয়ে আছে শিপিং লেবেল লাগানো কাঠের বাক্স। বেশ কয়েকটা খোলা হয়েছে। খড় আর স্টাইরোফোম ছড়িয়ে মেঝে একাকার। দরজার বাঁপাশে টেবিলের ওপর একটা কম্পিউটার আর একটা প্রিন্টার রাখা। কাঠের মেঝেতে একটা নারীমূর্তি পড়ে আছে, অবশ্য মূর্তিটার হাত নেই একটাও। একটা পিতলের ষাঁড়ের মাথা দেখা গেল, এছাড়াও আছে একটা পাথুরে পিলারের ভিত্তিপ্রস্তর।

ট্রেইল অনুসরণ করে ভেতরের দিকে চলল গ্রে। প্রফেসর এখানে কেন এসেছিলেন বুঝে উঠতে পারছে না। কোনও পাহারাদার থেকে লুকানোর জন্য? কিন্তু দেখে তো তা মনে হয় না। ট্রেইলটা মেঝেতে পড়ে থাকা পাথর খোদাই করে তৈরী এক গম্বুজের দিকে এগিয়েছে। আর্টিফ্যাক্টটা প্রায় কোমর সমান উঁচু, চূড়ায় একটা গর্ত। দেখতে ঠিক যেন একটা গ্রানাইটের তৈরি আগ্নেয়গিরি, পার্থক্য শুধু এর দেহ জুড়ে খালি লেখা আর লেখা। গম্বুজটার দিকে ঝুঁকলো গ্রে।

লেখাগুলো প্রাচীন গ্রিক ভাষায়।

ট্রেইল অনুসরণ করে গম্বুজটার চারদিকে একবার পাক খেলো গ্রে। এই গম্বুজের ওপর পোকের নজর পড়েছিল কেন?

এমন সময় বাঁপাশ থেকে কিছু একটা আছড়ে পড়ার শব্দ এল। চমকে উঠে সেদিকে ফিরল গ্রে। একটা টেবিলের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কোয়ালস্কি। তার পায়ের কাছে একটা ভাঙ্গা ফুলদানি পড়ে আছে। "ধুশ শালা! জিনিসগুলো একটু গুছিয়ে রাখবে না?"

কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না গ্রে। লোকটাকে সাথে আনাটাই ভুল হয়েছে।

এমন সময় টেবিলে চোখ পড়ল ওর, চকচক করছে সারিবদ্ধ কিছু কয়েন। এগিয়ে গেল ও। প্রাচীন গ্রিক কয়েন এগুলো। দ্বিতীয় সারিতে একটা কয়েন নেই। তবে কি এটা নিতেই এখানে এসেছিলেন পোক?

"টেবিলটার পায়ার সাথে পা লেগে গিয়েছিল..." সাফাই গাইতে শুরু করল কোয়ালস্কি। হাত তুলে থামিয়ে দিল গ্রে।

"ওটা নিয়ে আর ভাবার দরকার নেই। তোমার বেতন থেকে দামটা কেটে নেয়া হবে।"

"ধ্যাত্তেরি! কত হতে পারে দামটা?"

"কয়েকশো তো হবেই।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কোয়ালস্কি। "তাহলে সমস্যা নেই।"

"কয়েকশো হাজার।" ভুলটা ধরিয়ে দিল গ্রে।

কোয়ালস্কির মাথায় বাজ পড়ল যেন। বোবা হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর কিছু বলে উঠার আগেই দরজা থেকে শব্দ ভেসে এল। গ্রে কিছু করে উঠার আগেই ওকে পিছনে ঠেলে দিল কোয়ালস্কি, মুহূর্তেই কাঁধের হোলস্টার থেকে পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের পিস্তলটা বের করে এনেছে লোকটা।

পার্স ঘাটতে ঘাটতে রুমে প্রবেশ করল এক তরুণী। টেরই পায়নি যে রুমে আরও দুজন আছে। লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচ খুঁজতে লাগল। তখনই তার খেয়াল হলো যে রুমের লাইট জ্বলছে আর একটা দানব পিস্তল তাক করে আছে তার দিকে।

আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল তরুণী। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে রুম থেকে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগল।

"দুঃখিত," বলে পিস্তল সরিয়ে নিলো কোয়ালস্কি।

গ্রে তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলো। "ভয় পাবেন না, ম্যাম। আমরা মিউজিয়াম সিকিউরিটি। একটা চুরির রিপোর্ট পেয়ে তদন্তে এসেছি।"

ভাঙ্গা ফুলদানির দিকে পিস্তলের নল দিয়ে ইশারা করল কোয়ালস্কি। "হ্যাঁ। এই যে দেখুন, দামি ফুলদানিটাও ভেঙ্গে ফেলেছে ব্যাটারা।"

এক হাত দিয়ে পার্সটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তরুণী। আরেক হাতে নাকের ওপর নেমে আসা চশমাটা ঠিক করল। প্রথম দেখাতে তাকে একজন কলেজ ছাত্রী মনে হবে, কিন্তু চোখের কোণায় চামড়ার ভাঁজ অন্য কথা বলছে।

"কোনও আইডি কার্ড দেখাতে পারবেন?"বলতে বলতে দরজা খুলে ফেলল সে।

নিজের আইডি কার্ড তুলে ধরল গ্রে। পাসটায় ওর ছবির সাথে সোনালি রঙের প্রেসিডেন্সিয়াল মোহর ছাপা আছে। "চাইলে আপনাকে একটা ফোন নম্বর দিতে পারি। কল করে আমাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারেন।"

পাস দেখে একটু সহজ হয়ে এলেও সন্দেহ পুরোপুরি গেল না তরুণীর মন থেকে। পুরো রুমের ওপর একবার ঘুরে এল তার চোখজোড়া। "কিছু কি চুরি গেছে?"

"তা হয়তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন," বলল গ্রে। আশা করছে তরুণী সাহায্য করতে পারবে ওর তদন্তে। "আমার ধারণা, টেবিলের ওপর থেকে একটা কয়েন খোয়া গেছে।"

"কী?" কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই দ্রুত পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলতরুণী। আতঙ্ক ভর করল তার চোখেমুখে। "ওহ হো! ডেলফি মিউজিয়াম থেকে আমরা কয়েনগুলো ধার এনেছিলাম।"

আবারও ডেলফি!

পাথরের গম্বুজটার দিকে ফিরল তরুণী, যেটার ওপর নজর পড়েছিল পোকেরও। "প্লিজ, ওটা স্পর্শ করবেন না।"

ঝট করে সোজা হয়ে গেল কোয়ালস্কি। এতোক্ষণ গম্বুজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। নিজের হাতের তালুর দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন সব ওই হাতেরই দোষ। "সরি।"

"এই জিনিসটা কী?"পাথরটার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"প্রদর্শনির জন্য আনা হয়েছে। ভাগ্য ভালো এটায় হাত দেয়নি চোর।" নিশ্চিত হওয়ার জন্য গম্বুজটার চারপাশে একবার পাক খেল তরুণী। "ছয়শো বছর বয়স জিনিসটার।"

"তা ঠিক আছে। কিন্তু কী এটা?" জোর দিল গ্রে।

"এটাকে বলা হয় ওম্ফালোস, অর্থাৎ নাভি। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এটা। অনেক কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে এর সাথে। পুরাণ বলে, অতিশক্তির আধার এই ওম্ফালোস।"

"এটা এখানে এল কিভাবে?"

টেবিলের দিকে নড করল তরুণী। "কয়েনগুলোর সাথে। ডেলফি থেকে ধার করে আনা হয়েছে।"

"ডেলফি বলতে ওরাকল অফ ডেলফির মন্দির যেখানে ছিল?"

চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে গ্রের দিকে তাকাল তরুণী। "হ্যাঁ, ওটাই। মন্দিরের সবচেয়ে পবিত্র চেম্বার ছিল ঐ মন্দিরের অন্তঃবেদী। ওম্ফালোস ওখানেই রাখা হতো।"

"এটাই আসল জিনিস?"

"না, ঠিক তা নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এটা একটা রেপ্লিকা। তবে এতোদিন যাবত এটাকে আসলই মনে করে আসা হয়েছে। প্লুটার্ক আর সক্রেটিসের বর্ণনায়ও তাই ছিল। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী, ডেলফির ওরাকলদের ভগিনী সংঘের বয়স প্রায় তিন হাজার বছর। অথচ এই পাথরটার বয়স তার অর্ধেকও না।"

"তাহলে আসলটা কোথায়?"

"হারিয়ে গেছে ইতিহাসের অন্তরালে। কেউ তার হদিস জানে না।"

কথা শেষ করে দরজার আঙটায় ঝুলানো একটা অ্যাপ্রন নামিয়ে নিল তরুণী। তারপর শার্ট থেকে তার মিউজিয়াম আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ খুলে নিয়ে অ্যাপ্রনে লাগিয়ে পরে নিল।

এতক্ষণ যাবত ট্যাগে চোখ পড়েনি গ্রে'র, এবার পড়ল। তরুণীর ছবির নীচে নাম লেখা আছেঃ

ই. পোক

"পোক..." জোরেই পড়ে ফেলল গ্রে।

"ড. এলিজাবেথ পোক," জানাল তরুণী।

এতক্ষণে প্রফেসরের এখানে আসার কারণ অনুধাবন করতে পারল গ্রে। "আর্চিবাল্ডপোক কি আপনার কেউ হন?"

"আমার বাবা।" অবাক দৃষ্টিতে গ্রের দিকে তাকাল তরুণী। "কেন বলুন তো?"

৩

৫ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭:২২
ওয়াশিংটন ডি.সি

"মারা গেছেন!" খবরটা শুনে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল এলিজাবেথ পোক। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে। স্টোররুমের ডেস্কের কোনায় হেলান দিয়ে আছে গ্রে। দৃষ্টি তরুণীর ওপর নিবদ্ধ। প্রচণ্ড শক পেয়েছে মেয়েটা। আলতো করে চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে নিলো সে, যেন কাঁদার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"মলে গোলাগুলির খবরটা কানে এসেছিল," নিজেকেই যেন বলল এলিজাবেথ। "কিন্তু ভাবতেও পারিনি যে... সারাদিন এই সেলারেই পড়ে ছিলাম। ফোনের নেটওয়ার্কও নেই। কেউ যদি জানানোর জন্য ফোন করেও থাকে, টের পাইনি।"

"জানি এ সময় এমন প্রশ্ন করা খারাপ দেখায়," বলল গ্রে। "কিন্তু না করেও পারছি না। শেষ কবে আপনার বাবার সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?"

ঢোক গিলল এলিজাবেথ। অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেকে। "প্রায় এক বছর," কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল। "ঠিক মনে নেই। আমাদের সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিল না।"

মেয়েটার কষ্ট ছুঁয়ে গেল গ্রেকে। "আমার মনে হয় তিনি জানতেন, আপনি কতটা ভালোবাসেন তাকে।"

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার। "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা কি বাবাকে চিনতেন?"

তার শীতল, নিঃস্পৃহ দৃষ্টির পেছনে চাপা রাগ অনুভব করতে পারল গ্রে। কোয়ালস্কি রুমের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

"হ্যাঁ, আপনার বাবার কাছে একটা কয়েন ছিল। কয়েনটার একপাশে ডেলফির মন্দির আর অন্যপাশে ফস্টিনা দ্য এল্ডার-এর ছাপ আঁকা।"

টেবিলের দিকে তাকাল মেয়েটা। নজর কয়েনের সারির ফাঁকা স্থানটার দিকে।

"গুলি খাওয়ার আগে তিনি এখানে এসেছিলেন," বলল গ্রে। "আপনার অফিসে।"

"এটা আমার অফিস না," বলে চারদিকে তাকাতে লাগল মেয়েটা। যেন বাবার উপস্থিতি অনুভব করছে আশেপাশে। "আমি ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার জন্য গবেষণা করছি। আসলে বাবাই কলকাঠি নেড়ে আমাকে গ্রীসে ডেলফি মিউজিয়ামে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে জায়গা পাইয়ে দিয়েছেন। এটা প্রায় মাসখানেক আগের ঘটনা। আমি এখন এখানে প্রদর্শনীর ব্যাপারটা তদারক করছি। আমি যে এখানে আছি সেটা বাবার

জানার কথা না। আমাদের ঝামেলার পর... " বাক্যটা শেষ করার প্রয়োজন মনে করল না সে।

"হয়তো আপনার উপর নজর রাখছিলেন তিনি।"

কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল মেয়েটার চোখের কোনা বেয়ে। তাড়াতাড়ি ল্যাব কোটের হাতা দিয়ে পানিটুকু মুছে ফেলল ও।

তাকে সামলে ওঠার সময় দিল গ্রে। অলস পদক্ষেপে ওম্ফালোসটাকে প্রদক্ষিণ করছে কোয়ালস্কি। গ্রে উপলব্ধি করল, প্রফেসরও হয়তো এভাবেই জিনিসটার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন। কিন্তু কেন?

এলিজাবেথও একই প্রশ্ন করল। "বাবা এখানে কেন এসেছিলেন? কয়েনটা নেয়ার পেছনে কী কারণ হতে পারে?"

"বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি জানতেন যে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। হয়তো এটাও আশঙ্কা করেছিলেন, তার উপর হামলা হতে পারে। কয়েনটা আকারে ছোট, শরীরে সময় নিয়ে খোঁজাখুঁজি না করলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মর্গে পরীক্ষা করার সময় সেটা খুঁজে পাওয়া যাবেই। হয়তো তার ধারণা ছিল জিনিসটা অনুসন্ধানকারীকে এখানে, যেখান থেকে এটা চুরি করা হয়েছে, আসার ইঙ্গিত দেবে।"

চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল গ্রে, নিজেকে প্রফেসরের জায়গায় কল্পনা করছে। "যদি আমার ধারণা ঠিক হয় তাহলে আপনার বাবা জানতেন, অনুসরণকারীরা কিছু একটা খুঁজছে। এমন একটা কিছু যা উনার কাছে ছিল।"

অবশ্যই তাই।

উঠে দাড়ালো গ্রে। তার দেখাদেখি এলিজাবেথও উঠে দাঁড়িয়ে ঘরটায় নজর বুলাতে শুরু করল। তার বাবা নিশ্চয়ই এখানে কিছু একটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

কোয়ালস্কিকে এখনও ওম্ফালোসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গ্রে। "মনে হয় ওম্ফালোসটার ব্যাপারে আপনার বাবার আগ্রহ একটু বেশিই ছিল।"

"এমন ভাবার কারণ?"

"প্রফেসরের ট্রেইল অনুসরণ করে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি আমি। পাথরটার আশেপাশে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি।"

"ওখানে, দেয়ালে একটা ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাশলাইট আছে," কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে বলল এলিজাবেথ।

জিনিসটা নামিয়ে আনলো ও।

ওম্ফালোসটার দিকে এগোলো এলিজাবেথ। "পাথরটা নিরেট দেখালেও আসলে এর ভেতরের অংশ ফাঁপা। অনেকটা উল্টানো বিশালাকায় পাথরের বাটির মতো," বলে উপরের ছিদ্রটার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

গ্রে আন্দাজ করল, প্রফেসর হয়তো ছিদ্রটা দিয়ে ভেতরে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সে কোয়ালস্কির হাত থেকে লাইটটা নিয়ে ভেতরে আলো ফেলল। পরিষ্কার দেখা

যাচ্ছে না, কিন্তু ভেতরে কিছু একটা আছে। অনেকটা এবড়োখেবড়ো পাথরের টুকরোর এতো দেখালো জিনিসটা।

"বুঝতে পারছি না," সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে। "মনে হচ্ছে পাথরটা উল্টাতে হবে।"

"জিনিসটা খুবই ভারী," ব্যাখ্যা শুরু করল এলিজাবেথ। বাক্স থেকে বের করতেই ছয়জন লোক লেগেছিল। তবে ঘরের পেছনের দিকে একটা ক্রোবার আছে। ওটার সাহায্য পাথরটা উল্টানো যাবে। কিন্তু খুব সাবধানে করতে হবে কাজটা।"

"আনছি আমি," বলল কোয়ালস্কি।

সে পা বাড়ানোর আগেই এলিজাবেথের ডেস্কে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। কলার আইডি চেক করল ও। "সিকিউরিটি থেকে কল এসেছে।" কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা। "মিউজিয়াম বন্ধের সময় হয়ে গিয়েছে প্রায়। তারা হয়তো জানতে চায় আমার আর কতক্ষণ লাগবে।"

"বলে দিন, প্রায় এক ঘন্টা।"

রিসিভারটা কানে ঠেকালো এলিজাবেথ। পরিচয় দেয়ার পর ওপাশের কথা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। "বুঝতে পেরেছি। আসছি আমরা।"

ফোনটা রেখে গ্রের দিকে তাকাল মেয়েটা। "কেউ একজন মিউজিয়ামে বোমা প্লান্ট করার হুমকি দিয়েছে। ভবনটা খালি করে দিচ্ছে সিকিউরিটির লোকজন।"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল গ্রে। "মলে গোলাগুলির পর বোমার হুমকিকে খাটো করে দেখবে না কেউ। ভবনগুলোতে তল্লাশি চালাবার মোক্ষম সুযোগ একেবারে।" এলিজাবেথের চাউনিতেও একই কথা প্রকাশ পেল।

ওম্ফালোসটার দিকে তাকাল গ্রে।

হাতে সময় নেই।

কোয়ালস্কিও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। "শুনেছি আমি," স্টোরেজ থেকে ফিরে আসতে আসতে বলল ও। ক্রোবারের বদলে হাতে একটা স্লেজহ্যামার। "সরে দাড়াও।"

"না!" সতর্ক করল এলিজাবেথ।

তবে তাতে কোয়ালস্কির কোনও ভাবান্তর হলো না। মাঝখানের দুরত্বটুকু নিমিষেই পেরিয়ে গেল ও। মাথার উপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনলো হ্যামারটা।

শতাব্দী পুরনো আর্টিফ্যাক্টটার জন্য হাহাকার করে উঠল মেয়েটা।

কিন্তু সেটা অক্ষতই আছে। পাথরটাকে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের বেদিতে আঘাত করেছে কোয়ালস্কির স্লেজহ্যামার, কাঠের টুকরো ছড়িয়ে গেল আশেপাশে। আবারও আঘাত করল সে। এবার পুরোপুরি ভেঙে গেল কাঠটা। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল পাথর, কয়েকটা গড়ান খেয়ে থামল। অক্ষতই আছে মনে হচ্ছে।

হ্যামারটা কাঁধে নিল কোয়ালস্কি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এলিজাবেথ, চোখে ভয়।

পাথরটা মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল গ্রে। গড়িয়ে ছিদ্রের কাছে চলে এসেছে ভেতরের জিনিসটা, পাথর না। গামা স্কাউট রিডারটা কাছাকাছি আনতেই তেজস্ক্রিয়তার সিগন্যাল পাওয়া গেল। তবে ক্ষতিকর কিছু না।

সন্তুষ্ট হয়ে জিনিসটা বের করে আনলো গ্রে।

সরু হয়ে এল কোয়ালস্কির চোখ। "খুলি? এই মরার খুলির জন্য এতো কাহিনী?"

"মানুষের না," খুলিটা ভালোভাবে উল্টেপাল্টে দেখে বলল গ্রে। "আকার দেখে মনে হচ্ছে বানর জাতীয় কোনও প্রাণি, সম্ভবত শিম্পাঞ্জী।"

"পাশে ওটা আবার কী?" খুলিটার কানের দিকে ইঙ্গিত করল এলিজাবেথ।

কানের ছিদ্রের উপরে স্টিলের বাঁকা একটা টুকরো আটকানো আছে।

"বুঝতে পারছি না," জবাব দিল গ্রে। "হিয়ারিং এইড হতে পারে।"

"বানরের আবার হিয়ারিং এইড!" শ্রাগ করল কোয়ালস্কি।

"বাবা এটা এখানে এনেছিলেন কেন?"

মাথা নাড়লো গ্রে। "জানি না। কিন্তু এই জিনিসটার পেছনেই হন্যে হয়ে ঘুরছিল কেউ। আর এখনও ঘুরছে।"

"কী করব এখন?"

"আমরা জিনিসটা খুঁজে পেয়েছি, এটা কেউ জানার আগেই এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।"

প্রফেসর আরও কিছু রেখে গেছেন কিনা দেখার জন্য বাক্সগুলোর আশেপাশে আলো ফেলল গ্রে, নেই কিছুই।

ওম্ফালোসের ভেতরে আলো ফেলতে মুখের দিকে একটা জিনিস নজরে পড়ল ওর। একটা লাইন খোদাই করা আছে। ভালোভাবে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলো গ্রে।

এলিজাবেথ ধরতে পারল ব্যাপারটা। "প্রাচীন সংস্কৃত।"

"গ্রীক ওম্ফালোসের ভেতর সংস্কৃত কী করছে?" সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল গ্রে।

কোয়ালস্কি বাধ সাধলো তার কথায়। "ধুর, বাদ দাও তো।" হাত দিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ও। "বোমার কথা ভুলে গেছো? পালাতে হবে এখান থেকে।"

যুক্তি আছে ওর কথায়, ভাবল গ্রে। ইতোমধ্যেই অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। হলওয়ের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

"কী করব এখন আমরা?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

সন্ধ্যা ৭:৩৭

প্যাথলজিস্টের অফিসের আধখোলা দরজায় নক করলেন পেইন্টার।

"ভেতরে আসুন," ম্যালকমের গলা শোনা গেল। "জোনস, তুমি কি তথ্যগুলো......"

ডেস্কে বসে আছেন ড. ম্যালকম জেনিংস। পরনে এখনও অপারেশনের পোষাক। চশমা কপালে ওঠানো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন পেইন্টার। তাকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল প্যাথলজিস্টের। "ডিরেক্টর..." চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন পেইন্টার।

"ব্র্যান্ট বলেছিল যে আপনি ফোন করেছেন। আমি সবেমাত্র সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো দেখে আসলাম।"

"আততায়ীর কোনও চিহ্ন?"

"না। তবে এখনও খোঁজাখুঁজি চলছে। পাহাড় সমান ফুটেজ জমে আছে।"

নাইন ইলেভেনের পর রাজধানীতে নজরদারির পরিমাণ ব্যাপক বাড়ানো হয়েছে। হোয়াইট হাউজের চারপাশে প্রায় দশ মাইল এলাকা ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। বিভিন্ন রাস্তা, পার্কের প্রতিটা ইঞ্চি এমনকি শতকরা ষাট ভাগ ভবনের অভ্যন্তরীণ জায়গাও বাদ যায়নি। কিছু ক্যামেরা প্রফেসরের পোকের ট্রেইলেও ছিল। ডিটেক্টর নিয়ে গ্রে'র পদক্ষেপ ধরা পড়েছে সেগুলোতে। প্রফেসরের মৃত্যুর দৃশ্যের ভিডিও পাওয়া গেছে। কিন্তু, আততায়ীর একটা চুলও কোথাও দেখা যায়নি।

চিন্তার বিষয়।

পেইন্টারের মনে হয়, খুনি হয়তো আগে থেকেই ক্যামেরাগুলোর ব্যাপারে জানতো। হামলা করার জন্য সে ক্যামেরাগুলো কভার করে না এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ তার ফুটেজগুলো ডিলিট করে দিয়েছে।

যাই ঘটুক না কেন, এটা পরিষ্কার যে প্রফেসরের মৃত্যুর সাথে ওয়াশিংটনের কোনও না কোনও সম্পর্ক আছেই।

জেসন হিসেবে প্রফেসর পোকের অতীতের সাথে যদি তার মৃত্যুর কোনও যোগসাজশ থেকে থাকে তাহলে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। সরকারি বেসরকারি প্রতিটা গোপনীয় প্রজেক্টেই জেসনদের প্রত্যক্ষ নয়তো পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, আজ রাতে আর ঘুম আসবে না তার।

কারোরই আসবে না।

"গ্রে'র কোনও খবর আছে?" একটা চেয়ার থেকে কাগজের স্তুপ সরিয়ে পেইন্টারকে বসতে ইশারা করলেন ম্যালকম।

"সে ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। পোকের ট্রেইল সেদিকেই গেছে।"

"আশা করি সে কিছু খুঁজে পাবে। তবে আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম অন্য একটা কারণে।" কম্পিউটারের স্ক্রিনটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন ম্যালকম, যাতে পেইন্টারের নজর ভালোভাবে স্ক্রিনের উপর পড়ে।

"কী পেয়েছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"যদিও নিশ্চিত নই, তবে মনে হয় ব্যাপারটা তদন্তে সাহায্য করতে পারবে। প্রফেসরের মৃতদেহ নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা করেছি আমি। অন্ত্র আর লিভার থেকে ধারণা পাওয়া গেছে যে, তার শরীরে কৃত্রিমভাবে কোনরকম তেজস্ক্রিয়তা ঢোকানো হয়নি।"

"মানে তার খাবারে কিছু মেশানো হয়নি বা শরীরে ইনজেকশনও দেয়া হয়নি, তাই তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ম্যালকম। "চামড়ার পোড়া ভাব বলছে, শরীরের তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশগত কোনও মাধ্যম থেকে এসেছে। তিনি তেজস্ক্রিয় কোনও এলাকায় ছিলেন। চুলের মাইক্রো অ্যানালাইসিসে দেখা গেছে, প্রাকৃতিকভাবেই আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। এটা প্রায় এক সপ্তাহ আগের ঘটনা।"

"কিন্তু কোথায়?"

এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন ম্যালকম। অন্য হাতে কী-বোর্ডে টিপতেই স্ক্রিনে একটা মানচিত্র ভেসে উঠল। প্রফেসরের ফুসফুসের গভীর প্রকোষ্ঠে তেজস্ক্রিয় ধ্বংসাবশেষের উপাদান পাওয়া গেছে। কয়লাখনিতে কাজ করা শ্রমিকদের ফুসফুসেও এরকম কয়লার গুঁড়া পাওয়া যায়। ম্যাস স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রে পরীক্ষায় আইসোটোপ-এর কণাগুলোতে ভাঙন লক্ষ্য করা গেছে।"

স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। মনিটরের বামপাশে প্রচুর তথ্য উঠানামা করতে দেখা গেল। "তথ্যগুলো আঙুলের ছাপের মতই জটিল। ভিয়েনায় আই.এ.ই.এ ডাটাবেসে অনুসন্ধান করছি আমি।"

মনিটরের উপরের অংশে নজর গেল পেইন্টারের। সার্চবক্সে একেবারে উপরে সংস্থার নাম উল্লেখিত আছে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি।

"সংস্থাটা গোটা দুনিয়ার যাবতীয় তেজস্ক্রিয় এলাকাগুলোর দেখভাল করে... মাইন, রিঅ্যাক্টর, শিল্প কারখানা ইত্যাদি। তবে সব জায়গার তেজস্ক্রিয়তা একরকম হয় না। জিনিসটা আসলে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। উপাদানের আইসোটোপে ভিন্নতা আছে, উৎপাদন আর প্রক্রিয়াজাতকরণ গত ভিন্নতাও আছে। শেষকথা হল, একেক জায়গার তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ একেক রকম।"

"প্রফেসরের ফুসফুসে পাওয়া জিনিসগুলো কোথাকার হতে পারে?"

"আই.এ.ই.এ ডাটাবেসে খুঁজে একটা সূত্র পেয়েছি আমি।"

"তার মানে আপনি জানেন, প্রফেসর পোক কোথায় সংক্রমিত হয়েছেন?"

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ম্যালকম। আর তখনই স্ক্রিনে তথ্যের উঠানামা বন্ধ হয়ে একটা মানচিত্র আবির্ভূত হলো। মানচিত্রটাকে আপনাআপনিই জুম করে

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় একটা এলাকাকে চিহ্নিত করল কম্পিউটার, তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ে জর্জরিত একটা নাম ভেসে উঠল বক্সে।

চেরনোবিল

আর্চিবাল্ড পোক চেরনোবিলে কী করছিলেন? বন্ধ হয়ে যাওয়া পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর থেকে মরণঘাতী মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তায় সংক্রমিত হলেন কীভাবে তিনি?

এই সপ্তাহে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে ওটা, ঢেকে দেয়া হচ্ছে বিশাল স্টিলের গম্বুজ দিয়ে।

এমন সময় বেজে উঠল পেইন্টারের সেলফোন। ব্রায়ান্ট ফোন করেছে।

"কী হয়েছে, ব্রায়ান্ট?"

"ডিরেক্টর, রাজধানীতে একটা বিপদ দেখা দিয়েছে। ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছে কেউ।"

সেলফোনে শক্ত হয়ে বসল পেইন্টারের আঙুল।

ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়াম...গ্রে তো ওখানেই গিয়েছে।

কোথাও কোনও গড়বড় আছে।

"গ্রে'র রেডিওতে সংযোগ দাও।"

ফোন কানে ধরে অপেক্ষায় রইলেন তিনি। ম্যালকম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

এক মুহূর্ত পর ব্রায়ান্ট ফিরে এল লাইনে। "স্যার, ও সাড়া দিচ্ছে না।"

সন্ধ্যা ৭:৫৬

মিউজিয়ামের লোডিং বে-র দিকে এগোতে এগোতে গ্রে'র মুখের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। রোদে পোড়া চেহারার একপাশে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত, মারপিটের ফল। ঘটনাটার পর সম্ভবত মাসখানেক পেরিয়ে গেছে। ক্ষতের কারণে আরও কঠোর রূপ পেয়েছে মুখটা। গ্রে'র নীল চোখ শিহরিত করল মেয়েটাকে। লোডিং এরিয়ায় পৌঁছতেই ছয়জন লোক দেখা গেল, খালি করছে এলাকাটা।

"কোনও একটা ঝামেলা আছে এখানে," বলল গ্রে।

আশেপাশে তাকাল এলিজাবেথ। ফ্লোরোসেন্টের আলোয় আলোকিত গুহার মতো জায়গাটা বাক্স আর যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। বামপাশে একটা ফর্কলিফট দাঁড়ানো, ভারী মালামাল উঠানামা করাতে কাজে লাগে যন্ত্রটা। ডানপাশে স্টিলের খোলা দরজা দিয়ে লোকজন বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দরজার পাশে দাঙ্গাবাহিনীর পোষাক পরা কিছু লোক দাঁড়ানো, বেরিয়ে যাওয়া প্রত্যেককে সার্চ করছে ওরা।

নীল স্যুট পরা এক ব্যক্তি ব্যাপারটা তদারক করছে, সে ই সম্ভবত তাদের নেতা।

হলওয়ের দিকে যাওয়ার জন্য এলিজাবেথকে ইঙ্গিত করল গ্রে। তার কাঁধে মিউজিয়ামের লোগো ছাপা একটা ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর তার বাবার সেই অদ্ভুত খুলিটা। বাবার কথা মনে হতেই আবারও কান্না পেল এলিজাবেথের।

হলওয়ের অপর প্রান্তে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। চিৎকার করে প্রতিটা ঘর সার্চ করতে বলছে কেউ। সিঁড়িতে বুটজুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

থামল গ্রে। "বের হওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই?"

নড করল এলিজাবেথ। "সার্ভিস টানেল...এদিকে।"

কঠোর চোখে তার দিকে তাকাল গ্রে, কথাটার সত্যতা যাচাই করছে।

"কর্মচারীরা ধূমপানের জন্য ওই জায়গাটা ব্যবহার করে। মিউজিয়ামের ভেতর ধূমপানের অনুমতি নেই। তবে ওখানে শুধুই পাথর আর পাইপের জঙ্গল," ব্যাখ্যা করল ও।

দরজাটার সামনে তাদের নিয়ে গেল মেয়েটা। নিজের কার্ড ব্যবহার করে খুলে ফেলল দরজা। ওপাশে স্টিলের রেলিংওয়ালা সিমেন্টের সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা শুরু করার আগেই হলওয়ের এপাশ থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল। একটা নিচু অবয়ব নজরে এল তাদের। কালো ভেস্ট পড়া একটা জার্মান কুকুর। গলায় বাঁধা ফিতার একপ্রান্ত দৃষ্টির বাইরে থাকা কোনও একজনের হাতে।

থমকে গেল এলিজাবেথ।

তাদের দেখতে পেয়ে যেন তর্জন-গর্জন আরও বেড়ে গেল কুকুরটার।

"যাও," বলে এলিজাবেথকে আলতো ধাক্কা দিল গ্রে। কোয়ালস্কি সবার পেছনে। জায়গাটা মিউজিয়ামের এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমের আওতার বাইরে, গরম হয়ে আছে। আলো বলতে শুধু একটা খাঁচা লাগানো এমারজেন্সি বাল্ব। গ্রে দরজাটা লাগিয়ে দিতেই চাপা পড়ে গেল অ্যালার্মের আওয়াজ।

"টানেলটা কোথায় গিয়েছে?"

মাথা নাড়লো এলিজাবেথ। "জানি না ঠিক। কখনও আসিনি এদিকে। শুনেছি, নিচে একটা গোলকধাঁধা আছে...এদিক সেদিক ছড়ানো। তবে বেরোনোর রাস্তা পাওয়া যাবেই।"

তাদের পেছনে বন্ধ দরজায় ভারী কিছু একটার আঘাত শোনা গেল। সেই সাথে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক।

"ওটা কি আসলেই বোমা খোঁজা কুকুর নাকি?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ। "বোমার ব্যাপারটা সত্যিও হতে পারে।"

"পিয়ার্স সাথে থাকলে বোমা-টোমা গোনার টাইম নাই," অস্ফুটে বলল কোয়ালস্কি।

সিঁড়ি বেয়ে নামার পর তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল একটা বন্ধ দরজা। হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে সামনে এগোলো গ্রে। সামনে-পেছনে, দুদিকেই চলে গেছে ভ্যাপসা গন্ধে ভরা অন্ধকার টানেল।

"ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এলেই ভালো হত," বলল কোয়ালস্কি।

আফসোস হলো গ্রে'র। লাইটটা স্টোররুমে ফেলে এসেছে ও।

পকেট হাতড়ে সিগারেট লাইটার বের করল এলিজাবেথ, একটা অ্যান্টিক সিলভার ডানহিল। সুইচ টিপতেই আগুনের মৃদু শিখা বেরিয়ে এল।

"চমৎকার...কয়েকটা সিগারেট নিয়ে এলেও পারতাম!" স্বগোতক্তি করল কোয়ালস্কি।

"আমিও," এলিজাবেথও সুর মেলালো তার সাথে।

এমন সময় উপর থেকে আলোর বন্যা ভেসে এল, তীব্র হয়ে এল অ্যালার্মের আওয়াজ। অর্থ একটাই, উপরের দরজাটা খুলে ফেলেছে ধাওয়াকারীরা।

"তাড়াতাড়ি," ডানদিকে এগোতে শুরু করল গ্রে। "কাছাকাছি থাকো।"

এলিজাবেথের লাইটারের মৃদু আলোয় পথ চলা শুরু করল তারা। সবার সামনে গ্রে, পরে এলিজাবেথ আর সবার পেছনে কোয়ালস্কি। খুব অল্প জায়গাই আলোকিত করছে লাইটারটা। একটা শাখা টানেল সামনে আসতেই তাতে ঢুকে গেল সবাই।

পেছন থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসতেই হাঁটা পরিণত হল দৌড়ে।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

"বাইরে," ছোট করে উত্তর গ্রের।

"আচ্ছা... এটাই তাহলে তোমার প্ল্যান? বাইরে?"

কুকুরের ডাক কাছাকাছি চলে এসেছে। সেই সাথে মানুষের চেঁচামেচিও শোনা গেল। এবার তাদের ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে সম্ভবত।

"ভুলে যাও আগে যা বলেছি... বাইরে শব্দটা খারাপ শোনায় না আসলে," চাপা গলায় বলল কোয়ালস্কি।

অন্ধকার টানেলের গোলকধাঁধায় ছুটে চলল তিনজন।

শহরের অন্যপ্রান্তে, চেরিগাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চে বসে আছেন ড. ইউরি রাইভ। হাঁটুতে আর পিঠের নিচের অংশে ব্যাথা করছিল। বসার পর একটু আরাম বোধ হচ্ছে এখন। চারটা ট্যাবলেটও তেমন কোনও কাজ দেয়নি। বাড়িতে অবশ্য আরও ভালো চিকিৎসাব্যবস্থা আছে তার, কিন্তু ওয়াশিংটন পর্যন্ত তো আর সেগুলো বয়ে আনা সম্ভব না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিতে হবে, একহাতে হাঁটু ডলতে ডলতে ভাবতে লাগলেন তিনি।

দিগন্তরেখার ওপারে ডুবতে বসেছে সূর্য। বেঞ্চের একটু সামনেই পথের একপাশে সিমেন্টের একটা দেয়াল। বাবা-মা রা তাদের সন্তানদের নিয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন ওপাশে। গুহা, পুকুর আর জলপ্রপাতের সমন্বয়ে চীনের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ওদিকে। এগুলো ছাড়াও উইলো, কর্ক আর কয়েক প্রকাতির বাঁশের সমারোহও আছে। এলাকাটার বাসিন্দা বলতে এখন মাত্র দুজনকে দেখা যাচ্ছে, মেই জিয়াং আর তিয়ান তিয়ান-চীন থেকে আনা দুটো

প্রাপ্তবয়স্ক পান্ডা। আনার পর থেকেই পার্কের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে পান্ডা দুটো।

সাশার কাছেও তাই। দেয়ালের ওপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। একটা পা সামনে পেছনে দুলছে, অনবরত লাথি মারছে দেয়ালটায়।

ম্যাপলথোর্পের সাথে সাক্ষাতের পরই মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসেছেন ইউরি। অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বাচ্চাদের শান্ত করতে প্রানিদের সাহচর্যের তুলনা নেই, বিশেষ করে সাশা ক্ষেত্রে। মেয়েটার অবস্থা বোঝার জন্য স্পাইনাল ফ্লুইডের বি.ডি.এন.এফ. (ব্রেইন ডেরাইভড নিউরোট্রোপিক ফ্যাক্টরস) লেভেল পরীক্ষার দরকার নেই। এমন একটা ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কের নিরোট্রোপিক ফ্যাক্টরের হরমোন স্তরের মাত্রা ক্ষতিকর পর্যায়ে বেড়ে যায়। ইউরি বুঝতে পেরেছিলেন, খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে যাতে সাশার মানসিক অস্থিরতা কেটে যায়, নয়তো মস্তিষ্কে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। আগেও এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছেন তিনি। প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির সাথে প্রানিদের একটা মিথস্ক্রিয়া আছে, ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে কয়েক দশক লেগে গেছে বিজ্ঞানীদের।

আর তাই, ম্যাপলথোর্প ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামে অনুসন্ধান চালানোর উদ্দেশ্যে রওনা হতেই সাশাকে নিয়ে এই পার্কে চলে এসেছেন তিনি।

দেয়ালে লাথি মারার বেগ কমে এল মেয়েটার, সিমেন্টে ল্যাথি মারতে থাকায় ইতোমধ্যে জুতার সামনের অংশে দাগ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দাগ থেকে যদি দারুন কিছু হয় তবে তো দাগই ভালো।

দুই কাঁধের হাড়ের মাঝের অংশে দলা পাকিয়ে উঠল যেন ইউরির। পরবর্তী ফ্লাইটেই মেয়েটাকে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রক্ত, মূত্র, সিটি স্ক্যান ছাড়াও আরও কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে সাশা সুস্থ আছে।

কিন্তু তার আগে জানতে হবে মেয়েটা একটু আগে কাজটা কীভাবে করল। ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক। মাথায় প্ল্যান্ট করা যন্ত্রটা প্রতিটা বাচ্চার ক্ষমতার সাপেক্ষে উত্তেজনার একটা আবেশ সৃষ্টি করে। তার যন্ত্রটাকে কেউ অ্যাক্টিভেট না করলে মেয়েটার পক্ষে ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।

তবে কী যন্ত্রটায় কোনও গোলমাল দেখা দিয়েছে? অন্য কেউ যন্ত্রটাকে অ্যাক্টিভেট করেছে? নাকি মেয়েটা তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে?

ব্যাপারটা ভেবে সূর্যালোকের উষ্ণতার মধ্যেও শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল ইউরির।

কিছু একটা গণ্ডগোল অবশ্যই আছে।

সামনে থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল তার কানে। লোকজন ত্রস্ত পায়ে ছুটাছুটি শুরু করল। ঘনঘন জ্বলে উঠতে লাগল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। একটা নাম ধরে চিৎকার করা শুরু করল ছেলেবুড়ো সবাই। "তাই শান... তাই শান।"

সোজা হয়ে বসলেন ইউরি। পার্কেরলিফলেটে পড়া নামটা মনে পড়ল তার। তাই শান একটা বাচ্চা পান্ডা, বছর কয়েক আগে মেই জিয়াং-এর গর্ভে জন্মেছে সে। হয়তো দেখা গেছে বাচ্চাটাকে। তাই লোকজনের এতো লাফালাফি।

ভালোভাবে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করল সবাই। ছেলেমেয়েদের কাঁধে তুলে পান্ডা দেখাতে লাগলেন বাবারা। ক্রমাগত ক্লিক ক্লিক করেই চলেছে ক্যামেরার শাটার। উঠে দাঁড়ালেন ইউরি। দৃষ্টিসীমার আওতা থেকে হারিয়ে গেছে সাশা।

লোকজনের ভিড়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলেন তিনি। পার্ক বন্ধের সময় হয়ে গেছে প্রায়। বাড়ি ফিরতে হবে। সাশার ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালের দিকে এগোলেন তিনি। কিন্তু মেয়েটা নেই সেখানে।

বুকে হাতুড়ির বারি পড়তে লাগল যেন ইউরির। দেয়ালের এপাশে ওপাশে কোথাও নেই ও। লোকজনের সাথে ঠেলাঠেলি করে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন তিনি। আচমকা ধাক্কা লেগে একজনের হাত থেকে পড়ে গেল ক্যামেরা। কেউ একজন পেছন থেকে তার কাঁধ ধরে টান দিল।

"চোখে দেখতে পান না নাকি?"

লোকটার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন ইউরি, চোখে ভয় খেলা করছে। "আমার...আমার নাতনি। ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমি।"

মুহূর্তেই রাগ গলে জল হয়ে গেল লোকটার। কথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ইউরিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল লোকজন। মেয়েটা কেমন দেখতে? পরনে কী ছিল? সান্ত্বনাও দিতে লাগল অনেকে।

তবে তাদের কারও কথাই কানে ঢুকছে না ইউরির। নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজই যেন শতগুণ তীব্র হয়ে কানে আঘাত করছে তার। মেয়েটাকে একা ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি।

আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল লোকের ভীড়। হতাশ দৃষ্টিতে আশাপাশে তাকালেন ইউরি।

সত্যটা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারছেন...

সাশাকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি!

৪
৫ সেপ্টেম্বর, রাত ৮:১২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"দরজা!" পাশ থেকে চিৎকার করে বলল কোয়ালস্কি।

থমকে দাড়ালো গ্রে, পেছন দিকে তাকাল। লাইটার হাতে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ। টানেল থেকে দুই ধাপ নিচে দরজাটা লক্ষ্য না করেই এগিয়ে গিয়েছিল গ্রে। পেছনে ধাওয়াকারীদের চেঁচামেচি শোনা গেল। এতোক্ষণ তাদের খসানোর উদ্দেশ্যেই টানেলের গোলকধাঁধায় ছুটে বেড়িয়েছে ওরা, তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

দরজাটার হ্যান্ডেল ধরে কসরত শুরু করল কোয়ালস্কি। "বন্ধ।" হতাশ হয়ে স্টিলের কাঠামোতে ঘুসি মারলো ও।

সামনে এগোতেই হ্যান্ডেলের নিচে ইলেকট্রনিক লক চোখে পড়ল গ্রে'র। একটা লেবেলও আছে সেখানেঃ

ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ আমেরিকান হিস্টোরি

তার মানে দরজাটা অন্য আরেকটা মিউজিয়ামে ঢোকার রাস্তা। নিজের আইডি কার্ড বের করে লকে ঢোকালো এলিজাবেথ, কিন্তু খুললো না দরজা।

"আমার কার্ড শুধুই ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের জন্য," বলল মেয়েটা।

টানেলের পেছন দিকে আলোর রেখা দেখা গেল। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক।

"বাদ দাও," সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কোয়ালস্কি। ঠিক তখনি গুলির আওয়াজ শোনা গেল, এক সেকেন্ড আগে কোয়ালস্কির দাঁড়ানোর জায়গায় বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ খেলে গেল। দরজায় বাড়ি খেয়ে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে মেঝেতে পড়ে গেল একটা তীর। লাফিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

অস্ত্রটা চিনতে পেরেছে গ্রে, টেজার® গান। তারহীন বিদ্যুৎবাহী তীর ছুঁড়তে পারে অস্ত্রগুলো। প্রতিটা তীরেই থাকে উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ, পাহাড়ি গরিলাকেও কুপোকাত করার পক্ষে যথেষ্ট।

"হোমল্যান্ড সিকিউরিটি! দাঁড়াও, নয়তো আবারও গুলি করতে বাধ্য হব।"

"গুলি করার পর সতর্ক করছে শালারা," বলতে বলতে হাত মাথার উপর উঠালো কোয়ালস্কি।

সঙ্গীর শরীরের আড়ালে থেকে নিজের সিগমার আইডি কার্ড লকে ঢোকালো গ্রে। সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে জানান দিল যে এবার কাজ হয়েছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

"মাথার উপর হাত তুলে হাঁটু গেড়ে বসো!"

হ্যান্ডেল ধরে অল্প মোচড় দিতেই ফাঁক হয়ে গেল দরজাটা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার। এলিজাবেথের কনুই ধরে দরজার দিকে দেখালো গ্রে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কোয়ালস্কির বেল্টের প্রান্ত ধরল মেয়েটা। সে সবে মাত্র হাত মাথার উপর তুলে হাঁটু গেড়ে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এলিজাবেথের হাত ধরে টেনে দরজা দিয়ে ওপাশে চলে গেল গ্রে। টান সামলাতে না পেরে একেবারে তাদের উপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল কোয়ালস্কি।

আবারও শটগানের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

পড়ে থাকা অবস্থাতেই লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল কোয়ালস্কি।

গ্রে দেখতে পেল, বিশালদেহী লোকটার জুতোর তলায় বিঁধে আছে দ্বিতীয় তীরটা। এলিজাবেথ উঠে তার জুতো দিয়ে পিষে ফেলল জিনিসটাকে। "তোমার কপাল ভালো। জুতোর লেদারে আটকে গেছে তীরটা, গভীরে ঢোকেনি," বলল গ্রে।

"ভালো!" বাঁকা হয়ে জুতোর তলা থেকে তীরটা খুলতে খুলতে ফুঁসে উঠল কোয়ালস্কি। "আমার নতুন জুতার বারোটা বেজে গেছে।"

দরজার ওপাশ থেকে চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এল।

"চলো," যাওয়ার জন্য তাড়া দিল গ্রে।

সামনের সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করতে লাগল কোয়ালস্কি। "ক্রোর কাছ থেকে নতুন একজোড়া বাগাতে হবে।"

পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল গ্রে।

বকবকানি চলছেই... "বালের বানরের খুলিটা দিয়ে দাও শালাদের।"

"না!" গ্রে আর এলিজাবেথের গলা দিয়ে একসাথে বেরিয়ে এল কথাটা।

মেয়েটার গলার রাগের সুর ধরতে পারল গ্রে, তার নিজের ক্ষেত্রেও তাই। এলিজাবেথের বাবা খুলিটা নিরাপদে রাখতে গিয়ে মারা পড়েছেন, তাও আবার ওরই হাতের উপর। ব্যাপারটা এভাবে বাদ দেয়া যায় না।

সিঁড়ির উপরে দরজাটাও আগেরটার মতোই তালাবদ্ধ। ইলেকট্রনিক লকের দিকে ইঙ্গিত করল এলিজাবেথ। সামনে বেড়ে নিজের আইডি কার্ড ঢোকাতেই খুলে গেল দরজাটা। তাদের পালানোর খবরটা হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা *মিউজিয়াম অফ আমেরিকান হিস্টোরি-র* দিকে যাচ্ছে, এটা ধাওয়াকারীদের এতোক্ষণে অজানা থাকার কথা না।

দরজার ওপাশে একটা হলওয়ে। অনেকটা আগে দেখা ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের হলওয়ের মতোই দেখতে জায়গাটা। পার্থক্য একটাই, এখানে সারি সারি বস্তা রাখা আছে।

"এদিকে," একটা সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে।

কাঁধে একগাদা যন্ত্রপাতি নিয়ে নামতে থাকা ইউনিফর্ম পরা এক ইলেক্ট্রিশিয়ানের সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো প্রায়।

"চোখে দেখ না নাকি!"

গ্রে'র চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল লোকটা, সরে গেল সামনে থেকে। তাকে অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওরা। উপরে উঠার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে কানে আসতে লাগল কর্মচারীদের হইহল্লার আওয়াজ। মোটরের গুঞ্জন আর করাতের কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে অনবরত। বাতাস রঙের গন্ধে সয়লাব।

আমেরিকান হিস্টোরি মিউজিয়ামে যে সংস্কারকাজ চলছে, তা মনে পরে গেল গ্রে'র। আব্রাহাম লিংকন-এর হ্যাট থেকে শুরু করে ডরোথি-এর জুতা পর্যন্ত, প্রায় তিন মিলিয়ন নিদর্শন প্রদর্শনীর জন্য নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। মিউজিয়ামটা গত দু-বছর যাবত বন্ধ, তবে সামনের মাসেই খুলে দেয়ার কথা।

কিন্তু ভেতরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কাজ শেষ হতে আরও দেরি হবে, চারদিকে প্লাস্টিক শিটের ছড়াছড়ি। প্রতি তলার মাঝে সংযোগস্থাপন করেছে সিঁড়িগুলো। মাথার ঠিক উপরে একটা বিশাল স্কাইলাইট এখনও কাগজের শিটে ঢাকা।

কাজ করতে থাকা এক রংমিস্ত্রির কাঁধ টেনে ধরল গ্রে। "বাইরে যাবার রাস্তা কোন দিকে?"

তার দিকে আড়চোখে তাকাল লোকটা। "দ্বিতীয় লেভেলের প্রধান প্রবেশপথ ছাড়া বাকি সব রাস্তা বন্ধ। ওদিক দিয়ে যান।" বলে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল ও।

একসাথে এগোতে লাগল সবাই। রেডিওর দিকে তাকাল গ্রে, সিগন্যাল নেই। সম্ভবত ব্লক করে রাখা হয়েছে সিগন্যাল।

সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় লেভেলে পৌছালো ওরা, অপেক্ষাকৃত নীরব এদিকটা। সবুজ মার্বেলের মেঝে সম্প্রতি পালিশ করা হয়েছে, রুপালি রঙের ছাপ দেয়া তারা ফুটে আছে। কেন্দ্র থেকে একেবারে সোজাসুজি বাইরে যাওয়ার কাঁচের দরজাটা চোখে পড়ল গ্রের।

কিন্তু... দেরি হয়ে গেছে।

সেই মুহূর্তেই অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে কয়েকজন লোক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। পিছিয়ে যাওয়ার জন্য এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কিকে ধাক্কা দিল গ্রে। তাদের পেছনে প্রথম লেভেলে কুকুরের ডাক শোনা গেল, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে কর্মীরা।

"এখন কী হবে?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

প্রবেশপথের দিক থেকে বুলহর্নের আওয়াজ ভেসে এল। *"হোমল্যান্ড সিকিউরিটি! ভবন খালি করা হচ্ছে, সবাই এখনই বেরিয়ে যান!"*

"এদিকে এসো," তাড়া দিল গ্রে।

এই ফ্লোরের সবচেয়ে বিশালাকায় নিদর্শন সাজিয়ে রাখা শোকেসের সামনে পৌঁছলো তারা, একটা পতাকা-পলিকার্বোনেটের পনেরোটা টুকরো দিয়ে তৈরি।

"এভাবে পালিয়ে পার পাওয়া যাবে না," এলিজাবেথ বলল।

"পালাচ্ছি না।"

"তাহলে কী লুকোবো?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করল। "ব্যাটাদের কুকুরগুলোর জন্য তাও তো করা যাবে না।"

"পালাবোও না, লুকোবোও না," নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল গ্রে।

উজ্জ্বল রঙের পতাকাটা অতিক্রম করল ওরা। মিউজিয়ামের অপর দিকের দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে পতাকাটার গায়ে। গ্রে দেখতে পেল, একমাত্র বাইরে যাবার রাস্তাটায় অবস্থান নিয়েছে রাইফেলধারী লোকগুলো।

কর্মীদের অতিরিক্ত পোষাক আর যন্ত্রপাতির মাঝখান দিয়ে এগোনোর সময় কয়েকটা জিনিস কোয়ালস্কির হাতে তুলে দিল ও। নিজের হাতে রাখল শুধু একটা রঙের ক্যান আর এক গ্যালন পেইন্ট থিনার-পালানোর রাস্তা বানানোর জন্য আপাতত এগুলোই দরকার।

পতাকাটার নিচ দিয়ে হলওয়ের দিকে এগোলো গ্রে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দম আটকে এল কোয়ালস্কির।

"কী করতে যাচ্ছো তুমি, পিয়ার্স?"

মিউজিয়ামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশে পৌঁছলো তারা, একটা প্রায়ান্ধকার হল। একপাশে সারিবদ্ধভাবে বসার আসন রাখা, অন্যপাশে কাঁচের আড়ালে আমেরিকার সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শনগুলোর একটি সাজানো। রঙ চটে মলিন হয়ে যাওয়া উল আর সুতোয় বোনা একটা কাপড়ের টুকরো, জিনিসটার আকৃতি অর্ধেক ফুটবল মাঠের আকারের সমান।

"পিয়ার্স?" গুঙিয়ে উঠল বিশালদেহী লোকটা, "আমেরিকার পতাকা এটা!"

ততক্ষণে রঙের ক্যানটা মেঝেতে রেখে থিনারের গ্যালনের মুখের ছিপি খুলতে লেগে গিয়েছে গ্রে, উচ্চমাত্রার দাহ্য পদার্থ এই থিনার।

"কাজটা করার কোনও অধিকার তোমার নেই, পিয়ার্স।"

কোয়ালস্কির কথা অগ্রাহ্য করে এলিজাবেথের দিকে ফিরল ও।

"লাইটারটা কোথায় তোমার?"

রাত ৮:৩২

ন্যাশনাল জু-র সিকিউরিটি অফিসে বসে নিজের বয়সের ভার অনুভব করতে পারলেন ইউরি। অ্যান্ড্রোজেন, স্টিমুল্যান্টস আর সার্জারি তার দৈহিক বয়স ঢেকে রাখতে পারলেও মনের বয়স তো আর ঢাকতে পারছে না।

"আমরা আপনার নাতনিকে খুঁজে বের করব," নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন সিকিউরিটি চীফ। "পার্কের গেইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সবাই খুঁজছে ওকে।"

অফিসে ইউরি ছাড়াও একটা মেয়ে আছে, কতই বা হবে বয়স...বিশ-পঁচিশ। তার পরনে কর্মীদের খাকি ইউনিফর্ম। নেমপ্লেটে নাম দেখা যাচ্ছে- তাবিথা। মনে হচ্ছে, ইউরির উপস্থিতি মেয়েটাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে। ডেস্ক থেকে উঠে তার দিকে এগোলো ও।

"কাউকে ফোন করতে চান আপনি? কোনও আত্মীয়?"

মাথা তুলে তার দিকে তাকালেন ইউরি। এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করলেন মেয়েটাকে, তারুণ্যের প্রাচুর্যে ভরপুর। তিনি মনে করতে পারলেন, কার্পাথিয়ান পর্বতমালায় অভিযান চালানোর সময় তিনিও এই বয়সীই ছিলেন। কতই না ভালো হত, যদি তখন জিপসি ক্যাম্পটা খুঁজে না পাওয়া যেত!

"আপনি কি ফোনটা ব্যবহার করবেন?" আবারও জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। "*ডা।*"

ওয়াশিংটনের পুলিশ সার্ভিসের সহায়তা পাবার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যেই ম্যাপলথোর্পকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন ইউরি। তবে এখন ন্যাশনাল মিউজিয়ামে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন উনি, খবরটা বিভ্রান্ত করেছে উনাকে। প্রফেসরের পোকের মেয়ের ব্যাপারে কী যেন একটা বলেছিলেন, কথাটায় কান দেননি ইউরি। যাই হোক, ম্যাপলথোর্প কথা দিয়েছেন যে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। অ্যালার্ট জারি করে দেয়া হবে ওয়াশিংটন আর আশেপাশের সকল এলাকাতে। মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই।

সাশা...

গোলগাল মুখ আর উজ্জ্বল নীল চোখদুটো ভেসে উঠল ইউরির চোখের সামনে। ওকে একা ছাড়াই উচিত হয়নি। কেউ অপহরণ করেনি তো মেয়েটাকে? মানসিক দৈন্যতার কারণে ওকে নয়-ছয় বুঝিয়ে সাথে করে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ কাজ।

তাবিথার ডাকে সম্বিত ফিরল তার। একটা পোর্টেবল টেলিফোন নিয়ে এসেছে মেয়েটা।

মাথা নেড়ে নিজের সেলফোনের দিকে ইঙ্গিত করলেন ইউরি। "ধন্যবাদ, কিন্তু আমি রাশিয়ায় ফোন করব, আমার স্ত্রীর কাছে। আমার সেলফোনটাই যথেষ্ট।"

নড করে পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

সে চলে যেতেই একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি। সেলফোনটায় কারিকুরি ফলিয়েছে রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্সের এক্সপার্টরা। এটার সিগন্যাল ক্রমাগত কয়েকটা নেটওয়ার্ক টাওয়ারে ধাক্কা খায়, যার কারণে এতে আড়ি পাতা সম্ভব না।

যেখানে কল করছেন সেখানে এখন ভোররাত, প্রায় চারটা বা এতো বাজে। কিন্তু ঠিকই রিসিভ করা হল কলটা।

"কী হয়েছে?"

অন্যপ্রান্তে থাকা মহিলার চেহারা ভেসে উঠল ইউরির চোখের সামনে, তার বর্তমান বস ডক্টর সাভিনা মারতভ। তারা দুজনে একসাথেই কার্পাথিয়ান পর্বতে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু কেজিবির সাথে দহরম-মহরম থাকায় পদের দিক দিয়ে উপরে উঠে গেছেন উনি।

"সাভিনা, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে," রাশিয়ান ভাষায় উত্তর দিলেন ইউরি।

ঝামেলার কথা শুনে মহিলার কুঁচকে যাওয়া চেহারাটা কল্পনা করলেন তিনি। ইউরির এতো উনিও সার্জিক্যাল, হরমোনজনিত বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু

তাকে ইউরির চেয়ে অনেক কমবয়স্ক দেখায়। কালো চুল, নিদাগ ত্বকের কারণে মনে হয় তার বয়স চল্লিশের বেশি না।

কিন্তু এর পেছনের আসল কারণ জানেন ইউরি। তার মতো অপরাধবোধে ভোগেন না সাভিনা। এ ব্যাপারটাই মহিলাকে তার তারুণ্য ধরে রাখতে সহায়তা করছে।

"চুরি যাওয়া জিনিসটা এখনও খুঁজে পাওনি তুমি?" রাগী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি। "শুনলাম পোককে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাহলে সমস্যা কোথায়?"

"সাশা...হারিয়ে গেছে ও।"

ওপ্রান্তে নীরবতা নেমে এল।

"সাভিনা, শুনতে পাচ্ছো?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি। এইমাত্র ডরমেটরীর এক কর্মী খবর দিল, তিনটা বিছানা খালি। সেজন্যই আমি এতো তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি ঘুম থেকে।"

"তিনজন! কে কে?"

"কনস্টানটাইন, ওর বোন কিস্কা আর পিওতর।"

তাদের খোঁজাখুঁজি ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলে চললেন সাভিনা, কিন্তু শেষ নামটা শোনার পর থেকে আর কিছু ঢুকছে না ইউরির কান দিয়ে।

পিওতর...

সাশার জমজ ভাই ও।

"কখন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"শেষ তত্ত্বাবধানকারী মহিলাও ওদেরকে বিছানায় দেখেছিল। তার মানে এটা গত এক ঘন্টার ভেতর ঘটেছে।"

হাত ঘড়ি দেখলেন ইউরি।

সাশার হারিয়ে যাওয়ার সময়েই।

ব্যাপার দুটো কি কাকতালীয়? নাকি পিওতর তার বোনের বিপদের কথা কিছু আঁচ করতে পেরেছিল? প্রানিদের সহানুভূতি অনুভব করার ক্ষমতা আছে ছেলেটার। কিন্তু আগে কখনওই বোনের ব্যাপারে এমন কোনও উদ্বেগ তার ভেতর দেখা যায়নি। তবে এটা ঠিক, অন্যান্য জমজদের থেকে তারা দুজন একে অপরের অনেক নিকটবর্তী। এমনকি তারা নিজেদের ভেতর যোগাযোগের জন্য বিশেষ ভাষা ব্যবহার করতো।

কানে ফোন ধরে রাখা অবস্থায় ইউরি উপলব্ধি করতে পারলেন, কোথাও না কোথাও একটা সংযোগ অবশ্যই আছে। যেন একটা অদৃশ্য হাত নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছু। কিন্তু কার?

সাভিনা চেঁচিয়ে ওঠায় সম্বিত ফিরল তার।

"খুঁজে বের করো মেয়েটাকে...দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই। আগামী দু-দিনে কী ঘটতে চলেছে, তা নিশ্চয়ই তোমাকে আবারও বলে দেয়া লাগবে না।"

ইউরি খুব ভালো করেই জানেন ব্যাপারটা। এজন্যই এত বছর ধরে এত কষ্ট সহ্য করা, এজন্যই এতো নিষ্ঠুরতা, শুধুমাত্র...

দরজা বন্ধ করার শব্দে ঘুরে তাকালেন ইউরি। সিকিউরিটি চীফ ঘরে ঢুকেছেন। "তাকে খুঁজে বের করব আমি," বলে ফোন রেখে দিলেন তিনি।

"কোনও খবর পাওয়া গেছে?" ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, গোটা পার্ক চষে ফেলেছি। কোনও নাম-নিশানাই নেই।"

পেটের ভেতর মুচড়ে উঠল ইউরির।

"তবে একটা খবর আছে। আপনার বর্ণনার সাথে মেলে এমন একটা মেয়েকে নাকি ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে," দ্বিধামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন চীফ।

উঠে দাঁড়ালেন ইউরি, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

এক হাত উঠিয়ে তাকে শান্ত থাকতে ইশারা করলেন চীফ। "ডিসি পুলিশ ব্যাপারটা তত্ত্বাবধান করছে। আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না। দুঃখিত, স্যার। ফেরার সময় শুনলাম এফবিআই-কে খবর দেয়া হয়েছে। যে কোনও সময় পৌঁছাবে তারা।"

এর পেছনে ম্যাপলথোর্পের হাত থাকতে পারে, ভাবলেন ইউরি। "ধন্যবাদ আপনাদের," বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি। "মুক্ত হাওয়া দরকার আমার।"

"বাইরে একটা বেঞ্চ আছে। সেখানে বসতে পারেন।"

ঘর থেকে বেরিয়ে বেঞ্চটার সামনে গেলেন তিনি। জায়গাটা অফিসের জানালা দিয়ে দেখা যায় না, নিশ্চিত হয়ে পার্ক থেকে বের হওয়ার পথের দিকে এগোতে লাগলেন।

ম্যাপলথোর্পের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না। ব্যাপারটার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছেন না লোকটা।

যা করার তা নিজেকেই করতে হবে। আর এজন্য মাত্র একটাই পথ খোলা আছে।

পার্ক থেকে বের হয়ে একটা নাম্বারে ফোন করলেন তিনি। এক মুহূর্ত পর আনসারিং মেশিন- জবাব দিল অন্যপ্রান্তে।

"আপনি আর্গো-র সুইচবোর্ডে সফলভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। আপনার মেসেজ বলুন..."

আর্গো, জেসনস-দের ছদ্মনাম। গ্রীক মিথলজির জেসনদের কিংবদন্তী জাহাজ আর্গো থেকে নামটা নেয়া হয়েছে।

বীপ শব্দটা শোনার আগমুহূর্তে কয়েকটা চিন্তা খেলে গেল ইউরির মাথায়। জেসনদের একজনকে ইতোমধ্যে খুন করেছেন তিনি, আর এখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের সাহায্যই নিতে চলেছেন। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উভয়পক্ষই প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে একে অপরকে টেক্কা দেয়ার জন্য চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে যাচ্ছিলো। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এগুলোর তত্ত্বাবধানে ছিল। যুদ্ধ শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়েই হয় না...জুলুম, নাশকতা, হুমকি ইত্যাদিও যুদ্ধেরই অংশ। তবে উভয়পক্ষের

বিজ্ঞানীদেরই নিজ নিজ সৈন্যদের উপর কর্তৃত্ব ছিল। এক সময় তারা উপলব্ধি করলেন যে, দুপক্ষের মাঝেই একটা সাধারণ ক্ষেত্র আছে। কিন্তু, মাঝখানে একটা অদৃশ্য সীমারেখাও টানা আছে, যা অতিক্রম করা কারও জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না।

কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটলে তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটা মাধ্যম ঠিক করা হয়, একটা গোপন কোড। ইউরি এখন সেটাই উচ্চারন করতে যাচ্ছেন।

"প্যানডোরা।"

রাত ৮:৩৮

হলওয়ে থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া ছড়িয়ে চলেছে।

কোয়ালস্কি আর এলিজাবেথকে নিয়ে মিউজিয়ামের কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে গ্রে। গায়ে চড়িয়েছে রংমিস্ত্রিদের রেখে যাওয়া অতিরিক্ত পোষাক, মুখ ঢেকে নিয়েছে রেসপিরেটররে ১২। কাপড়ে খানিকটা করে রঙও মেখে নিয়েছে।

মাথা ঘুরিয়ে পেছনের গ্যালারির দিকে তাকাল ও। মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়া থিনারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। এক মুহূর্ত পরই কানফাটা শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল, সিলিঙে ফিট করা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থেকে ফোয়ারা দিয়ে বেরিয়ে এল পানি।

শোকেসের কাঁচের ভেতর সুরক্ষিতই আছে ব্যানারটা, ভেবে গেটের দিকে নজর ফেরালো গ্রে। প্রথমে বোমার হুমকি আর এখন এই আগুন, কর্মীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে।

গ্রেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্মীরা। একজন একজন করে সার্চ করার পরই বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলছে। কিন্তু অ্যালার্মের আওয়াজ কানে যেতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল। লোকজনের চাপ সামাল দিতে সার্চ একেবারে বন্ধ না হলেও, হাত চালানোর গতি বাড়িয়ে দিল গার্ডরা।

ছোট দলটা নিয়ে জনস্রোতে ঢুকে গেল গ্রে। তবে ব্যাপারটা পাহাড় থেকে উত্তাল সাগরে পড়ার এতো হয়ে গেল অনেকটা। ধাক্কা, কনুইয়ের গুতো, পায়ে পাড়া দেয়া সব মিলিয়ে এলাহী কারবার।

এলিজাবেথকে সার্চ করে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিল এক গার্ড, পাশে দাঁড়ানো কুকুরটা একবার ডেকে উঠে চুপ হয়ে গেল, এতো এতো মানুষের মাঝে তাদের গায়ের গন্ধ গুলিয়ে ফেলেছে ওটা। তাছাড়া ধোঁয়া আর রঙের গন্ধ তো আছেই।

অন্যদিকে কোয়ালস্কিও পৌছে গেছে এক গার্ডের সামনে। এক হাতে রঙের একটা ক্যান ধরা, জিনিসটা এতোক্ষন লোকজনকে ধাক্কাতে ব্যবহার করছিল ও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সার্চ করা হলো ওকে, রঙের ক্যানটাও খুলে দেখল। ব্যাপারটা

চোখে পড়তেই আঁতকে উঠল গ্রে। কিন্তু কোনও সমস্যা ধরা পড়ল না গার্ডের চোখে। সার্চ শেষ হতে বেরিয়ে গেল কোয়ালস্কি।

বড় করে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রের মুখ দিয়ে। ধাক্কা খেতে খেতে নিজেও দরজার সামনে পৌঁছে গেছে ও।

"হাত উপরে তোলো!" আদেশ কানে যেতে মাথার উপর হাত উঠাল গ্রে। আদেশকারী গার্ডের পাশে দাঁড়ানো অন্য একজন অস্ত্র তাক করেছে ওর দিকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গার্ডের হাতের স্পর্শ অনুভব করল গ্রে। কপাল ভালো, বুদ্ধি করে হোলস্টার আর পিস্তলটা পেছনের গ্যালারির আবর্জনার বাক্সে ফেলে এসেছিল।

"ব্যাগ খোলো!"

কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে চেইন খুলে দেখাল গ্রে। ভেতর থেকে শুধু একটা জিনিসই বেরোলো, ইলেকট্রিক স্যান্ডার-কোনও কিছু পালিশ করতে কাজে লাগে যন্ত্রটা। ব্যাগটা ঝাঁকিয়ে দেখা হলো আরও কিছু আছে কিনা... নেই।

বেরিয়ে আসার সময় একপাশে দাঁড়ানো এক লোকের দিকে নজর গেল ওর। স্যুট পরা, কানে ব্লুটুথ হেডফোন লাগানো। এই লোকটাকেই ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামে দেখেছিল গ্রে।

পাশ কাটানোর সময় লোকটার স্যুটের পকেটে লাগানো ক্রেডেনশিয়ালের দিকে তাকাল ও।

ডি.আই.এ-ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।

পাশে নামও লেখা আছেঃ ম্যাপলথোর্প।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে অন্যদের সাথে যোগ দিল গ্রে। সেই সাথে চোয়ালে নিচে আটকে রাখা রেডিওতে ক্লিক করল, সাথে সাথে অন্যপ্রান্ত থেকে জবাব পাওয়া গেল।

"গ্রে! কোথায় তুমি?" পেইন্টার ক্রোর গলা ভেসে এল।

"ব্যাখ্যা করার সময় নেই। চোদ্দ নাম্বার স্ট্রিটের মোড়ে একটা গাড়ি চাই, এখনই।"

"পাঠাচ্ছি।"

মোড়ের দিকে এগোতে এগোতে কোয়ালস্কির দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিল ও। রঙের ক্যানটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল বিশালদেহী লোকটা। "এটা ধরে রেখে শরীর শিরশির করছিল একেবারে।"

ক্যানটা হাতে নিল গ্রে। রঙের ভেতর মিউজিয়ামে পাওয়া খুলিটা ডোবানো আছে। কপাল ভালো, লোকগুলো রঙ নেড়েচেড়ে দেখেনি। রংমিস্ত্রির হাতে রঙের ক্যান, ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে ওরা।

"আমরা পেরেছি," উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল এলিজাবেথ।

কিন্তু খুশি হতে পারল না গ্রে।

বুঝতে পেরেছে, খেলা মাত্র শুরু।

দুনিয়ার অন্যপ্রান্তে অন্ধকার ঘরে জেগে উঠল এক ব্যক্তি। যন্ত্রপাতির মৃদু মিটমিট করা বাতি ছাড়া আলোর আর কোনও উৎস নেই এখানে। নাকে জিবাণুনাশক আর আয়োডিনের গন্ধ ধাক্কা মারছে, মাথার ভেতর এক টুকরো স্মৃতি ধরা দিয়েই আবার হারিয়ে গেল।

গভীর কালো পানির নিচে উপর থেকে আলো ভেসে আসছে...

উঠে বসার জন্য কসরত করতেই বিছানার রেলিং-এ হাতের কনুই ঠেকে গেল। স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হাত দুটো। তাছাড়া জোর পাচ্ছে না হাতে, অনেক দুর্বল। শুয়েই রইল ও।

আমার কি কোনও দুর্ঘটনা হয়েছিল?

হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন তাকে দেখছে। মাথা ঘোরাতেই দরজার অবয়ব নজরে এল। একজোড়া পায়ের শব্দ, তারপরই কানে এল মৃদু কণ্ঠ। ভাষাটা অবশ্য বিদেশী, রাশিয়ান।

"কে ওখানে?" অনেক চেষ্টার পর ভয়ার্ত গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো। জ্বলতে লাগল গলা, যেন এসিড ঢেলে দিয়েছে কেউ।

নীরবতা...

দম আটকে অপেক্ষা করতে থাকলো ও। একটু পর আলো জ্বলে উঠল দরজার কাছে। আলো পড়তেই অন্ধ হয়ে গেল চোখ। মিটমিট করে তাকানোর চেষ্টা করল ও, বুঝতে পারল আলোর উৎস হচ্ছে ছোট একটা পেনলাইট। বিহ্বলভাব কাটতেই তিনটা ছোট আকৃতি নজরে এল। তিনজন বাচ্চা, বারো-তেরো বছরের এক ছেলের হাতে লাইটটা ধরা। সাথে একটা মেয়ে, বয়স আট বছরের বেশি হবে না। এবং আরেকটা ছেলে, আরও ছোট।

ছোট ছেলেটার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলল বড় ছেলেটা, সম্ভবত ও ই দলটার নেতা। একটা নাম শোনা গেল-পিটার। উত্তরে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে লাগল ছোট ছেলেটা।

"কে তোমরা? কী চাও?" জিজ্ঞেস করল বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা।

এগিয়ে এসে তাকে আটকে রাখা স্ট্র্যাপগুলো খুলতে শুরু করল নেতাগোছের ছেলে আর মেয়েটা। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল অপেক্ষাকৃত ছোটজন। ছেলেটার পরনে ঢোলা প্যান্ট আর ধূসর গলাবন্ধ সোয়েটার। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে মানুষটার মুখের দিকে, যেন কপালে লেখা কিছু একটা পড়তে চেষ্টা করছে।

বাঁধন খোলা হতেই উঠে বসল ও। দুলে উঠল ঘরটা, তবে আগের তুলনায় কম। মাথা ঘোরাচ্ছে, বুঝতে পারল ও। ডানহাতে মাথায় হাত দিল, নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করছে। মাথা পুরোটা কামানো, বাম কানের নিচে সেলাইয়ের দাগ অনুভূত হলো।

অপারেশনের দাগ? সেজন্যই কি মাথা কামানো হয়েছে?

অন্যহাত চোখের সামনে আনতেই বুকটা ধক করে উঠল। তালু বা আঙুল কিছুই নেই, কবজি পর্যন্ত এসেই ফুরিয়ে গেছে হাতটা। বড় কোনও দুর্ঘটনা হয়েছিল

আমার, ভাবল ও। কিন্তু কানের পাশের ক্ষতটা সাম্প্রতিক। তবে হাতের ক্ষতটা অনেক পুরনো, শুকিয়ে গেছে।

বড় ছেলেটা বিছানার পাশ থেকে ইংরেজিতে বলে উঠল, "এস।"

ছেলেটার কণ্ঠে বিপদের আঁচ পেল ও। নামার জন্য ঠাণ্ডা টাইলসের মেঝেতে পা রাখতেই আবারও ঘরটা দুলে উঠল যেন।

"তাড়াতাড়ি," তাড়া দিল ছেলেটা।

"দাঁড়াও, উত্তর দিল ও। সেই সাথে বুক ভরে টেনে নিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। "কি হয়েছে? খুলে বলো আমাকে।"

"এখন এতো সময় নেই।" নিজের পরিচয় দেয়ার ভঙ্গিতে বুকে হাত ঠেকালো ও। "আমার নাম কন্সটানটাইন। তাড়াতাড়ি চলো। হাতে সময় খুব কম।"

"কিন্তু... কিন্তু, আমি..."

"বুঝতে পেরেছি। বিহ্বল হয়ে গেছো তুমি। আপাতত এটুকু জেনে রাখো, তোমার নাম হচ্ছে মঙ্ক কক্কালিস।"

মাথা নাড়লো ও, মঙ্ক কক্কালিস!

নামে আর কী ই বা এসে যায়। স্মৃতির হাতড়ানো শুরু করল ও, কিন্তু এই নামটা ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না। আজব ব্যাপার তো... কী হয়েছে তার? জেগে ওঠার আগের কোনও স্মৃতিই মনে পড়ছে না।

বিছানার পাশে দাঁড় করা ই.কে.জি মনিটরের দিকে তাকাল ও, জিনিসটার কোনায় হৃৎস্পন্দন মাপার যন্ত্রও আছে। আইভি লাইন ঝুলে আছে রেলিং-এ। এসব কিছুই চিনতে পারছে, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই মাথায় আসছে না।

তার মনের কথাগুলো যেন পড়তে পারছে ছোট ছেলেটা, সামনে এগিয়ে এল ও। যেন ওর নিজের থেকেও ওর সম্পর্কে বেশি জানে ছেলেটা, মনে হলো মঙ্ক-এর।

সামনে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা, যেন ওর চাহিদাটাকেই প্রকাশ করার জন্যই ছড়িয়ে রেখেছে আঙুলগুলো।

"বাঁচাও আমাদের।"

৫
সেপ্টেম্বর ৫, রাত ৯:৩০
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"চেরনোবিল?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ। "বাবা রাশিয়ায় কী করছিলেন?"

কফি টেবিলের অন্যপ্রান্তে থাকা মানুষ দুজনের দিকে তাকাল মেয়েটা। একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে ও এখন, পেছনের জানালা দিয়ে রক ক্রীক পার্কের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। মিউজিয়াম থেকে পালানোর পর গ্রে তাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এটা নাকি একটা সেফ হাউস, অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনীর এতো ব্যাপারস্যাপার। তবে বাড়ির পরিবেশটা আসলেই মন ভালো করে দেয়ার মতো।

এখানে এসে গোসল করেছে ও, কিন্তু পানির ঝাপটাও গা থেকে রঙ আর ধোঁয়ার গন্ধ পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ দুহাতে মুখ ঢেকে কমোডের উপর বসেছিল ও, চোখের পানিতে হাত ভিজে যাবার আগে বুঝতেই পারেনি যে কাঁদছে! আসলে বাবার মৃত্যুটা মন থেকে পারছে না এখনও। অন্তত কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে তো নয়ই।

উত্তরের আশাই তাকে বাথরুম থেকে বের করেছে।

টেবিলের অন্যপ্রান্তে কফির কাপ হাতে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকাল ও। তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন গ্রে'র বস বলে, ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো। রোদে পোড়া তামাটে ত্বক উনার। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে লোকটার চেহারার স্থানীয় আমেরিকান ধাঁচ ধরতে পারল ও। নীল চোখের তারায় উজ্জ্বল দ্যুতি খেলা করছে। মাথার কালো চুলের পাশাপাশি একপাশে কানের উপর হালকা সাদার পোচ, আরেকটু আভিজাত্য এনে দিয়েছে চেহারাটায়।

গ্রে-ও ভদ্রলোকের সাথে একই সোফায় বসে আছে, তার সামনের টেবিলে কাগজের স্তূপ।

কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই রান্নাঘর থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি। সাধের জুতোজোড়া পালিশ করে রেখে দিয়ে শুধু মোজা পরে আছে এখন।

"কিছু বিস্কুট পেয়েছি, সেই সাথে পনিরের মতো দেখতে আরও কী যেন আছে," বলতে বলতে হাতের প্লেটটা এলিজাবেথের সামনে রাখল ও।

"ধন্যবাদ, জো।"

শ্রাগ করল বিশালদেহী লোকটা। "সমস্যা নেই..." প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ভুলে গেছে। মাথা নেড়ে নিজের সাধের জুতোজোড়া আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও।

সোজা হয়ে বসলেন পেইন্টার। "জানি না তোমার বাবা ওখানে কেন গিয়েছিলেন। উনার পাসপোর্ট চেক করেছি আমরা। পাসপোর্টে রাশিয়ায় যাবার বা ইউনাইটেড স্টেটসে ফিরে আসার কোনও রেকর্ডই নেই। একমাত্র যে রেকর্ড পাওয়া গেছে তা হলো, মাস পাঁচেক আগে ভারতে গিয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি।"

সায় দিল এলিজাবেথ। "ভারতে প্রায়ই যেতেন তিনি, বছরে প্রায় দুবার করে।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"রিসার্চের জন্য। নিউরোলজিস্ট হিসেবে সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে মুম্বাই ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক তাকে সাহায্য করতেন।"

পেইন্টারের দিকে তাকাল গ্রে।

"খোঁজ নিয়ে দেখছি," বললেন তিনি। "অনুভূতি আর সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপারে তোমার বাবার আগ্রহের ব্যাপারে জানা ছিল আমার। এ কারণেই মূলত জেসনদের সাথে সম্পৃক্ততা হয়েছিল তার।"

শেষের বাক্যটা গ্রে কে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও সংস্থাটার নাম শুনে চমকে উঠল এলিজাবেথ।

"তাহলে আপনারা জেসনদের সম্পর্কেও জানেন।"

তার দিকে তাকালেন পেইন্টার। "হ্যাঁ, আমরা জানি যে তোমার বাবা ওদের সঙ্গে কাজ করতেন।"

"কাজ? কাজ না বলে ওটাকে বরং নেশা বলা যেতে পারে।"

"মানে কী?"

ব্যাখ্যা করতে লাগল এলিজাবেথ, কীভাবে মিলিটারিদের সাথে কাজ করা ওর বাবার সকল ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। প্রায় প্রত্যেক গ্রীষ্মে, কয়েক মাসের জন্য বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতেন তিনি। বছরের বাকি সময়টুকু এম.আই.টি'র প্রফেসর হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন। যার কারণে বাড়িতে থাকতেনই না বলতে গেলে। তার বাবা আর মার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকে ব্যাপারটা। মিসেস পোকের ধারণা ছিল উনার হয়তো অন্য কারও সাথে সম্পর্ক আছে।

অশান্তি বাড়তে থাকে, মদে আসক্ত হয়ে পড়েন মিসেস পোক। ধীরে ধীরে আওতার বাইরে চলে যায় ব্যাপারটা। এলিজাবেথের বয়স যখন ষোল, একদিন মাতাল হয়ে গাড়ি নিয়ে চার্লস নদীতে পড়ে যান তিনি। কখনওই জানা যায়নি, ঘটনাটা অ্যাকসিডেন্ট ছিল নাকি আত্মহত্যা। কিন্তু এলিজাবেথ বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটার জন্য সম্পূর্ণভাবে তার বাবাই দায়ী।

তারপর থেকেই বাবার সাথে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দেয় ও। এমনকি এখন, মৃত্যুর পরও তার উপর থেকে রাগ কমছে না এলিজাবেথের।

"কী মনে হয় আপনাদের, বাবার মৃত্যুর সাথে কী জেসনদের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে?" জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "ধারণা করা কঠিন। তদন্ত তো সবে শুরু হলো। তবে জানতে পেরেছি তোমার বাবা মিলিটারিদের সাথে একটা গোপন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলেন। নামটা হলো প্রজেক্ট---"

"-স্টারগেট," বাক্যটা শেষ করল এলিজাবেথ।

ওর মুখে নামটা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন পেইন্টার।

ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। "হ্যাঁ, স্টারগেট নামের মুভিটা দেখেছি আমি... ওই এলিয়েন আরও কী হাবিজাবি নিয়ে যেন, তাই না? "

"এটা ওই স্টারগেট না, জো, উত্তর দিল এলিজাবেথ। "আর ভাববেন না, মিস্টার ক্রো। আমার বাবা নিজের সিক্রেট ক্লিয়ারেন্স অমান্য করে আমাকে কিছু জানাননি। কথায় কথায় উনার মুখে শব্দটা কয়েকবার শুনেছিলাম আমি। আর তার প্রায় এক দশক পর সিআইএ থেকে প্রজেক্টের ব্যাপারে পাঠানো রিপোর্ট পড়ি আমি, ততদিনে আর গোপন ছিল না ব্যাপারটা।"

"কী সংক্রান্ত প্রজেক্ট ওটা?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

টেবিলে রাখা কাগজের স্তুপের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। "ওগুলোতে বিস্তারিত লেখা আছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম থিংক-ট্যাংক, দ্য স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তত্ত্বাবধানে ছিল ব্যাপারটা, স্টেলথ টেকনোলজির উন্নতি সংক্রান্ত। তবে উনিশশো তিয়াত্তর সালে সংস্থাটাকে সিআইএর আওতাধীন করা হয়, ইন্টেলিজেন্স বিভাগে প্যারাসাইকোলজি-র ব্যাবহার সম্পর্কে গবেষণার জন্য।

"প্যারাসাইকোলজি?" ভ্রূ কুচকালো গ্রে।

সায় দিলেন পেইন্টার। "টেলিপ্যাথি, টেলিকাইনেসিস...তবে ওদের মূল লক্ষ্য ছিল চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দূর থেকে কোনও দৃশ্য দেখা বা কোনও জিনিসের স্থানান্তর ঘটানো।"

"মনস্তাত্ত্বিক স্পাই!" ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে কোয়ালস্কির গলা শোনা গেল।

"ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি কেমন ছিল, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েতরা প্যারাসাইকোলজি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করতো। বায়োনিক্স, জীবপদার্থবিদ্যা, পদার্থের উপর মনের প্রভাব, পদার্থের উপর মস্তিষ্কের প্রভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছিল তাদের।"

এলিজাবেথের দিকে ফিরলেন পেইন্টার। "তেমনিভাবে সহজাত প্রবৃত্তি আর অনুভূতিসংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার বাবার আসল গবেষণার সাথেও যোগসূত্র ছিল নিউরোফিজিওলজির।"

গ্রে'র দিকে তাকাল এলিজাবেথ, মনোযোগী শ্রোতার মতো পেইন্টারের কথা শুনে যাচ্ছে ও।

"সিআইএ-র রিপোর্ট অনুয়ায়ী, সোভিয়েতরা ভালোই অগ্রগতি দেখাচ্ছিলো। কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালে হঠাৎ করেই গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় গোটা প্রক্রিয়াটা। অনুমান করা হয়, কেজিবির তত্ত্বাবধানে গোপনভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো কাজ। তাই মূলত স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়।"

"ফলাফল?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"ভালো-মন্দ মিলিয়েই।"

"আসলে খুব একটা সাফল্য আসেনি," বলল এলিজাবেথ, রিপোর্টগুলো পড়া আছে তার।

"সাফল্য আসেনি, তাও বলা ঠিক না," প্রতিবাদ করলেন পেইন্টার। "রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে দূর থেকে জিনিসপত্র দেখার ব্যাপারে গড়ে প্রায় পনেরো ভাগ সফলতা এসেছিল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ ঘটনাও ঘটে। নিউ ইয়র্কের এক চিত্রকর, ইনগো সোয়ান, সে লংগিচিউড আর ল্যাটিচিউড দেখে ওই জায়গার বিল্ডিং-এর বর্ণনা দিতে পারতো। তার ওই বর্ণনা ক্ষেত্রভেদে পঁচাশিভাগ পর্যন্ত মিলেও গিয়েছে। আরেকটা ঘটনা আছে, জেনারেল জেমস ডোজিয়ার-এর অপহরণের ব্যাপারটা। প্রজেক্টের আওতাধীন এক দূরদর্শক ঠিকঠাক আন্দাজ করতে পেরেছিল, কোথায় জেনারেলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরেকজন ওই জায়গার ভবনের বর্ণনাও দিয়েছিল। এতো সব কাহিনী থাকার পর প্রজেক্টটাকে ব্যর্থ বলা যায় না কোনওমতেই।"

"আমার মতে, নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেয়া হয়," বলল এলিজাবেথ।

"পুরোপুরিভাবে না," যোগ করলেন পেইন্টার।

তিনি কিছু ব্যাখ্যা করার আগেই মুখ খুললো গ্রে। "কিন্তু এগুলোর সাথে জেসনদের কী সম্পর্ক?"

"ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি। স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো সোভিয়েতরাও বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের উভয়পক্ষের গবেষণাতেই একটা সাধারন ক্ষেত্র আছে। তাই তারা নিজেদের গবেষণার পরিধি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দুজন জেসনের সাথে যোগাযোগ করে। এদের একজন তোমার বাবা, আর অন্যজন হলেন ডক্টর ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড, মস্তিষ্কবিদ্যার একজন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার তিনি।

নামটা মনে করতে পারল এলিজাবেথ। ছোটবেলায় প্রায়ই বাবার সাথে দেখা করতে বাড়িতে আসতো লোকটা, সবসময়ই ওর জন্য কিছু না কিছু গিফট আনতোই।

"তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি আমি," বলে চললেন পেইন্টার। "কিন্তু জানতে পেরেছি, গত পাঁচ যাবত কারও সাথেই যোগাযোগ নেই উনার।"

শিরশিরে অনুভূতি হলো এলিজাবেথের। পাঁচ মাস! "বাবার ভারতে যাবার সময় থেকেই।" গ্রে'র দিকে তাকাল ও।

কী হচ্ছে এগুলো?

রাত ৯:৪০

লিফট থেকে বেরিয়ে এলেন ইউরি রাইভ, রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মাটির নিচের ফ্লোর এটা। ফোনকলে তাকে এখানে আসার জন্যই বলা হয়েছিল, মেরিল্যান্ডের ওয়াল্টার রিড আর্মি ইনস্টিটিউট। পৌঁছতে প্রায় পৌনে একঘন্টা লেগেছে। পাঁচ লাখ ঘনফুট জায়গার

অধিকাংশ স্থানই যেন সকল ধরণের সংক্রমণমুক্ত থাকতে পারে, সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে বিশালাকায় ভবনটা।

জেসনদের কাছে পৌঁছতে গোপন কোডটা ব্যবহার করেছেন ইউরি-প্যানডোরা। তিনি আশা করছেন, সাশাকে খুঁজতে তাকে সাহায্য করবে জেসনরা। শারীরিবিদ্যা, মনস্তাত্ত্বিকবিদ্যা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ধ্যান-ধারনা থাকায় ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন তারা। অন্যদিকে, ম্যাপলথোর্প ঘটনাটা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। লোকটার উপর ভরসা নেই ইউরির।

তাকে ডক্টর জেমস চেন-এর সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে, নিউরোলজিস্ট হওয়ার পাশাপাশি ভদ্রলোক জেসনদের অন্যতম প্রধানও। নিজে না পারলেও, সাহায্য করতে পারবে এমন কারও সাথে হয়তো ইউরিকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারবেন তিনি।

দেখা করার জায়গা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আছে ইউরির। হলওয়ে ধরে এগিয়ে চললেন উনি। পার হয়ে আসা বেশিরভাগ দরজাই বন্ধ। লোকজনের সমাগমও খুব একটা নেই। ব্লিচের গন্ধ নাকে এল তার।

হাঁটতে হাঁটতে দরজার পাশে সাঁটানো লেবেলে কাঙ্ক্ষিত রুম নাম্বারটা নজরে এল তার, বি-২৩৪০।

কাঁচের দরজায় নক করতে ভেতর থেকে একটা ছায়ার এতো অবয়ব খুলে দিল দরজাটা।

"ডক্টর রাইভ, এসেছেন তাহলে।"

এশিয়ান লোকটার দিকে তাকালেন ইউরি, ইনিই জেমস চেন। সাদা ল্যাব কোট পরনে উনার, চশমা কপালের উপর ওঠানো। তার পিছু নিয়ে আরেকটা দরজার দিকে এগোলেন ইউরি। দরজাটার অপর পাশে একটা অফিসরুম। ঘরটায় একটা স্টিলের ডেস্ক, টু-ডু লিস্ট সাঁটানো একটা সাদা বোর্ড আর একপাশে একটা বুককেস ছাড়া আর কিছু নেই। ওহ না...আছে, ডেস্কের পেছনে ফোন কানে ধরে বসে আছেন এক ব্যক্তি। ঘুরে তাকাতেই তার রুক্ষ ত্বক, চোয়ালের কাঠামোর সাথে মিলিয়ে ছাঁটা লালচে দাঁড়ি দেখা গেল।

ডক্টর ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড, জেসনদের রাশিয়ানদের সাহায্যকারী বিভাগের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি তিনি আর্চিবাল্ড পোকের বন্ধুও ছিলেন।

"মাত্রই পৌঁছেছেন," ইউরির উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে ফোনে বললেন তিনি। "আমি একঘন্টা পর ব্রিফ করবো সবাইকে।"

ফোন রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ইউরির উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "ঘটনাটা সম্পর্কে শুনেছি আমি, ইউরি। মেয়েটার শারীরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। যতদুর করা সম্ভব আমরা করব।"

হাত মিলিয়ে চেয়ারে বসলেন ইউরি। ম্যাকব্রাইডের কথায় কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। অভিজাত মুখাবয়বের পাশাপাশি মাথায় বুদ্ধিও আছে লোকটার।

"ব্যাপারটার গভীরতা বুঝতে পারছেন তো?" বললেন তিনি। "মেয়েটাকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে।"

সায় দিলেন ম্যাকব্রাইড। "ওষুধপত্র ছাড়া কতক্ষণ থাকা সম্ভব ওর পক্ষে?"

"বত্রিশ ঘন্টা।"

"শেষবার ইনজেকশন কখন দিয়েছিলেন?"

"সাত ঘন্টা আগে," উত্তর দিলেন ইউরি।

তার মানে একদিনের কিছু বেশি সময় হাতে আছে।

"তাহলে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে," বললেন ম্যাকব্রাইড। "হয়তো বুঝতে পেরেছেন, ম্যাপলথোর্প ফোন করেছিলেন আমাকে। আসলে, এজন্যই আমি এখন এখানে।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি জেনেভায়। যতদূর জানি, আপনার এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকার কথা!" জবাবে বললেন ইউরি।

"আর্চিবান্ডের সাথে সাথে আমার লুকিয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়েছে। যদিও ফলাফল আরও ভালো হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমার বন্ধু ছিল ও।"

"আপনি তো জানেনই, বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না পোকের পক্ষে। আমি প্রয়োজনের তাগিদে সময়টুকু খানিকটা এগিয়ে এনেছি মাত্র।"

অপ্রস্তুত দেখালো ম্যাকব্রাইডকে। চেয়ারে হেলান দিলেন উনি। "সত্যি বলতে কী, আরেকটু নমনীয়তা আশা করেছিলাম আমি ওর থেকে। সর্বোপরি, এটা ওর কাজেরই অংশ ছিল। আর ও যেরকম হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাতে এটাই একমাত্র রাস্তা ছিল... "

বাক্যটা শেষ না করে দুঃখিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকালেন উনি।

ম্যাকব্রাইড যতটুকু ভেবেছিলেন, পোক আসলে তার চেয়েও গভীরভাবে প্রজেক্টের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা ছিল। তার সাথে মানিয়ে নেয়া, নয়তো তাকে খতম করে দেয়া।

মানিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং...

ওয়ারেনে ফিরে এসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি। ফলাফল, মৃত্যু ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না।

"আর্চিবান্ডের ব্যাপারে দুঃখিত আমি," বললেন ইউরি।

কথাটা শুধু মুখের কথা না। আসলেই দুঃখিত ছিলেন তিনি। পোকের মৃত্যু, প্রয়োজনের পাশাপাশি ক্ষতির কারনও ছিল। এতো বছর ধরে আমেরিকানদের কাছ থেকে যা লুকিয়ে এসেছে রাশিয়ানরা, তা প্রায় ফাঁস করতে বসেছিলেন মানুষটা। আসলে, উভয়পক্ষই তার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছিল।

কথা চালিয়ে গেলেন ইউরি। "হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা..."

তার কথার মাঝখানে বাঁধা দিলেন ম্যাকব্রাইড। "মনে হয় সে আপনার 'ওমেগা সাবজেক্ট'-দের একজন ছিল।"

সায় দিলেন তিনি। "সাতানব্বই ভাগ সফল ছিল মেয়েটা, প্রজেক্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট। একটা ওমেগা সাবজেক্টকে সচল রাখা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ,

ম্যাপলথোর্প ব্যাপারটার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছেন না বলেই আমার মনে হচ্ছে।"

"আমার মনে হয় সে-ও এটাই চায়।"

পেছনে দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ইউরি, কেউ একজন এসেছে। ডক্টর চেন সম্ভাষণ জানালেন তাকে।

অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন জন ম্যাপলথোর্প। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার চোখমুখ। দুশ্চিন্তা দোলা দিয়ে গেল ইউরির মনে।

উঠে দাঁড়ালেন ম্যাকব্রাইড। "জন, আসুন আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিলো। খুলিটার ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি হয়েছে কী?"

"না। দুটো মিউজিয়ামেই খুঁজে দেখা হয়েছে।"

"ওহ হো," চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ম্যাকব্রাইড। "আর মেয়েটা?"

"হেলিকপ্টার গোটা শহর চষে ফেলছে। তবে এখনও পর্যন্ত ট্র্যাকিং ডিভাইসের সিগন্যাল পাওয়া যায়নি।"

শেষের কথাটুকু মনোযোগ কেড়ে নিল ইউরির। "ট্র্যাকিং...কীসের ট্র্যাকিং ডিভাইস?

হাত বাড়িয়ে আঙুলের আগায় একটা জিনিস দেখালেন ম্যাকব্রাইড। একটা বিন্দুর চেয়ে আকারে বড় হবে না ওটা, দেখার জন্য মাথা ঝুঁকে তাকাতে হলো ইউরিকে।

"ন্যানোটেকনোলজির কামাল," বললেন ম্যাকব্রাইড। "পলিমারের তৈরি একটা মাইক্রোট্রান্সমিটার এটা, সেকেন্ডে সেকেন্ডে সংকেত পাঠাতে পারে। শেষবার ওয়ারেনে যাওয়ার সময় সবগুলো ছেলেমেয়ের গায়ে এমন একেকটা করে ডিভাইস ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি।"

"সাভিনা এগুলোর ব্যাপারে জানে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ইউরি।

উত্তরে কিছু না বলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ম্যাকব্রাইড। তার মানে সাভিনা কিছুই জানে না এগুলোর ব্যাপারে। আমেরিকানরা গোপনে করেছে কাজটা।

কিন্তু কেন?

সম্ভাবনা খেলা করতে লাগল ইউরির মাথায়। সবগুলো ছেলেমেয়ের শরীরে ট্র্যাকিং ডিভাইস... তার মানে কোনও বাচ্চাকে ওখান থেকে বাইরে বের করে আনাটাই আমেরিকানদের প্ল্যান ছিল।

বিস্ফোরিত হলেন ইউরি। "তার মানে গোটা ব্যাপারটাই নাটক! ডক্টর পোকের পালানো..."

মুচকি হেসে সায় দিলেন ম্যাকব্রাইড।

"আর্চিবাল্ডের পালানোর সময় আপনি ওয়ারেনে উপস্থিত ছিলেন। আপনিই ওকে পালাতে সাহায্য করেছেন," বললেন ইউরি, বোকা হয়েছে গিয়েছেন একেবারে।

"হ্যাঁ। আমরা চাচ্ছিলাম, যে কোন ভাবে একটা ওমেগা সাবজেক্টকে বাইরের পরিবেশে ছাড়তে।"

"আর্চিবাল্ডকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন আপনারা! নিজের বন্ধু আর সহকর্মীকে!"

"প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়েছে।"

"সে কি... সে কি জানতো যে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে?"

"কে জানে! আন্দাজ করতে পেরেছিল হয়তো। তবে তার সামনে আর কোনও উপায়ও ছিল না। কখনও কখনও না চাইলেও বাধ্য হয়ে অনেক কিছুই করতে হয়। তবে হ্যাঁ, বলতে হচ্ছে, খুবই ভালো কাজ দেখিয়েছিল ও," উত্তর দিলেন ম্যাকব্রাইড।

"একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করার জন্যই তাহলে এতো কিছু?"

নাকের আগা চুলকাতে লাগলেন ম্যাকব্রাইড। "আমাদের মতে আপনারা...মানে রাশিয়ানরা, কিছু একটা লুকাচ্ছেন, তাই না?"

মুখভঙ্গি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন ইউরি। ম্যাকব্রাইডের ধারনাই ঠিক।

"আমরা বাচ্চাটাকে ব্যবহার করবো," বলে চললেন তিনি। "ইউনাইটেড স্টেটসে নিজেদের মতো করে প্রোগ্রাম শুরু করবো আমরা। খুঁজে বের করবো, যা আপনারা এতো বছর ধরে লুকিয়ে আসছেন।"

আমাদের তথ্য আছে, সেই সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও, ভাবলেন ইউরি।

"মেয়েটার চিকিৎসার কী হবে?" জোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমরা ম্যানেজ করে নেবো। সাহায্যের জন্য আপনি তো আছেনই।"

মাথা নাড়লেন ইউরি। "কক্ষনও না।"

"জানতাম এটাই বলবেন আপনি।"

নিজের কাঁধের উপর দিয়ে পেছন দিকে ম্যাকব্রাইডের দৃষ্টি অনুভব করতে পারলেন ইউরি, ঘুরে তাকালেন সাথে সাথে।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাপলথোর্প।

পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে দিল লোকটা।

রাত ৯:৪৫

কাকতালীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে না গ্রে। একই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা দুজন বিজ্ঞানী একই সময় নিখোঁজ হলেন, তারপর একজনকে আবিষ্কার করা হলো ওয়াশিংটনে, মৃত্যুর মুখে।

"এলিজাবেথ, ব্যাপারটা অবশ্যই তোমার বাবার আসল রিসার্চের সাথে সম্পর্কযুক্ত।"

সায় দিলেন পেইন্টার। "কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে? জানার কোনও মাধ্যমই নেই আমাদের হাতে।"

"জানি না আমি। গত ক'বছর ধরে, খুব একটা কথা হতো না আমাদের। আমি অ্যানথ্রোপলজি নিয়ে পড়ি, এটাও পছন্দ ছিল না বাবার। চাইতেন, আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করি," উত্তর দিল এলিজাবেথ।

"কিন্তু তিনিই তো তোমাকে গ্রীসের মিউজিয়ামে কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন," বলল গ্রে।

মাথা নাড়লো মেয়েটা। "তা না ঠিক। আসলে, ডেলফির ওরাকলের ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল বাবার। ওরাকলের সাথে সহজাত প্রবৃত্তি আর অনুভূতির বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। বাবা বিশ্বাস করতেন, ওরাকলদের ভেতর এক ধরণের জেনেটিক মিল ছিল, অথবা কোনও মস্তিষ্কজনিত অস্বাভাবিকতা। তাই তিনি আমাকে ওখানে কাজে লাগান। যাতে আমি উনাকে রিসার্চে সহায়তা করতে পারি।"

"কিন্তু তার রিসার্চটা ছিল কী নিয়ে?"

"আমি যেটুকু জানি তা বলছি," উত্তর দিল ও। "আপনাদের কেউ কী রাশিয়ানদের অনুভূতিসংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্টের কথা শুনেছেন?"

মাথা নাড়লো সবাই, কেউ শোনেনি।

"ব্যাপারটা নিউরোলজি সংক্রান্ত, মানে বাবার রিসার্চের মতোই আর কি। কয়েক দশক আগে, রাশিয়ানরা কিছু বিড়ালের বাচ্চাকে মা বিড়াল থেকে আলাদা করে একটা সাবমেরিনে নিয়ে যায়। মা বিড়ালের শারীরিক অবস্থা মনিটরের আওতায় রাখা হয়। অন্যদিকে সাবমেরিনে একে একে বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলা হয়। লক্ষ্য করা হয় যে, প্রতিবারই একেকটা বাচ্চাকে মেরে ফেলার সময় মা বিড়ালের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বিড়ালটা। দূরে থাকা সত্ত্বেও নিজ সন্তানের বিপদ টের পেয়েছিল ওটা।"

"মাতৃসুলভ প্রবৃত্তি," বলল গ্রে।

সায় দিল এলিজাবেথ। "অথবা অনুভূতিও বলা যেতে পারে। যাই হোক, বাবা বুঝতে পারেন, তাদের ভেতর একটা জৈবিক সংযোগ আছে। তাই তিনি রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ভারতের ওই প্রফেসরের সাথে দল গঠন করেন। তিনিও তখন ভারতীয় যোগী-সন্ন্যাসীদের ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন।

"কীসের ক্ষমতা?"

হাতে ধরা কফির কাপে চুমুক দিল এলিজাবেথ। "মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষজনের প্রতি আগ্রহ ছিল বাবার। ব্যাপারটা কিন্তু হেলাফেলা করার মতো কিছু না। আইনস্টাইনও এমনটা লক্ষ্য করেছিলেন।"

বিস্ময় লুকাতে পারল না গ্রে। "আইনস্টাইন?"

"হ্যাঁ। শকুন্তলা নামে এক ভারতীয় নারীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের। কিন্তু গণিতে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন তিনি। আসলে অসাধারণ বলতেও কম বলা হয়, কঠিন কোনও গাণিতিক সমস্যা তাকে প্রশ্ন করার আগেই ওটা সমাধান করা শুরু করে দিতেন উনি। আইনস্টাইনের নজরে আসে ঘটনাটা। নিজে তিন মাস ধরে সমাধান করা একটা প্রশ্ন মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি। কিন্তু দেখা যায়, তিনি প্রশ্ন মুখে বলা শেষ করার আগেই চক, ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন শকুন্তলা। বহা বাহুল্য, ঠিক উত্তরই লিখেছিলেন তিনি। আইনস্টাইন উনাকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে করেন তিনি ওটা। উনার জবাব ছিল, "জানি না।" তার চোখের সামনে নাকি আপনা আপনিই উত্তর ভেসে ওঠা শুরু করতো, আর তার কাজ ছিল শুধু ওটাকে লিখে ফেলা।"

সবার দিকে তাকাল এলিজাবেথ, ভেবেছিল কেউ বিশ্বাস করবে না কথাগুলো। কিন্তু পেইন্টার ওকে কথা চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত দিলেন।

"আরেকটা ঘটনা...ভারতেই, মাদ্রাজের এক রিকশাচালক। তারও গাণিতিক দক্ষতা ছিল। সেও প্রশ্ন শোনার আগেই উত্তর বলে দিতে পারতো। তার বক্তব্য ছিল, কাছাকাছি কেউ যদি কোনও গণিতের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনাও করে, তবে সে এক ধরণের উৎকণ্ঠা অনুভব করতো। আর মাথার ভেতর আপনাআপনিই উত্তর এসে ধরা দিতো। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এনে তাকে অমিমাংসিত কিছু প্রশ্নের উত্তর বের করতে বলা হয়েছিল। তার উত্তরগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কয়েক দশক পর যখন স্বাভাবিকভাবে উত্তরগুলো আবিষ্কৃত হলো, তখন দেখা গেল যে রিকশাওয়ালার বের করা উত্তরগুলোই সঠিক। কিন্তু ততদিনে বার্ধক্যের কারণে মৃত্যু হয়েছে তার।"

কফির কাপ নামিয়ে রাখল এলিজাবেথ। "কেসগুলো বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। জীবিত প্রতিভাদের খোঁজে ভারতে পাড়ি জমান তিনি। যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেককে খুঁজেও পান, তবে ততদিনে তাদের বিশেষ শারীরিক ক্ষমতার ব্যাখ্যা বের করে ফেলেছিলেন বিজ্ঞানীরা। যেমন ধরুন, দিনের পর দিন বরফের মাঝে থাকতে পারতেন তারা, কোনও রকম জামাকাপড় ছাড়াই। শরীরে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটা করা হতো। খাবার পরিপাকের হার কমিয়ে মাসের পর মাস কিছু না খেয়েও কাটিয়ে দিতে পারতেন অনেকে।

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। ব্যাপারটা সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানে ও। পুরোটাই শরীরের উপর মানসিক শক্তির প্রভাব।

"ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতিতে ডুবে যান বাবা। এমনকি প্রাচীন বৈদিক লিপি নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন। বিশেষ প্রতিভাধারী যোগী-সন্ন্যাসীদের নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান উনি, রক্ত-পরীক্ষা, ব্রেইন ম্যাপিং, হৃৎস্পন্দনের হার মাপা এমনকি ডিএনএ টেস্টও করেন, যাতে বংশগত কোনও ধারা থাকলে ধরতে পারেন। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাশিয়ান বিড়ালদের মতো তাদের মাঝেও মস্তিষ্কজনিত একটা সংযোগ আছে।"

সোফায় হেলান দিলেন পেইন্টার। "এজন্যই তাকে স্ট্যানফোর্ড প্রজেক্টে যুক্ত করা হয়েছিল, এই ধরণের গবেষণার কারণে।"

"কিন্তু বাবাকে এভাবে মরতে হলো কেন? প্রশ্ন করল এলিজাবেথ। "আর এসবের সাথে অদ্ভুত খুলিটার সম্পর্কই বা কী?"

"এখনও জানা যায়নি," উত্তর দিলেন তিনি। "তবে আশা করছি, কাল সকালের ভেতর কিছু না কিছু অবশ্যই জানতে পারব।"

সিগমার কিছু এক্সপার্টরা বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে ওটাকে।

এমন সময় দরজায় নকের শব্দ মনোযোগ কেড়ে নিলো সবার। ঘুরে তাকালেন পেইন্টার; জুতা হাতে দাঁড়িয়ে গেল কোয়ালস্কি। গ্রেও উঠে দাঁড়াল।

বাইরে দু'জন গার্ড আছে। কোন সমস্যা হলে তাদের রেডিওতে যোগাযোগ করার কথা। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিলো গ্রে।

সবাইকে যার যার জায়গায় থাকতে ইঙ্গিত করে দরজার দিকে এগোলো ও, দরজার পাশে একটা ভিডিও মনিটর আছে। বাইরের কয়েকটা জায়গার সিসিক্যামেরার দৃশ্য দেখাচ্ছে ওটা। তাতেই দেখা গেল, দরজার সামনে দুটো অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। লাল উইন্ডব্রেকার পড়া পেশীবহুল এক লোক, এক হাতে বাচ্চা একটা মেয়ের হাত ধরা। মাথায় লাল ফিতা বাঁধা মেয়েটার। তবে লোকটার হাবভাবে তাকে হুমকি বলে মনে হলো না গ্রের কাছে। উবু হয়ে দরজার নিচ দিয়ে একটা খাম ঢুকিয়ে দিল ও। গড়াতে গড়াতে গ্রের পায়ের সামনে এসে থামল জিনিসটা।

খামটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা কাগজ বের হলো। কালো রংপেন্সিলে আঁকা একটা ছবি, সম্ভবত বাইরে দাঁড়ানো মেয়েটাই একেছে ওটা। ছবিতে সেইফ হাউজের মেইন রুম দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ যে ঘরে ওরা এতোক্ষন বসেছিল, ওটা। ফায়ারপ্লেস, সোফা, চেয়ার সব ঠিক জায়গাতেই আছে। চারটা মানুষের আকৃতিও আছে ছবিতে, দু'জন সোফায়, একজন চেয়ারে। বিশালদেহী একজন জুতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডের সামনে, নিঃসন্দেহে কোয়ালস্কি ওটা।

বাচ্চাটা এই ঘরের ছবি এঁকেছে!

মনিটরের দিকে তাকাল গ্রে। অন্যান্য সিসিক্যামেরার দৃশ্যে উইন্ডব্রেকার পরা আরও কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। গার্ড দুজনকে দেখা গেল, অস্ত্র তাক করে রাখা তাদের সামনে।

ধীরে ধীরে গ্রের দিকে এগোলো কোয়ালস্কি। মনিটরে দৃশগুলো দেখল সেও।

"বাহ!" বলে উঠল ও। "এই তাহলে সেইফহাউজের নমুনা? ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়া হয়েছিল নাকি ঠিকানাটা?"

বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে অস্ত্রধারীরা।

ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে, স্বাধীনতার পথে যাত্রা করেছে মঙ্ক নামের মানুষটা।

হাসপাতালের কেবিনে একজোড়া ডেনিম কভারঅল পেয়ে পরে নিয়েছে ও, একহাতে কাপড় পরা খুব একটা সহজ কাজ না অবশ্য। টাক মাথায় চড়িয়েছে উলের একটা ক্যাপ। কাজ চলা গোছের কোনওরকম একজোড়া বুটও পাওয়া গিয়েছে, সাথে ভারী মোজা।

একটা দরজা খোলার চেষ্টা করছে বড় ছেলেটা, কী যেন নাম বলেছিল... কন্সটানটাইন। দরজা খোলার ক্যাচকোচ শব্দে বোঝা গেল, তারা এখানে বন্দী, পালাতে হবে। পিওতর নামের ছোট ছেলেটা এগিয়ে এসে হাত ধরল ওর। হলওয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল ওকে। মেয়েটা আগেআগে পথ দেখাচ্ছে।

একটা সিঁড়ির কাছে পৌছগুলো ওরা। সিঁড়ির পাশে লেখাগুলো চিনতে পারল মঙ্ক, রাশিয়ান।

তার মানে, ওরা এখন রাশিয়ায়।

মন বলছে, ওর এখানে থাকার কথা ছিল না। ইংরেজীতে কথা বলছে ও, ব্রিটিশ উচ্চারণে। তার মানে ও আমেরিকান। এতো কিছু চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে কিন্তু...

হঠাৎ ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতো কিছু দৃশ্য খেলে গেল ওর মাথায়, যেন অন্য কোনও জীবনের স্মৃতি ওগুলো।

একটা হাসির আওয়াজ... রান্নাঘরে পেছন ফিরে কাজ করছে কেউ...আকাশ চিরে দিচ্ছে তীক্ষ্ণ একটা ফলা...ঘন কালো পানির নিচে আলো আসছে উপর থেকে...

তারপরই উধাও হয়ে গেল দৃশ্যগুলো।

বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন, ভারসাম্য রাখতে সিঁড়ির রেলিং-এ হাত দিল ও।

সামনে সিঁড়ি বেয়ে উঠা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো। সেও পিছু নিলো।

উপরে উঠে এল ওরা। জায়গাটা অন্ধকার, চাঁদ নেই আকাশে। বাতাস কেমন গুমোট বাঁধা আর শুষ্ক মনে হলো। সামনে বসে গুঞ্জন তুলছে একটা জেনারেটর। পেছন ফিরে হাসপাতালের কাঠামোর দিকে তাকাল মঙ্ক। পাশে দুটো পাঁচতলা সমান উঁচু দালানও আছে।

"এদিকে," সামনে এগোতে ইঙ্গিত করল কনস্টানটাইন।

পথের বামপাশে দেয়াল, জায়গায় জায়গায় বাতি জ্বালানো আছে দেয়ালটায়। এক প্রান্তে পৌঁছালো ওরা। মাটি এখানে এবড়োখেবড়ো আর ভেজা। বাতি নেই এদিকটায়। দেয়াল ধরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল ছোট দলটা।

পশুপাখির চেঁচামেচি কানে এল মঙ্কের। চিড়িয়াখানা নাকি এটা? ভাবল ও।

"মেনাজিরী," শব্দটা বলে সামনে এগোনোর জন্য ইঙ্গিত করল কনস্টানটাইন।

মেনাজিরী?

সামনে রাস্তা ঢালু হতে শুরু করেছে এখন। আবছা আলোতে সামনে একটা গ্রাম নজরে এল ওর। ছোট ছোট ঘর, একপাশে তিনতলা একটা বিল্ডিং, সম্ভবত স্কুল। সামনে একটা মাঠও আছে। ছোট গ্রামটার কেন্দ্রে পানির ফোয়ারা খেলা করছে।

গ্রামের অপর পাশে বড় বড় বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। চার-পাঁচতলা উঁচু একেকটা, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। আলো-অন্ধকারের খেলায় নীরব দেখাচ্ছে জায়গাটা।

কিন্তু সামনের গ্রামটা নীরব নয়।

বাচ্চাকাচ্চাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে অবিরাম। নাইটগাউন পরা বাচ্চাদের দেখা গেল, বয়সে বড়ও মানুষও আছে কিছু। তাদের কারও কারও পরনে ধূসর ইউনিফর্ম। ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচানাচি করছে সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে।

হঠাৎ নাম ধরে ডাকতে শোনা গেল কিছু লোককে, গলায় রাগের সুর।

"কনস্টানটাইন...পিওতর...কিস্কা!"

তার সাথের বাচ্চাগুলোর নাম।

শহরের কেন্দ্র থেকে একটা লাল ফেয়ার জ্বলে উঠল, গ্রামের দিকে ছোঁড়া হয়েছে ওটা। ফ্লেয়ারটা অনুসরণ করে উপরে উঠে গেল মঙ্কের দৃষ্টি।

আকাশটা... এটা চাঁদহীন নয়।

আসলে এটা আকাশই না।

বিশালাকায় পাথুরে গম্বুজের নিচের দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে ফ্লেয়ারের আলো। গম্বুজটা ঢেকে রেখেছে গোটা এলাকাটাকে। ছাদ দেখে মনে হলো, মানুষের হাতে তৈরি।

গুহার ভেতর আছে ওরা।

বের হবে কীভাবে এখন?

হাত ধরে টেনে ওকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল কনস্টানটাইন। কয়েকটা জীপ পাশ কাটালো ওদের, হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে। গাড়িতে অস্ত্রধারী লোকজন বসে থাকতে দেখা গেল।

ভালো ঠেকছে না ব্যাপারটা।

গ্রামটার দিকে ইঙ্গিত করল কন্সটানটাইন। একপ্রান্তে একটা টানেলের মুখের এতো কাঠামো আছে, বিশালাকায় লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ করা। "বাহির" লেবেল সাঁটানো আছে দরজাটায়। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে উল্টোদিকে এগোতে লাগল বাচ্চাগুলো।

এমন সময় হাসপাতালের ছাদ থেকে লাল আলো জ্বলে উঠল, পাল্লা দিয়ে বাজতে লাগল অ্যালার্ম।

আরেকটা ব্যাপার ধরতে পেরেছে লোকজন।

শুধুমাত্র বাচ্চাগুলোই না, সাথে আরও একজনও পালিয়েছে।

বাচ্চাগুলোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলল মঙ্ক, কিন্তু সাইরেনের তীব্র আওয়াজে কিছু একটা হচ্ছে বাচ্চাগুলোর। কানে হাত দিয়ে রেখেছে ওরা, চোখ বন্ধ। টলতে টলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কনস্টানটাইন। মঙ্কের গা ঘেঁসে এল পিওতর।

অতিমাত্রায় সংবেদনশীল।

এগোনোর জন্য ওদেরকে তাড়া দিল মঙ্ক। পিওতরকে কোলে তুলে নিলো ও, সেই সাথে এক হাতে টানছে কিস্কাকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ও। তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটা ব্যাপার ভালোভাবেই বুঝতে পারছেঃ ধরা পড়লে এবার স্মৃতি হারানোর চাইতেও খারাপ পরিণতি হবে ওর।

বাচ্চাগুলোর অবস্থা ওর চেয়েও খারাপ হবে হয়তো।

চলতে থাকলো ওরা...কিন্তু গন্তব্য?

৬
৬ সেপ্টেম্বর, সকাল ৫:২২
কিয়েভ, ইউক্রেন

ক্যামেরাগুলো রেডি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন নিকোলাস সলোকভ। নিজে ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছেন। টিস্যু পেপার দিয়ে কলার মুরিয়ে রেখেছেন, যাতে মুখ থেকে মেকআপ সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল স্যুটে লেগে না যায়। এতিমখানার হাসপাতালের একটা ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা সকালের খবর প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছে।

কিয়েভ চিলড্রেন হোম-নামের এই জায়গাটায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা বাচ্চাদের রাখা হয়েছে। এই যেমন দুই বছর বয়সী একটা মেয়ে, গলায় অপারেশনের অনুপযোগী ইয়া বড় সাইজের এক টিউমার। হাইড্রোসেফালাস রোগে আক্রান্ত দশ বছরের একটা ছেলে, মাথা ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে দুটো চোখই চুপসে গেছে আরেকজনের, হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে ওর।

নীল অ্যাপ্রন পরা এক নার্স নিকোলাসের দৃষ্টি অনুসরণ করে ছেলেটার দিকে তাকাল।

"নিজের কোনও ক্ষতি যেন করে না ফেলে, সেজন্য..." ব্যাখ্যা করল ও। এসব দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার চোখ।

এর চেয়েও খারাপ ঘটনা ঘটেছিল এখানে। উনিশশো তিরানব্বই-এ দুই মাথা, দুই হৃৎপিণ্ড, দুই মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মেছিল এক বাচ্চা। কিন্তু হাত পা ছিল একজোড়া করে। খুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরেকজনের মগজ।

সবই চেরনোবিল দুর্ঘটনার ফসল।

উনিশশো ছিয়াশি সালের এক রাতে, চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চার নাম্বার রিঅ্যাক্টর বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণটার শক্তি ছিল হিরোশিমায় বিস্ফোরিত পারমাণবিক বোমার চাইতেও চারশো গুণ বেশি। রাশিয়ান মেডিকেল সায়েন্স অ্যাকাডেমি-র মতে, দশদিনের মাথায় তেজস্ক্রিয়তার কারণে প্রায় এক লক্ষ মানুষ মারা যায়, আক্রান্ত হয় আরও সত্তর লক্ষের মতো, যাদের বেশিরভাগই ছিল শিশু। এরপর থেকেই ক্যান্সার আর প্রতিবন্ধিতা তাদের নিত্যসঙ্গী।

আর এখন, সেই দূর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরবর্তী ঢেউ আঘাত হানছে। মা-বাবা হচ্ছে তৎকালীন শিশু কিশোররা, জন্ম নিচ্ছে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত শিশু। হিসেব করে দেখা গেছে, এ ধরণের বিকৃতির হার প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ!

সেজন্যই মূলত এখানে আগমন নিকোলাসের, রাশিয়ান পার্লামেন্টের নিম্নসভার একজন নেতা তিনি। তার নিজের এলাকা চেলিয়াবিংস্ক অবশ্য এখান থেকে হাজার মাইল দূরে। কিন্তু সেখানেও একই হাল। চেলিয়াবিংস্কের ইউরাল পর্বত থেকেই চেরনোবিল রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি উত্তোলন করা হতো, এমনকি সোভিয়েত ওয়েপন্স প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়ামও সেখান থেকেই তোলা হতো। এই গ্রহের সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ওটাকে।

"ওরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, সিনেটর," পেছন থেকে তার সহকারীর গলা শোনা গেল।

মেয়েটার দিকে ফিরলেন তিনি।

ইলেনা ওজেরভ, ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, বয়স বিশের কোঠায়। কালো একটা বিজনেস স্যুট পরনে। সুন্দরী, চাপা স্বভাবের পাশাপাশি কঠোরতাও একটা বিশেষ গুণ মেয়েটার।

সবসময় নিকোলাসের ছায়াসঙ্গী হয়েই থাকে, যার কারণে ওকে নিকোলাসের রাসপুটিন খেতাব দিয়েছে প্রেসের লোকজন। অবশ্য একচল্লিশ বছর বয়সী, কালো চুল আর খাটো করে ছাঁটা দাঁড়িওয়ালা নিকোলাসকেও রোমানভ রাজবংশের শেষ সম্রাট নিকোলাস দ্বিতীয়-এর পুনর্জন্ম বলে অনেকে।

এই তুলনা দেয়ার ব্যাপারটা খুব উপভোগ করেন তিনি।

বর্তমানের এই ঋণ, দারিদ্র, ঘুষ, দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে ধুঁকতে থাকা রাশিয়াকে নতুনভাবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের জন্য একজন নেতা দরকার। সেই নেতা, যে দেশ ও জাতিকে টিকিয়ে রাখবে হাজার বছর।

নিকোলাস সেই নেতা হতে চান।

শুধু তাই নয়, তার পরিকল্পনা আরও সুদূরপ্রসারী।

গলা থেকে টিস্যু পেপার সরিয়ে নিলো ইলেনা, বক্তৃতাস্থলের দিকে এগোলেন তিনি। কয়েক ধাপ সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে বক্তৃতামঞ্চটা, পেছনের ফ্রেমে এতিমখানার নাম সাঁটানো।

মাইকের সামনে দাঁড়াতেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের স্রোত শুরু হলো। তাতে কান না দিয়ে কী বলবেন তা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন তিনি।

"দরজাটা বন্ধ করার সময় এসে গেছে!" বলেই নাটকীয়ভাবে পেছনের এতিমখানার দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন নিকোলাস। "ইউক্রেনের, বেলারুশের...অতীতের ভুলের কারণে যথেষ্ট ভুগেছে পুরো রাশিয়ার সন্তানরা। ভোগান্তির দিন এবার শেষ!"

কথা বলার সাথে সাথে রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে নিকোলাসের চোখমুখ দিয়ে। জানেন, জনগণের সমর্থন পেতে হলে ব্যাপারটা কত জরুরী! আবেগভরা গলায় রাশিয়ার জন্য নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে চললেন তিনি।

"দুই দিনের ভেতর চেরনোবিলের চার নাম্বার রিঅ্যাক্টর নতুন স্টিলের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে। সকল দুঃস্বপ্নের ইতি টানবে নতুন সারকোফ্যাগাস-। নতুন

প্রজন্মের কাছে কেবলই একটা স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রইবে কাঠামোটা। যারা নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন গোটা বিশ্বকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, যে সব ফায়ারম্যানরা নিজেদের ভবিষ্যতের পরোয়া না করে হোসপাইপ হাতে লড়ে গেছেন অন্যের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য, তেজস্ক্রিয়তাকে ভয় না পেয়ে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছেন যেসব পাইলট, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রিঅ্যাক্টরের প্রাথমিক ঢাকনা বানানোর জন্য কাজ করা মাইনাররা, সবার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখবে নতুন গম্বুজটা। তারাই আমাদের সম্পদ, তারাই আমাদের গর্ব। রুশ-মাতার হে বীর সৈনিকেরা, আমরা তোমাদের ভুলবো না।"

বক্তৃতা শেষ হতেই বৃষ্টির মতো করতালির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

এটুকু আসলে চেরনোবিলে ঢাকনা লাগানোর অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা নিকোলাসের ভাষণের অংশবিশেষ। দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে রিঅ্যাক্টরের প্রাথমিক শিল্ড, কংক্রিট দিয়ে সাময়িকভাবে বানানো হয়েছিল ওটা। তাও প্রায় বিশ বছর আগের কাহিনী। নতুন স্টিলের গম্বুজটার ওজন আঠারো হাজার টন, উচ্চতায় আইফেল টাওয়ারের অর্ধেক। বিশ্বের সবচেয়ে নড়নক্ষম বড় কাঠামো ওটা।

অন্যান্য রাজনীতিবিদরাও যে ব্যাপারটা নিয়ে চেঁচামেচি করছে না, তা না । কিন্তু জনগণের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা নিকোলাসেরই। এজন্য নিজের সহকর্মীরাও ঈর্ষান্বিত হয়ে গালমন্দ করে তাকে। তবে পাত্তা দেন না তিনি।

সময় হলেই সত্য উন্মোচিত হবে।

"জেনে রাখুন," বলে চললেন নিকোলাস। "এই দুঃস্বপ্নের ইতি টানার মাধ্যমে আমরা পরিখার মাত্র একটা ছিদ্রই বন্ধ করতে পারব। বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। পরবর্তীতে যখনই এমন বিপর্যয় আসবে, আশা করি আপনারা সকলেই এগিয়ে আসবেন। নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করবেন বিপদ মোকাবিলার, যেমনটা করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তারা আমাদের সে জীবন উপহার দিয়ে গেছেন, আসুন কাজে লাগাই ওটাকে। নবজাগরণ আরম্ভ হোক এখন থেকেই। ছাইভস্ম থেকে জন্ম হোক এক নতুন পৃথিবীর।"

শেষ বাক্যটা উচ্চারণের সাথে সাথে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ। এটাই তার স্লোগানঃ

নবজাগরণ।

রাশিয়ান নবজাগরণ।

সেটাই হবে। লক্ষ্য ঠিক করাই আছে, এখন শুধু অপেক্ষা সঠিক পদক্ষেপের।

নিকোলাসের কনুই স্পর্শ করল ইলেনা, যেন কিছু একটা বলতে চাচ্ছে। শোনার জন্য ঘাড় ঘোরাতেই রাস্তার ওপারে পার্ক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। নিকোলাসের কানের এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

স্নাইপার!

সাথে সাথে টান দিয়ে তাকে মঞ্চের নিচে নিয়ে গেল ইলেনা। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলো, বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল লোকজনের মাঝে। সময়টুকু কাজে লাগালেন নিকোলাস, ইলেনার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখলেন তিনি। মেয়েটার চুলের ভেতর চলে গেল তার হাত, কানের পেছনের সার্জিকাল স্টিলের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলেন আঙুলে।

চুমুর ফাঁকে ফিসফিসিয়ে উঠলেন তিনি।

"ভালোয় ভালোয় শেষ হলো ব্যাপারটা।"

রাত ১০:২৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

গ্রে'র দিকে এগোলেন পেইন্টার, চোখ রাখলেন ভিডিও মনিটরে। অস্ত্রের মুখে জিম্মি হয়ে আছে গার্ডরা।

"আমরা কারও কোনও ক্ষতি করবো না," বলে উঠল দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটা, বাচনভঙ্গিতে মনে হলো পূর্ব ইউরোপিয়ান।

লোকটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। আর তারপর পাশের মেয়েটার দিকে, সোজাসুজি লুকানো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

"আমরা আর্চিবাল্ড পোকের বন্ধু," আবারও বলে উঠল লোকটা। তবে ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে নিজেই জানে না কথাটায় কাজ হবে কি না। "হাতে সময় খুব কম।"

পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন পেইন্টার আর এলিজাবেথ। ডক্টর পোক সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার খাতিরে খানিকটা ঝুঁকি নেয়াই যায়।

ইন্টারকম বাটন টিপে দিলেন পেইন্টার। "ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকলে তোমার লোকদের বলো অস্ত্র ফেলে দিতে, আর গার্ডদের মুক্ত করে দিতে।"

মাথা নাড়লো লোকটা। "আগেপ্রমাণ করুন যে আপনারা বিশ্বস্ত। মেয়েটাকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে।"

"আপনাদের ভেতরে আসতে দেয়া হবে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "কিন্তু শুধু আপনি আর মেয়েটা আসবেন।"

"তাহলে আমরাও আপনার লোকদের ছাড়ছি না, আমাদের নিরাপত্তার জন্য।"

"বাহ! বড় পরিবার, সুখী পরিবার," বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি।

এলিজাবেথকে নিয়ে কোনার দিকে চলে যেতে গ্রে-কে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। দরজার একপাশে দাঁড়ালেন তিনি, অন্যপাশে কোয়ালস্কি। হাতের একমাত্র অস্ত্র উঁচু করে ধরল বিশালদেহী লোকটা, একপাটি জুতো।

যা হওয়ার হবে।

ছিটকিনি খুলে দরজাটা অল্প ফাঁক করলেন পেইন্টার। এক হাত উঁচু করল লোকটা, উদ্দেশ্যঃ হাতে যে কিছুই নেই, তা দেখানো। অন্য হাতে মেয়েটার হাত ধরা। দশ বছরের বেশি হবে না বাচ্চাটার বয়স, কালো চুল আর পরনে কালোর উপর ধূসর চেক বসানো একটা জামা। এদিকে জলপাই রঙা লোকটা সম্ভবত মিশর বা আরবের অধিবাসী। বাদামী চোখজোড়া পোর্চের আলোতে কালো দেখাচ্ছিলো এতোক্ষণ। জিন্স প্যান্ট আর গাঢ় লাল রঙের উইন্ডব্রেকার পরনে ওর।

নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কিছু বলল ও। ভাষাটা অপরিচিত হলেও পেইন্টার বুঝতে পারলেন, সতর্ক থাকার বা ওই ধরনেরই কিছু একটা আদেশ করা হয়েছে।

"মেয়েটা জিপসি," আস্তে করে বলল কোয়ালস্কি।

ওর দিকে তাকালেন পেইন্টার।

"আমার বাড়ির পাশেই একটা জিপসি পরিবার থাকে। ওদের কথাবার্তা শুনেছি আমি। রোমানি ভাষা বলে ওটাকে।"

"ও ঠিকই বলেছে," বলল লোকটা। "আমার নাম লুকা হার্ন।"

দরজাটা প্রশস্ত করলেন পেইন্টার, বাচ্চাটাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা। ঘরে ঢুকেই পেইন্টার আর কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে বাউ করল। "সাটিমোস।"

"নেইস টুকে," উত্তর দিল কোয়ালস্কি। "তবে কিনা ভায়া, রোমানি ভাষায় আমার দৌড় ওই পর্যন্তই।"

এক কোনায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। তাকে অস্ত্র নামানোর ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। লোকটাকে কোনও হুমকি বলে মনে হচ্ছে না আপাতত।

"বাবার কথা কী যেন বললেন?" এক পা এগিয়ে বলল এলিজাবেথ।

ভ্রূ কুচকালো লুকা, বুঝতে পারেনি কথা।

পেইন্টার ব্যাখ্যা করলেন, "ও প্রফেসর পোকের মেয়ে।"

বড় বড় হয়ে গেল লুকার চোখ। এলিজাবেথের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালো ও। "আপনার বাবার ব্যাপারে দুঃখিত। খুবই ভালো মানুষ ছিলেন উনি।"

"বাবাকে কীভাবে চেনেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করল ও। "আর এই মেয়েটাই বা কে?"

লুকার হাত ছাড়িয়ে টেবিলের দিকে হাঁটা ধরল মেয়েটা।

"ও?" উত্তর দিল লোকটা। "জানি না। আপনার বাবার কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছিলো কোনও ঝামেলায় আছেন, খুব দ্রুত কথা বলছিলেন। রেডিওর দোকান থেকে আমাকে এক ডজন কোবরা মেরিন রিসিভার কিনে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করার কথা বলেন, ফ্রিকোয়েন্সি নাম্বারও দেন। তারপর বলেন ন্যাশনাল মলের আশেপাশে থাকতে, যাতে 'প্যাকেজ'-এর সিগন্যাল ধরা পড়ে রিসিভারগুলোতে।"

"প্যাকেজ?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

মেয়েটার দিকে ইশারা করল লুকা, "ও।"

"মেয়েটা!" অবাক হয়ে গেল এলিজাবেথ। "কিন্তু কেন?"

মাথা নাড়লো লুকা। "আপনার বাবার আছে ঋণী আমরা। তার কথা মতোই কাজটা করেছিলাম আমরা। আসলে তিনি গুলি খাওয়ার সময়ও মলেই ছিলাম, কিন্তু জানতাম না যে ওটা প্রফেসর পোক ছিলেন। মেয়েটার ট্রেইল খুঁজে পাই তারপরই।"

বাচ্চাটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। ওর গায়ে কোনও আড়িপাতা যন্ত্র আছে, আন্দাজ করলেন তিনি। সম্ভবত একটা মাইক্রোট্রান্সমিটার।

"মেয়েটার পিছু পিছু চিড়িয়াখানায় যাই আমরা, সেখান থেকেই ওকে নিয়ে এসেছি।"

"তার মানে ওকে কিডন্যাপ করেছ তোমরা?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

শ্রাগ করল ও। "প্রফেসরের মেসেজের শেষ বাক্য ছিল, প্যাকেজটা চুরি করে সিগমা নামে কারও কাছে পৌঁছানো।"

কথাটা শুনে শিহরিত হলেন পেইন্টার।

"তারপরই হঠাৎ শেষ যায় মেসেজটা। মেয়েটাকে হাতে পাওয়ার পর সতর্ক হয়ে যায় গোটা এলাকার কর্তৃপক্ষ। হাতে সময় ছিল না, কিন্তু আমরা বুঝতেও পারিনি আসলে সিগমা বলতে কী বুঝিয়েছেন প্রফেসর। তখনই একটা ছবি আঁকা শুরু করে মেয়েটা।"

বাচ্চাটার দিকে ইশারা করল লুকা। ততক্ষণে ফায়ারপ্লেস থেকে একটা কয়লার টুকরো তুলে নিয়ে দেয়ালের পাশে বসে পড়েছে ও। দেয়ালের এখানে সেখানে নেচে বেড়াচ্ছে হাতটা।

"গাছপালাওয়ালা একটা পার্কের দৃশ্য এঁকেছিল মেয়েটা, পাশেই রক ক্রীক ব্রিজ।" জানালার দিকে ইঙ্গিত করল ও। "আর সাথে কাঠের তৈরি একটা বাড়ি। তখন ছবিটা দেখে পার্কের এদিক সেদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা, ভেবেছিলাম ও হয়তো জায়গাটা চেনে। আর তারপর আরেকটা ছবি আঁকে ও, যেটা দরজার নিচ দিয়ে পাঠিয়েছি আমি একটু আগেই।"

ঘাড় বাঁকিয়ে সবার দিকে পালাক্রমে তাকাল লুকা। "ছবিতে যেঁা আপনারাই ছিলেন, ডক্টর পোকের বন্ধু, পবিবারের লোকজন। সিগমাকে চেনেন নাকি আপনারা কেউ?"

নিজের আইডি কার্ড বের করে ওর চোখের সামনে ধরলেন পেইন্টার। প্রেসিডেন্সিয়াল সিল লাগানো ছবির পাশাপাশি একটা হলোগ্রাফিক গ্রীক অক্ষর ছাপা আছে কার্ডটায়, সিগমা।

চিহ্নটা চিনতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল লুকার চোখ।

এদিকে ততক্ষণে মেয়েটার দিকে এগোলো গ্রে, হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটার আঁকিবুকি দেখতে লাগল। এক হাতে আড়াল করে মেয়েটার দিকে কিছু একটা নির্দেশ করার ভঙ্গিতে অন্য হাতের আঙুল তুললো সে। সাথে সাথে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, ঘাড় কাত হয়ে গেল একদিকে। চোখ খোলাই আছে, কিন্তু আঁকিবুকির দিকে নজর নেই। যেন একটা ঘোরের ভেতর ডুবে আছে।

পেইন্টারও খেয়াল করলেন ব্যাপারটা। কানের পাশ থেকে সরে গেল মেয়েটার ঘামে ভেজা চুল। কানের পেছন থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠল ইস্পাতের একটা টুকরো, জিনিসটার আকৃতি প্রফেসর পোকের সেই খুলির মাথায় লাগানো ডিভাইসটার সমান।

পার্থক্য শুধু, এটা জীবিত কারও মাথায় লাগানো।

আর্চিবাল্ড তাদের কাছে কেন পাঠালেন ওকে?

এলিজাবেথের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ল পেইন্টারের। "দেখুন, মেয়েটা কী আঁকছে," ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল মেয়েটা।

বাচ্চাটার দিকে এগোলেন তিনি। যা দেখলেন, তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হলো না তার। এতোক্ষণ যেটাকে বাচ্চাটার অর্থহীন আঁকিবুঁকি বলে হচ্ছিলো, ধীরে ধীরে একটা রূপ পাচ্ছে আকৃতিটা।

বিস্ময় ঢেকে রাখতে পারল না এলিজাবেথ। "এটা...এটা তো..."
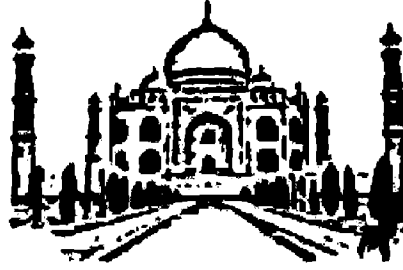
"...তাজমহল," বাক্যটা শেষ করলেন পেইন্টার।

এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ মনোযোগ কেড়ে নিলো সবার।

হুম্প...হুম্প...

হেলিকপ্টার, নিচু দিয়ে উড়ছে, ক্রমেই কাছে চলে আসছে শব্দটা।

সবার আগে নড়ে উঠল গ্রে। "আমাদের অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে।"

সন্ধ্যা ৬:০২
কিয়েভ, ইউক্রেন

ইলেনার উপর থেকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন নিকোলাস।

ফ্যানের বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। পিঠের নিচের অংশে ব্যাথা করছে তার, কাঁধে জ্বালাপোড়া করছে নখের আঁচড়। উঠে দাঁড়াল ইলেনা, চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। সুগঠিত দেহের বাঁকগুলো যেন আবারও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আবারও এগোবেন মেয়েটার দিকে, ভাবলেন নিকোলাস। কিন্তু আধা ঘন্টা পর একটা ইন্টারভিউ আছে, মনে পড়তেই নিজেকে নিবৃত করলেন।

হামলার খবরটা ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে এতোক্ষণে। সব নিউজ চ্যানেলের বিষয়বস্তু এখন এটাই। পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে আততায়ী, হাসপাতালে নিতে নিতে মারাও গেছে।

লোকটার মৃত্যুর সাথে সাথে ধামাচাপা পড়ে গেছে গোটা ব্যাপারটা, কেউ বুঝতেও পারবে না যে পুরোটাই ছিল নাটক। স্নাইপারের ভূমিকায় থাকা লোকটা পোলস্কয়-এর এক খনি শ্রমিক। বেচারা জানতেও পারল না যে হামলার দৃশ্যে কতখানি চতুরতার মাধ্যমে তাকে ব্যবহার হয়েছে।

গোটা ব্যাপারটায় আসলে ইলেনার ভূমিকাই বেশি। সম্ভাব্যতার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা আছে মেয়েটার, বিপদের মাত্রা আগেই আঁচ করতে পারে ও। গুলিটা হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে নিকোলাসের কনুই স্পর্শ করে তাকে সতর্ক করার ছিল ইলেনার, তাই সে করেছে। এছাড়াও আরও কিছু গুণ আছে ওর। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ওস্তাদ, যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ধরার ভঙ্গি দেখেই নির্ভুল অনুমান করতে পারে বুলেটের গতিপথ।

ইলেনার দক্ষতার উপরই আজ নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন নিকোলাস।

বাজিতে জিতেও গেছেন।

আসলে সবসময় নিজের খেয়াল নিজে রাখতে অভ্যস্ত তিনি। হোক না সেটা এক মুহূর্তের জন্যই, কিন্তু অন্য আরেকজনের হাতে নিজের জীবন ছেড়ে দিতে কেমন যেন অসহায় অনুভূতি হচ্ছিল। যাই হোক, ব্যাপারটা মিটে যাওয়া পর হোটেলে ফিরতেও খানিকটা দেরি হয়েছিল।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল ইলেনা, নগ্ন। চোখে জ্বলতে থাকা কামনার আগুন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আসলে তাদের দুজনের বিশেষ দক্ষতা ধরে রাখার জন্য উত্তেজনা জিনিসটা খুবই জরুরি। নিকোলাসের পড়া আছে ডকুমেন্টগুলো। তাছাড়া তার মা ও চান তাদের দুজনের সন্তান হোক। নিকোলাসের ইচ্ছাশক্তি আর ইলেনার চতুরতা, একেবারে পারফেক্ট ম্যাচ।

মা'র ইচ্ছা পূরন করার জন্য আজকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ও। কাঁধের আঁচড়গুলোও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় বিছানার পাশে টেবিলের উপর রাখা ফোনটা বেজে উঠল। ইলেনা এগিয়ে এসে রিসিভ করল কলটা, কয়েক সেকেন্ড পর নিকোলাসের দিকে এগিয়ে দিল রিসিভার। "জেনারেল-মেজর সাভিনা মারতোভ, কথা বলবেন তোমার সাথে।"

ফোনটা কানে ঠেকালো নিকোলাস। মায়ের কানে গিয়েছে হয়তো হামলার ব্যাপারটা। তার অবশ্য তখনই তাকে রিপোর্ট করা উচিত ছিল। বিশেষ করে চেরনোবিল সীল করার আগের এই সময়টুকু তাদের প্ল্যানের পক্ষে খুবই মূল্যবান, ছোট একটা ভুলের কারণেও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

সে মুখ খোলার আগেই অন্যপ্রান্ত থেকে মহিলার গলা ভেসে এল, "একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, নিকোলাস।"

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। "কী হয়েছে, মা?"

রাত ১০:৫০
ওয়াশিংটন ডি.সি.

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে উঠানে বেরিয়ে এল গ্রে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে বাচ্চাটার গা। আঁকাআঁকি করার সময় আরও বেড়েছে জ্বরটা। যদি জ্ঞান আছে এখনও, কিন্তু একটা ঘোরে ডুবে আছে ও। আড়ষ্ট হয়ে আছে হাত-পা। গ্রে'র মনে হলো যেন একটা পুতুল কোলে নিয়ে ঘুরছে।

বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও, তিনটা হেলিকপ্টার নজরে এল। কালো রঙের, মিলিটারি ডিজাইনের কপ্টারগুলো। রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসছে একটা, নিচু দিয়ে উড়ছে। অপেক্ষাকৃত উঁচুতে আরেকটা, ব্লকের শেষ মাথায়। শেষেরটা পেছনের পার্কটাকে কভার করছে।

তাদের ঘিরে একটা ত্রিভুজ রচনা করেছে কপ্টারগুলো।

সেডান গাড়িটা এখনও ড্রাইভওয়েতেই আছে। লুকা আর তার লোকজন তিনটা ফোর্ড এসইউভি নিয়ে এসেছিল, রাস্তায় পার্ক করা ওগুলো। নিজের লোকদের ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আদেশ দিয়ে দিয়েছে জিপসি গোত্র প্রধান। পায়ে হেঁটে পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা দিল তিনজন, সেখানে পৌঁছে আবার আলাদা হয়ে যাবে। রাস্তা পার হয়ে দুটো বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আরও দুজন।

এলিজাবেথকে নিয়ে ড্রাইভওয়েতে লিংকন টাউন কারটার দিকে এগোলো কোয়ালস্কি। ফোন কানে ধরে আছে মেয়েটা।

গ্যারেজে পার্ক করে রাখা ছোট একটা গাড়ির দিকে এগোলেন পেইন্টার, এক গার্ডের গাড়ি ওটা। গ্রে-ও সেদিকেই গেল। লুকার লোকজনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ইতোমধ্যে ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়েছে গার্ড।

পেছনের সিটে উঠে বসলেন পেইন্টার, হাত বাড়িয়ে দিলেন গ্রে'র দিকে। উদ্দেশ্যঃ বাচ্চাটাকে কোলে নেয়া।

"গায়ে অনেক জ্বর," বলল গ্রে।

নড করলেন পেইন্টার। "নিরাপদ জায়গায় পৌঁছেই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো আমি। ক্যাট আর লিসাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। তৈরি থাকবে ওরা।"

লিসা মানে ডক্টর লিসা কামিংস, শারীরবিদ্যায় পিএইচডির পাশাপাশি ও একজন মেডিকেল ডাক্তার। আরেকটা পরিচয় আছে অবশ্য মেয়েটার, ডিরেক্টরের গার্লফ্রেন্ড। ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্র্যায়ান্ট সিগমার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এক্সপার্ট। মাঠপর্যায়ের অপারেশনগুলো পরিচালনা করে ও।

"তবে সবার আগে," উপরের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার, "এই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।"

অন্যদিকে, হেডলাইট বন্ধ করে রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল ফোর্ড এসইউভিগুলোর একটা। আরেকটা অনুসরণ করল পেইন্টারের টয়োটাকে।

"আশা করি পরিকল্পনাটা কাজে দেবে," বলল গ্রে।

বাইরে বের হওয়ার আগে লুকার রেডিও ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করেছেন পেইন্টার, এগুলো দিয়ে ন্যাশনাল মলে মেয়েটার ট্রেইল খুজে পেয়েছিল জিপসিরা। যা আশা করেছিলেন তাই, জিনিসগুলো আসলে ট্রান্সসিভার সিগন্যাল পাঠানো আর রিসিভ করা, দুটোই করতে পারে। কীভাবে সিগন্যাল পাঠাতে হবে তা লুকাকে শিখিয়ে দিয়েছেন পেইন্টার। লুকা দেখিয়ে দিয়েছে তার লোকদের। মেয়েটার ট্রান্সমিটারের মতোই একই মাপের সিগন্যাল ছড়াচ্ছে এখন লুকার এক ডজন ট্রান্সসিভার। একেকজন জিপসির সাথে একেক দিকে যাত্রা করেছে সেগুলো। পেইন্টার আশা করছেন, এতে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে হেলিকপ্টারগুলো। সেই ফাঁকে বাচ্চাটাকে নিয়ে সিগমার কমান্ড সেন্টারে পৌঁছে যাবেন তিনি, আর একবার ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে পৌঁছাতে পারলে ট্রান্সমিটারটা বন্ধ করার রাস্তাও পেয়ে যাবেন।

বিদায় নিয়ে টাউন কারের দিকে এগোলো গ্রে। কোয়ালস্কির হাতে পড়ে ইতোমধ্যে গর্জন করা শুরু করেছে গাড়ির ইঞ্জিন। ওদের গন্তব্যঃ রিগ্যান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কয়লায় টুকরায় আঁকা তাজমহলের ছবির কথা মনে পড়ল গ্রে'র, ভারতে অবস্থিত বিখ্যাত সমাধিসৌধটা। আসলে মেয়েটা আসার আগেও ভারতে যাবার কথাই ঘুরছিল ওর মাথায়। প্রফেসর পোকের ব্যাপারে হয়তো কিছু জানা যাবে ওখানে।

ওকে সাহায্য করার মতো একজনই আছেন ভারতে। প্রফেসরের রিসার্চ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানা থাকার কথা উনার।

গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। গ্রে পৌঁছতেই ফোন টেপা বন্ধ করল ও।

"ডক্টর মাস্টারসনের সাথে কথা হয়েছে," বলল মেয়েটা। "মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে তিনিই বাবার সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু এখন আগ্রায় অবস্থান করছে।"

"আগ্রা?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"হ্যাঁ! আগ্রা, তাজমহল ওখানেই অবস্থিত। সমাধিসৌধটার কাছাকাছিই আছেন।"

টয়োটার উপর দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো গ্রে। জিপসিদের ট্রেইল ধরে ভিন্ন ভিন্ন দিকে এগোচ্ছে হেলিকপ্টারগুলো, কিন্তু পেইন্টারের গাড়ির দিকে যাচ্ছে না একটাও।

প্ল্যানটা কাজে লেগেছে, ভাবল ও।

শেষবারের মতো এলিজাবেথকে থামানোর চেষ্টা করল গ্রে। "তুমি এখানেই নিরাপদ থাকবে।"

"না, তোমাদের সাথেই যাচ্ছি আমি। ডক্টর মাস্টারসন একমাত্র আমাকেই চেনেন। তার সাহায্য পেতে হলে আমার ওখানে থাকাটা জরুরি।"

এলিজাবেথের মুখে দিকে তাকিয়ে কয়েকটা মিশ্র অনুভূতি খেয়াল করল ও। শোক, ভয়... দৃঢ়তা।

"আমার বাবা খুন হয়েছেন," যোগ করল মেয়েটা। "যেতে আমাকে হবেই।"

"সমস্যা নেই," ড্রাইভিং সিট থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি। "আমি ওকে দেখে রাখবো।"

আর কথা বাড়ালো না গ্রে। এলিজাবেথের পেশাগত দক্ষতা সাহায্য করবে ওদের, ভাবল ও। গ্রীক মিউজিয়ামে মেয়েটাকে জায়গা পাইয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর পোক। হয়তো ডেলফির সাথে কিছু একটা সম্পর্ক আছে গোটা ব্যাপারটার। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে এখন।

লুকা তাদের সাথে যোগ দিল। তাদের কথার শেষ বাক্যটা শুনতে পেয়েছে ও। "আমিও আসছি তোমাদের সাথে।"

সায় দিল গ্রে। জিপসি লোকটাকে সাথে নিতে বলে গেছেন পেইন্টার। মেয়েটাকে খুঁজে বের করা, ওদের কাছে নিয়ে আসা, সব মিলিয়ে লোকটাকে খারাপ মনে হয়নি ওর। তাছাড়া আরেকটা প্রশ্ন ঘুরছে মাথায়, প্রফেসর পোকের সাথে জিপসিদের কী সম্পর্ক? মনে হচ্ছে লুকাও কিছু একটা বলতে চায়, কীসের যেন একটা ছায়া লুকানো আছে ওর চোখে।

ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসল গ্রে, পেছনে এলিজাবেথ আর লুকা।

"চললাম তাহলে," বলেই ব্যাকগিয়ার দিল কোয়ালস্কি। ড্রাইভওয়ে থেকে একটানে রাস্তায় নিয়ে এল গাড়িটাকে।

মাথার উপর, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ।

বাচ্চাটার কথা মনে পড়ল গ্রের।

"কে ও? কোথা থেকেই বা এসেছে?"

বাচ্চা তিনজনকে অনুসরণ করছে মঙ্ক। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে নতুন একজন।

তবে সে কোনও বাচ্চা নয়।

সবার পেছনে এগোচ্ছে ও।

পেঁচানো পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা এখন। পানিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে সিঁড়িটা। পথ যেন ফুরাতে চাইছে না। পিওতরকে কোলে তুলে নিয়েছে মঙ্ক।

সাইরেন বেজে উঠতেই বাচ্চাগুলোর পিছুপিছু একটা হ্যাচওয়েতে পৌঁছায় মঙ্ক, ওটার দরজায় গুহা থেকে এই সিঁড়িতে এনে দিয়েছে ওদের। সিঁড়ি বেয়ে উঠার আগে দলের নতুন সদস্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে ওরা।

ওর নাম মার্তা।

"এখানে," কনস্টানটাইনের গলা শোনা গেল। একমাত্র ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে আগেআগে চলেছে ও, সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে এখন। একটু পর মঙ্কও বাকি দুজনকে নিয়ে যোগ দিল তার সাথে। পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। সামনে হ্যাচওয়ের পরই একটা দরজা। সবার পেছনে আসতে থাকা দলের সর্বশেষ সদস্যের দিকে তাকাল মঙ্ক। মুখ আর হাত-পায়ের পাতাটুকু ছাড়া গোটা

দেহ নরম পশমে ঢাকা ওর। আশি পাউন্ড ওজনের শরীরটার উচ্চতা তিন ফুট, মুখের আশেপাশের পশম উজ্জ্বল ধূসর রঙের।

মাদী শিম্পাঞ্জীটার বয়স ষাটেরও বেশি, বলল কনস্টানটাইন।

নিচের হ্যাচওয়েতে শিম্পাঞ্জীটার সাথে বাচ্চাগুলোর দেখা হওয়ার মুহূর্ত মনে পড়ল মঙ্কের। মাতৃসুলভ উচ্ছ্বাস নিয়ে তিনজনকেই একে একে জড়িয়ে ধরেছিল প্রানিটা। ওর উপস্থিতি বাচ্চাগুলোকে উৎফুল্ল রাখবে, ভাবল মঙ্ক।

তবে বাকি দুজনের থেকে পিওতরের সাথে খাতির সবচেয়ে বেশি প্রাণিটার। প্রায়ই ইশারায় একে অপরের সাথে কথা বলছে ওরা।

হ্যাচের দিকে এগোলো কনস্টানটাইন। ব্যাগ থেকে ছোট প্লাস্টিকের ব্যাজ বের করে ধরিয়ে দিল মঙ্কের হাতে, কভারঅলে লাগিয়ে নিতে ইঙ্গিত করল জিনিসটা।

"কী এটা?" জিজ্ঞেস করল ও।

"মনিটরিং ব্যাজ," দরজার দিকে ইশারা করে জবাব দিল ছেলেটা। "তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বোঝার জন্য।"

"তেজস্ক্রিয়তা?" দরজাটার দিকে তাকাল ও। কী থাকতে পারে ওপাশে? হ্যাচের উপর হাত রাখল, মনে মনে কল্পনা করছে দরজার ওপারের দৃশ্যঃ ধ্বংসস্তূপ, ভাঙাচোরা কাঠমো, বিরান প্রান্তর।

দরজার দিকে এগোলো কনস্টানটাইন, সর্বশক্তিতে মোচড় দিতে লাগল লিভারে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আপত্তি জানিয়েও অবশেষে খুলে গেল ওটা।

আলোর স্রোত ধাক্কা মারলো মঙ্কের চোখে, হাত উঁচু করে তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকলো ও। জানা নেই, শেষবার কবে সূর্যোদয় দেখেছে। চোখে আলো সয়ে আসতেই সবাইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

যা ভেবেছিল, আশেপাশের পরিবেশ পুরোপুরি বিপরীত।

গাছপালায় ভরা একটা ঢালের মুখে উন্মুক্ত হয়েছে হ্যাচওয়েটা। চারপাশে বার্চজাতীয় গাছের ছড়াছড়ি। দূরে ছোট পাহাড়ের পাশ ঘেঁসে বয়ে চলা খাঁড়ি নজরে এল। টিলার গায়ে ছোট ছোট লেকগুলো সাদা ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে।

নিচের দৃশগুলোর কথা মনে পড়ল মঙ্কের, স্বর্গের ভেতর নরক যেন।

পেছনের হ্যাচওয়ে থেকে চাপা গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল। হাসপাতালের পাশেও এরকম শব্দই শুনেছিল।

মেনাজিরি।

গর্জন ক্রমাগত বাড়ছে। আওয়াজটা চিনতে পারল মঙ্ক। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির গভীরে লুকানো ওর সহজাত প্রবৃত্তি কথা বলে উঠল।

ধাওয়া করা হচ্ছে ওদের।

৭

৬ সেপ্টেম্বর, রাত ৪:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

জানালা দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। অবশেষে ঘুমিয়েছে ও। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে নজর রাখছে ক্যাট ব্রায়ান্ট।

মাঝরাতে এখানে আসার পর থেকে ফ্যালফ্যাল করে আশেপাশে তাকানো ছাড়া একটা কথাও বলেনি বাচ্চাটা। তবে হ্যাঁ, একেবারে নিঃসাড় অবশ্য ছিল না। সামনে পেছনে শরীর দোলানোর পাশাপাশি কেউ গায়ে হাত ছোঁয়ানো মাত্রই কেঁপে উঠছিল ও। দুটো চকোলেট বিস্কিট আর অল্প একটু জুস, অনেক জোড়াজুড়ি করে এটুকুই খাওয়ানো গেছে। রক্ত পরীক্ষা, এমআরআই- আর শারীরিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এখনও গায়ে জ্বর আছে মেয়েটার, তবে মাত্রায় দূর্বল।

মাইক্রোট্রান্সমিটারের হদিসও জানা গেছে। মেয়েটার হাতের উপরের অংশে আছে ওটা। সার্জারি ছাড়া আপাতত জিনিসটা বের করা সম্ভব না। তাই কাজটা পরে করার জন্য তুলে রাখা হয়েছে। অবশ্য সিগমার হেডকোয়ার্টার, এই ভূগর্ভস্থ বাংকার থেকে সিগন্যাল বাইরে যাবার সম্ভাবনা নেই।

উঠে দাঁড়াল ক্যাট। ঢিলেঢালা সাদা রঙের ক্যাজুয়াল শার্টের সাথে মাথার সোনালী চুল চমকাচ্ছে ওর। ফিল্ড প্রজেক্ট তদারকির জন্য এখানে ডাকা হয়েছিল ওকে, সাতপাঁচ না ভেবে পরিচারিকার হাতে বাচ্চার ভার ছেড়ে দিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছে ও। কিন্তু গ্রে'রা এখনও বিমানে থাকায় করার মতো আপাতত কাজ নেই হাতে।

ক্যাটকে কাজে ফিরতে দেখে খুশি হলেন পেইন্টার। স্বামীকে হারানোর পর গত কয়েক সপ্তাহ যাবত কোনও কিছুর দিকেই যেন খেয়াল নেই মেয়েটার। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তাহলে, ভাবলেন তিনি।

"ঘুমিয়েছে ও," পেইন্টারের পাশে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল ক্যাট।

"তুমিও ঘুমিয়ে নাও একটু। গ্রে'র প্লেন ল্যান্ড করতে আরও কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিল ও। "পেনেলোপের দায়িত্বে থাকা পরিচারিকার সাথে কথা বলতে হবে, তারপর ঘুমাবো।"

এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হলো। ঘরে ঢুকল লিসা কামিংস আর প্যাথলজিস্ট ম্যালকম জেনিংস। দুজনের পরনেই সাদা ল্যাবকোট, কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে ওরা। কোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে রেখেছে লিসা, কিছু একটা ভাবছে মন দিয়ে। গত কয়েক ঘন্টা এমআরআই ল্যাবে কাটিয়েছে দুজনেই, ফলাফল পরীক্ষা করেছে।

মেডিকেলীয় ভাষায় কথা চালিয়ে যাচ্ছে দুজন, যার বেশিরভাগই পেইন্টারের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বলে মনে হলো।

"গ্লিয়াল কোষের সাহায্য ছাড়াই ওই মাপের নিউরোমডিউলেশন-?" মাথা নাড়লো লিসা। "নিউক্লিয়াসের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে তো!"

"তাই নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার, আসলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই প্রশ্নটা করা।

পেইন্টারের উপস্থিতি বুঝতে পেরে মুচকি হাসি খেলে গেল লিসার ঠোঁটে। তাকে পাশ কাটিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও।

বাকি চেয়ারটার দখল নিলেন ম্যালকম। "বাচ্চাটা কী করছে?"

"ঘুমাচ্ছে আপাতত," উত্তর দিল ক্যাট।

"তো... কী জানতে পারলাম আমরা?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"এটাই যে, আমরা এখন নতুন আর পুরনোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করছি," হেঁয়ালিভরা জবাব ম্যালকমের।

চশমা চোখে লাগিয়ে বগলে ধরে রাখা ল্যাপটপটা চালু করলেন প্যাথলজিস্ট। "মেয়েটার এমআরআই স্ক্যান করেছি আমরা, খুলিটা নিয়েও বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। দুটো ডিভাইস একই। তবে মেয়েটার কানের উপরে লাগানো জিনিসটা আরেকটু জটিল।"

"নাম কী ওগুলোর?" জানতে চাইলো ক্যাট।

"টিএমএস জেনারেটর," উত্তর দিলেন ম্যালকম।

"ট্রান্সক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেটর," ব্যাখ্যা করল লিসা।

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ক্যাট আর পেইন্টার, মাথায় কিছুই ঢোকেনি। "একেবারে গোড়া থেকে বলো তো," লিসার উদ্দেশ্যে বললেন পেইন্টার। "সহজ ভাষায় অবশ্যই।"

একটা কলম দিয়ে মাথায় টোকা দিলেন ম্যালকম। "তাহলে এখান থেকেই শুরু করি। মানুষের মগজ...ত্রিশ বিলিয়ন নিউরন দিয়ে তৈরি। এক নিউরন অন্য নিউরণের সাথে যেখানে যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় সাইন্যাপ্স। ত্রিশ বিলিয়ন নিউরনের মাঝে এমন লক্ষ কোটি সাইন্যাপটিক কানেকশন আছে। সংখ্যার বিচারে হিসেবটা দাঁড়ায়... দশ এর পর এক মিলিয়ন শূন্য।

"এক মিলিয়ন শূন্য!" পেইন্টারের গলায় বিস্ময়।

সায় দিলেন ম্যালকম। "মানে হচ্ছে, কল্পনাতীত পরিমাণ হিসাবনিকাশ করার মতো শক্তি লুকানো আছে আমাদের মগজে। আমরা নিত্য নৈমিত্তিক যা করি, তা শুধু শক্তির পর্দায় একটা আঁচড় কাটা মাত্র।" জানালার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, ওপাশে শুয়ে আছে বাচ্চাটা। "তবে কেউ কেউ আরও গভীরে পৌঁছে গেছে।"

"মানে?" চিন্তিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ক্যাট।

"মহাশূন্যে অভিযান চালানো থেকে শুরু করে মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড ঢোকানো পর্যন্ত, বর্তমান প্রযুক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কে পাঠানো

সব অনুভূতি আসলে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো। যার মানে দাঁড়ায়, আমরা চোখ দিয়ে দেখি না...দেখি মস্তিষ্ক দিয়ে। কান দিয়ে শুনি না, মস্তিষ্ক দিয়ে শুনি। এজন্যই ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে বধিরদের শ্রবনশক্তি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব। শব্দকে বিদ্যুৎতরঙ্গে রূপান্তরিত করে সরাসরি মস্তিষ্কে পাঠায় ডিভাইসটা। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো স্পন্দনকে চিহ্নিত করতে পারে, ব্যাপারটা অনেকটা নতুন কোনও ভাষা শেখার মতো। যার ফলে শ্রবনশক্তি ফিরে পায় মানুষ।"

ল্যাপটপের দিকে ইঙ্গিত করলেন ম্যালকম। "দিনদিন নতুন সিগন্যালে অভ্যস্ত হতে হতে ইলেকট্রিকাল হয়ে যাচ্ছে মানুষের মগজ। মেশিনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সহজাত ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। বলতে গেলে, আমরা আসলে জন্ম থেকেই একেকজন যন্ত্রমানব।"

ভ্রূ কুঁচকালেন পেইন্টার। "মগজের সাথে এসবের সম্পর্ক কী?"

হাত তুলে তাকে থামালো লিসা। "বলছি। মানুষ আর মেশিনের মাঝের প্রতিবন্ধকতা আসলে দূর হয়ে গেছে অনেকটাই। এখন আমাদের হাতে এমন ক্ষুদ্র আকারের মাইক্রোইলেকট্রোড আছে, যেগুলো সহজেই নিউরনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব। দুহাজার ছয় সালে, ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে, একজন প্যারালাইজড মানুষের মগজে এমন মাইক্রোইলেকট্রোডে তৈরি মাইক্রোচিপ ঢোকানো হয়েছিল। অপারেশনের চারদিনের মাথায় লোকটা...অবশ্য লোকটা না বলে তার চিন্তা বলাই ভালো, কম্পিউটারের মাউস পয়েন্টার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল। ই-মেইল খোলা, টেলিভিশন চালানো এমনকি একটা রোবোটিক হাতও নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল সে। আর এর পুরোটাই করেছিল শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে। এভাবেই প্রযুক্তির সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছি আমরা।"

জানালার দিকে তাকালেন পেইন্টার। "আর কেউ এর থেকেও অনেক এগিয়ে গিয়েছে!"

ম্যালকম আর লিসা, মাথা নেড়ে সায় দিল দুজনেই।

"ডিভাইসটা?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"ওটা আমাদের ক্ষমতা থেকে এক ধাপ এগিয়ে। জিনিসটায় এতো ছোট আকারের ন্যানোফিলামেন্ট ইলেকট্রোড আছে যে, কোথায় মেশিনের শেষ আর কোথায় মগজের শুরু তা বোঝাই দুষ্কর। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইঁদুরের উপর পরীক্ষা থেকে আমরা জানি, নিউরনের ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে টিএমএস জেনারেটর। এমনকি যে অংশে স্মৃতি জমা থাকে, যে অংশ দিয়ে নতুন কিছু শেখা হয় ইত্যাদি সীমাও চিহ্নিত করা সম্ভব। চুম্বকীয় উত্তেজনার মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট এলাকার নিউরনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রনও করা যায়, সুইচের মতো ব্যবহার করা যায় জিনিসটাকে।"

"তার মানে, কেউ এমন একটা ডিভাইস মেয়েটার মাথায় লাগিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকার নিউরনকে সুইচের মতো অন-অফ করছে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, নিউরোলজিতে একটা সূত্র আছে, বিজ্ঞানী হেব-এর থিউরি বলা হয় ওটাকে। 'একাধিক নিউরনকে কোনও একটি বিশেষ কাজে লাগাতে হলে সেগুলো পরস্পর যুক্ত থাকতে হবে।' এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মেয়েটার কিছু নিউরনকে যুক্ত করছে

ডিভাইসটা, সেগুলোর সুইচ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি চুম্বকীয় উদ্দীপনা তৈরি করে নিউরনগুলোর কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলছে।"

"কিন্তু কেন?" প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

উত্তরের আশায় লিসার দিকে তাকালেন ম্যালকম।

বলা শুরু করল ও। "সাইকোলজিস্ট জ্যাক লারসনের সাথে কথা বলেছি আমি। এখানে আনার পর তিনিই মেয়েটাকে পরীক্ষা করেছিলেন। আচার-ব্যবহার, হাবভাবে তিনি নিশ্চিত যে মেয়েটা প্রতিবন্ধী। আর সেফ হাউজের ঘটনা বিচার করলে বোঝা যায়, ও যেন তেন প্রতিবন্ধীদের মতো না, বিরল প্রতিভাধর।"

লারসনের রিপোর্ট পড়েছেন পেইন্টার। মেয়েটার কিছু সাইকোলজিকাল টেস্ট করেছেন তিনি। অটিজমের প্রকারভেদ করার উদ্দেশ্যে জেনেটিক পরীক্ষাও করেছেন, তবে ফলাফল এখনও হাতে আসেনি। রিপোর্টের সাথে প্রতিভাধর প্রতিবন্ধীসংক্রান্ত কিছু নোটও যুক্ত আছে। তাতে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধীদের কারও কারও মাঝে অসাধারণ ক্ষমতা থাকতে পারে যেমন, গাণিতিক দক্ষতা, সঙ্গীতবিষয়ক জ্ঞান, মেকানিক্যাল চতুরতা, স্বাদ-গন্ধ-শ্রবনসংক্রান্ত বিশেষত্ব ইত্যাদি। মেয়েটার আঁকা তাজমহলের ছবিটার কথা ভাবলেন পেইন্টার। মাত্র কয়েক মিনিটে আঁকা হয়েছিল ছবিটা। দেখতে বেশ সুন্দরও ছিল। তার মানে, মেয়েটা আসলেই প্রতিভাধর।

এলিজাবেথের সাথে আগের কথোপকথন মনে পড়ল তার। প্রফেসর পোক অনুভূতি আর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি দূরদর্শনসংক্রান্ত গোপন প্রজেক্টের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তার সাথে কোনও সম্পর্ক না থেকেই পারে না এ ব্যাপারটার।

বলে চলেছে লিসা। "আমাদের মতে, মেয়েটার মস্তিষ্কের যে অংশে বিশেষ ক্ষমতা সুপ্ত আছে সে অংশকেই উত্তেজিত করছে ডিভাইসটা। তাছাড়া মানা হয়ে থাকে যে, বেশিরভাগ ক্ষমতা মস্তিষ্কের ডানভাগই নিয়ন্ত্রণ করে। মেয়েটা আর ওই খুলিটা, উভয়ক্ষেত্রেই মাথার ডানদিকে যুক্ত আছে ডিভাইসটা।"

আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। ম্যালকম আর লিসার ধারণা ঠিক হলে, মেয়েটার বিশেষ ক্ষমতাকে কেউ নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। জানালার দিকে এগোলেন তিনি।

কে আছে এর পেছনে?

পেইন্টারের সাথে জানালের পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাট। "জেগে উঠেছে মেয়েটা।"

আবারও আঁকাআঁকি শুরু করেছে ও।

বেডের পাশের টেবিল থেকে নোটপ্যাড আর কলম তুলে নিয়েছে মেয়েটা, মনোযোগ দিয়ে কাগজে কিছু একটা আঁকছে।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্যাট, পেইন্টার পিছু নিলেন।

তাদের চিনতে পারল না মেয়েটা। কিন্তু নিজের কাছাকাছি তাদের দেখে হাত থেকে কাগজ কলম ফেলে দিয়ে দুলতে লাগল। সামনে ঝুঁকে নোটপ্যাডের দিকে তাকাল ক্যাট, সাথে সাথে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল।

ছবিটা নজরে এসেছে পেইন্টারেরও। ছবিটা দেখে ক্যাটের পক্ষে এমন ব্যবহার করাই স্বাভাবিক, ভাবলেন তিনি। একটা মানুষের মুখ আঁকা আছে কাগজটায়।

ছবিটা ক্যাটের স্বামী, মঙ্ক-এর!

সকাল ১১:০৪
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা
রাশিয়ান ফেডারেশন

একটা গাছের গুঁড়ি পেরোতে পিওতরকে সাহায্য করল মঙ্ক। গভীর একটা জলস্রোতের দুইপাশে সংযোগ রক্ষা করছে গুঁড়িটা, ছত্রাক আর শ্যাওলা জন্মে পিচ্ছিল হয়ে আছে। গোটা এলাকা জুড়ে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

ইতোমধ্যে গুঁড়ির অপরদিকে পৌঁছে গেছে কিস্কা, শিম্পাঞ্জিটার থাবা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন বার্চ গাছের বন পার হচ্ছে ওরা। উদ্দেশ্য- ঢাল পার হয়ে সামনের উপত্যকাটায় যাওয়া। গাছের সবুজ রঙ বিবর্ণ ধূসর রূপ ধারণ করেছে।

পড়ে থাকা একটা পাতা হাতে তুলে নিল মঙ্ক, আঙুলে ঘসে দেখল। নরমই আছে, শুকিয়ে যায়নি। ঋতু পরিবর্তনই সম্ভবত পাতাঝড়ার কারণ, ভাবল ও। তবে শীত আসি আসি করলেও এখনও তুষারপাতের কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি। ভালো লক্ষণ...ভাবল ও, দলাপাকানো পাতাটা ফেলে দিল।

এতকিছু সে জানে কীভাবে?

মাথা নাড়লো মঙ্ক। উত্তর পাবার সময় এখনও আসেনি। তাছাড়া, তাড়া করা হচ্ছে ওদের। শব্দ না করে তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। যে কোনও ধরণের শব্দই পাহাড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাই আপাতত ফিসফিস করে আর হাতের ইশারায় যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

গুঁড়িটা পার হয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল মঙ্ক, কনস্টানটাইনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এখনও আসছে না কেন ছেলেটা?

ভাবতে ভাবতে পেছনের ঢাল বেয়ে উঠে এল কনস্টানটাইন। চোখেমুখ ঢেকে রেখেছে ভয়ের চাদর। পিচ্ছিল গুঁড়িটা পার হতে শুরু করল ও।

"কাজ হয়ে গেছে," বলতে বলতে মঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াল ও। "কথামতো তোমার হাসপাতালের শার্টটা উপত্যকার অন্যপ্রান্তে পানিতে ফেলে এসেছি।"

মাথা নাড়লো মঙ্ক। হাসপাতালে পরে থাকা তার শার্টটা ঘাম আর রক্তে ভেজা ছিল। কাপড় পাল্টানোর পর বুদ্ধি করে রুম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওটা। শার্টটা পাওয়া না গেলে ধাওয়াকারীরা বুঝতে পারবে না যে, ও কাপড় পাল্টেছে।

তাছাড়া ফল্স ট্রেইল তৈরিতেও কাজে লাগবে জিনসটা। মুখ আর বগল থেকে ঘাম মুছে ট্রেইলটা যাতে আরও ভালোভাবে ধরা যায় সেই ব্যবস্থা করেছে মঙ্ক। বাচ্চাগুলো আর শিম্পাঞ্জীটার ক্ষেত্রেও একই কাজ করা হয়েছে। ফেলে আসা কাপড়গুলোর গন্ধ ধাওয়াকারীদের ভুল পথে নিয়ে যাবে।

"হাত লাগাও।" কনস্টানটাইনের উদ্দেশ্য কথাগুলো বলে গুঁড়িটা ঠেলা শুরু করল মঙ্ক। ওটা পানিতে ফেলে দিলে আর কেউ এপারে আসতে পারবে না। তবে তাদের দুজনের ধাক্কাতে গুঁড়িটা অল্প নড়ে উঠল শুধু। শিম্পাঞ্জীটাকেও তাদের সাথে যোগ দিতে ইশারা করল ও। এগিয়ে এসে এক ধাক্কাতেই গুঁড়িটা উল্টে পানিতে ফেলে দিল ওটা। চেহারা বদখত হলে কী হবে... গায়ে বেশ ভালোই শক্তি ধরে বুড়ি শিম্পাঞ্জী, ভাবল মঙ্ক।

পানিতে ভেসে সামনে চলে গেল শ্যাওলাধরা গুঁড়ি। সন্তুষ্ট হল ও। ট্রেইল যত কঠিন করা যায়, ততই ভালো।

এগোনো শুরু করল ছোট দলটা। খাড়া পথ ধরে ওঠা ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিস্কা আর পিওতরের জন্য। অবশেষে চড়াইয়ের প্রান্তে পৌঁছালো ওরা। সামনে ছড়িয়ে থাকা পাহাড়ের সারি নজরে এল। বামদিকে রূপালি রঙের একটা ঝিলিক বলে দিল, ওটা একটা লেক।

ওদিকে এগোনো শুরু করল মঙ্ক। লেকের আশাপাশে মানুষ থাকতে পারে। আর মানুষ মানেই আশ্রয়। কিন্তু ওর হাত টেনে ধরল কনস্টানটাইন। "ওদিকে যাওয়া যাবে না। শুধু মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওখানে।" অন্য হাতে কোমরে আটকানো রেডিয়েশন ব্যাজের দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা।

মঙ্ক ভুলেই গিয়েছিল জিনিসটার কথা। ব্যাজটার দিকে তাকাল ও। জিনিসটার মনিটর সাদা, তবে তেজস্ক্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে রঙও পাল্টাবে। প্রথমে গোলাপী, তারপর লাল, তারপর গাঢ় লাল, সবশেষে কালো। অনেকটা প্রেগনেন্সি টেস্ট কিট-এর মতো।

প্রেগনেন্সির কথা মনে হতেই চোখের সামনে পুরনো স্মৃতি খেলে গেল তার।

হাসিমাখা চোখ... ছোট ছোট হাতের আঙুল...

যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই উবে গেল দৃশ্যটা।

পেটে হাত দিয়ে কাতরে উঠল কিস্কা, কনস্টানটাইনের বোন ও। "ক্ষিদে পেয়েছে।"

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কনস্টানটাইন। তবে মঙ্ক জানে, শক্তি ধরে রাখতে চাইলে খেতেই হবে ওদের। আর এতো ছোটাছুটির পর খানিকটা বিশ্রাম করলে মন্দ হয় না।

একবার লেকের দিকে, একবার রেডিয়েশন ব্যাজের দিকে তাকাল ও।

মৃত্যু অপেক্ষা করছে ওখানে।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে আগে।

ঢাল বেয়ে নিচের উপত্যকায় পৌঁছুলো ওরা। ছোট ছোট পুকুরে ভর্তি এলাকাটা। বেশ কিছু ছোট জলপ্রপাতও নজরে এল। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। ক্যাম্প করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। যার যার ব্যাগ খুললো সবাই, ভেতর থেকে প্রোটিন বার আর পানির বোতল বের হলো।

নিজের ব্যাগে একটা মানচিত্র খুঁজে পেল মঙ্ক। তাকে মানচিত্রটা মাটিতে বিছাতে দেখে এগিয়ে এল কনস্টানটাইন, একটা প্রোটিন বার চিবুচ্ছে ছেলেটা। মঙ্ক খেয়াল করল মানচিত্রে পাহাড়গুলোর জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট এক্স চিহ্নিত আছে।

"খনি," বলে উঠল কনস্টানটাইন। "ইউরেনিয়ামের খনি।" হাত দিয়ে আশেপাশের এলাকার দিকে ইশারা করল ও। "চেলিয়াবিংস্ক-এর ইউরাল পর্বতমালা এটা, প্রাচীন অস্ত্র কারখানার কেন্দ্রবিন্দু। বিপজ্জনক এলাকা।"

মানচিত্রে হ্যাজার্ড' চিহ্নযুক্ত জায়গাগুলোতে আঙুল বুলালো ও। "প্লুটোনিয়াম খনি, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলার ডাম্পিং স্টেশন...তবে দুএকটা ছাড়া প্রায় সবই পরিত্যক্ত।" পাহাড়ের আড়ালে থাকা বিশাল লেকটার দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা। "লেক করাশয়, মায়াক অ্যাটমিক কমপ্লেক্সের তরল বর্জ্য ওখানেই ফেলা হতো। খুবই বিপজ্জনক লেকটা। পাড়ে একঘন্টা দাঁড়াও, তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহের ভেতর তোমার আয়ু ফুরিয়ে আসবে। তবে ওটা পার হয়েই এগোতে হবে আমাদের।"

ভ্রূ কুঁচকালো মঙ্ক। "তার আগে বলো আমরা ছিলাম কোথায়?"

মানচিত্রের দিকে ঝুঁকে এল কনস্টানটাইন, রেডিয়েশন প্ল্যান্ট আর মাইনগুলোর মাঝের একটা জায়গা চিহ্নিত করল। "এই যে এখানে, দ্য ওয়ারেন; চেলিয়াবিংস্ক ৮৮- এর ভূগর্ভস্থ একটা শহর। মাইনে কাজ করা হাজার হাজার বন্দীদের ওখানেই রাখা হতো।"

গুহার ভেতর দেখা বড় বড় বিল্ডিংগুলোর কথা মনে পড়ল মঙ্কের। পরিত্যক্ত এলাকাটার ভালো ব্যবহারই করছে এরা।

বলে চলেছে কনস্টানটাইন, "লেক করাশয় পার হয়েই যেতে হবে আমাদের। কিন্তু সাবধান, কোনোমতেই কাছে যাওয়া যাবে না। যার মানে দাঁড়াচ্ছে, আসানভ জলাভূমি অতিক্রম করা ছাড়া আর পথ নেই। আর আমাদের গন্তব্য হলো, এই এখানে।" লেকের অন্যপ্রান্তের একটা মাইনে আঙুল রাখল ছেলেটা।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না মঙ্ক। "কী আছে ওখানে?"

"ওদেরকে থামাতে হবে আমাদের।" বলে পিওতরের দিকে তাকাল কনস্টানটাইন, মার্তার সাথে শ্যাওলার বিছানায় শুয়ে আছে ও।

"থামাবো? কাদের?"

পিওতরের কথাগুলো মনে পড়ল মঙ্কের।

বাঁচাও আমাদের।

তার দিকে ফিরল কনস্টানটাইন। "এজন্যই তোমাকে এখানে এনেছি আমরা।"

সকাল ১১:৩০

বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালেন জেনারেল-মেজর সাভিনা মারতোভ। স্কুলের প্রধান অডিটোরিয়ামে জড়ো হয়েছে সবাই। তার পেছনে একটা বড় এলসিডি স্ক্রিনে আমেরিকান লোকটার চেহারা ভেসে আছে।

"কেউ কি সকালে এই লোকটাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছো? ওর পরনে সম্ভবত হাসপাতালের গাউন ছিল।"

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল বাচ্চাগুলো। ডরমেটরি থেকে ডেকে আনা হয়েছে ওদের। নির্দিষ্ট রঙের শার্ট পরে বসে আছে সবাই। সাদা শার্টওয়ালারা সবার পেছনে, প্রতিভাবান হবার সমস্ত জেনেটিক মার্কার থাকা সত্ত্বেও যারা খুব একটা কাজের নয়। মাঝে সারির বাচ্চাগুলোর পরনে ধূসর শার্ট, এদের হালকাপাতলা প্রতিভা আছে, তবে আহামরি কিছু না।

সামনের সারিতে বসে আছে দশটা বাচ্চা।

কালো শার্ট পরনে ওদের, ওমেগা ক্লাস। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ওরা। সবার ভেতর থেকে বারোজনকে ওমেগা ক্লাসের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এরাই সাহায্য করবে নিকোলাসকে।

অবশ্য নিকোলাসের জন্য আফসোসও হয় সাভিনার। নিম্নপর্যায়ের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল ও, সাদা শার্ট ক্যাটাগরির। প্রথম প্রজন্মের জীন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভধারণ করেছিলেন সাভিনা। এজন্য যথেষ্ট মূল্যও চুকাতে হয়েছে, নিকোলাসের জন্মের সময় অনেক সমস্যা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তার। কিন্তু নিকোলাসকে দিয়েই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছেন উনি।

সেই স্বপ্ন পূরণ হতে খুব বেশি দেরি নেই আর।

কালো শার্টপরা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। দুটো সিট খালি পড়ে আছে।

একটা বাচ্চা গতকাল রাতেই উধাও হয়েছে।

পিওতর।

প্রায় একই সময়ে আমেরিকার একটা চিড়িয়াখানা থেকে হারিয়ে গেছে তার বোনও। এখনও ইউরির কাছ থেকে কোনও খবর আসেনি। করছে কী লোকটা?

উত্তর চাই তার।

তীক্ষ্ণ হয়ে এল সাভিনার গলা। "কনস্টানটাইন, কিস্কা আর পিওতরকে ডরমেটরি থেকে বেরোতে দেখেছো কেউ?"

আবারও সেই শূন্য দৃষ্টি।

ঘরের শেষ প্রান্তে নড়াচড়া চোখে পড়ল সাভিনার, কেউ একজন আসছে। সামনে এসে নড করল তার সেকেন্ড ইন কমান্ড, লেফটেন্যান্ট বরসাকোভ। ক্যাজুয়াল ধূসর ইউনিফর্ম পরনে লোকটার। কোনও একটা খবর এনেছে ও।

অবশেষে!

পাশে দাঁড়ানো তিন শিক্ষকের দিকে তাকালেন সাভিনা। "ডরমেটরিতে নিয়ে যান বাচ্চাগুলোকে। ব্যাপারটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাহারা জোরদার করে দিন।"

সিঁড়ি বেয়ে বাইরের উদ্দেশ্যে এগোতে লাগলেন সাভিনা মারতোভ। পিছু নিলো বরসাকোভ। উচ্চতা খুব একটা বেশি না লোকটার, তার কাঁধ সমান উঁচু। তবে গায়ের পাকানো পেশি উচ্চতার অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। অবশ্য নিজের তুলনায় খাটো লোকই পছন্দ করেন সাভিনা।

বাইরে দুজন গার্ড দাঁড়ানো। একজনের হাতের চেইনের অন্যপ্রান্তে একটা রাশিয়ান নেকড়ে বাঁধা। থেমে থেমে গর্জন করে চলেছে প্রাণিটা, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত। রাশিয়ান নেকড়ে আর সাইবেরিয়ান নেকড়ের সংকর ওটা, তাদের অ্যানিমেল রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে জন্ম দেয়া হয়েছে। মেনাজিরি নামে ডাকা হয় জায়গাটাকে। কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, বানর ইত্যাদি অনেক জাতের প্রাণী নিয়েই গবেষণা চালানো হয় ওখানে। চিড়িয়াখানা হিসেবেও ব্যবহৃত হয় জায়গাটা। দেখা গেছে, প্রানিদের সাথে বাচ্চাগুলোর একটা সাইকোলজিক্যাল সম্পর্ক আছে।

এমনকি নেকড়েটার মাথায়ও সার্জিক্যাল ডিভাইস লাগানো। রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তাদের উত্তেজনার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

"কী খবর, লেফটেন্যান্ট?" জিজ্ঞেস করলেন সাভিনা।

"বাচ্চাগুলো নেই!"

ঘুরে লোকটার দিকে তাকালেন তিনি।

"গোটা গ্রাম চষে ফেলেছি আমরা, পরিত্যক্ত বিল্ডিংগুলোও দেখা হয়েছে। কারও কোনও হদিস পাইনি। তবে অ্যানিমেল ফ্যাসিলিটির পাশ দিয়ে একটা ট্রেইল পাওয়া গেছে, একটা সার্ভিস হ্যাচ হয়ে উপরের সারফেসের দিকে গেছে ওটা।"

"বাইরে চলে গেছে নাকি?"

"হ্যাঁ। হাসপাতালের আমেরিকান লোকটাও ওদের সাথে আছে। হাসপাতাল থেকেই ট্রেইলটা শুরু হয়েছে।"

একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল তাহলে, ভাবলেন সাভিনা। তার মানে, আমেরিকান লোকটা কিডন্যাপ করেনি বাচ্চাগুলোকে। তারাই মূলত লোকটাকে হাসপাতাল থেকে পালাতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু কেন?

কে ওই লোক?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেকদিন যাবত খুঁজে চলেছেন তিনি, লোকটাকে প্রথম খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই। প্রায় মাস দুয়েক আগে রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট করে, ইন্দোনেশিয়ান সাগরে একটা জাহাজ হাইজ্যাক করেছে জলদস্যুরা। গোটা দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস খুঁজছে জাহাজটাকে। টেস্ট হিসেবে বাচ্চাগুলোকে জাহাজটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেন তিনি। আর বারোজন ওমেগা ক্লাস বাচ্চা অসাধ্য কাজটা সমাধানও করে ফেলে। জাহাজ লুকিয়ে রাখা দ্বীপটার অবস্থান শনাক্ত করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে হামলার কারণে ডুবতে বসেছে জাহাজটা। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে একটা রাশিয়ান সাবমেরিন

পাঠানো হয়। তখনই প্রচণ্ড জ্বর আসে সাশার। প্রায় এক ডজন ছবি আঁকে ও, প্রতিটা ছবির বিষয়বস্তুই জালে জড়িয়ে পানিতে ডুবতে থাকা একটা মানুষ। কৌতুহল দমাতে না পেরে সাবমেরিনারদের লোকটাকে খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেন সাভিনা।

আসলেই তেমন একটা লোক পাওয়া যায়, জালে আটকে ডুবে গিয়েছিল ও। জাল ছাড়িয়ে ডুবুরিরা তুলে আনে মানুষটাকে।

ওকে চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে আনতে বলেন সাভিনা, ভেবেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে হয়তো। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, লোকটা জাহাজের একজন ইলেকট্রিশিয়ান মাত্র। এক হাত কাটা লোকটার প্রতি আর কোনও আগ্রহ দেখায়নি সাশা বা অন্য কোনও ওমেগা ক্লাস বাচ্চা।

অবশ্য একদিন সংকেত পাঠানোর ভঙ্গিতে কাটা হাতের কব্জিতে আটকানো প্লাস্টিক কাফে টোকা দিতে শুরু করে লোকটা। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নিরাপত্তার খাতিরে কাফটা কেটে বাদ দেয় সার্জনরা।

কিছুদিন পর সাভিনা উপলব্ধি করতে পারেন, সাশার উদ্দেশ্য ছিল শুধু ডুবতে থাকা একজন মানুষকে উদ্ধার করা। তখন স্মৃতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন মেনাজিরির বিজ্ঞানীরা, জীবিত টেস্ট সাবজেক্টটা তাদের কাজে লাগবে ভেবে লোকটাকে তাদের আওতায় দিয়ে দেন তিনি।

তারা কী করেছে ওর সাথে?

ভাবলে এখনও সাভিনার গায়ে কাঁটা দেয়।

তবে এখন পালিয়েছে লোকটা, পালিয়েছে সাশার ভাইয়ের সাথে। নিজেও পালিয়েছে সাশা। কী খেলা খেলছে বাচ্চাগুলো?

জানেন না তিনি, তবে নিজের পরিকল্পনা পণ্ড করে উত্তর খোঁজার এতো সময়ও হাতে নেই।

"আপনার অর্ডার কী, জেনারেল-মেজর?"

"উপরে খোঁজ করো।"

"কুকুরগুলো নিয়ে আসছি," যোগ করল বরসাকোভ।

তাকে থামতে ইশারা করলেন সাভিনা। "শুধু কুকুরে হবে না।"

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। বুঝতে পেরেছে তিনি কীসের ইঙ্গিত করেছেন। "জেনারেল-মেজর? লোকটার সাথে বাচ্চারাও আছে, কী হবে ওদের?"

ঘুরে দাঁড়ালেন সাভিনা। ভং চং করার সময় নেই আর। হাতে এখনও দশটা বাচ্চা আছে, তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট।

"ছেড়ে দাও বিড়ালগুলোকে।"

সকাল ১১:৪৫

মার্তার দু'পায়ের ফাঁকে বসে আছে পিওতর। হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে রেখেছে শিম্পাঞ্জীটা। এমনিতে পিওতর চায় না কেউ তাকে স্পর্শ করুক, তবে মার্তার ব্যাপারটা আলাদা। প্রানিটার হৃৎস্পন্দন শুনতে পেল ও। পাঁচ বছর বয়সে, প্রথম অপারেশনের সময় মার্তার সাথে দেখা হয়েছিল ওর। বেড়ে হেলান দিয়ে সারাদিন বসে ছিল প্রাণিটা, একহাত বাড়িয়ে রেখেছিল পিওতরের দিকে। প্রথম প্রথম ভয় পেলেও আস্তে আস্তে ভয় কেটে যায় ওর মন থেকে। সে-ও হাত বাড়িয়ে দেয় একসময়। হাতে হাত রাখার পাশাপাশি বাদামী চোখজোড়া একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। চোখদুটোর ভাষা পড়তে পেরেছিল পিওতর।

প্রতিশ্রুতি।

তারপর একসাথে অনেক সময় একসাথে কাটিয়েছে ওরা; খেলা করেছে, হেসেছে, কেঁদেছে। সুখ-দুঃখ, অতীত-বর্তমান সবই ভাগবাটোয়ারা করেছে একে অপরের সাথে।

আশাপাশের বনের দিকে তাকাল পিওতর। আগেও কয়েকবার গাছপালা চেনানোর জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বনে আনা হয়েছে ওদের। তবে মন থেকে ভয় এখনও কাটেনি ওর।

সাশার মতো না পিওতর।

তবে আলাদা ক্ষমতা আছে তারও। হৃৎস্পন্দন বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে ওর, ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল পৃথিবী। দৃষ্টিসীমার ভেতর শুধু গাছের পাতাগুলো ছাড়া বাকি সব ঝাপসা হয়ে এল। নড়ছে পাতাগুলো, কাঁপছে, নাচছে, ঝড়ে পড়ছে...
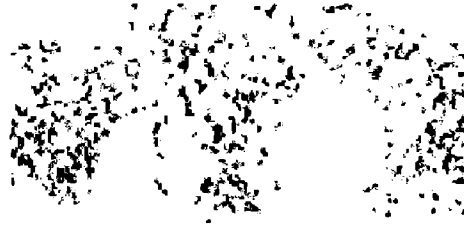
পিওতরের অস্থিরতা নজরে এল মার্তার। ছেলেটার কানে কানে নিঃশব্দে প্রশ্ন করল প্রানিটা।

কী হয়েছে?

উত্তর দেয়ার মতো অবস্থায় নেই ও। মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। কনস্টানটাইন একবার বলেছিল, কীভাবে ও কঠিন সব অঙ্কের সমাধান করে।

প্রতিটা সংখ্যারই একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। এমনকি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জটিল সংখ্যারও আকৃতি আছে। তাই হিসাবনিকাশ করার সময়, আমি প্রথমে সংখ্যার মাঝের ফাঁকা স্থানগুলোর দিকে নজর দেই। সংখ্যাগুলোর মতোই, ফাঁকা জায়গাটুকুরও একটা আকৃতি থাকে। সেই আকৃতি অনুযায়ী খাপে খাপে সংখ্যা মেলালেই বের হয়ে যায় উত্তর।

অবশ্য পুরো ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি পিওতরের। কনস্টানটাইনের মতো অঙ্ক পারে না ও, পারে না কিস্কার মতো পাজল সমাধান করতে, নিজের বোন সাশার মতো দুরের জিনিসও দেখতে পারে না। কিন্তু সবার থেকে আলাদা, অদ্বিতীয় এক ক্ষমতা আছে ওর।

মন পড়তে পারে ও...সব ধরণের মন...প্রানির, মানুষের।

ঠিক যেমন এখন বুঝতে পারছে, এগিয়ে আসছে কিছু একটা। এগিয়ে আসছে হিংস্র, ক্ষুধার্থ একটা মন।
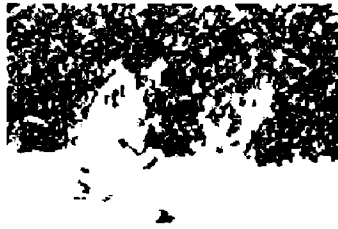
কনস্টানটাইন ডাকছে ওকে, কিন্তু সাড়া দেয়ার সময় নেই এখন। মাথার ভেতর শুধুই পাতার ঝাঁক খেলা করছে। পুরো ইচ্ছাশক্তিকে এক করে পাতাগুলোর মাঝের ফাঁকা স্থানের দিকে মন ফেরালো ও।

আসছে কিছু একটা।

মনে মনে ফাঁকা স্থানে কালি আর ছায়া ছড়িয়ে দিল পিওতর। তারপর যোগ করল দাঁত... একইসাথে চলছে ক্রুদ্ধ গর্জন...শক্ত মাটি আঁকড়ে ধরে আছে নরম থাবা।

দৃশ্যটা পরিস্কার হয়ে এল। অবশেষে কী এগিয়ে আসছে তা বুঝতে পেরেছে ও।

বাঘ!

দ্বিতীয়

৮
৬ সেপ্টেম্বর, দুপুর ১২:০৫
কাস্পিয়ান সাগর থেকে ৪৮,০০০ ফুট উঁচুতে

ল্যান্ডিং-এর এখনও দুইঘন্টা বাকি।

বম্বারডিয়ার গ্লোবাল এক্সপ্রেস এক্সআরএস বিমানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রে। সূর্য উদয় হয়ে এক নতুন দিনের আগমন ঘোষণা করেছে। মাথার উপর দিয়ে আবার অস্তাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রাও শুরু করেছে, কিন্তু তাদের পথ ফুরোচ্ছে না। শব্দের চাইতে দ্রুত গতিতে উড়ে চলেছে ওরা। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে মোডিফাই করা জেটপ্লেনটা সিগমাকে উপহার দিয়েছেন বিলিয়নিয়ার ব্যাবসায়ী রাইডার ব্লান্ট। ইউএস এয়ারফোর্সের দুজন অফিসার বর্তমানে দায়িত্বে আছেন বিমানটার।

নিজ দলের দিকে তাকাল গ্রে। প্রায় ছয় ঘন্টা ঘুমালেও জেটল্যাগ কাবু করে ফেলেছে সবাইকে। এখনও ইঞ্জিনের সাথে পাল্লা দিয়ে নাক ডেকে চলেছে কোয়ালস্কি। জাগানোর দরকার নেই, ভাবল ও।

দলে যোগ হয়েছে এক নতুন মুখ, ড. শে রোজারো। মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনে রাখা ডোশিয়ারের দিকে। বাকি সবার চেয়ে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, জেটল্যাগে বিচলিত হয়নি একটুও। আর্চিবাল্ড পোকের মতোই নিউরোলজি আর নিউরোকেমিস্ট্রিতে ডিগ্রী আছে ওর, এজন্যই মূলত সিগমার এই নতুন এজেন্টকে দলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন পেইন্টার।

সাধারণের চেয়ে উচ্চতা একটু বেশি মেয়েটার, গাঢ় শ্যামলা গায়ের রঙ, বাদামী চোখজোড়ায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল মাথার পেছনে ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। সিগমায় আসার আগে এয়ারফোর্সে ছিল ও, জেটপ্লেন চালানোর অভিজ্ঞতাও আছে।

যার সাথে দেখা করার জন্য এতোদূর আসা, প্লেন ল্যান্ডিং-এর আগে তার সম্পর্কে খানিকটা জেনে নেয়া যাক, ভাবল গ্রে। "এলিজাবেথ, ড. হেইডেন মাস্টারসন সম্পর্কে বলো আমাদের। তোমার বাবা উনাকে বেছে নিয়েছিলেন কেন?"

হাই তুললো এলিজাবেথ, চশমাটা নেড়েচেড়ে চোখে বসালো। "অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিওলজি আর সাইকোলজিতে ডিগ্রিধারী তিনি, মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি আর ধ্যানের পদ্ধতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। বিগত ত্রিশ বছর ধরে ভারতে যোগী-সন্ন্যাসীদের নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন।"

"তোমার বাবার মতো একই ধাঁচের কাজ।"

সায় দিল ও।

"মাস্টারসনের কাজ সম্পর্কে জানি আমি," কণ্ঠে বিস্ময় নিলে বলে উঠল রোজারো। "অসাধারণ জ্ঞান উনার। মস্তিষ্কের প্লাস্টিসিটি অর্থাৎ নমনীয়তায় সমর্থনকারী প্রথম গবেষকদের মধ্যে উনিও একজন। ব্যাপারটা সে আমলে বিতর্কিত হলেও এখন ধ্রুব সত্য বলেই মানা হয়।"

"নমনীয়তা?" প্রশ্ন করল গ্রে।

"মাত্র কয়েক বছর আগেও নিউরোলজি একটা ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করতো– মানব মস্তিষ্ক একেবারে সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির। যার মানে, মস্তিষ্কের প্রতিটা ভাগ আলাদা আলাদা কাজের উদ্দেশ্যে তৈরী। একটা অংশ, একটা মাত্র কাজ। কিন্তু কোন অংশ কোন কাজটা করে? গত দুই দশক ধরে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। তবে সময়ের সাথে সাথে এখন আমরা জানি, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা সুনির্দিষ্ট না, বরং পরিবর্তনযোগ্য, অর্থাৎ নমনীয়। মানে হচ্ছে, কোনও অংশের ক্ষতি হয়ে গেলে বাকি সব অংশ মিলে সেই অংশের কাজ ভাগাভাগি করে নিয়ে ক্ষতিটা পূরণ করতে সক্ষম।"

নড করল গ্রে, বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা।

বলে চলল এলিজাবেথ। "ড. মাস্টারসন প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, নমনীয়তার পাশাপাশি নতুন অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার ক্ষমতাও মস্তিষ্কের আছে। যোগী-সাধুরা তাদের পরিপাকের হার, রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এটা হয় শুধু মস্তিষ্ককে নতুনত্বে অভ্যস্ত করার মাধ্যমেই।"

"এই রহস্য উন্মোচন করা গেলে নিউরোলজির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। দেখতে পাবে অন্ধ, শুনতে পাবে বধির।" যোগ করল রোজারো।

খুলিতে আটকানো ডিভাইসটার কথা মনে পড়ল গ্রের। বধির শুনতে পাবে। শ্রবনসংক্রান্ত কোনও কিছুই হবে হয়তো জিনিসটা।

এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করল ও, "তোমার বাবার ব্যাপারে কিছু বলেছেন নাকি ড. মাস্টারসন?"

"তেমন কিছু বলেননি। তবে যারা বাবাকে নিয়োগ করেছিল তাদের সাথে আগে কথা বলতে চান তিনি। ভয়ার্ত শোনাচ্ছিলো উনার কণ্ঠ। এর বেশি আর কিছু তার পেট থেকে বের করতে পারিনি।"

"নিয়োগ করেছিল?"

"আমাদের গোত্রের কথা বলেছেন তিনি। আমরাই নিয়োগ করেছিলাম প্রফেসর পোককে," রোমান টানে ইংরেজিতে উত্তর দিল গ্রুপের সর্বশেষ সদস্য, জিপসি সর্দার লুকা হার্ন।

তার দিকে ফিরল গ্রে। লান্ডিং-এর আগেই গোটা ব্যাপারটায় তার ভূমিকা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। কেন প্রফেসর পোক তাকে বেছে নিলেন? নিজ দেশের সরকারী এজেন্টদের থেকে লোকটাকে বেশি বিশ্বাস করার কারণ কী?

"প্রফেসর পোকের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কীভাবে আপনি?" জিজ্ঞেস করল ও।

"দু'বছর আগেপ্রফেসর আমাদের সাথে দেখা করেন। গোত্রের লোকজনের ডিএনএ স্যাম্পল নিতে চেয়েছিলেন উনি। বিশেষ করে যারা পেন ডুকেরিন অনুশীলন করে, তাদের থেকে।"

"পেন কী?

"ডুকেরিন...," জবাব দিল কোয়ালস্কি। নাক ডাকা থেমে গেলেও চোখ এখনও বন্ধ তার। "ভবিষ্যৎবাণী। হাত দেখা, ক্রিস্টাল বল দেখে ভবিষ্যৎ বলা... এসব আর কী।"

মাথা নেড়ে সায় দিল লুকা। "আমাদের ঐতিহ্য বলা চলে ব্যাপারটাকে। শত শত বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু ম্যাজিক দেখানো কৌশলী জাদুকর না, বরং সত্যিকারের ভবিষ্যৎবক্তার খোঁজে ছিলেন প্রফেসর পোক। শোভিহানিস...আসল প্রতিভাধর।"

সোজা হয়ে বসল এলিজাবেথ। "বাবা ভারতেও যোগী-সন্ন্যাসীদের ডিএনএ স্যাম্পল যোগাড় করছিলেন। একটা বিশেষ বংশগতির খোঁজ করছিলেন তিনি।"

আরেকটা প্রশ্ন উদয় হলো গ্রে'র মনে। "সাধুসন্ন্যাসী থেকে হঠাত জিপসিদের প্রতি আগ্রহী হলেন কেন তিনি? দুটোর মাঝে সম্পর্ক কী?"

তার দিকে তাকাল লুকা। "রোমানিদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?"

মাথা নাড়লো গ্রে, তেমন কিছুই জানা নেই তার।

ওর বিব্রতকর অবস্থা বুঝতে পারল জিপসি সর্দার। "আসলে খুব বেশি লোক জানে না আমাদের কাহিনী। আমাদের লোকজন যখন ইউরোপে প্রথম আসে, তখন কালো চামড়া আর কালো চোখের জন্য মনে করা হতো আমরা মিশর থেকে এসেছি। তাই আমাদের এজিপ্টোই বা জিপসিয়ান বলে সম্বোধন করা হতো। ওই শব্দটাই ধীরে ধীরে জিপসি রূপ প্রাপ্ত হয়। তবে পরবর্তীতে ধরা পড়ে যে, আমাদের ভাষার সাথে সংস্কৃতের মিল আছে।"

"সংস্কৃত... প্রাচীন ভারতের ভাষা," গ্রে'র কণ্ঠে বিস্ময়। তবে বিস্মিত হলেও রহস্যটা ধরতে পারল ও।

"ভারত থেকে এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, উত্তর ভারত... পাঞ্জাব অঞ্চল।"

"দেশান্তরিত হলেন কেন আপনারা?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ। "আমি যতদূর জানি, ইউরোপে আপনাদের অতীত সময় সুখকর ছিল না।"

"সুখকর সময়?" রাগের আভাস লক্ষ্য করা গেল লুকার গলায়। "শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে জিপসিদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে হত্যা করেছে নাজি সৈন্যরা।"

মাথা নাড়লো জিপসি সর্দার, ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে গলার তেজ। "আমাদের অতীত সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। তবে পুরনো রেকর্ড থেকে জানা গেছে, দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ভারত ছাড়ে রোমানি গোত্রের লোকজন। তখন যুদ্ধে জর্জরিত অবস্থায় ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের পুরোটা। এছাড়াও, অদ্ভূত গোত্র ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ভারত জুড়ে। নিচু গোত্রের লোকদের অচ্ছুৎ বলে গন্য করা হতো।

চোর-ডাকাত, সংগীতশিল্পী, অখ্যাত যোদ্ধা এমনকি জাদুকররাও ছিল ওই পরিস্থিতির শিকার।

"আপনাদের শোভিহানিস-রাও," যোগ করল গ্রে।

সায় দিল লুকা। "মূলত ওই কারনেই গোত্রের লোকজন ভারত ছেড়ে পশ্চিমে অগ্রসর হতে শুরু করে।"

"ড.পোকে ফেরত আসি আমরা।" বিষয়টার ইতি টানলো গ্রে। "প্রফেসরের অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন আপনারা? ডিএনএ স্যাম্পল দিতে রাজি হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। সাহায্যের বিনিময়ে রক্ত দিতে রাজি হয়েছিলাম আমরা।"

"সাহায্য? কোন ব্যাপারে?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

আবারও রাগ প্রকাশ পেল লুকার কণ্ঠে। "আমাদের হৃদয় খুঁজে বের করতে, নির্মমভাবে কেড়ে নেয়া হয়েছিল ওটা।"

হঠাৎ ঝাঁকি খেলো বিমান। নিজের সিটে লাফিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। গ্রে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সিটবেল্ট বাঁধলো।

পাইলটের কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। "দুঃখিত, বাত্থূর্ণিতে পড়ে গিয়েছিলাম।"

আবারও ঝাঁকি খেলো বিমান, এবার আরও বেশি সময় নিয়ে।

"সীটবেল্ট বেঁধে নিন," বলে চলল পাইলট। "একঘন্টা পর ল্যান্ড করবো। আর কমান্ডার পিয়ার্স, আপনার জন্য একটা ফোনকল আছে। ডিরেক্টর ক্রো কথা বলতে চান। আপনার ফোনে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি কলটা।"

চেয়ারের হাতল থেকে ফোনটা খুলে কানে ঠেকালো গ্রে। "কমান্ডার পিয়ার্স বলছি।"

"গ্রে, লিসা আর ম্যালকম খুলিতে আটকানো ডিভাইসটা সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছে। ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে দেই।"

মাইক্রোইলেকট্রোড আর প্রতিভাধর অটিস্টিকদের ব্যাপারে পেইন্টারের লেকচার শুনতে শুনতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে হেলে পড়ছে সূর্য। চোখের সামনে মেয়েটার চেহারা ভেসে উঠল।

অবশেষে নিরাপদে আছে বাচ্চাটা।

সেই সাথে আরেকটা প্রশ্নও উঁকি দিয়ে গেল গ্রে'র মাথায়।

ওর মতো আরও কেউ আছে কী?।

দুপুর ১২:২২
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

পিওতরকে কোলে নিয়ে জলস্রোতের পাড় ধরে দৌড়ে চলেছে মঙ্ক। ওর গায়ে একেবারে লেপ্টে আছে ছেলেটা, ঘাম আর চোখের পানিতে ভিজে গেছে মুখ। সবার আগেআগে চলেছে মার্তা, তার পেছনে কিস্কা আর সবার পেছনে মঙ্ক। কনস্টানটাইনও ওর পাশেই আছে।

"পিওতর ঠিক দেখেছে তার গ্যারান্টি কী?" দৌড়ানোর ফাঁকে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। "বাঘ? ব্যাপারটা নিছক ওর মনের কল্পনাও হতে পারে।"

মাথার ক্যাপ উঁচু করে কানের পাশের স্টিলের টুকরোটার দিকে ইঙ্গিত করল কনস্টানটাইন। "যাদের এটা আছে, তারা ভুল করে না। পিওতর ঠিকই বলেছে।"

ও ইতোমধ্যে বলেছে, কীভাবে পিওতরের বোনের আঁকা ছবির উপর ভিত্তি করে মঙ্ককে উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে মঙ্কের মাথায় ঢোকেনি ব্যাপারটা।

বলে চলেছে কনস্টানটাইন, "মেনাজিরিতে আর্কাডি আর জাখার নামে দুটো সাইবেরিয়ান বাঘ আছে। মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে জঙ্গলে আসে সৈন্যরা, শূকর আর হরিণ শিকার করে। খুবই চালাক ওরা।"

"কতদূরে আছে বাঘগুলো?"

পিওতরকে রাশিয়ান ভাষায় প্রশ্নটা করল কনস্টানটাইন। সেও একই ভাষায় উত্তর দিল।

মাথা নাড়লো ছেলেটা। "তা বলতে পারবে না ও। শুধু জানে, বাঘগুলো এগিয়ে আসছে। ওদের হিংস্রতা অনুভব করতে পারছে পিওতর।"

চলতে থাকলো ছোট দলটা। সামনে জলস্রোত প্রশস্ত হয়ে চওড়া নদীর রূপ নিয়েছে। ওটা পার হতে পারলে...

এমন সময় বাতাসে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল, অনেকটা সাইরেনের মতো আওয়াজটা। উপত্যকার উপরদিক থেকে আসছে। হাড়ে একেবার কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন শব্দটা। ইতোমধ্যে দুহাতে কান চেপে মাটিতে বসে পড়েছে বাচ্চাগুলো। ওদের সামনে ঢাল হয়ে শব্দ আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে মার্তা। স্প্রুসগাছের শাখাগুলোর ফাঁক দিয়ে উপরদিকে তাকাল মঙ্ক। পেছনদিকে উপত্যকার উপর আকাশে ছোট প্যারাসুটের মতো কী যেন ভাসছে। দেখতে ফ্লেয়ার বেলুনের মতো মনে হলেও বেলুনের নিচে আলোর পরিবর্তে একটা গোলাকার চাকতি আটকানো, শব্দটা ওটার ভেতর থেকেই আসছে। সামনের উঁচু বোল্ডারের উপর উঠতেই আরও কয়েকটা বেলুন নজরে পড়ল।

বাচ্চাগুলোর সংবেদনশীলতায় আঘাত করে ওদের অচল করে দিতে চাচ্ছে ধাওয়াকারীরা।

বেশ খানিকটা পেছনে জলস্রোতের পাড় থেকে গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল মঙ্কের কানে। তামাটে রঙের পশমের ঝলকও দেখা গেল।

বাঘ।

বাচ্চাগুলোর দিকে ফিরল মঙ্ক। পিওতরকে কাঁধে তুলে নিলো ও, সেই সাথে কিস্কার হাত ধরে টেনে দু'পায়ে দাঁড় করালো মেয়েটাকে। পথচলা থামানো যাবে না এখন। অপেক্ষা করলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। এগিয়ে এল মার্তা, কনস্টানটাইনের এক হাত নিজ কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ওর ভর নিজের উপর নিলো শিম্পাঞ্জীটা। সাইরেনের আওয়াজ বেশ খারাপ প্রভাব ফেলেছে বাচ্চাগুলোর উপর, ভাবল মঙ্ক।

পাড় ধরে এগিয়ে চলল ওরা। জলস্রোত এখানে প্রশস্ত হয়ে গেছে। প্রায় চার মিটার চওড়া, স্রোতও আছে বেশ। পানির আওয়াজে আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল দুর্বল হয়ে আসা সাইরেনের চিৎকার।

সবার আগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিস্কা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল কনস্টানটাইনও। মার্তাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগল ওরা।

তবে পাশ থেকে একটা খসখসে আওয়াজ কানে যেতেই থমকে গেল বাচ্চাদুটো।

পেছনে পাথরের ফাঁক থেকে উদয় হলো একটা বাদামী ভালুক। ফ্লেয়ারের আওয়াজ যথেষ্ট রাগিয়ে দিয়েছে প্রানিটাকে। কালো চোখজোড়া এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ছোট দলটার দিকে।

রাশিয়ান গ্রিজলী ওটা।

কয়েক সেকেন্ড পর, ছয়শো পাউন্ড ওজনের শরীর নিয়ে তাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল প্রানিটা।

সকাল ৬:০৩
ওয়াশিংটন ডি.সি.

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে একটা বেডে দেখেতে পেলেন ইউরি রাইভ, হাত-পা স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আশেপাশের উজ্জ্বলতা চোখ ভেদ করে মগজে আঘাত করতে চাইছে যেন। গলা দিয়ে বের হয়ে আসতে চাওয়া বমি আটকাতে গিয়ে খাবি খেতে লাগলেন তিনি। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে এল দৃষ্টি। ঘাড় তুলে নিম্নাঙ্গের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন। সহজেই বুঝে গেলেন, চাদরে ঢাকা থাকলেও গায়ে একবিন্দু কাপড়ও নেই।

ঘরটায় দরজার সাথে ছোট একটা জানালা, তবে বন্ধ দুটোই। বিছানার পাশের চেয়ারে স্যুট পরা এক লোক বসে আছে। জ্যাকেট চেয়ারের পেছনে ঝোলানো। মানুষটার পা সামনের দিকে আড়াআড়ি করে রাখা, হাতদুটো লুটোপুটি খাচ্ছে কোলের উপর।

তাকে নড়তে দেখে সামনে দিকে ঝুঁকে মুচকি হাসলেন ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড। "শুভ সকাল, ইউরি।"

আগের ঘটনা মনে পড়ল ইউরির, ট্রাঙ্কুলাইজার- গান থেকে গুলি করা হয়েছিল তাকে। শকের প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ফ্যালফ্যাল করে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন তিনি।

"নকশাবাজি ছাড়ো তো," তাচ্ছিল্যমাখা স্বরে বললেন ম্যাকব্রাইড। "অনেক কথা আছে তোমার সাথে।"

"ক...ক..." শুকনো জিহ্বায় কথা জড়িয়ে এল তার, গলায় কফ জমে আছে।

বিছানার পাশের টেবিল থেকে পানির গ্লাস মুখের সামনে ধরলেন ম্যাকব্রাইড। আপত্তির কোনও কারণ নেই, ইউরি চুমুক দিলেন গ্লাসে। কাজে দিল পানিটুকু, চলে গেল জিহ্বার আড়ষ্টতা।

"কী করছো তুমি এগুলো, ট্রেন্ট?" স্ট্র্যাপ থেকে হাত ছাড়ানোর জন্য ব্যর্থ ঝাঁকি দিলেন তিনি।

"শূন্যস্থান পূরণ," বলে বিছানার মাথার দিকে ইন্টারকম বাটন টিপলেন ম্যাকব্রাইড। "আগেও বলেছি, চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে তোমার রিসার্চ সম্পর্কে কিছু একটা লুকিয়েছো তুমি আমাদের কাছে থেকে।"

"কীভাবে বুঝলে তুমি?" কণ্ঠ শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ইউরি, কিন্তু তবুও কেঁপে উঠল গলা।

"সে যাই হোক...তোমার ঝেড়ে কাশার সময় হয়েছে এখন," বললেন ম্যাকব্রাইড। "আর তাছাড়া...আমরা তো সহকর্মী, তাই না?"

নিজের শরীরের দিকে তাকালেন ইউরি। দু'পায়ের আঙুল থেকে কোমর, হাতের আঙুল থেকে কাঁধপর্যন্ত, এমনকি বুকেও ছোট পয়সার আকৃতির কিছু কাপ আটকানো আছে। কাপগুলোর মাথায় আবার চিকন অ্যান্টেনার মতো কী যেন লাগানো। জিনিসগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করার আগেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল চিকন এক লোক। এক মুহূর্ত পর তার নাম মনে এল ইউরির, ড. জেমস চেন। ওয়াল্টার রীডে দেখা হয়েছিল উনার সাথে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামনে এগোলো লোকটা, হাতে একটা ল্যাপটপ। চেয়ারে বসে বিছানার পাশে টেবিলের উপর ল্যাপটপটা রেখে অন করল সে। স্ক্রিনে একটা মানুষের অবয়ব ভেসে উঠল, সারা গায়ে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছে। ওটা উনারই কাঠামো, বুঝতে পারলেন ইউরি।

"আমরা তৈরি।"

"ইলেকট্রোআকুপাংচার," শব্দটা উচ্চারণ করেই ইউরির গায়ে লাগানো কাপগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন ম্যাকব্রাইড। "শরীরের প্রতিটা অংশে মাইক্রোইলেকট্রোড ঢোকানো হয় এই প্রক্রিয়ায়। অবশ্য এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা, এটা ডক্টর চেন-এর সেক্টর। ইলেকট্রোআকুপাংচারে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছেন তিনি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের অজ্ঞান না করেই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব, যে কোনও ধরণের ব্যাথাকে উপশম করতে সক্ষম এটা। এই সাফল্যের কারণেই জেসন হতে পেরেছেন তিনি। আর তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদে কাজে লাগবে প্রক্রিয়াটা, এটা ভেবেই উনাকে এখানে ডেকেছি আমি।"

একটা কাপের মাথায় লাগানো অ্যান্টেনাতে স্পর্শ করলেন ম্যাকব্রাইড, সাথে সাথে যেন ছুরি ঢুকিয়ে দেয়া হলো জায়গাটায়। ব্যাথায় মুখ কুঁচকালেন ইউরি।

"অবশ্য আরেকটা ব্যাপার আছে, ইলেকট্রোআকুপাংচারের মাধ্যমে যেমন ব্যাথা কমানো যায়, তেমনিভাবে ব্যাথাকে বাড়ানোও যায়। অমানুষিক যন্ত্রণা দেয়া যায় ভিক্টিমকে।"

"ট্রেন্ট...না...প্লিজ," কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলেন ইউরি।

তার কথায় কান না দিয়ে ডক্টর চেনের দিকে তাকালেন ম্যাকব্রাইড। হাঁটুতে থাকা একটা কাপের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারপর কুঁচকির উপর থাকা আরেকটা।

মাউসপ্যাডে একটা রেখা আঁকলেন চেন। সাথে সাথে অমানুষিক যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলেন ইউরি, যেন কেউ একটা ছুরি ধরে টান দিচ্ছে তার হাঁটু থেকে কুঁচকির দিকে। একেবারে হাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে ছুরির ফলা। এক মুহূর্ত পরেই উধাও হয়ে গেল ব্যাথাটা।

খাবি খেতে খেতে পায়ের দিকে তাকালেন ইউরি; ভাবছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাঁটু। কিন্তু না, ফ্যাকাশে চামড়ায় কোনও ক্ষত চোখে পড়ল না।

সারা গায়ে লাগানো কাপগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন ম্যাকব্রাইড। "চাইলে তোমার শরীরের যে কোনও জায়গায় এভাবে ব্যাথা দিতে পারি আমরা। কেটে ফালাফালা করে দিতে পারি তোমার দেহ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না। পুরোটাই ভার্চুয়াল ব্যাপার স্যাপার। মজা না?"

"ক...কেন?"

মুচকি হাসলেন ম্যাকব্রাইড। "তাহলে লক্ষ্মী তোতাপাখির মতো বুলি আউরানো শুরু করে দাও। সবার আগে বাচ্চাগুলোর ব্যাপারেই শুরু করি। কি লুকাচ্ছিলে বলো।"

"কিছু লুকাইনি আমি..."

চেনের দিকে ফিরলেন ম্যাকব্রাইড।

"না!" চেঁচিয়ে উঠলেন ইউরি।

আবারও তার দিকে তাকালেন ম্যাকব্রাইড। "ইঁদুর-বেড়াল খেলা বন্ধ করো তো। তোমাদের দেয়া থিউরি অনুযায়ী ওই টিএমএস ডিভাইসগুলোর অনুলিপি তৈরি করতে পেরেছিলাম আমরা। কানাডাতে একজোড়া প্রতিবন্ধী বাচ্চার উপর পরীক্ষাও করেছিলাম, কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হয়নি।"

সাভিনা যতখানি আন্দাজ করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল আমেরিকানরা, ভাবলেন ইউরি।

"তার মানে," বলে চললেন ম্যাকব্রাইড। "আমাদের থেকে কিছু একটা লুকিয়েছো তোমরা। কী ওটা?"

নিশ্চুপ রইলেন ইউরি। বুকে ছুরির ঘা অনুভব করতেই লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। এতো জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে, গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরোলো না। অদৃশ্য ছুরির কাটাকুটি থেমে গেলেও কাঁপতে লাগলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী। দাঁতের কামড় লেগে কেটে গেছে ঠোঁট, জিহ্বায় রক্তের স্বাদ পেলেন। আর সহ্য করা সম্ভব না। কী ই বা হবে বলে দিলে? ভাবলেন তিনি। ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন সবকিছু জানলেও আমেরিকানদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না।

"ডিএনএ," অবশেষে গোপন রহস্য ফাঁস করে দিলেন ইউরি। "তাদের ডিএনএ।"

"বুঝিয়ে বলো," সামনে ঝুঁকে এলেন ম্যাকব্রাইড।

বড় করে শ্বাস নিলেন তিনি। "বাচ্চাগুলোর ডিএনএ-তেই লুকিয়ে আছে সব রহস্য।"

উনিশশো উনষাট সালে তাদের আবিষ্কার সম্পর্কে বলে চললেন ইউরি। কীভাবে জিপসিদের মাঝখান থেকে উদ্ভূত হওয়া জেনেটিক লাইন, শোভিহানিস- দের কব্জা করেছিলেন তারা। কীভাবে জেনেটিক ক্রস ঘটানোর মাধ্যমে বর্তমান সাবজেক্টগুলো পাওয়া গেছে, সব ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

"বাচ্চাগুলো প্রডিজি লেভেলের প্রতিভাধর ছিল। তাদের ক্ষমতাকে শুধু বাড়িয়ে গেছি আমরা। প্রথমে প্রজননের মাধ্যমে, আর তারপর বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে। তার কয়েক বছর পর আসল ক্ষমতার চাবিকাঠি ধরা পরে আমাদের হাতে। আমরা বুঝতে পারি কেন বিরল প্রতিভা প্রদর্শন করে বাচ্চাগুলো।"

আগ্রহী হয়ে ইউরির আরও কাছে ঘেঁসে এলেন ম্যাকব্রাইড।

"আসলে, প্রতিবন্ধিতার ছাপ বহন করে দশটা জীন। ওমেগা ক্লাস সাবজেক্টগুলোকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের ওই দশটা জীনের ভেতর সঠিক ক্রমান্বয়ে সাজানো তিনটা আলাদা জীন আছে। আর নিজেদের ওই সাজানো রূপ থাকলেই কেবল বিরল প্রতিভা প্রদর্শন করতে পারে জীনগুলো।"

"আর বায়োইঞ্জিনিইয়ারিং-এর মাধ্যমে সেই জীনগুলোকেই আরও উন্নত করেছো তোমরা, তাই তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ইউরি।

"চমৎকার... আসলেই চমৎকার। আর তোমাদের ওই ওমেগা সাবজেক্টগুলো একটাকেই আর্চিবাল্ডকে দিয়ে বাইরে বের করে এনেছি আমরা। অবশ্য এখনও পুরোপুরিভাবে হাতে আসেনি ও।"

"সাশা তোমাদের কাছে নেই?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ইউরি।

চেয়ারে হেলান দিলেন ম্যাকব্রাইড। "না। তবে মেয়েটা কাদের কাছে আছে, তা জানতে পেরেছি। আরও জানতে পেরেছি, আর্চিবাল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে একটা দলও নাকি পাঠিয়েছে ওরা। কিন্তু চিন্তা করো না, পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য যেন ওদের কোনও পা-ই অবশিষ্ট না থাকে, সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।"

"কাদের সাছে আছে সাশা?"

"জানতে চাও?" বাঁকাচোখে ইউরির দিকে তাকালেন ম্যাকব্রাইড। "ঠিক আছে। দেখাচ্ছি তোমাকে।"

চেনের দিকে ফিরলেন তিনি।

না!

আগুন জ্বলে উঠল ইউরির বুকে। এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে অগ্রসর হচ্ছে আগুনটা, কিছু একটা লেখা হচ্ছে যেন। অবর্ণনীয় ব্যাথাসহ ইউরির বুকে একটা অক্ষর ভেসে উঠল, একটা গ্রীক অক্ষর।

ব্যাথা ছাপিয়ে ম্যাকব্রাইডের কণ্ঠ কানে এল তার। "সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।"

দুপুর ২:০৪
আগ্রা, ভারত

আগে কখনও ভারতে আসেনি এলিজাবেথ। এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়া করা ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। জানালাগুলো বন্ধ থাকলেও বাইরের গরম বাতাস আসা ঠেকানো যাচ্ছে না। রিকশা আর বাইসেকেলের চাপে পড়ে শামুকের গতিতে সামনে এগোচ্ছে ট্যাক্সি, ভীড়ের মাঝে একটা উটও চোখে পড়ল।

ওদের ট্যাক্সির পাশ ঘেঁসে এগোচ্ছে আরেকটা ট্যাক্সি, ওটার ড্রাইভার হার না মানার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে ক্রমাগত হর্ন বাজিয়েই যাচ্ছে। সামনের রাস্তায় চিৎকার চেঁচামেচি আরও বেশি। কীসের যেন একটা শোভাযাত্রা হচ্ছে। ভীড়ের চাপে একটু ফাঁকা জায়গার জন্য তড়পাচ্ছে মোটরসাইকেল আর বাইসাইকেলগুলো।

এলিজাবেথের শ্বাস ভারি হয়ে এল, ধড়ফড় করতে লাগল বুক। গরমের জন্য নয়, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার কথা ভেবে। ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই ওর, কিন্তু তবুও মানুষের চেঁচামেচি, ইঞ্জিনের কম্পন, হর্নের আওয়াজ মাথার খুলির ভেতরে আঘাত করছে যেন।

অবশেষে জ্যামের মাঝে একটু ফুরসত মিলতেই গ্যাস পেডালে চাপ বাড়ালো ড্রাইভার, পৌঁছে গেল রাস্তার বাঁকে। এখান থেকে ভীড় কিছুটা কম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর গলা বেয়ে।

"অবশেষে," পাশে থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি, তার গলায়ও স্বস্তির ছাপ। "একটা ভ্যানগাড়ি ভাড়া করলেই ভালো হত, অন্তত তাড়াতাড়ি পৌছানো যেত।" গাদাগাদি করে বসলেও এলিজাবেথের গায়ে যেন চাপ না লাগে সে ব্যাপারে খেয়াল রেখেছে বিশালদেহী লোকটা, আর তা করতে গিয়ে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে বাকিদের।

তার অন্য পাশ থেকে জায়গার জন্য ক্রমাগত কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে চলেছে শে রোজারো, ঘামে ভিজে আছে মেয়েটার মুখ।

ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে পেছন ফিরল গ্রে। "আর দশ মিনিটের ভেতর হোটেলে পৌঁছে যাব আমরা।"

ট্যাক্সির পেছনের সারির সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে বসে আছে দলের সর্বশেষ সদস্য, লুকা হার্ন। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে লোকটা। বিমান থেকে নামার আগে দু'কব্জির ভেতরের দিকে দুটো ছুরি আটকে নিয়েছে জিপসি সর্দার।

সামনের রাস্তা যমুনা নদীর পাড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে, বাঁক নিলো ট্যাক্সি। আবারও আটকে গেল জ্যামে, তবে এবার মাত্র কয়েক মিনেটের জন্য। রাস্তার বামপাশে হ্রদ, বাগান আর গাছের সারি দেখা গেল। তবে সবার আগে নজর কেড়ে নিলো আকাশ ছুঁতে থাকা সাদা মেঘের মতো মার্বেল পাথরের একটা কাঠামো।

তাজ মহল।

তিনশো বছর আগে বানানো স্থাপত্যকলার এক অত্যাশ্চর্য্য নমুনা এটা। স্ত্রীর প্রতি সম্রাট শাহজাহান-এর ভালোবাসার অমূল্য নিদর্শন। তবে তাদের গন্তব্য তাজ মহল নয়।

রাস্তার পাশে একটা পাঁচতলা ভবনের সামনে এসে ব্রেক কষলো ট্যাক্সি ড্রাইভার, দীদার-এ-তাজ হোটেল। প্রতি তলায় রাজকীয় নকশা করা জানালা চোখে পড়ল। এখানেই ডক্টর হেইডেন মাস্টারসনের সাথে দেখা করার কথা ওদের।

গাড়ি থেকে নামতেই মুখ খুললো এলিজাবেথ, "রেস্টুরেন্টটা একেবারে উপর তলায়।" হাতঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা। ইতোমধ্যে আধাঘন্টা দেরি হয়ে গেছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। লবিতে একটা সুদৃশ্য ফোয়ারাকে পাশ কাটিয়ে ফ্রন্ট ডেস্কের দিকে এগোলো।

"কোয়ালস্কি, তুমি আর লুকা আমাদের রুমগুলোর দেখাশোনা করবে। আমরা উপরে রেস্টুরেন্টে মাস্টারসনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি," বলে এলিজাবেথ আর রোজারোর দিকে ইশারা করল গ্রে।

ও লিফটের দিকে এগোনো শুরু করতেই এলিজাবেথের দিকে এক পা এগোলো কোয়ালস্কি। "তুমি ঠিক আছো তো?"

"আমি?"

"ট্যাক্সিতে, আমি ভেবেছিলেম... তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছিলো," শ্রাগ করল বিশালদেহী লোকটা।

"বাদ দাও, একটু নার্ভাস ছিলাম।" জবাব দিল এলিজাবেথ।

"দেখ তোমার জন্য কী এনেছি," বলে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে কোটের এক প্রান্ত ফাঁক করে ধরল কোয়ালস্কি, যাতে ভেতরের পকেটে রাখা সিগার দুটো নজরে আসে ওর। "কিউবান, এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে।"

মুচকি হাসলো এলিজাবেথ। তবে কিছু বলার আগেই লিফট একে থামল, এগোনোর জন্য তাড়া দিল গ্রে।

কোট ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার উদ্দেশ্যে চোখ টিপলো কোয়ালস্কি। ততক্ষণে হাসিমাখা মুখ নিয়ে লিফটে গ্রে আর রোজারোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও।

টপ ফ্লোরের বাটন টিপে দিল গ্রে। "মাস্টারসনের ব্যাপারে আর কিছু জানা কি জরুরী আমাদের?" এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করল ও।

"শুধু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এর ব্যাপারে মুখ খুলো না।"

"ফুটবল টিম?"

"হ্যাঁ, শব্দদুটো শুনলেই চটে যাবেন তিনি। আরেকটা কথা, নিজে থেকে বলতে দেবে উনাকে। চাপ দিও না।"

খুলে গেল লিফটের দরজা। সামনে সাজানো গোছানো একটা রেস্টুরেন্ট, মশলার হালকা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো, আস্তে আস্তে ঘুরছে গোটা রেস্টুরেন্টটা। যার ফলে, এক জায়গায় বসেই পুরো শহর দেখা হয়ে যাবে, এমনকি তাজ মহলও।

জানালার পাশের একটা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন লম্বা গোছের এক লোক। হাত তুলে ইশারা করলেন তাদের দিকে। তারপর অন্য হাতে হাতঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন। মুচকি হেসে সবাইকে নিয়ে তার দিকে এগোলো এলিজাবেথ। কয়েকজন বেয়ারা তাদের উদ্দেশ্যে নড করল।

বেশ ক'বছর পর মাস্টারসনের সাথে দেখা হলো এলিজাবেথের। এখনও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছেন ডক্টর। পরনে ফর্মাল সাদা রঙের স্যুট। মাথার পানামা হ্যাট খুলে পাশের টেবিলে রেখে দিয়েছেন। আইভরি হাতলওয়ালা একটা লাঠিও দাঁড়িয়ে আছে টেবিলটার গায়ে হেলান দিয়ে।

মাথাভরা সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করে ছাঁটা, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে আছে মুখের ত্বক।

পরিচয় করিয়ে দিল এলিজাবেথ। শে রোজারো একটু বেশিই বিনয় দেখিয়ে ফেলল। তবে তার কোনও দরকার ছিল না। মেয়েদের প্রতি সবসময় একটু বেশি আগ্রহী মাস্টারসন, বিশেষ করে রোজারোর মতো দীর্ঘকায়া মেয়ের প্রতি।

বসার জন্য তাদের ইঙ্গিত করলেন মাস্টারসন। রোজারো তার পাশের চেয়ারটা দখল করল। বসতে বসতে তাজ মহলের দিকে ঘুরে গেল রেস্টুরেন্টের মুখ।

অত্যাশ্চর্য্য স্থাপনাটার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মাস্টারসন। "সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজের সমাধি। মৃত্যুর সময় শাহজাহানের কাছ থেকে চারটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন মমতাজ।" আঙুল তুলে গুনতে লাগলেন ডক্টর। "এক: তার জন্য বিশালাকায় সমাধি নির্মান; দুই: আবার বিয়ে করা... স্ত্রী তো এমন হওয়াই দরকার, কী বলেন? যাই হোক, তিন: ছেলেমেয়েদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার; আর চার: প্রতি বছর তার মৃত্যুর তারিখে কবর জিয়ারত। তাজ মহলে নিজের স্ত্রীর পাশে কবর দেয়ার আগপর্যন্ত কথাগুলোর মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন শাহজাহান।"

"একেই বলে সত্যিকারের ভালোবাসা," সমাধিশৌধটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রোজারো।

বলে চললেন মাস্টারসন, "আর এমন এক প্রেম কাহিনী তো রক্তের ছোঁয়া ছাড়া শেষ হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে যে, মহলের নির্মানকাজ শেষ হওয়ার পর সব

শ্রমিকদের হাত কেটে নেন শাহজাহান, যাতে তারা কখনও তাজ মহলের অনুলিপি তৈরী করতে না পারে।"

মাস্টারসনের অন্যপাশে বসে গ্রে ভাবছে কীভাবে প্রফেসরের প্রসঙ্গটা তুলবে। নিজের উপর এলিজাবেথের দৃষ্টি অনুভব করতে পারল ও।

চাপ দেয়া যাবে না তাকে।

এমন সময় হঠাত কাঁচে ফাটল ধরার শব্দের সাথে বিস্ফোরিত হলো মাস্টারসনের ডানপাশের কান, রক্ত ছিটকে গেল আশেপাশে।

ঘটনার আকস্মিকতায় নিজ জায়গায় জমে গেল এলিজাবেথ। একসাথে নড়ে উঠল গ্রে আর রোজারো। ডক্টরকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে নিজেও শরীর গড়িয়ে দিল রোজারো, অপরদিকে এলিজাবেথকে নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে গ্রে ও। মাস্টারসনের পেছনের কাঁচের দেয়ালে আরও কয়েকটা ফুটো দেখা গেল। ওদিকের কোন একটা বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে গুলি করছে স্নাইপার।

চেঁচিয়ে উঠল গ্রে, "উঠো না।"

গায়ে গুলি লাগায় লুটিয়ে পড়ল এক বেয়ারা, রক্ত গড়াতে লাগল মেঝের টাইলস বেয়ে।

"আমাদের এখানে আটকে রাখতে চাইছে স্নাইপার," মাস্টারসন আর এলিজাবেথ, দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলল গ্রে। "উঠতে দেবে না।"

কথাটার সারমর্ম বুঝতে পারল এলিজাবেথ। হাতের তালু আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো ও। বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, এক্ষুনি।

আরও হামলাকারী আসছে।

৯
৬ সেপ্টেম্বর, দুপুর ১:০১
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

ভালুকটা তেড়ে আসতেই পিওতরকে ধাক্কা দিয়ে নদী তীরে ফেলে দিল মঙ্ক। পড়ে থাকা ছোট ছোট ডালপালার উপর দিয়ে গড়িয়ে অগভীর পানিতে নেমে গেল ছেলেটা। একটা তীব্র ভয় জেঁকে ধরল ওকে, সাঁতার জানে না যে!

ভালুকের গর্জন ছাপিয়ে ওর চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

ওর বন্ধুরাও চেঁচিয়ে উঠল, কনস্টানটাইন আর কিস্কা।

হাচড়ে পাঁচড়ে পানি থেকে উঠে পড়ল পিওতর। একটা পাথরে লেগে কেটে গেছে কনুই, চিনচিনে ব্যাথা করছে জায়গাটা। পাশ ঘেঁসে বয়ে চলা স্রোতের দিকে তাকাল ও, পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। পানির দিকে তাকাতেই ভয়টা আরও ঘিরে ধরল ওকে।

বাদামী ভালুকটার আসার কোনও পূর্বাভাসই পায়নি সে। প্রাণিটার শান্ত, নিরুদ্বেগ মনকে ছাপিয়ে তার মাথায় তখন পেছনে ধাওয়া করে আসা ক্ষুধার্থ আর হিংস্র স্বত্বাগুলোর ব্যাপারে সতর্কবার্তা খেলা করছিল।

এখনও ভয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তবে পানির জন্য নয়... ভালুকের জন্যও নয়।

একটা বিম্ব খেলা করে বেড়াচ্ছে যেন পানিতে।

আসল বিপদ ভালুকটা নয়।

অন্য কিছু।

আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে এল দৃশ্যটা।

দুপুর ১:০২

ভালুকটা তেড়ে আসতেই হাতের একমাত্র অস্ত্র, ব্যাগটা উঁচু করল মঙ্ক। ইতোমধ্যে পিওতর আর বাকি দুটো বাচ্চাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ও। লাফ দিয়ে গাছের একটা নিচু শাখায় উঠে পড়েছে মার্তা, এগোচ্ছে পিওতরের দিকে।

মঙ্ক চিৎকার করে হাতের ব্যাগটা উপরে দোলাতে লাগল।

ছুটে আসছে ভালুকটা, কাছাকাছি আসতেই হাতের ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে চট করে একপাশে যরে যেতে চাইলো ও। তবে দেরি হয়ে গিয়েছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো বিপুল বেগে গায়ে আছড়ে পড়ল ভালুকটা। মঙ্কের হাত থেকে ছিটকে গেল ব্যাগ।

একটু দূরে দাঁড়ানো গাছের কাণ্ডে আছড়ে পড়ল মঙ্ক। ধাক্কার চোটে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে মুহূর্তেই। কোনওমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ও, কুংফু লড়ার ভঙ্গিতে হাত সামনে এনে মুখ আর মাথা আড়াল করল।

তবে ওর আর দিকে আর ফিরে তাকাল না ভালুকটা, ওদের পেছন ফেলে আসা পথের দিকে এগোতে লাগল।

মঙ্কও তাকাল সেদিকে। প্রায় চল্লিশ গজ দূর থেকে ছুটে আসা দুটো বিশাল দেহের কাঠামো নজরে এল। দুটো নেকড়ে, ক্রমাগত গজরাচ্ছে। চোখের পলকে ভালুকের থাবার এক চাপড় খেয়ে শূন্যে উঠে গেল একটা। ভালুকের গলা লক্ষ্য করে লাফ দিল অন্য নেকড়েটা, তবে কপালে জুটলো শুধু তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড়। মারাত্মকভাবে আহত হয়েও লড়তে লাগল ওটা।

নেকড়ে দুটোর কানের পেছনে স্টিলের টুকরোর দিকে চোখ গেল মঙ্কের। ভূগর্ভস্থ শহরের বাসিন্দা ওরা। পেছনে আরও থাকতে পারে, ভাবল সে। তাড়াতাড়ি

কনস্টানটাইন আর কিস্কা-কে দাঁড় করালো ও। মার্তাও এগিয়ে এল, পিঠে ঝুলে আছে পিওতর।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। "দৌড়াও।"

আবারও শুরু হলো পথচলা। পেছনে ধাওয়াকারীদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে ভালুকটা। এই সুযোগে, যতটুকু সম্ভব সরে যেতে হবে।

ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাল মঙ্ক, যুদ্ধ পুরোদমে চলছে। প্রবল আক্রোশে অন্ধ হয়ে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে ভালুকটা। সম্ভবত এটা নেকড়েগুলোর সাথে ওর প্রথম সাক্ষাৎ নয়। সৈন্যরা কী নেকড়ে নিয়ে ভালুক শিকার করতে আসতো কখনও সখনও? নাকি এটা শুধুই প্রকৃতির খেয়াল?

যাই হোক না কেন, এ যাত্রায় প্রানিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওদের।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কতক্ষণ সময় পেল ওরা?

দুপুর ২:২৮
আগ্রা, ভারত

দলের সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে গ্রে। স্নাইপারের মুহুর্মুহু গুলির কারণে মাথা উঁচু করা যাচ্ছে না।

ক্রল করে এগোতে এগোতে ফায়ার এক্সিট অর্থাৎ লিফটের পাশের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করল ও। কোনওভাবেই এখন লিফট ব্যবহার করা উচিত হবে না। আক্রমণকারী যে-ই হোক না কেন, সে অবশ্যই নিচের লবিতে লিফটের দিকে নজর রাখার জন্য আলাদা লোক রাখবে। আষ্টেপৃষ্টে ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে ওরা। এখন শুধু একটাই পথ খোলা আছে সামনে- সিঁড়ি বেয়ে নিচের লেভেলে নেমে যাওয়া। সবাই একত্রে জড়ো হয়ে পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা করা যাবে।

রেস্টুরেন্টের ঘূর্ণনের কারণে সিঁড়ির দিকে গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে। তবে এই ঘূর্ণনই জীবন বাঁচিয়েছে ড. মাস্টারসনের। খুলির পেছনে আঘাত হানতে যাওয়া গুলিটাকে কানের দিকে টেনে আনার পুরো কৃতিত্ব ওই ঘূর্ণনেরই।

বুড়ো লোকটাকের বাহবা দিতে হবে। তাৎক্ষণিক শক কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। কাপড়ের একটা টুকরা ক্ষতে ধরে আছেন এখন, রক্তে ভিজে জবজব করছে জিনিসটা। কীভাবে যেন পাশের টেবিল থেকে হ্যাটটাও তুলে নিয়েছেন, মাথার উপর শোভা পাচ্ছে ওটা। তার হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠিটা হাতে পাশেই আছে রোজারো।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে গ্রে আর এলিজাবেথ। "এদিকে," রোজারোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

একছুটে মাঝের দুরত্বটুকু পার হলো রোজারো, তারপর পিছলে দরজার একেবারে সামনে চলে এল। সেই সাথে হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, একটা সিগ

সাওয়ার সেমি অটোমেটিক। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল ও, কাঁধের ঠেলা দিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করল।

সাথে সাথে সিঁড়ি থেকে বুটের শব্দ ভেসে এল। গ্রে ও শুনতে পেয়েছে শব্দটা...অনেকগুলো বুটপরা পা উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

"সাত থেকে দশ," আন্দাজ করল রোজারো।

অনেক দেরি হয়ে গেছে।

"আটকে রাখো ওদের," বলে লিফটের দিকে এগোলো গ্রে। তার মনোভাব বুঝতে পেরে লিফটের কল বাটনে চাপ দিতে গেল এলিজাবেথ, কিন্তু আঙুল বাটনে স্পর্শ করার আগমুহূর্তে তাকে আটকালো গ্রে। বোতামের প্যানেলে জ্বলা বাতি বলে দিচ্ছে, এখনও নিচের লবিতেই আছে লিফটটা... নিশ্চয়ই নজরদারির আওতায়।

ওয়েটারদের সার্ভিস স্টেশন থেকে কয়েকটা টেবিলক্লথ আর একটা ছুরি তুলে নিলো গ্রে। লিফটের সামনে গিয়ে দরজার দুই পাল্লার ফাঁকে ছুরিটা ঢুকিয়ে মোচড়াতে শুরু করল। পাল্লাদুটো একটু ফাঁক হতেই আঙুল ঢুকিয়ে টান শুরু করল এবার। ধীরে ধীরে পুরোপুরি খুলে গেল দরজাটা।

ওদিকে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে গুলি পাঠাচ্ছে রোজারো, চেষ্টা করছে বুট পরা আক্রমনকারীদের আটকে রাখতে। নিচ থেকে পাল্টা গুলি করছে ওরাও। তবে উপরে থাকার কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে সিগমার এজেন্ট। গ্রে'র জানা নেই কতক্ষণ এভাবে আটকানো যাবে ওদের, একবার উপরে উঠে এলেই রোজারোর কিচ্ছা খতম।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

খোলা দরজার ফাঁকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন দুটো কেবল দেখা যাচ্ছে, সেই সাথে একটা সার্ভিস ল্যাডার। তবে বেয়ে নামার মতো সময় হাতে নেই আর।

হাতের টেবিলক্লথগুলো এলিজাবেথ আর মাস্টারসনের দিকে এগিয়ে দিল গ্রে। কীভাবে কাপড়গুলো হাতে প্যাঁচাতে হবে তাও দেখিয়ে দিল ও। "ঘাবড়ানোর কিছু নেই," বলে কেবলগুলোর দিকে ইশারা করল। "শক্ত করে কেবল ধরে পিছলে নামবেন শুধু। আর ব্রেক করার জন্য জুতোজোড়া তো আছেই। তবে নিচে নামার সময় যেন শব্দ না হয়, সেটা মাথায় রাখবেন। আমরাও পেছনেই আছি।"

এলিজাবেথের চোখে মৃদু ভয় খেল দেখল গ্রে। তবে পরমুহূর্তেই গুলির আওয়াজে জড়তাটুকু কেটে গেল মেয়েটার। কাপড় প্যাঁচানো হাতে কেবল ধরে ঝুলে পড়ল ও, অস্ফুট চিৎকার করে নেমে গেল কেবল বেয়ে। মাস্টারসনও তার পিছু নিলেন। বেল্টে ঝুলছে তার সেই বিখ্যাত হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠি, যেন কোনও সম্রাটের কোমরে ঝুলতে থাকা তরবারি ওটা।

"যাও," গ্রে'র উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল রোজারো, পরমুহূর্তেই ঘুরে সিঁড়ির দিকে দুটো গুলি পাঠালো। "আমি তোমার পেছনে আসছি।"

"লিফটের হ্যাচ..."

"যাও, পিয়ার্স!"

গ্রে খুব ভালো করেই জানে, মেয়েদের সাথে তর্ক করার পরিণতি খুব একটা ভালো হয় না। আর এক্ষেত্রে মেয়ের হাতে বন্দুকও আছে। কথা না বাড়িয়ে কেবল ধরে ঝুলে পড়ল ও, শুরু হয়েছে পতন। খানিকটা নামতেই দরজার মুখে রোজারোকে দেখা গেল। সার্ভিস ল্যাডার, অর্থাৎ মইতে দাঁড়িয়ে খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। কেবলের কেঁপে ওঠায় গ্রে বুঝতে পারল, মেয়েটাও ঝুলে পড়েছে ইতিমধ্যে।

লিফটের প্রতি ফ্লোরের দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে, সেই আলোতে তলা গুনতে গুনতে নেমে চলেছে গ্রে। নিচে আবছাভাবে লিফটের ছাদ দেখা যাচ্ছে, উপরে এক কোনায় দুটো অবয়ব। হঠাত ছোট একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল একজনের হাতে, এলিজাবেথের সিগারেট লাইটার।

কাছাকাছি পৌঁছে জুতোজোড়া কেবলের গায়ে চেপে ধরে পতনের গতি শ্লথ করল ও। তারপর আস্তে করে এসে নামলো লিফটের ছাদে। এক মুহূর্ত পর রোজারোও তার সাথে যোগ দিল।

এক হাতে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে অন্যহাতে লিফটের ছাদের সার্ভিস হ্যাচ খুলে ফেলল গ্রে। ভেতরটা খালি, দরজাও বন্ধ। বাকিদের উপরেই থাকতে বলে হ্যাচের ছিদ্র গলে নিজে নেমে এল লিফটের ভেতর। বাইরের লবি থেকে লোকজনের চেঁচামেচি কানে আসছে। পিস্তল উঁচু করে ধরে দরজা খোলার বাটন টিপে দিল ও।

যা আছে কপালে।

বাইরের কোলাহল হয়তো রক্ষা করবে ওদের।

দরজাটা যথেষ্ট ফাঁক হতেই বেরিয়ে এল গ্রে, বেরিয়ে সাথে সাথে বামদিকে ঘুরে গেল। একটা পাম গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। সাময়িক আড়াল দিল ওকে জিনিসটা।

লবি লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। চাপ সামাল দিতে হিন্দি আর ইংরেজী, দুই ভাষাতেই চেঁচিয়ে চলেছে কর্তৃপক্ষ।

একটু সামনে দুজন লোক নজরে পড়ল গ্রে'র। আশেপাশের আতংকিত মানুষজনের তুলনায় ওরা একটু বেশিই শান্ত। এই গরমেও পরনে জ্যাকেট, হাতদুটো পকেটে ঢোকানো। ও বাবা! কানে আবার এয়ারফোনও লাগিয়েছে। এতেই যা বোঝার, বোঝা হয়ে গেছে ওর।

লোকদুটোও গ্রে-কে দেখে ফেলেছে। কিন্তু হঠাৎ ওর এই প্রত্যাবর্তন খানিকটা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওদের। সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল ও।

পামগাছের পাতার ফাঁকে পিস্তলটা লক্ষ্যের দিকে তাক করাই ছিল, মাথায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল একজন। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অন্যজনের দিকে দুটো গুলি পাঠালো গ্রে। জানে, এবার নিশানা অতটা স্থির করা নেই। একটা গুলি কাঁধে আঘাত হানতে আধপাক ঘুরে গেল লোকটা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে মুখ গুঁজেছে অন্য গুলিটা।

তবে গুলি খেয়েও থেমে নেই হামলাকারী, পকেটে হাত ঢোকানো অবস্থাতেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে সেও। কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে মেঝেতে গড়িয়ে দিয়েছে গ্রে। পেছনের দেয়ালে চুমু খেলো বুলেট। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই লক্ষ্য স্থির করে আবারও গুলি করল গ্রে। এবার আর মিস হয়নি, আক্রমণকারীর গোড়ালি গুঁড়িয়ে দিয়েছে বুলেট। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। দড়াম করে থুতনি সামনে দিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে, আর নড়লো না।

আচমকা গোলাগুলি শুরু হওয়াতে থমকে গিয়েছিল লবির চিৎকাররত লোকজন। এখন যে যেদিকে পারে দৌড় শুরু করল।

লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে সেদিকে এগোলো গ্রে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওর হাত ছোবল মারলো বাটন প্যানেলে। তবে কাজের কাজ কিছু হলো না।

হবেই বা কীভাবে? উপর থেকে কল বাটন চেপেছে কেউ। ততক্ষণে সেদিকে রওনা হয়ে গেছে লিফট।

উপরে...রেস্টুরেন্টে ওঁত পেতে থাকা আততায়ীর উদ্দেশ্যে।

লিফটের ছাদে দাঁড়িয়ে কপিকল রিলিজ হতে দেখল এলিজাবেথ। মৃদু ঝাঁকি খেয়ে তাদেরকে নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে কাঠামোটা।

"ধুশ শালা," পাশ থেকে বলে উঠল রোজারো।

"কী করবো এখন?" এলিজাবেথের গলায় ভয়ের সুর। এখনও হাতে লাইটার জ্বালিয়ে ধরে রেখেছে, হতাশায় কাঁপতে থাকা হাতের সাথে পাল্লা দিয়ে কাঁপছে আলোকরশ্মি।

"এখানেই থাকো," বলে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল রোজারো। "অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, কোনও শব্দ করবে না।"

সার্ভিস হ্যাচ খুলে নীচে নেমে গেল মেয়েটা। তারপর ফিসিফিস করে বলল, "হ্যাচটা লাগিয়ে দাও, তবে লক করো না।"

সায় দিয়ে হ্যাচটা লাগিয়ে দিল এলিজাবেথ, তবে কথামতো অল্প একটু ফাঁক রাখতে ভুললো না। ফাঁকটা দিয়ে দেখা তার শেষ দৃশ্য হলো, লিফটের একপাশে দাঁড়িয়ে হাতের অস্ত্র উঁচু করে ধরে আছে রোজারো।

অভিশাপ দিতে দিতে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলেছে গ্রে। কয়েকজন লোক মাথা নিচু করে বসে আছে সিঁড়িতে, ধাক্কা খেতে খেতে তাদের কোনওমতে পাশ কাটালো ও। একসাথে তিনটা করে সিঁড়ি টপকাচ্ছে। লিফটের আগেই উপরতলায় পৌঁছে কল বাটন চাপতে পারলেই শুধু থামানো যাবে ওটাকে।

দ্বিতীয় তলায় পৌঁছতে পৌঁছতে মিস হয়ে গেল লিফট। পড়িমড়ি করে আবারও সিঁড়ি ভাঙতে লাগল গ্রে।

উপর থেকে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। মনে হয়, নিচের দিকে রওনা হয়ে গেছে হামলাকারীরা। তৃতীয়তলায় লিফটের সামনে পৌঁছতেই ধুপ করে একটা দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেলো ও। অবশ্য, মানুষরূপী রক্তমাংসের দেয়াল ওটা।

কোয়ালস্কি দাঁড়িয়ে আছে লিফটের দরজার সামনে, বাটনে চেপে রেখেছে আঙুল।

"গ্রে!," পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল ও। "চোখে দেখ না নাকি মিয়া?"

সাথে সাথে খুলে গেল লিফটের দরজা।

তীরবেগে বেরিয়ে এল রোজারো, হাতের পিস্তল কোয়ালস্কির দিকে তাক করা।

"ওরে বাপ," বলে এক পা পিছিয়ে গেল বিশালদেহী লোকটা।

"তুমি লিফটের বাটন চেপেছো?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"হ্যাঁ। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে দেখতে চাচ্ছিলাম, কী খাচ্ছো তোমরা।"

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো গ্রের। বুঝতে পারছে না, কোয়ালস্কির সবচেয়ে বড় সম্পদ কোনটা- আলসেমি নাকি নির্বুদ্ধিতা।

"বের হও সবাই," পরক্ষনেই চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

ততক্ষণে কাজে লেগে গিয়েছে রোজারো, একে একে এলিজাবেথ আর মাস্টারসনকে নামিয়ে আনলো উপর থেকে। সবাইকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো গ্রে।

"ওদেরকে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি আমি, কোনও ব্রিটিশ টান ছিল না। তার মানে, আমেরিকান," সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল রোজারো।

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। আমেরিকান হিস্টোরি মিউজিয়ামে দেখা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ব্যাজ পরা লোকটার কথা মনে পড়ল ওর। ওরা যে এখানে আছে, তা কোনওভাবে জানতে পেরেছেন তিনি।

খাঁ খাঁ করছে লবি, কোনও লোক নেই আর। সামনে খোলা দরজার দিকে এগোনোর ইঙ্গিত করল গ্রে। তবে সাথে সাথে এম ফোর কারবাইন অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে একটা লোক উদয় হলো দরজার সামনে, কাঁধে স্নাইপার স্কোপ লাগানো আরেকটা লম্বা ব্যারেলের এম টুয়েন্টি ফোর রাইফেল।

এ-ই তাহলে রেস্টুরেন্টে হামলা করা সেই স্নাইপার।

হাতের অস্ত্রটা মাস্টারসনের নাম বরাবর তাক করে রেখেছে লোকটা। এতো কাছে থেকে মিস করার প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু হঠাৎ করেই লোকটার মাথা পেছনদিকে হেলে গেল। দড়িছেঁড়া পুতুলের মতো হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল সে, এক সেকেন্ড পর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনের মেঝেতে। পেছনে খুলির গোড়া থেকে একটা ছুরির হাতল উঁকি দিচ্ছে।

লোকটার পেছন বরাবর নাচতে থাকা ফোয়ারার পাশে লুকাকে দেখা গেল। হাতে আরেকটা ছুরি, ছোঁড়ার জন্য তৈরি। মৃত স্নাইপারের রাইফেল লাথি মেরে সরিয়ে দিল গ্রে, কোয়ালস্কি উঠিয়ে নিলো অস্ত্রটা। হাতের ছুরিটা দোলাতে দোলাতে সামনে এসে দাঁড়াল জিপসিসর্দার।

"ধন্যবাদ," বলে উঠল গ্রে।

"বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম আমি, তখনই গুলির শব্দ শুনতে পাই," কোর্টইয়ার্ডেরদিকে ইশারা করে বলতে লাগল লুকা। "গুলির শব্দের উৎস আঁচ করতে পেরে রাস্তার ওপাশের বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম আমি, তখনই দেখি এই ব্যাটা নেমে আসছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে অনুসরণ করে গেছি শুধু।"

খুশি হয়ে ওর কাঁধ চাপড়ে দিল গ্রে। লোকটা সবার জীবন বাঁচিয়েছে। তারপর দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ও। "বেরোও সবাই, এক্ষুনি এই শহর ছেড়ে পালাতে হবে...তাড়াতাড়ি"

"তাড়াতাড়ি করাটাই যে সমস্যা," দরজার পাশ থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি। বাইরের দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ও, কোটের ভেতরে স্নাইপারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা রাইফেলটা অর্ধেক লুকানো।

সামনে এগিয়ে রাস্তার দিকে চোখ বুলালো গ্রে। ট্যাক্সি, রিকশা, ট্রাক ইত্যাদিতে ছেয়ে আছে সবদিকের রাস্তা।

নড়ছে না একটা গাড়িও, জ্যাম।

সামনে থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা গেল, সেই সাথে লোকজনের চেঁচামেচি তো আছেই। একটা শোভাযাত্রা চলেছে, তার হই-হুল্লোরের শব্দেই ঢাকা পড়ে গিয়েছে হোটেলের গোলাগুলি। তবে পুরোপুরিভাবে নয়।

কোলাহল ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ কানে এল গ্রের। পুলিশে খবর দিয়েছে কেউ। লবির দিক থেকেও কথা শোনা গেল, হামলাকারীরা নিচে নেমে এসেছে সম্ভবত।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রোজারো, "কী করবো এখন..."

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল বাকি কথা। বাইরের দিকে ঘুরলো গ্রে। বামপাশে কয়েক ব্লক দূরে তিনটা মোটরসাইকেল, লোকজনের গায়ের উপর দিয়ে উঠে আসছে প্রায়। হোটেলের দিকেই এগোচ্ছে ওরা। প্রতিটায় দুজন করে আরোহী, পেছন বসা প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

আরও হামলাকারী আসছে।

সবাইকে পাশের সরু গলির দিকে ঠেলে দিল গ্রে। এখন আর সরাসরি নজরে পড়বে না। তারপর মাস্টারসনের মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে নিলো ও। "কোটটাও দিন," হ্যাটটা নিজের মাথায় বসাতে বসাতে বলল গ্রে।

"কী করতে চাচ্ছেন আপনি, জনাব?" গা থেকে কোট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন মাস্টারসন।

"স্নাইপার আপনাকেই আগে টার্গেট করেছিল, ডক্টর। তার মানে, ওদের প্রধান লক্ষ্য আপনিই।"

"পিয়ার্স," সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ওকে ডাক দিল রোজারো।

"ওদেরকে ঘোল খাওয়াতে চলেছি আমি," বলে সামনের ভিড়ভাট্টা ভরা রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল ও। "তুমি বাকিদের নিয়ে এই সরু গলি ধরে সরে পড়ো। আসার সময় দেখা দুর্গটার কাছে আবার জড়ো হব আমরা।"

প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছে রোজারো, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আমি তোমার সাথে আসছি," পাশ থেকে এগিয়ে এসে কোটের নিচে লুকানো অস্ত্রের দিকে ইশারা করল কোয়ালস্কি। "ব্যাকআপ দরকার হবে তোমার।"

সায় দিল রোজারো। "সেই ভালো। নিয়ে যাও ওকে।"

তর্ক করার সময় নেই আর। লোকটা সাথে থাকলে ভালোই হবে, ভাবল গ্রে। "চলো।"

"মি.পিয়ার্স!"

ডাক শুনে পেছনে ফিরতেই মাস্টারসন হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে দিলেন, লুফে নিলো গ্রে। ছদ্মবেশ পুরো হয়েছে এবার।

"তবে দেখবেন, যেন না হারায়। হাতির দাঁতের হাতলটা আঠারো শতকের।"

ততক্ষণে কোয়ালস্কিকে সাথে নিয়ে সামনের রাস্তার দিকে ছুট লাগিয়েছে গ্রে, লাঠি নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে যাচ্ছে অবিরাম। "বাঁচাও... মেরে ফেলল আমাকে!"

থেমে থাকা গাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে চলেছে গ্রে। মোটরসাইকেলগুলো হোটেলের সামনে পৌঁছুতেই চালকরা দেখতে পেল তাকে। তারপর সামনে বাড়লো, লক্ষ্য- মাস্টারসনের ছদ্মবেশধারী গ্রে।।

"টোপ গিলেছে শালারা," বলে উঠল কোয়ালস্কি।

সকাল ৬:৩৩
ওয়াশিংটন ডি.সি.

দরজায় নক হওয়ার শব্দে সম্বিত ফিরল পেইন্টারের। চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন তিনি। কনুই টেবিলের উপর, চোখের সামনে লিসা আর ম্যালকমের পাঠানো নোট আর টেস্ট রিপোর্টের স্তূপ। ক্যাটকেও মেডিক্যাল সেকশনের একটা খালি বেডে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

টেবিলের নিচের বাটন চাপতেই খুলে গেল দরজা। লিসা অথবা ম্যালকম এসেছে সম্ভবত, ভাবলেন পেইন্টার। তবে আগন্তুককে দেখে বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। লম্বা গড়নের, চওড়া কাঁধওয়ালা এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন ঘরে, পরনে নীল স্যুট। বয়সের ভারে ফ্যাকাশে ধূসর হয়ে এসেছে পরিপাটি করে আঁচড়ানো লাল চুল।

"শেন?"

শেন ম্যাকনাইট, ডারপার ডিরেক্টর হওয়ার পাশাপাশি তিনি পেইন্টারের ইমিডিয়েট বস। তিনিই প্রায় এক দশক আগে পেইন্টারকে সিগমায় নিয়োগ দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য শেন নিজেই পেইন্টারের বর্তমান চেয়ারে বসতেন। সিগমা

বলতে গেলে তার হাতেই গড়া। তবে সিনিয়র-জুনিয়রের চেয়েও পেইন্টার আর শেনের সম্পর্ক আরও গাঢ়, আর তা হলো বন্ধুত্ব।

পেইন্টারকে নিজের চেয়ারে বসে পোড়তে ইশারা করলেন তিনি।

"ওঠার কোনও দরকার নেই হে," বললেন শেন। "আমি ফের তোমার ওই চেয়ারে বসতে আসিনি।"

হাসলেন পেইন্টার। "কার কাছে যেন শুনলাম, শেন, আপনার কাজও খুব একটা সহজ নয়।"

"না, অন্তত আজকের কাজটা তো নয়ই।" টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন শেন। "কমান্ডার পিয়ার্সের দেখা মিউজিয়ামের বাইরের লোকটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি আমি। ম্যাপলথোর্প, জন ম্যাপলথোর্প।"

"তার মানে ওটা ভুয়া আইডি ছিল না?"

"আরে নাহ। ম্যাপলথোর্প পদমর্যাদার হিসেবে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একজন ডিভিশন চীফ। রাশিয়ান ফেডারেশন আর তৎসংলগ্ন এলাকার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন উনি।"

প্রফেসর পোকের তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য স্থানের কথা মনে পড়ল পেইন্টারের, চেরনোবিল। রাশিয়ায় অবস্থিত জায়গাটা। এসবের সাথে ম্যাপলথোর্পের কোনো সম্পর্ক না থেকেই পারে না।

"বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ভেতর ম্যাপলথোর্পের অনেক খাতিরের লোক আছে," বলে চলেছেন শেন। "আর এমনিতেও কূটকৌশল এবং নির্মমতার ব্যাপারে দক্ষ লোকটা। ওয়াশিংটনেও উপরের লেভেলে হাত আছে ওর।"

"এসবের সাথে তার সম্পর্ক কী?"

"তোমার পাঠানো রিপোর্টগুলো পড়েছি আমি। প্রজেক্ট স্টারগেট সম্পর্কে তো জানোই, নব্বই এর দশকের মাঝামাঝির দিকে বন্ধ হয়ে যায় ওটা।"

"তবে আসলে বন্ধ হয়নি," বললেন পেইন্টার। "গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা পড়ার সময় ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির আওতায় চলে যায় ওটা।"

"ঠিক তাই। ম্যাপলথোর্পের কর্তৃত্বে ছেড়ে দেয়া হয় গোটা প্রজেক্টকে। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে প্রজেক্ট স্টারগেটের রাশিয়ান ভার্সন পরিচালনা করা দুজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী তার কথা প্রস্তাব করেন। খরচের দিক সামাল দিতে না পেরে আমাদের সাহায্য চায় রাশিয়ানরা। সীমাহীন শত্রুতার এই নতুন বিশ্বে, লাভের গুড়ে ভাগ বসানোর আশায় আমরাও রাজি হয়ে যাই তাদের প্রস্তাবে। তখনই কয়েকজন জেসনকে রাশিয়ানদের সাথে প্রজেক্টে কাজ করতে অনুমতি দেয়া হয়। তারপরই গোপনীয়তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয় গোটা প্রক্রিয়াটা। মাত্র হাতেগোনা কয়েকজনই জানতেন যে, সচল আছে প্রজেক্ট স্টারগেট।"

"যতক্ষণ না আর্চিবাল্ড এসে কড়া নাড়েন আমাদের দরজায়," যোগ করলেন পেইন্টার।

"মনে হয়, ওদের কুকীর্তি ফাঁস করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।"

"বিজ্ঞানের নামে চালিয়ে যাওয়া নৃশংসতা রুখে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রফেসর।"

"উঁহু। বিজ্ঞানের নামে নয়, জাতীয় নিরাপত্তার নামে," সংশোধন করলেন শেন। "মাথায় রেখো, জাতীয় নিরাপত্তাই হলো সেই তেল, যা সচল রেখেছে ওয়াশিংটনের চাকা। ম্যাপলথোর্পকে খাটো করে দেখ না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বর্তমান জায়গায় এসেছে সে।"

"মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার।"

বলে চলেছেন শেন, "সিআইএ, এফবিআই, এনএসএ, এনআরও, ওএনআই... প্রত্যেকটা এজেন্সিকে তোমাদের ওই খুলির পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে লোকটা। মনে হয় না, আর বেশিক্ষণ আমি ব্যাপারটা হাতের মুঠোয় রাখতে পারব। একেবারে তোমাদের দোরগোড়ায় এসে গুলি খেয়েছে আর্চিবাল্ড। সিগমা, জেসন উভয়ের সাথেই সম্পর্ক ছিল ওর। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে বেশিক্ষণ লাগবে না ওদের।"

"তাহলে, আপনার পরামর্শ কী?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

"ধীরে ধীরে বৃত্ত ছোট করে আনছে নেকড়েরা। আমার মতে, খুলিটা দিয়ে এখন একটা চাল চালা যেতে পারে। অন্য একটা এজেন্সির মাধ্যমে খুলিটা ওদের হাতে পৌঁছে দিতে পারব আমি। এতে করে ঘটনাটার সাথে সিগমার সম্পর্কের ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া যাবে।"

ভ্রূ কুঁচকে শেনের দিকে তাকালের পেইন্টার।

তবে সেদিকে নজর নেই শেনের। বলে চলেছেন তিনি, "তবে এতে করে শুধুমাত্র আর একবেলা মেয়েটাকে হাতে রাখার সময় বের করা যাবে। গ্রে আর তার দল যদি সেই সময়ের ভেতর কোনও সমাধান বের করতে না পারে তাহলে, মেয়েটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

"তা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না, শেন।"

"আর কোনও উপায়ও তো নেই।"

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। "চলুন, মেয়েটাকে দেখাই আপনাকে। দেখুন, ওর কী হাল করেছে হারামিগুলো। তারপর বলুন, কীভাবে আবার ম্যাপলথোর্পের হাতে ছেড়ে দেব আমি বাচ্চাটাকে।"

শেনও উঠে দাঁড়ালেন। পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে কখনও ভয় পান না তিনি। এজন্যই পেইন্টার আরও পছন্দ করেন তাকে। "চলো, হ্যালো বলে আসি ওকে।"

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তারা। গন্তব্য- দুই লেভেল নিচের মেডিকেল এরিয়া। নিচে পৌঁছতেই মেয়েটার ঘরের দরজার সামনে ক্যাট আর লিসাকে আবিষ্কার করলেন পেইন্টার। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কাটকে। জানেন, বাচ্চাটাকে মঙ্কের ছবি আঁকতে দেখার পর থেকেই মনমরা হয়ে আছে ও। তবে কষ্টটা কাটিয়ে উঠেছে সাথে সাথেই। ওয়ালেট খুলে বাচ্চাটাকে ওর মেয়ে, পেনেলোপের ছবি দেখাচ্ছিলো ক্যাট। ভেবেছিল, আরেকটা বাচ্চার ছবি দেখে কিছুটা শান্ত হবে মেয়েটা। ওখানে

মঙ্কের ছবিও ছিল। তবে ক্যাট নিশ্চিত, ওই ছবি চোখে পড়েনি মেয়েটার। তাহলে কীভাবে মঙ্কের ছবি আঁকলো ও?

অদ্ভুত শোনালেও আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে ব্যাপারটার- ক্যাটের মাথা অর্থাৎ চিন্তাধারা থেকে কোনওভাবে মঙ্কের চেহারা আন্দাজ করতে পেরেছে ও।

যাই হোক, তবে আসল কথা হচ্ছে, শান্ত হয়ে গিয়েছিল ক্যাট। রাজি হয়েছিল একটু ঘুমিয়ে নিতে। আর হবে নাই না কেন, ক্লান্তির একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল ও।

ওদেরকে দেখে তাড়াতাড়ি হল ধরে এগিয়ে এল ক্যাট।

"ডিরেক্টর, আপনাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম আমরা। মেয়েটার জ্বর বাড়ছে। এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে। লিসার ধারণা...মারা যাচ্ছে ও।"

দুপুর ২:৩৫
আগ্রা, ভারত

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে গ্রে। যত সামনে যাচ্ছে, ভিড় আর চেঁচামেচি ততো বাড়ছে। একেবারে প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা, গাড়ি-ঘোড়া আস্তে আস্তে পাশ্ববর্তী বিকল্প পথে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে সেদিকেও এগোবার পথ নেই, জ্যাম আটকে রেখেছে সব রাস্তাঘাট।

গাড়ির হর্ণ, সাইকেলের টুংটাং, লোকজনের চিৎকার-সব মিলিয়ে এক এলাহী কাণ্ড।

পেছনে মোটরসাইকেলগুলোও একই সমস্যায় ভুগছে, এগোতে পারছে না আর। তবুও নিচু হয়ে রইল গ্রে, অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না।

কাছে ঘেঁসে এল কোয়ালস্কি। "ব্যাটারা দেখি নেমে পড়ছে পক্ষীরাজ থেকে।"

পেছনে তাকাল গ্রে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে মোটরসাইকেলগুলো। পেছনে বসা তিন আরোহী নেমে হাঁটা শুরু করেছে, খুঁজছে মাস্টারসনের রূপধারী গ্রে-কে। দুজন রাস্তার দুপাশে, আর একজন সরাসরি মাঝ বরাবর এগোচ্ছে।

লে হালুয়া...তিন ঝামেলা এখন বেড়ে ছয়ের রূপ নিয়েছে।

চট করে বুদ্ধি খেলে গেল গ্রের মাথায়। আলাদা হয়ে যেতে হবে এখন ওদের দুজনকে। পরবর্তী সাক্ষাতের জায়গা কোয়ালস্কিকে জানিয়ে দিল ও। "আমি উঁচু রাস্তা ধরে এগোব, তুমি নিচ দিয়ে।"

"কেন? আমি নিচ দিয়ে যাব কেন?" জিজ্ঞেস করল বিশালদেহী লোকটা।

"কারণ, আমিই ছদ্মবেশ ধরে আছি, হাঁদারাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কোয়ালস্কি, এতোক্ষণে প্ল্যানটা মাথায় ঢুকেছে। নিচু হয়ে গেল ও, আশেপাশের লোকজনের মাঝে যেন ওকে দেখা না যায়, সেই চেষ্টা করছে। তারপর গুঁড়ি মেরে রওনা হয়ে হয়ে গেল পেছনের হোটেলের দিকে।

অন্যদিকে মাথার পানামা হ্যাটটা একহাতে ধরে, সামনে থাকা ট্যাক্সির ছাদে লাফিয়ে উঠল গ্রে। তারপর গাড়ির ছাদের উপর দিয়েই রওনা হলো শোভাযাত্রার কেন্দ্রের দিকে। একের পর এক ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, ট্রাকের ছাদ বেয়ে এগিয়ে চলল ও। পায়ের চাপে দেবে যাচ্ছে কোনও কোনও ট্যাক্সির হালকা ছাদ, চেঁচাচ্ছে লোকজন। তবে এখন সেগুলোর দিকে নজর দেয়ার সময় নেই। নিচে ভিড়ের চেয়ে এভাবে উপর দিয়েই তাড়াতাড়ি এগোনো যাচ্ছে।

পেছনে তাকাল গ্রে। যা ভেবেছিল তাই, তাকে দেখতে পেয়েছে ধাওয়াকারীরা। হাচড়ে পাচড়ে এগিয়ে আছে ওর দিকে। তবে স্বস্তিদায়ক ব্যাপার হলো, এতো মানুষের মাঝে নিশ্চিত না হয়ে গুলি করতে চাচ্ছে না ব্যাটারা।

নিচু হয়ে মাস্টারসনের লাঠির সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে এগিয়ে চলল গ্রে, তিন আরোহীকে তাদের মোটোরসাইকেলে বসা সঙ্গীদের থেকে যথাসম্ভব দূরে নিয়ে যেতে হবে।

একটা ভ্যানের ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল গ্রে, পেছনে গভীর জনসমুদ্র। তবে একটু আগের সাথে এখনকার পরিস্থিতির পার্থক্য হলো, এখন সেই সমুদ্রে নতুন একটা হাঙর জুটে গিয়েছে। কোয়ালস্কিকে কোথাও দেখা না গেলেও, ওর কীর্তি দেখা গেল। একটা ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সবার সামনে থাকা মোটরসাইকেলটা। হঠাৎ দড়িছেঁড়া পুতুলের মতো নাচতে লাগল ওটার আরোহী। হালকা পপ-পপ-পপ শব্দ কানে এল গ্রে'র, যেন শোভাযাত্রায় পটকা ফাটাচ্ছে কেউ। তবে সে ভালোভাবেই জানে, আওয়াজটা কীসের। প্ল্যানটা কাজে লেগেছে।

জনসমুদ্রে ডুবে গেল মোটরসাইকেল আর তার আরোহী দুটোই।

লুকিয়ে আছে কোয়ালস্কি। শিকারীদের চোখ গ্রে'র উপর থাকায়, ওর পক্ষে পিছিয়ে গিয়ে ওঁত পেতে থাকতে কোনো সমস্যাই হয়নি। তারপর, একজনকে সামনে পেয়েই চুরি করা এম ফোর কারবাইনটা দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে ব্যাটার।

তবে খেলা এখনও শেষ হয়নি।

কোয়ালস্কিকে তার কাজ সারতে দিয়ে নিজের কাজে মন দিল গ্রে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কোলাহল আরও বাড়ছে। এতোক্ষণে বুঝতে পারল ও, আজ জন্মাষ্টমী- হিন্দু দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। তারই উৎসব পালন করছে লোকজন।

সাজগোজ করা কিছু লোক নজরে এল, ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী নাচ নাচছে ওরা। রাসলীলা বলা হয় এটাকে। একজনের উপর আরেকজন চড়ে ত্রিকোনাকৃতি মানুষের পিরামিড বানাচ্ছে কিছু লোক, উপরে তারে ঝুলিয়ে রাখা দইয়ের পাত্র-এর নাগাল পেতে চাইছে। এটা আসলে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের একটা মাধ্যম। শিশু বয়সে এভাবেই একজনের উপর আরেকজন চড়ে পাত্র থেকে মাখন চুরি করতেন কৃষ্ণ আর তার বন্ধুরা।

সব কোলাহল ছাপিয়ে সমস্বরে একটা নাম জপছে পিরামিড বানাতে থাকা লোকগুলো।

"গোভিন্দা! গোভিন্দা!"

এটা কৃষ্ণেরই আরেকটা নাম।

গাড়ির উপরের পথ বেয়ে একেবারে শেষমাথায় চলে এসেছে গ্রে। সামনে শুধুই হইহল্লারত লোকজন। এখান থেকে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে গাড়িগুলো। ছাদ থেকে নেমে এল ও। একহাতে মাথার হ্যাট ধরে অন্যহাতে পিস্তলটা প্রস্তুত রাখল গ্রে, তারপর এগিয়ে চলল জনসমুদ্রের শেষ সীমা লক্ষ্য করে। খাবার আর বিভিন্ন জিনিসপত্র বেচতে থাকা দোকানপাট দেখা যাচ্ছে ওদিকে।

চত্বরের উত্তরদিকের কোনায় কোয়ালস্কির সাথে দেখা করার কথা ছিল। পেছন থেকে ফেউ খসানোর আগে বাকিদের সাথে দুর্গে মিলিত হওয়া যাবে না। সিঁড়ি বেয়ে সামনের একটা বাড়ির উপরতলায় উঠে গেল গ্রে। সব লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, নজর নিচের উৎসবের দিকে। উপরতলায় পৌঁছে নিচের লোকজনের দিকে নজর বুলালো গ্রে, উদ্দেশ্য-কোয়ালস্কিকে খুঁজে বের করা। তবে তাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই তিন ধাওয়াকারীকে দেখতে পেল ও। কালো হেলমেট মাথায় থাকায় সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে ওদের। একজনের হাতে গ্রে'র ফেলে আসা হ্যাট, ওটা হাতে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে লোকটা।

এমন সময় দেখা গেল কোয়ালস্কিকে। কুঁচকে গেছে পরনের স্যুট, মুখে রক্তের দাগ, হাত দুটো খালি। সন্দেহ নেই, নিজের কাজ ভালোভাবেই শেষ করেছে ও। পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে বাকি দুই মোটরসাইকেল চালককে। তবে খারাপ খবর হচ্ছে, আশেপাশের লোকজনের চেয়ে একমাথা উঁচু লোকটা। আর এখন সবার মাথার উপর দিয়ে, চোখের উপর হাত রেখে ইতিউতি তাকাচ্ছে, খুঁজছে গ্রে-কে।

কোয়ালস্কির দিকে ইশারা করল হেলমেটধারী একজন, চিনে ফেলেছে। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগোতে শুরু করল তিনজনই।

সর্বনাশ।

নামার জন্য ঘুরে দাঁড়াল গ্রে, তবে বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামা এখন আর সম্ভব নয়। সিঁড়ি ঢেকে ফেলেছে উৎসব দেখতে আসা উৎসুক জনতা।

মনঃস্থির করে ফেলল ও। বারান্দার রেলিং এর উপর উঠে দাঁড়াল, আর তারপর লাফ দিল- উপরের দিকে।

মাথার উপরে একটা মোটা তেলতেলে তার ঝুলছে, বারান্দা থেকে সোজা চত্বরের দিকে এগিয়েছে ওটা। লাঠি ধরা হাতটা উঁচু করল গ্রে, হাতলের বাঁকা প্রান্ত আটকে ফেলল তারে। গ্রে'র ওজন, ঢালু তার বেয়ে ওকে নিয়ে চলল চত্বরের দিকে। ওহ না, ভুল হলো...চত্বরে ঝুলিয়ে রাখা একটা মাখনভরা পাত্রের দিকে!

একহাতে লাঠি ধরে ঝুলতে ঝুলতে হেলমেটধারী একজন নিচে আসতেই অন্যহাতে পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল গ্রে। অব্যর্থ লক্ষভেদ। লোকটা লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়, বাদামের খোসার মতো হেলমেট চর্তু করে ভেতরে ঢুকে গেছে গুলিটা।

মানুষের পিরামিডে ধাক্কা খেলো গ্রে। তাল সামলাতে না পেরে নিচে মানুষজনের ঘাড়ে পড়ে গেল পিরামিডের একেবারে মাথায় থাকা লোকটা। ততক্ষণে তার জায়গা

দখল করে নিয়েছে গ্রে, তবে ধাক্কা লেগে লাঠি আর পিস্তল- দুটোই পড়ে গিয়েছে হাত থেকে।

চমকে উঠে উপরদিকে তাকাল নিচের লোকজন।

বাকি দুই অস্ত্রধারীও তাকিয়েছে।

কোনওমতে ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়েই তড়িঘড়ি করে মাথার উপর থাকা দইয়ের পাত্রটা খুলে নিলো গ্রে। মনে মনে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কাছাকাছি থাকা অস্ত্রধারীর মুখে ছুঁড়ে মারলো ওটা।

ওর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন কৃষ্ণ।

লোকটার মুখে আঘাত হেনেছে ভারী পাত্রটা, পাত্র ভেঙে ভেতরে থাকা মাখন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ধাওয়াকারী, আর উঠল না।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠেছে তৃতীয় অস্ত্রধারী। পিস্তল তুলে ধরে গ্রের উদ্দেশ্যে দুটো গুলি পাঠালো ও। তবে ততক্ষণে গ্রে ওখানে থাকলে তো! ভেঙে পড়েছে মানুষের তৈরি পিরামিড। ধপাস করে একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে লোকজন। কোনওমতে মানুষজনের স্তুপের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল গ্রে। ওকে দেখতে পেয়েই আবারও পিস্তল তুললো লোকটা। তবে ট্রিগার চাপার আগেই ঢলে পড়ে গেল ও। পেছনে কখন কোয়ালস্কি এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারেনি। মাস্টারসনের সেই বিখ্যাত লাঠি শোভা পাচ্ছে ওর হাতে, এটা দিয়েই ব্যাটার মুণ্ডু দুভাগ করে দিয়েছে সে।

ঝুঁকে পড়ে লোকটার হাত থেকে পিস্তলটা উঠিয়ে নিলো কোয়ালস্কি। তারপর লোকজনের স্তুপ থেকে টেনে বের করল গ্রে-কেও।

"মাখন খাইয়ে মেরে ফেললে ব্যাটাকে, পিয়ার্স?" বিশালদেহী লোকটার কণ্ঠে কৌতুকের সুর। "মরতে হলে, খেয়ে মরাই ভালো না?"

আশেপাশের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। একটু সামনে কয়েকজন পুলিশকে দেখা গেল, আপ্রাণ চেষ্টা করছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। তবে বানের পানির স্রোত কী আর এতো সহজে থামে?

পরবর্তী কয়েক মিনিটে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বয়ে চলা যমুনা নদীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে আকবরের কেল্লা-তাজ মহলের পর শহরের দ্বিতীয় পর্যটনকেন্দ্র। ট্যাক্সি, ভ্যান, লিমোজিন ইত্যাদি গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশপথের সামনে।

"পিয়ার্স," একটা ডাক শোনা গেল।

সাদা রঙের একটা লিমোজিনের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে রোজারো। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লুকা। এলিজাবেথ আর মাস্টারসন, দুজনেই ভেতরে বসা।

"সহজে চোখে পড়ার মতো না জিনিসটা," গাড়িটার উপর একবার নজর বুলিয়ে বলল গ্রে।

"আমাদের সবাইকে ভেতরে আঁটাতে হবে তো," বলে কোয়ালস্কির দিকে লাজুক চাউনি দিল রোজারো। "আর তাছাড়া, অন্যের টাকা খরচ করে ভ্রমনটা একটু আরামের হলে ক্ষতি কী?"

"কী হাবিজাবি বলছো, তা তুমিই জানো," বলে সামনের সিটের দিকে এগোলো কোয়ালস্কি। "তবে এটা চালাবো তো আমিই।"

"না!" গ্রে আর রোজারোর মুখ দিয়ে একসাথে বেরিয়ে এল শব্দটা।

দুঃখী মুখ করে পিছিয়ে এল কোয়ালস্কি। পেছনের দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। একই কাজ করল রোজারোও।

গাড়িতে ওঠার আগে আশেপাশে নজর বুলালো গ্রে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না। সম্ভবত, পেছনে লেগে থাকা ছাড়পোকা পুরোপুরিভাবেই খসানো গেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর দিকে তাকাল ও। বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতপাথরের সেই অমূল্য নিদর্শন, তাজ মহল। শান্তি আর সমৃদ্ধির প্রতীক। সূর্যেরআলো পড়ে অদ্ভূত দ্যুতি ছড়াচ্ছে গোটা কাঠামো।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মাস্টারসনের ক্রোধান্বিত কণ্ঠ কানে এল ওর। "আমার লাঠির এ কী হাল করেছেন আপনি!"

সিটে উঠে বসল গ্রে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে লাঠিটা। তারের উপর দিয়ে পিছলে নামার সময় ঘর্ষনের ফলে পুরোপুরি মুছে গিয়েছে আঠারো শতকের হাতির দাঁতের উপরে থাকা কারুকাজ।

"এখনও লাঠি নিয়েই ভাবছেন আপনি, প্রফেসর?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মাস্টারসন।

উনার ব্যান্ডেজবাঁধা কানের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। "কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে, ড. মাস্টারসন। প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন?"

১০
৬ সেপ্টেম্বর, সকাল ৭:৪৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"ছেঁড়া সুতো," বলে উঠলেন ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড। "অনেকগুলো ছেঁড়া সুতো আছে এখানে।"

নিজের দিকে লোকটাকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন ইউরি। তবে পাত্তা দিলেন না। মারলে মেরে ফেলুক তাকে, কিছু আসে যায় না। একটা অফিসরুমে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। শরীর থেকে ইলেকট্রোডগুলো খুলে নেয়ার পর তাকে কাপড় পরতে দেয়া হয়েছে। আরও বিশ মিনিট অত্যাচার চালিয়েছে কসাইগুলো, বাচ্চাগুলোর জীন সম্পর্কে মুটামুটি সব কথাই বের করে নিয়েছে পেট থেকে।

ইউরি এটাও বলে দিয়েছেন রাশিয়ানরা কেন আর্চিবাল্ডকে দলে টানার ব্যাপারে আপত্তি জানায়নি। কারণ, জেনেটিক ব্যাপারটার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। ইতোমধ্যে ওয়ারেনে, একটা অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে লোকটার মুখ বন্ধ করার ছক কষে ফেলেছিলেন সাভিনা। তবে তারা কেউই ভাবতে পারেন নি আমেরিকানরা, আর্চিবাল্ডের নিজের কলিগরা তাকে নিয়ে এভাবে খেলা করবে।

"ছেঁড়া সুতো?" জিজ্ঞেস করলেন ম্যাপলথোর্প। "আমি তো মাত্র তিনটে দেখতে পাচ্ছি। বাচ্চা মেয়েটা, খুলিটা আর ভারতে পোকের ট্রেইল। শেষোক্ত ঝামেলা মেটানোর জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়ে গেছে। আর ইন্টেলিজেন্ট চ্যানেল থেকে খবর পেয়েছি খুলিটাও খুব তাড়াতাড়ি হাতে এসে যাবে।"

"কীভাবে করলেন ওটা?" প্রশ্ন করলেন ম্যাকব্রাইড।

"লোহা গরম হলেই হাতুড়ি মারতে হয়," বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন ম্যাপলথোর্প।

"আর মেয়েটা?"

বাচ্চাটার কথা উঠতেই সামনে ঝুঁকালেন ইউরি। ম্যাপলথোর্প লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। অবশ্য ইউরি বুঝে গেছেন, শুধু মেয়েটার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যই তাকে দরকার লোকগুলোর। নয়তো এতোক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতেন। বাচ্চাগুলোর শারীরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে মানসিক সক্ষমতা। বিশ বছর বয়স পার হবার পর খুব কম বাচ্চাকেই বাঁচানো গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাপলথোর্প। "সূর্যাস্তের আগে মেয়েটাকেও হাতের নাগালে পেয়ে যাবো।"

তারপরও দেরি হয়ে গেছে বাছাধন, ভাবলেন ইউরি।

সাভিনার প্ল্যানের কথা মনে হলো তার।

লক্ষ কোটি মানুষ মরতে চলেছে, খুব শীঘ্রই।

নুতুন পৃথিবীর প্রারম্ভ হবে।

নবজাগরণ।

আত্মতৃপ্তি আর গর্বে টগবগ করে ফুটতে থাকা ম্যাপলথোর্প আর ম্যাকব্রাইডের মুখের দিকে তাকালেন ইউরি।

চেহারাগুলো দেখতেই সকল দ্বিধা দূর হয়ে গেল মন থেকে।

সাভিনাই ঠিক।

এখনই সময়, জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাক পৃথিবী।

দুপুর ২:৫৫
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

মন কু ডাকছে মেজর জেনারেল সাভিনা মারতোভের। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। সঠিক খবর জানা দরকার এখন।

হাতে রেডিও নিয়ে চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-এর ভূগর্ভস্থ গুহা ধরে এগোতে লাগলেন তিনি। পিছু পিছু আসছে দুজন সৈনিক। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত দালানগুলো। মাইনে কাজ করা বন্দীদের রাখা হতো এখানে। বেচারা... গুলাগ কারাগারে জীবন কাটানোর চেয়ে এখানে পাঁচ বছর কাজ করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল লোকগুলো। তবে পাঁচ বছর পর্যন্ত টিকতে পারেনি কেউ। তার আগেই তেজস্ক্রিয়তার কারণে অক্কা পেয়েছে।

জুয়া খেলা...নিষ্ঠুরতা...

নিষ্ঠুরতা? কই! তার চোখে তো নিষ্ঠুরতা ধরা পড়ছে না।

যা হয়েছে, সবই প্রয়োজনের তাগিদে।

খড়খড় করে উঠল তার রেডিও, অনলাইনে এসেছে লেফটেন্যান্ট বরসাকোভ। এখনও বাচ্চাগুলোর খোঁজে পাহাড় চষে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু সেই থেকে একের পর এক শুধু খারাপ খবরই দিয়ে চলেছে লোকটা। হাসপাতালে পরে থাকা শার্ট দিয়ে ফলস ট্রেইল বানিয়ে তাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে আমেরিকান লোকটা আর বাচ্চাগুলো।

"নদীর পাড়ে আমাদের নেকড়ে দুটোর মৃতদেহ পাওয়া গেছে," বলে উঠল বরসাকোভ। "চিরে ফালা ফালা হয়ে আছে গোটা শরীর, ভালুকের আক্রমণ। তবে একটা শক্ত ট্রেইল পেয়েছি আমরা।"

"বিড়ালগুলোর খবর কী?"

অন্যপ্রান্তে নীরবতা নেমে এল।

"লেফটেন্যান্ট," গলাটা একটু কঠোর করলেন সাভিনা।

"আসলে পরিষ্কার ট্রেইল পাওয়ার আগে আমরা ওগুলোকে ছাড়তে চাইনি। নেকড়ে আর বাঘ, দুটোকে একসাথে পাহাড়ে ছাড়াটা বোকামী হতো।"

গলা যথাসম্ভব শান্ত রাখতে চাইছে লেফটেন্যান্ট। কিন্তু তার উদ্বিগ্নতা ধরা পড়ে গেল সাভিনার কানে।

কঠোর না হলে কাজ হবে না, ভাবলেন তিনি।

কাটা কাটা স্বরে প্রশ্ন করলেন সাভিনা, "তোমাদের হাতে এখন পরিষ্কার একটা ট্রেইল আছে, তাই না, লেফটেন্যান্ট?"

"হ্যাঁ, জেনারেল মেজর।"

"তাহলে কাজ দেখাও। আরেকবার ব্যর্থতার খবর যেন আমার কানে না আসে।"

"ঠিক আছে, জেনারেল মেজর।"

লাইন কেটে দিলেন তিনি। একটু বেশি রুক্ষ ব্যবহার হয়ে গেছে হয়তো, তবে গত কয়েক ঘন্টার ব্যর্থতার পর এটুকু ঝাড়ি খাওয়া বরসাকোভের প্রাপ্য ছিল।

পাশ্ববর্তী শহর- ওজাইরস্কের এক শ্রমিক ওয়ারেনের বর্জ্য ফেলতে ব্যবহৃত হতো এমন একটা ট্রাক আবিষ্কার করেছে, তাও একেবারে লেক করাশয়ের পাড়ে। ট্রাকের ভেতর ডক্টর পোকের ছবিওয়ালা একটা ব্যাজও ছিল।

অন্তত প্রফেসরের পালানোর ধাঁধাঁর রহস্য সমাধান হয়েছে, ভাবলেন সাভিনা।

কেউ সাহায্য করেছিল তাকে।

আর কে সাহায্য করেছিল সেটা সহজেই অনুমেয়, অবশ্যই ড. ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড। কী খেলা খেলছে এই ধুরন্ধর আমেরিকানরা? ইউরির চুপ থাকার মানে দাঁড়ায়, সে আর বাচ্চাটা হয়তো ধরা পরে গেছে ওদের হাতে। খুব সম্ভবত, এই পরিণতিটার জন্যই পোকের পালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তারপরেও, ম্যাকব্রাইডের প্রতি সমীহ অনুভব করলেন সাভিনা।

তার নিজের মতোই, প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে কাজ করেছে লোকটা।

তবে সত্যি কথা বলতে, প্রজেক্টের কাজে আমেরিকানদের নাক গলানো কখনওই মানতে পারেননি সাভিনা। তবে তখন হাতে আর কোনও উপায়ও ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর প্রজেক্টের সব রকম আর্থিক সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যায়। কাজ সচল রাখার জন্য কারও সাহায্য পাওয়া খুবই জরুরী ছিল।

তখনই মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসে ইউনাইটেড স্টেটস। ইউরোপে সিআইএ-র আওতাধীন টর্চার ক্যাম্পগুলোর মতোই তার প্রজেক্টেও অর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ফায়দা লুটতে চেয়েছিল আমেরিকানরা। এখন আর আগের সেই দিন নেই। বর্তমান বিশ্বে লাভের আশায় শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ভুলে যায় সবাই।

ইউরি আর বাচ্চাটা নিরুদ্দেশ হওয়াতে তেমন একটা ক্ষতি হয়নি, কাজের সময়টা এগিয়ে আনতে হয়েছে শুধু। চেরনোবিলে নিকোলাস তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার এক সপ্তাহ পর সাভিনার কাজ- অপারেশন স্যাটার্ন শুরু হতো। তবে এখন, একই দিনে, একই সাথে ঘটবে ঘটনা দুটো।

আগামীকাল।

ইউরেনাস আর স্যাটার্ন- দুটো অপারেশন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে নামগুলো। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে, জার্মানদের পরাজিত করেছিল সোভিয়েত আর্মি। ইতিহাসের প্রধান নৃশংস ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম এটা। সাধারণ নাগরিক আর জার্মান সেনা মিলিয়ে মারা গিয়েছিল প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ। অবশ্য, ওই

একটা ধ্বংসযজ্ঞই বলতে গেলে ঘুরিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধের মোড়। সেখান থেকেই এসেছে নামদুটো।

মাতৃভূমির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিজয়টা।

আর অতীতের মতোই, আরও একবার রাশিয়াকে মুক্ত করবে অপারেশন ইউরেনাস আর স্যাটার্ন, নতুনভাবে উপস্থাপন করবে বিশ্বের দরবারে।

আগের মতোই, রক্তের বিনিময়ে।

ভাবতে ভাবতে গুহার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন সাভিনা। সামনে একটা টানেল দেখা যাচ্ছে। খোলাই আছে টানেলের মুখের স্টিলের ব্লাস্ট ডোরটা।

ভেতরে ঢুকতেই একটা রেললাইন নজরে এল। ওয়ারেন থেকে শুরু করে লেক করাশয়ের ওপারে, অপারেশন স্যাটার্নের কেন্দ্র পর্যন্ত একটা ইলেকট্রিক্যাল ট্রেন চলাচল করে লাইনটা ধরে। স্ট্রনটিয়াম-৯০ আর সিজিয়াম-১৩৭ এর বিষাক্ত বর্জ্য ভরা লেকের তলা দিয়ে এগিয়েছে সুড়ঙ্গটা।

এখন তার জন্যই অপেক্ষা করছে ট্রেনটা।

সীসা দিয়ে মোড়া একটা বগিতে উঠে বসলেন সাভিনা। গোটা বাহনে এমন দুটো বগিই আছে। বাকি চারটা বগি খোলা। মালপত্র, মাইনিং এর সরঞ্জাম আর পাথর বহনে কাজে লাগে ওগুলো।

চাকার ঘর্ষণের মৃদু শব্দ করে ট্রেনটা চলা শুরু করতেই পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ব্লাস্ট ডোর। গোটা টানেল অন্ধকারে ছেয়ে গেল। শুরু হলো পাঁচ মিনিটের ট্রেনযাত্রা। মাথার উপরে যেন লেকের বিষাক্ত পানির চাপ অনুভব করতে পারলেন সাভিনা, অবশ্য তার এবং পানির মাঝে প্রায় আধা মাইল পুরু পাথরের স্তর আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই এলাকাটা। সাতটা প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাক্টর আর তিনটা বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চারপাশে। সফলভাবেই চলছিল সব। তবে উনিশশো আটচল্লিশ সালে, চেরনোবিলের দুর্ঘটনার চাইতেও পাঁচগুণ তীব্র তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে এখানে।

সময়ের সাথে বিপদের মাত্রা কমে এসেছে। তবে এখনও তার অর্ধেক পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা জমে আছে লেক করাশয়ের পানিতে। পরিমাপের হিসাবে তা দাঁড়ায় প্রতি ঘন্টায় ছয়শো রন্টজেন, যা এক ঘন্টায় মৃত্যু ডেকে আনতে যথেষ্ট।

সাভিনা মনে করতে পারলেন, এখানেই ওজাইরস্কের শ্রমিক প্রফেসর পোকের পরিত্যক্ত ট্রাকটা খুঁজে পেয়েছিল। এই লেকের পাড়েই।

মাথা নাড়লেন তিনি। প্রফেসরকে খুন করার কোনও দরকারই ছিল না। তেজস্ক্রিয়তাই তাদের হয়ে কাজটা করে দিত।

সামনে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

অপারেশন স্যাটার্নের কেন্দ্র।

সাভিনার চোখে নতুন ভবিষ্যতের পথ হিসেবে ধরা দিচ্ছে আলোটা।

বিকেল ৩:১৫

"কী করতে চলেছে ওরা?" নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

গত কয়েক ঘন্টা ধরেই এই নদীর পাড় ঘেঁসে এগিয়ে চলেছে ওরা। তবে যেখানে তাদের উপর ভালুকের হামলা হয়েছিল, এটা সেই জলস্রোত নয়। কয়েকটা পাথরের বোল্ডারের উপর দিয়ে লাফিয়ে ওই জলধারা পেরিয়ে এসেছে ছোট দলটা। এখন চলেছে নিচের অপেক্ষাকৃত বড় নদীটা ধরে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর ধারা, তুষারগলা পানি আর বৃষ্টির পানি বয়ে নিয়ে ফেলছে পশ্চিমের কাস্পিয়ান সাগরে।

কী পরিকল্পনা করেছে এই রাশিয়ানরা...

আনমনেই মঙ্কের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো, তবে একটু উচ্চস্বরে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল কনস্টানটাইন।

"দুঃখিত," আস্তে করে বলল মঙ্ক। সে-ই বাচ্চাদের ফিসফিস করে কথা বলতে বলেছিল। আর এখন, নিজেই নিজের কথার খেলাপ করেছে ও। গলার স্বর আরও নিচুতে নামিয়ে আনলো মঙ্ক। "স্মৃতি না থাকার পরেও আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, কোনও না কোনও পাগলামির পরিকল্পনা করছে ওরা।"

"সফল হবে ওরা," জবাব দিল কনস্টানটাইন। "খুবই সহজ পরিকল্পনা। আমরা..." বলে পিওতর আর কিস্কার দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা, তারপর নিজের পেছনে হাত ঘোরালো, ভূগর্ভস্থ শহরে থাকা বাকি বাচ্চাগুলোর কথা বোঝাতে চাইছে। "...ওদের কাজের ব্যাপারে হিসেব-নিকেশ করে দেখেছি, তথ্যগুলো বিচার-বিশ্লেষন করেছি, সম্ভাব্যতার মাত্রা যাচাই করেও দেখেছি। শুধু পাগলামি বললে কম বলা হয়।"

মন দিয়ে কন্সটানটাইনের কথাগুলো শুনছিল মঙ্ক। ওর মনে হলো, ছেলেটার বলা কথাগুলো কোনও টিনএজার না, বরং একটা কম্পিউটারের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। ছেলেটার কানের পেছনে থাকা স্টিলের ডিভাইসটার কথা মনে পড়ল মঙ্কের। সবার মাথাতেই আছে ওগুলো। এমনকি মার্তার কানের পেছনেও হাতের মুঠোর আকারের একটা স্টিলের টুকরা শোভা পাচ্ছে। গত কয়েক ঘন্টায় হাঁটার সময় নিজের ক্ষমতা মঙ্ককে দেখিয়েছে কনস্টানটাইন। মানসিক ব্যায়াম করলে নাকি শান্তি পায় ও। কিস্কাও দেখিয়েছে, কীভাবে সে একটা পাখির ডাকের হুবহু নকল করতে পারে।

শুধু পিওতরই নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে চুপ করে ছিল।

"সহানুভূতি," ব্যাখ্যা করল কনস্টানটাইন। "অন্যদের মনের কথা, তাদের অনুভূতি বুঝতে পারে ও। এমনকি কেউ মনের ভাব লুকানোর চেষ্টা করলেও তা ধরতে পারে পিওতর। আমাদের এক শিক্ষক বলেছিলেন, ও হচ্ছে একটা জীবিত লাই ডিটেক্টর। এসব কারণেই প্রানিদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে ছেলেটা। নিচে থাকাকালীন, অবসরের বেশিরভাগ সময়ই মেনাজিরিতে কাটত ওর। তার কথাতেই মার্তাকে সাথে এনেছি আমরা।"

ছেলেটার দিকে তাকাল মঙ্ক। বয়স্ক শিম্পাঞ্জীটার সাথে হেঁটে চলেছে ও। একটা আলাদা সম্পর্ক আছে ওদের দুজনের ভেতর। আছে আলাদা ধরণের যোগাযোগও। ভ্রূ কুঁচকানো, ঠোঁট বাঁকানো, হাত নাড়া...পুরোটাই ইশারাভিত্তিক।

হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে দিল পিওতর, মার্তাও তাই করল। তাড়াতাড়ি কনস্টানটাইনের দিকে ধেয়ে এল ছেলেটা, হড়বড় করে রাশিয়ান ভাষায় বলল কিছু একটা। মঙ্কের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে আবারও কথাটার পুনরাবৃত্তি করল ও।

"ওরা এসে গেছে।"

কারা এসে গেছে, তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না মঙ্ক। ছেলেটার হাবভাবেই যা বোঝার, বোঝা হয়ে গেছে ওর।

আর্কাডি আর জাখার।

সাইবেরিয়ান বাঘদুটো।

"দৌড়াও!" বলে উঠল মঙ্ক। নদীতট ধরে ছোটা শুরু করল গোটা দলটা। সবার আগেআগে চলেছে কনস্টানটাইন, কিস্কা অনুসরণ করছে ওকে। ব্লুবেরি গাছ, কাটাময় ঝোপের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকেও নজর রাখতে লাগল মঙ্ক। চিড়বিড় করে আপত্তি জানাচ্ছে পায়ের নিচে থাকা স্প্রুসগাছের শুকনো পাতা।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পিওতর। মার্তা হাত ধরে টেনে উঠালো ওকে। তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য তাড়া দিতে লাগল মঙ্ক, ইতোমধ্যে সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে কনস্টানটাইন আর কিস্কা।

পাঁচ মিনিট দৌড়ানোর পরই কমে আসতে লাগল গতি। ক্লান্তি আচ্ছন্ন করে ফেলছে সবাইকে। আরও দশ মিনিট সবাইকে একসাথে থেমে হাঁপাতে দেখা গেল।

আশেপাশে নড়ছে না কোনওকিছুই। বাঘদুটোর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ছে না।

শুধু শুধু ভয় দেখানোর জন্য পিওতরকে বকতে শুরু করল কনস্টানটাইন।

ছেলেটাকে থামালো মঙ্ক। "ওর দোষ নেই।"

মার্তাও থামার জন্য নাড়া দিল কনস্টানটাইনের হাত ধরে।

রাশিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল কিস্কা।

মঙ্ক জানে, দুরত্বের ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে না পিওতর, ওর মনে হয়তো বলেছিল...

হঠাৎ আঁতকে উঠল পিওতর, বড় বড় হয়ে গেছে চোখদুটো।

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললো ছেলেটা, তবে ভয়ের চোটে কোনও শব্দ বেরোলো না গলা দিয়ে।

কিছু বলার দরকারও নেই অবশ্য। বুঝতে পেরেছে মঙ্ক।

"এখনই," চেঁচিয়ে উঠল সে।

আবারও একসাথে দৌড় শুরু করল ওরা, গন্তব্য-বয়ে চলা নদীটা। আগে থেকেই ওদের কথাটা বলে রেখেছিল মঙ্ক। ছুটতে ছুটতে এক হাতে পিওতরকে জাপটে ধরল ও,

লাফ দিল পানিতে। পাশ থেকে দুটো ঝপাৎ শব্দ বলে দিল, প্রায় একই সময়ে লাফ দিয়েছে কনস্টানটাইন আর কিঙ্কাও।

পেছনে জঙ্গল থেকে ছুটে আসছে একটা বিশাল অবয়ব।

পানিতে জোড়ালো লাথি দিয়ে এক সেকেন্ড পর উপরে ভেসে উঠল মঙ্ক। গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে মার্তা, শিম্পাঞ্জীরা সাঁতার জানে না। এমনকি পানিতে ভাসার ক্ষমতাও নেই ওদের। তাই আপাতত এখান থেকে সরে যাচ্ছে মার্তা, অন্য কোনও উপায়ে নদী পার হবে।

ততক্ষণে বন থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্ষুধার্ত, হিংস্র অবয়বটা।

যথাসম্ভব নিচু হয়ে, থাবা প্রসারিত করে মঙ্ককে লক্ষ্য করে পানিতে ঝাঁপ দিল একটা বাঘ, পেছনে উঁচু হয়ে আছে লেজ।

প্রাণপণ হাত পা চালিয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল মঙ্ক, গলা ধরে ঝুলে আছে পিওতর।

পানিতে আছড়ে পড়ল বাঘটা, অল্পের জন্য শিকারকে থাবার নাগালে পায়নি।

এর চেয়ে জোরে সাঁতার কাটা সম্ভব নয় মঙ্কের পক্ষে, তবে পানির স্রোত তার কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছে। উঁচু হয়ে থাকা দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে গা গলিয়ে দিল ও। পরক্ষণেই একটা ঘূর্ণিতে পড়ে ডুবে গেল, ভেসে উঠল এক সেকেন্ড পর।

ভয় পেয়ে তাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে পিওতর।

মাথা ঘুরিয়ে মঙ্ক দেখতে পেল, আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বাঘটা। পেছনের পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। সাধারণত স্রোত পছন্দ করে না বাঘসহ অন্যান্য বিড়াল গোত্রের প্রাণী। তাছাড়া পানিতে ধাওয়া করে শিকার করা ওদের স্বাভাবিক আচরণের আওতায় পড়ে না।

শিকারের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে ওরা।

এতোক্ষণ সন্তর্পনে ওদের পিছু নিয়েছে জন্তুটা। তার মানে, পিওতরের সতর্কবার্তা সঠিক ছিল। অনুসরণ করে এসে শিকারের ক্লান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ওটা, আরেকটু পরই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তো মাথায়। এটাই বাঘদের শিকার করার ধরণ-সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা।

আরেকটা বাঘ এসে দাঁড়াল নদীর কিনারায়। ততক্ষণে পাড়ে উঠে গেছে পানিতে নামা বাঘটা, গা ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

সাঁতার কাটার ফাঁকেই বাঘ দুটোর দিকে ভালোভাবে তাকাল মঙ্ক। লম্বা, স্বাস্থ্যবান দুটোই। ঘন লোমে ঢাকা পুরো শরীর। নেকড়েগুলোর মতো, এগুলোর কানের পেছনেও স্টিলের ডিভাইস লাগানো আছে। একটার কানে কাটা দাগ ছাড়া, বাঘ দুটোর আর কোনও পার্থক্য নেই। কনস্টানটাইনের ভাষ্যমতে, কানকাটা বাঘটার নামই জাখার। বেশ আগের একটা দুর্ঘটনায় কানের এক অংশ কাটা পড়ে প্রানিটার।

পিছিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলে হারিয়ে গেল জন্তুদুটো।

মঙ্ক জানে, বিপদ এখনও কাটেনি।

খেলা সবে শুরু হলো।

ঘাড় ঘুরিয়ে কনস্টানটাইন আর কিস্কাকে নদীর একটা বাঁকের আড়ালে চলে যেতে দেখল ও, নিজেও হাত পা নেড়ে পিছু নিলো ওদের। পিওতর গলা ধরে ঝুলে আছে। অল্প অল্প কাঁপছে ছেলেটা। মঙ্ক জানে, কাঁপুনির কারণ ঠাণ্ডা পানি নয়, এমনকি বাঘের ভয়ও নয়। পানির দিকে স্থিরদৃস্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার চোখদুটো। যেন খুঁজছে কিছু একটা।

কীসের ভয় পাচ্ছে ও?

বিকেল ৩:৩৫

বিশালদেহী লোকটার গায়ে সেঁটে আছে পিওতর। দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে ঘাড়, পা দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে কোমর। পানির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। ঠোঁট, কান, চোখ সব ইন্দ্রিয়তেই পানির স্পর্শ পাচ্ছে ও। ঠাণ্ডা পানি যেন কামড় বসাতে চাইছে হাড়ে।

মার্তার মতোই সাঁতার জানে না ও।

পুরনো বন্ধুর খোঁজে পাড়ের দিকে তাকাল পিওতর। জানে, মার্তা কতখানি ভয় পায় পানিকে। আজকে বোল্ডারের উপর দিয়ে লাফিয়ে পানির ধারা পার হওয়ার সময়ও ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল বয়স্ক শিম্পাঞ্জী, শক্ত হয়ে উঠেছিল চোয়াল। ওর হৃদয়ের ধুকপুকানি অনুভব করতে পেরেছিল পিওতর।

লোকটাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও।

তবে মার্তার মনের আসল ভয়ের ব্যাপারটা কোনও সাগরের চেয়েও গভীর। যখন প্রথম ওর বিছানার পাশে এসে বসেছিল প্রাণিটা, বন্ধুত্বের নিমন্ত্রণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ওর দিকে, তখনই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল সে।

সবাই ভেবেছিল, অপারেশনের পর পিওতরকে ধকল সামাল দেয়ার সাহস যোগাতেই এসেছিল প্রাণিটা, তবে গাঢ় বাদামী চোখের দিকে তাকিয়েই ওর সকল সত্যি, সকল গোপনীয়তা জেনে গিয়েছিল সে। পিওতরের নয়, বরং নিজে শান্তি পেতেই ওর কাছে এসেছিল মার্তা।

তারপর থেকেই ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে ওরা।

গোপনীয়তার বাঁধন।

বিকেল ৪:২৮
নয়াদিল্লী, ভারত

"মানুষ যে ভবিষ্যৎ দেখতে পারে, জানেন নাকি?" কম্পিউটারের কী-বোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলেন মাস্টারসন।

কফির কাপ থেকে নজর সরিয়ে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল গ্রে। এই মুহূর্তে দিল্লীর একটা ইন্টারনেট ক্যাফের প্রাইভেট রুমে বসে আছে ওরা। কাঁচের দরজার সামনে বসে আছে কোয়ালস্কি, নিরাপত্তার দিকটা খেয়াল রাখছে। থুতনিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা বিশালদেহী

লোকটার। প্রিন্টারের সামনে বসে একের পর এক বেরিয়ে আসা কাগজগুলো জমা করছে এলিজাবেথ। ঘরে ওরা চারজনই আছে আপাতত, রোজারো আর লুকা গেছে পরবর্তী ভ্রমণের জন্য গাড়ি ঠিক করতে।

অবশ্য গ্রে এখনও জানে না, এরপর কোথায় যেতে হবে ওদের।

পুরোটাই নির্ভর করছে মাস্টারসনের উপর, কিন্তু তিনি যেন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। হোটেলের হামলা থেকে বেঁচে ফেরার পর থেকে কোনও কথাই বলেননি প্রফেসর। শুধু একদৃষ্টিতে তার সাধের হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠির দিকে তাকিয়েছিলেন। একটা দ্যুতি ছড়াচ্ছিলো তার চোখদুটো থেকে। শকের কারণে নয়, কিছু একটার প্রতি তীব্র মনোযোগের প্রমাণ হিসেবে।

চোখে চোখে কথা হলো এলিজাবেথ আর গ্রে'র।

তাকে চাপ দেয়া যাবে না।

আগ্রা থেকে বেরিয়ে ভারতের রাজধানী, নয়াদিল্লীর দিকে এগিয়েছে দলটা। মাঝের নব্বই মাইল রাস্তায় নিরাপত্তাজনিত কারণে দুবার গাড়ি বদলও করেছে।

শহরে পৌঁছানোর পর শুধু একটামাত্র কথাই বেরিয়েছিল মাস্টারসনের মুখ দিয়ে, *একটা কম্পিউটার চাই আমার।*

সে কারণেই এখানে এসেছে ওরা। ইন্টারনেট ক্যাফের এই রুমটাতে ঢুকেই মুম্বাই ইউনিভার্সিটির গোপন একটা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছেন মাস্টারসন। তা-ও যে সে গোপন না ওয়েবসাইটটা, একেবারে তিন মাত্রার কোড দিয়ে সুরক্ষিত।

"আর্চিবাল্ডের রিসার্চ," প্রিন্ট করা শুরু হতেই ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর।

"মানে?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

চেয়ারে হেলান দিলেন মাস্টারসন। "যদিও অনেকেই জানে না, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আগে থেকেই অনাগত ভবিষ্যতের এক ঝলক উপলব্ধি করতে পারে মানুষ। সময়ের হিসেবে যা দাঁড়ায় প্রায় তিন সেকেন্ড পূর্বে।"

"তিন সেকেন্ড?" বলে উঠল কোয়ালস্কি। "তিন সেকেন্ডে তো অনেক কিছুই করা সম্ভব।"

"অবশ্যই।"

কোয়ালস্কির দিকে এক পলক তাকিয়েই সাথে সাথে প্রফেসরের দিকে নজর ঘুরিয়ে আনলো গ্রে। "কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত বলতে কী বুঝাতে চাইলেন আপনি?"

"সিআইএ-র স্টারগেটপ্রজেক্ট সম্পর্কে শুনেছেন আপনারা?"

এলিজাবেথের সাথে চোখাচোখি হলো গ্রের। "ওই প্রজেক্টেই তো কিছু সময়ের জন্য কাজ করেছিলেন ড. পোক।"

"ওই প্রজেক্টেরই আরেকজন রিসার্চার, ড. ডীন র‍্যাডিন কিছু স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। ওদের দেহে লাই ডিটেক্টর যুক্ত করেছিলেন তিনি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেহের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াও ধরতে পারে যন্ত্রটা। তারপর ওদেরকে ভালো আর খারাপ মিলিয়ে কিছু ছবি দেখানো হয়। এলোমেলো ধারায় একের পর এক স্ক্রিনে আসতে থাকে ভালো আর খারাপ ছবিগুলো। মনের উপর আলাদা ধরণের প্রভাব সৃষ্টি করে বীভৎস

ছবিগুলো, আর সেই প্রতিক্রিয়াটুকুই ধরা পড়ে লাই ডিটেক্টরে। কয়েক মিনিট এরকম চলার পর দেখা যায়, একটা ছন্দ খুঁজে পেয়েছে মানুষগুলোর মন। কোনও বীভৎস বা খারাপ ছবি স্ক্রিনে আসার খানিকক্ষণ আগে, প্রায় তিন সেকেন্ড পূর্বেই প্রতিক্রিয়া দেখানো শুরু করেছে তারা। একাধিকবার, একাধিক মানুষের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা হয়, ফলাফল একই। এডিনবার্গ আর কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এটা নিয়ে আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করে একই ফল পান, তাদের মধ্যে নোবেল পদক পাওয়া গবেষকও ছিলেন।"

বিস্ময় আর অবিশ্বাসে মাথা নাড়লো এলিজাবেথ। "এটা কীভাবে সম্ভব?"

শ্রাগ করলেন মাস্টারসন। "তা তো জানি না। তবে জুয়াড়িদের মাঝেও এমন প্রবৃত্তি লক্ষ করা গেছে। পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের নিয়েও। কিছুক্ষণ জুয়া খেলার পর কার্ড বাটার সময় হাতে ভালো কার্ড আসবে না খারাপ কার্ড, এটাও আন্দাজ করতে পারে তারা। তুরুপের তাস উল্টানোর সময় তাদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ভালো কার্ড থাকলে সেটা উল্টানোর আগেই উল্লাস কাজ করে তাদের মনে, আবার বিপরীতভাবে খারাপ কার্ড থাকলে দেখা যায় বিষণ্ণতা। জুয়াড়িদের ব্যাপারটা উদ্ভাবন করেন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির নোবেল বিজয়ী এক বিজ্ঞানী। মস্তিষ্কের এমআরআই পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান, এই পূর্বাভাসসংক্রান্ত প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি মগজ থেকেই হয়। কথাটা মাথায় রাখবেন... নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় জানা গেছে এটা, কোনও হাতুড়ে ডাক্তারের না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবেই এই কথা স্বীকৃত যে, সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে।"

"দারুন তো," বলে উঠল এলিজাবেথ। গোটা ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে এবার।

ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে চললেন মাস্টারসন। "এই ঘটনাগুলোই আকৃষ্ট করেছিল তোমার বাবাকে। তিনি এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে চাইছিলেন। যদি সাধারণ মানুষ তিন সেকেন্ড আগেই ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারে, তাহলে আরও বেশি সময়ের জন্য পারবে না কেন? পদার্থবিজ্ঞানের মতে এটা অসম্ভব কিছু না। এমনকি আইনস্টাইনও বলে গিয়েছেন, অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে ফারাকটুকু আসলে একটা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই না। দুরত্বের মতো সময়ও শুধুই একটা মাত্রা। যদি দুরত্বের ক্ষেত্রে আমরা স্থান পরিবর্তন করতে পারি, তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে কেন নয়?"

বাচ্চা মেয়েটার আঁকা তাজ মহলের ছবিটা ভেসে উঠল গ্রে'র চোখের সামনে। ঘটনাটার সাথে মাস্টারসনের কথার মিল খুঁজে পেল ও। যদি সময়ের সীমা ভেদ করে ভবিষ্যৎ দেখা সম্ভব, তাহলে তা দূরত্বের বেলাতেও সম্ভব। পেইন্টারও সিআইএ-র দুরের জিনিস দেখা সংক্রান্ত প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেছিলেন তাকে।

"এই তো গেল সাধারনদের কথা," বললেন মাস্টারসন। "তাদের মাঝে এমন অনেক অসাধারনও আছে যাদের ক্ষমতা আরও বেশি, আরও বিস্ময়কর। প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকেই খুঁজে বের করা।"

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ভাবল গ্রে। মাথায় এখনও বাচ্চাটার কথাই ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসা শেষ কাগজটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ, এগিয়ে দিল মাস্টারসনের দিকে। "আমার বাবা... ওই অসাধারনদেরকেই খুঁজছিলেন, তাই তো?"

"না বাছা। খুঁজছিলেন না।"

দ্বিধা আর কৌতুহলে বড় বড় হয়ে গেল এলিজাবেথের চোখজোড়া।

ওর হাতে আলতো চাপড় দিলেন প্রফেসর।

"খুঁজছিলেন না, বলো খুঁজে পেয়েছিলেন।"

লাফিয়ে উঠল গ্রে। "কী?"

মাস্টারসন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার আগেই দরজায় নকের শব্দ সবার মনোযোগ কেড়ে নিলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুললো কোয়ালস্কি।

হাতে চাবির রিং নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকল রোজারো। এগিয়ে এসে চাবিটা ছুঁড়ে দিল গ্রের উদ্দেশ্যে। "এখানকার কাজ শেষ?"

"না," জবাব দিল গ্রে।

বগলের নিচে কাগজের স্তুপ নিয়ে তাকে পাশ কাটালেন মাস্টারসন। "হ্যাঁ, শেষ।"

"চলো তাহলে," বাকিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল গ্রে।

প্রফেসরের পেছন পেছন ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এল সবাই। গ্রের পাশে হাঁটছে কোয়ালস্কি। "ভদ্রলোকের রাগ এখনও কমেনি কিন্তু," বলে মাস্টারসনের হাতের লাঠির দিকে ইঙ্গিত করল ও। "কমবেই বা কীভাবে? বেচারার লাঠিটার যা হাল করেছো তুমি।"

বাইরে একটা মার্সিডিজ বেঞ্জ জি-৫৫ মডেলের এসইউভির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লুকা হার্ন। বাহনটা দেখতে পুরোপুরি সাঁজোয়া ট্যাঙ্কের মতোই বিশাল।

গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করল রোজারো, বুঝতে পেরেছে গ্রে'র খুব একটা পছন্দ হয়নি ওটা। "হ্যাঁ...আমি জানি এই গাড়ি নিয়ে আসাটা একটু অদ্ভুতই। কিন্তু আমার জানা ছিল না, কোথায় যাব আমরা বা কত দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে হবে।"

পাশ থেকে ভেংচি কাটলো কোয়ালস্কি। "অথবা কয়টা মোটরসাইকেলকে পেছনে ফেলতে হবে।"

বলে চলেছে রোজারো, "প্রায় পাঁচশো হর্স পাওয়ারের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এটা, আর আমার বেশ পছন্দও হয়েছে।"

গাড়িটাকে কাছে থেকে ভালোভাবে দেখতে লাগল কোয়ালস্কি। "হ্যাঁ, ভালোই আছে মালটা। এখন থেকে আমাদের সব যানবাহন রোজারো ঠিক করবে।"

পাত্তা না দিয়ে মাস্টারসনের দিকে তাকাল গ্রে। "এবার কোন দিকে?"

হাতের কাগজে দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে অন্য হাতে লাঠি উঁচু করে দেখালেন তিনি। "ওই উত্তর দিকে।"

এমন আচরণে রাগ করারই কথা। তবে এলিজাবেথের নীরব দৃষ্টি আবারও শাসালো গ্রে-কে।

চাপ দেয়া যাবে না...

আর কথা না বাড়িয়ে এসইউভির দিকে এগোলো গ্রে। সময় নষ্ট করা যাবে না। এমনিতেই এখানে বেশ খানিকক্ষণ যাবত অবস্থান করছে ওরা। কেউ যদি মুম্বাই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে কোনও ট্রেসার পোষ্ট করে থাকে, তাহলে এতোক্ষণে ওদের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবার কথা।

"গাড়িতে ওঠো," সবার উদ্দেশ্যে বলল ও।

চাবির জন্য ক্যাচ ধরার ভঙ্গিতে হাত পাতলো কোয়ালস্কি, গাড়ি চালাতে চায়।

তার দিকে এক পলক তাকিয়ে চাবির রিংটা রোজারোর দিকে ছুঁড়ে দিল গ্রে।

হতাশায় বিড়বিড় করে উঠল বিশালদেহী লোকটা। "তুমি একটা আস্ত শয়তান।"

বিকেল ৫:০৬

আর ধৈর্য ধরা সম্ভব না এলিজাবেথের পক্ষে। নিজের উপদেশ অমান্য করে ড. মাস্টারসনের দিকে ফিরল ও। "হেইডেন, অনেক হয়েছে। এখন ঝেড়ে কাশুন। বাবা ঐ লোকগুলোকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন?"

"যা বলেছি তাই, বাছা।"

এসইউভির মাঝের সারির এককোনায় বসে আছেন প্রফেসর। পাশে এলিজাবেথ আর গ্রে। কলম হাতে নিয়ে কোলের উপর রাখা কাগজগুলোর উপর কিছু একটা আঁকিবুঁকি করছেন তিনি। ড্রাইভিং সিটে রোজারো, তার পাশে গোমড়ামুখে বসে আছে কোয়ালস্কি। সবার পেছনের সারিতে বসে ওদের কথা শোনার জন্য ঝুঁকে আছে লুকা হার্ন।

ব্যাখ্যা করলেন মাস্টারসন, "বিগত কয়েক দশক ভারতের যোগী-সন্ন্যাসীদের ডিএনএ স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন তোমার বাবা। চষে বেড়িয়েছেন উত্তর থেকে দক্ষিণ। বাদ দেননি কোনও এলাকা। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ক্রস রেফারেন্স করে দেখেছেন প্রাপ্ত জেনেটিক কোডে। জেনেটিক পার্থক্যের সাথে মানসিক ক্ষমতার ধারা মিলিয়ে দেখছিলেন।"

"লুকার লোকজনদেরও পরীক্ষা করেছেন তিনি," বলল এলিজাবেথ।

মাথা নেড়ে সায় দিল জিপসীসর্দার।

"কারণ তাদের আদি বাসস্থান ভারতে, পাঞ্জাবে।" জবাব দিলেন মাস্টারসন।

"ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"দেখাচ্ছি, দাঁড়ান।" পরের আধা মিনিট কাগজের স্তূপ ঘাঁটলেন প্রফেসর, তারপর একটা পৃষ্ঠা বের করে আনলেন। "তোমার বাবা আসলেই একজন জিনিয়াস ছিলেন, এলিজাবেথ। প্রতিভাধারী ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের ডিএনএ-র ভেতরে তিনটা জীনকে নির্দিষ্টভাবে মার্ক করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। প্রতিবন্ধীতার লক্ষণ দেখানো প্রতিটা প্রতিভাধারী মানুষের মাঝেই এই তিনটা জীনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এগুলোর জন্যই মূলত বিকাশ ঘটেছে তাদের ভেতর লুকানো সুপ্ত ক্ষমতার।"

"প্রতিবন্ধীতা? কেন?"

"কেননা, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়-এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যাদের মাঝেই ওইরকম প্রতিভা দেখা গেছে, তারা সবাই কোনও না কোনও দিক থেকে কিছুটা অক্ষম

ছিলেন।" এলিজাবেথের কনুই স্পর্শ করলেন মাস্টারসন। "তুমি কী জানো, ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়া অনেক মনিষীই প্রতিবন্ধী ছিলেন?"

মাথা নাড়লো মেয়েটা, জানে না।

আঙুলে গুনতে শুরু করলেন প্রফেসর। "শিল্পের দিক দিয়ে- মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, জেন অস্টিন, এমিলি ডিকিনসন; সেই সাথে বিটোভেন, মোজার্ট। বিজ্ঞানীদের ভেতর টমাস এডিসন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন। রাজনীতির ক্ষেত্রে থমাস জেফারসন। এমনকি নস্ট্রাডামুসও সাময়িক প্রতিবন্ধীতার শিকার ছিলেন।"

"নস্ট্রাডামুস?" জিজ্ঞেস করল গ্রে। "ফ্রেঞ্চ জোতির্বিদ?"

"হ্যাঁ," সায় দিলেন প্রফেসর। "ইতিহাস পাল্টে দেয়া সব ব্যক্তিত্ব-এরাই তো এগিয়ে এনেছেন সভ্যতা, সমৃদ্ধ করেছেন সময়কে। প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক বিখ্যাত গবেষক ড. টেম্পল গ্রান্ডিন-এর একটা লাইন প্রায়ই বলতো আর্চিবাল্ড। 'যদি কোনওভাবে পৃথিবী থেকে প্রতিবন্ধীতা পুরোপুরিভাবে দূর করে দেয়া যেত, তাহলে এখনও কোনও গুহার সামনে বসে আগুন পোহাতো মানুষের পূর্বপুরুষ।' আর আমি বিশ্বাস করি, তিনি ঠিকই বলেছিলেন।"

"আর আমার বাবা?"

"তার ধারণাও ঠিক। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, প্রতিবন্ধীতা আর অনুভূতি এবং পূর্বাভাস সংক্রান্ত তার গবেষণা, দুটো ব্যাপার একই সুত্রে গাঁথা।"

"আর তিনি ওই যোগসুত্রটা ধরতেও পেরেছিলেন, তাই না?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাস্টারসন। "প্রতিবন্ধীতার আসল কারণ এখনও ধরতে পারেনি বিজ্ঞান। তবে অধিকাংশ গবেষক একমত হয়েছেন যে, এই অবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে দশটা বিশেষ জীন। ওই জীন নিয়েই গবেষণা চালিয়ে যায় আর্চিবাল্ড আর প্রমাণ করে, ক্ষমতাধারী প্রতিভাবানদের ভেতর ওই দশটা জীনের পাশাপাশি ওর আবিষ্কৃত সেই নির্দিষ্ট তিনটা জীনও আছে। এই ব্যাপারটাই আসলে খুঁজছিল ও। তারপর সে গোটা ভারতের জনসংখ্যার ভেতর ওই তিনটা জীনের ট্রেইল খোঁজা শুরু করে। এতে এই জিনিসটা পাওয়া যায়।"

কোলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে এলিজাবেথের দিকে বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। ভারতের একটা মানচিত্র ওটা, জায়গায় জায়গায় শত শত বিন্দু চিহ্নিত করা।

একবার চোখ বুলিয়ে গ্রের দিকে মানচিত্রটা এগিয়ে দিল ও।
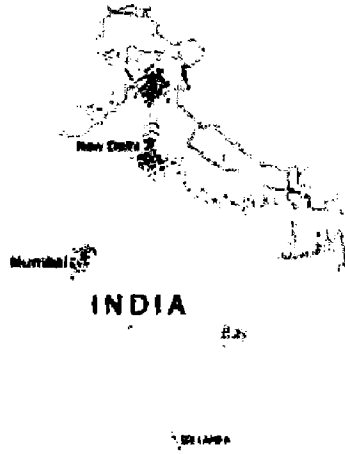
ব্যাখ্যা করলেন মাস্টারসন, "প্রতিটা বিন্দু ওই জীনের একেকটা মার্কার চিহ্নিত করেছে। তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটা শহর অর্থাৎ দিল্লী, মুম্বাইতে ঠিক পরিমাণ বিন্দু উল্লেখিত আছে। যার মানে দাঁড়ায়, এখনও এমন অনেক লোক বাস করে এখানে।"

"কিন্তু এখানে?" মানচিত্রের উত্তরদিকে আঙুলে দেখিয়ে প্রশ্ন করল গ্রে।

এলিজাবেথও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। উত্তরের ওই অঞ্চলে অন্যান্য অংশের চেয়ে বিন্দুর পরিমাণ অনেক বেশি, কিন্তু কোনও শহরের নাম উল্লেখ করা নেই।

"ঠিক তাই। ওটাই আর্চিবাল্ডের গবেষণার ফসল।" মানচিত্রটা হাতে নিয়ে জায়গাটা স্পর্শ করলেন প্রফেসর। "গত তিন বছর যাবত এই অঞ্চলেই ছিল সে। এতোগুলো বিন্দু এক এলাকায় থাকার কারণ অনুসন্ধান করছিল।"

"কী ওখানে?" প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

"পাঞ্জাব।" উত্তরটা মাস্টারসন না, পেছনে বসা লুকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। "রোমানিদের আসল মাতৃভূমি।"

"এজন্যই ইউরোপে থাকা জিপসীদের কাছে গিয়েছিল আর্চিবাল্ড। তাছাড়া মজার ব্যাপার হলো, জিপসীদের ভেতর থেকেই উদ্ভূত হয়ে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যৎবক্তারা। সে দেখতে চেয়েছিল, ওই জেনেটিক মার্কার জিপসীদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।"

"তারপর?" মাস্টারসন আর লুকা, দুজনের দিকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছে এলিজাবেথ।

প্রফেসরই উত্তর দিলেন। " হ্যাঁ, তবে সে যা ভেবেছিল ফলাফলটা ততোখানি আশানুরূপ ছিল না।"

"কেন?"

"একটা কারণ ছিল এর পেছনে," জবাব দিল লুকা।

পেছনে ফিরে জিপসীসর্দারের দিকে তাকাল গ্রে। "বুঝিয়ে বলো।"

"ওই কারণেই আমরা ড. পোককে নিয়োগ করেছিলাম।"

এলিজাবেথ মনে করতে পারল, আগে কথাটা উঠলেও বিস্তারিত কিছু জানায়নি লুকা।

"আগেই বলেছি, ড. পোক রক্ত আর ডিএনএ স্যাম্পল যোগাড় করার জন্য আমাদের প্রতিভাধর শোভিহানিস-দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কোনও হুজুগে ভবিষ্যৎবক্তা না, বরং সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতাবানদের খোঁজ করছিলেন তিনি। তবে সেরকম হাতেগোনা কয়েকজনই অবশিষ্ট ছিল আমাদের মাঝে।"

"কেন?"

"কারণ, আমাদের হৃদয় অনেক আগেই চুরি হয়ে গিয়েছে।"

ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করতে লাগল লুকাঃ এটা তার গোত্রের খুবই গোপন একটা বিষয়। শত শত বছর লুকানো কিংবদন্তিরূপেই ছিল ব্যাপারটা। জিপসীদের ভেতর আলাদা বিশেষ একটা গোত্র ছিল। বাইরের কারও সাথে যোগাযোগ করতো না ওই গোত্রের লোকজন। অন্যান্য গোত্রের ভেতর সুরক্ষিত অবস্থায় বাস করতো তারা। তাদের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে দুই-একজন আলাদা হয়ে অন্যান্য গোত্রে বসবাস শুরু করতো, বিয়ে করে সংসার করতো। ছড়িয়ে দিতো তাদের প্রতিভা। তারপর একদিন হঠাৎ করে হারিয়ে যায় পুরো দলটা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে সবাইকে যদিওবা আবিষ্কার করা হয়, তাও মৃত অবস্থায়। ততোদিনে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে গণকবরে থাকা প্রতিটা দেহ। কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, কোনও বাচ্চার দেহাবশেষ ছিল না কবরটাতে।

রহস্যটা ধরতে পেরেছে এলিজাবেথ। "অপহরণ করা হয়েছিল বাচ্চাগুলোকে।"

"কাজটা কার, তা এখনও বুঝতে পারিনি আমরা...তবে অনুসন্ধানও থামাইনি। আমরা ভেবেছিলাম, ড. পোকের ওই নতুন ধরণের খোঁজার পদ্ধতি-ডিএনএ ট্রেইল, হয়তো রহস্যটা উদঘাটন করতে পারবে।"

"পেরেছিল কী?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

মাথা নাড়লো লুকা। "তা আর প্রকাশ করে যেতে পারেননি প্রফেসর। তবে কয়েক মাস আগে একটা অদ্ভুত জিনিস সম্পর্কে জানতে চান তিনি। ভারতে আমাদের 'অচ্ছুৎ' বলে গণ্য করার ব্যাপারটা।"

এ সম্পর্কে কিছুই মাথায় ঢুকল না এলিজাবেথের। উত্তরের আশায় মাস্টারসনের দিকে তাকাতেই, শ্রাগ করলেন তিনি। তবে তার চোখের দ্যুতি এলিজাবেথকে বলে দিল, কিছু একটা লুকাচ্ছেন প্রফেসর।

কলম হাতে মানচিত্রের একটা জায়গা চিহ্নিত করলেন উনি।
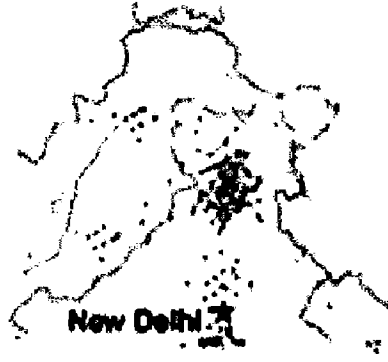
"কী ওটা?" জানতে চাইলো এলিজাবেথ। ওর চোখে পাঞ্জাব অঞ্চলের বিন্দুগুলোর ভেতর একটা ক্রস ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না।

"উত্তর জানতে হলে এখানে যেতে হবে আমাদের।"

"কী আছে ওখানে?" এবার প্রশ্ন করল গ্রে।

"উধাও হওয়ার আগে ওখানেই শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল আর্চিবাল্ডকে।"

১১
৬ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৫:৩৮
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

ভুতুড়ে শহরের পরিত্যক্ত শিশুপার্কটা অতিক্রম করছেন নিকোলাস।

শ্যাওলাপড়া গাঢ় সবুজ পানিতে স্থির হয়ে আছে রঙ জ্বলে যাওয়া খেলনা গাড়িগুলো। খুব তীক্ষ্ণ চোখে না তাকালে বোঝার উপায় নেই, এককালে হলুদ রঙের ছিল ওগুলো। লাল মরিচার আস্তরণ জমেয়ে গায়ে। বিকেলের শান্ত আকাশে ঝুলছে উঁচু নাগরদোলা। নিচে পেতে রাখা ছাতার তলায় চেয়ারগুলোর এখন শুধু কঙ্কালই অবশিষ্ট আছে। চেরনোবিলের আচমকা জেগে ওঠায় ধ্বংসের করাল গ্রাস ছেয়ে গেছে সর্বত্র।

এগিয়ে চললেন নিকোলাস।

উনিশশো ছিয়াশি সালের মে ডে-তে, অর্থাৎ শ্রমিক দিবসে উদ্বোধন করা হয়েছিল পার্কটা। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই তেজস্ক্রিয়তার বন্যায় ডুবে মারা যায় শহরের আটচল্লিশ হাজার অধিবাসী। জমকালো থিয়েটার, জাকজমকপূর্ণ পলিসিয়া হোটেল, বিরাট হাসপাতাল, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টসংখ্যক স্কুল-কলেজের সমন্বয়ে সত্তরের দশকে নির্মিত এই প্রাইপিয়াট শহরকে তৎকালীন সোভিয়েত স্থাপত্যবিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হতো। আর এখন? আক্ষরিক অর্থেই নিদর্শনে পরিণত হয়েছে সব।

থিয়েটারটাকে এখন থিয়েটার বলে চেনাই যায় না। হোটেলের ছাদে বেড়ে উঠছে বার্চ গাছ। স্কুলের শুধু কাঠামোটুকুই অবশিষ্ট আছে। তবে কোনও কোনও রুমে হয়তো এক আধটা পোড়া বই, ছেঁড়া পুতুল, খেলনা কাঠের ব্লকও খুঁজে পাওয়া যাবে। এক জায়গায় উদ্ধাররকর্মীদের ফেলে যাওয়া কিছু পরিত্যক্ত গ্যাস মাস্ক দেখতে পেলেন নিকোলাস। ভ্রম হলো, যেন মৃতদের মুখ সেগুলো, শূন্য কোটরে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এককালের সমৃদ্ধ নগরী আজ নীরব, নিস্তব্ধ। একসময় মানুষ বাস করার চিহ্ন বলতে শুধু ভাঙা জানালা, ফাটা দেয়াল, বিছানার ফ্রেম, আর জায়গায় জায়গায় ঝলসে যাওয়া রঙ। এখন শুধু পর্যটকরা আসে এখানে। জনপ্রতি একশো ডলার ফী দিয়ে দেখতে আসে এই ধ্বংসস্তুপ।

আর এসবের কারণ...

দুই মাইল দূরে অবস্থিত স্থাপনাটা নিকোলাসের চোখে ভেসে উঠল যেন।

চেরনোবিল পাওয়ার প্ল্যান্ট।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটার চার নাম্বার রিঅ্যাক্টরের মারাত্মক বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। এখনও খুব বেশি হলে মাত্র ত্রিশ ঘন্টা অবস্থান করা যাবে এখানে। শহরের আশাপাশের জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লালচে রঙের তেজস্ক্রিয় ছাই।

মাথা নাড়লেন নিকোলাস। জানেন, পেছন পেছন আসছে এক সাংবাদিক, সন্ধ্যার খবরে দেখানোর জন্য রেকর্ড করছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ। পার্কটা পেরিয়ে এলেন তিনি। যেখানেই যান না কেন, শুধুমাত্র পিচঢালা রাস্তাতেই থাকতে বলা হয়েছে তাকে। রাস্তা ছেড়ে এদিক সেদিক যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে তেজস্ক্রিয়তা। বেশি খারাপ এলাকাগুলো হলুদ রঙের ত্রিভুজ আঁকা সাইনবোর্ড দিয়ে চিহ্নিত করা।

আজ সন্ধ্যায়, সাবেক ঔজ্জ্বল্যের খানিকটা ফিরে পাচ্ছে পলিসিয়া হোটেল। যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে হোটেলের বলরুম। বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে আজকের পার্টির জন্য। এমনকি এতো কাল ধরে ছাদের উপর স্বমহিমায় বেড়ে ওঠা বার্চগাছটাও কেটে ফেলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষ অতিথিদের জন্য অন্তত এটুকু করাই যায়। প্রায় সব জাতির প্রতিনিধিরাই আজ উপস্থিত হতে চলেছেন এখানে। পাশাপাশি হলিউডের কিছু নামীদামী তারকারাও থাকবেন। তেজস্ক্রিয় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে নতুনভাবে, নতুন সাজে আত্মপ্রকাশ করবে প্রাইপিয়াট।

রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রী, উপস্থিত থাকবেন দু'জনেই। সেই সাথে থাকবেন সরকারের উচ্চ আর নিম্ন পর্যায়ের অনেক নেতৃবৃন্দ। কেউ কেউ অবশ্য পৌঁছে গিয়েছেন এখনই, পরিবর্তন আর নবজাগরণ সম্পর্কে ফাঁকা বুলি ছাড়ছেন। তবে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে তাদের কেউই সিনেটর নিকোলাস সলোকভের ধারেকাছে নেই। আর সকালের ব্যর্থ আততায়ী হামলার পর সকলের দৃষ্টি আরও বেশি করে নিবদ্ধ হয়ে আছে তার উপর।

রাস্তা ছেড়ে পাশ্ববর্তী একটা দেয়ালের দিকে এগোলেন ক্যামেরা পরিবেষ্টিত নিকোলাস। দেয়ালের গায়ে কালো কালিতে একজোড়া বাচ্চার প্রতিকৃতি আঁকা, খেলনা ট্রাক নিয়ে খেলছে। হঠাৎ দেখলে ছায়া বলে ভ্রম হয়। কথিত আছে, এক পাগলাটে ফ্রেঞ্চ লোক কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন এখানে। বাচ্চাদের মৃত্যুতে শোকাহত লোকটাই হস্তশিল্পের ছাপ রেখে গিয়েছেন শহরের বিভিন্ন জায়গায়।

অবশ্য নিকোলাসের নিজের ছায়া, ইলেনা কংক্রিটের রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন আসার আগেই তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারণকারী যন্ত্র নিয়ে গোটা এলাকাটা ঘুরে দেখেছে ও। এই ছবিটাও সে-ই চিহ্নিত করেছে।

যা হচ্ছে এবং যা হতে চলেছে, তার সবই লোক দেখানো।

এক হাত বাড়িয়ে দেয়ালটা স্পর্শ করলেন নিকোলাস, বাচ্চাগুলোর কাঠামোতে আঙুল বোলালেন। অন্য হাতের কব্জি তুলে ধরেছেন চোখের সামনে। ওই হাতের

আস্তিনে আগেই কয়েকফোঁটা অ্যামোনিয়া ঢেলে রেখেছিল ইলেনা, যাতে চোখের সামনে ধরলেই অ্যামোনিয়ার প্রভাবে পানি চলে আসে চোখে।

ক্যামেরার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সিনেটর, হাত এখনও দেয়ালে। "এই জন্যই পরিবর্তন জরুরী," বলে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন শহরের দিকে। "এই ধ্বংসস্তুপের দিকে যে-ই একবার তাকাবে, সে-ই বলবে নবজাগরণ দরকার। সব দুঃস্বপ্ন পেছনে ফেলে সামনে এগোতে হবে আমাদের। তবে স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে হবে সবকিছুই, ভুললে চলবে না।"

হাত তুলে গালে নেমে আসা চোখের পানির ফোঁটা মুছে ফেললেন নিকোলাস, আরও কঠোর করলেন মুখের অভিব্যক্তি। সামান্য চোখের পানি পর্যন্তই ঠিক থাকবে ব্যাপারটা, তবে বেশি দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না। তারপর মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকে এলেন খানিকটা। "তাকান শহরটার দিকে! দেখুন কতখানি ক্ষতি হয়েছে, সভ্যতাকে কতখানি গ্রাস করেছে প্রকৃতি। শুনলাম কেউ একজন বলছেন, এটা নাকি চেরনোবিলের ইডেনের বাগান। তাকিয়ে দেখুন সবাই, তাকান গোটা শহরকে গ্রাস করে নেয়া সুন্দর বনটার দিকে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বলে চললেন তিনি। "প্রকৃতির বর্তমান সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়ার কিছুই নেই। এখনও তেজস্ক্রিয়তায় ভরপুর গোটা এলাকা। এখানে উপস্থিত সবাইকেই দুটো মিলিটারি চেকপোস্ট অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, পার হয়ে আসতে হয়েছে সারি সারি সাজিয়ে রাখা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বহনকারী দু'হাজার ট্রাক, বিমান, অ্যাম্বুলেন্সকে। এখনও যথেষ্ট বিপজ্জনক, কাছে যাবার মতো পরিস্থিতিতে পৌঁছায়নি বাহনগুলো। নিজ নিজ ডোসিমিটার ব্যাজ পরে আছি আমরা সবাই। প্রকৃতি ফিরেছে ঠিকই, তবে মাত্রাতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে। যার ফল ভুগতে হবে পরবর্তী কয়েক প্রজন্মকে। এটাকে পুনর্জন্ম বলা যায় না, শুধুই মিথ্যে আশা। পুনর্জন্ম তখনই হবে, যখন নতুন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবো আমরা, যাত্রা করবো নবজাগরণের উদ্দেশ্যে।"

দেয়ালে আঁকা ছবিটার দিকে আবারও ফিরে তাকালেন তিনি।

"না করে উপায়-ই বা কী?" বাচ্চাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে দুঃখী কণ্ঠে কথাটা বলে ভাষণ শেষ করলেন নিকোলাস।

তালি বাজাতে লাগল কেউ কেউ।

ক্যামেরার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন নিকোলাস, ছবি তোলার পোজ। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের কারণে দেয়ালের বাচ্চাগুলোর উপর গিয়ে পড়ছে তার ছায়া। কয়েক মুহূর্ত পর রাস্তায় উঠে এলেন তিনি।

হোটেলের উদ্দেশ্যে এগোনো শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। পেছন পেছন আসছে ইলেনা। সামনের বাঁক ঘুরতেই পলিসিয়া হোটেলের সামনে জটলা চোখে পড়ল। একটা চওড়া লিমোজিন দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের প্রধান প্রবেশপথের সামনে, বুলেটপ্রুফ কয়েকটা সেডান গাড়ি ঘিরে রেখেছে ওটাকে। কালো স্যুট পরা কয়েকজন দেহরক্ষী বেরিয়ে এসে একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করল। দীর্ঘদেহী একটা অবয়ব

বেরিয়ে এল লিমোজিনের দরজা খুলে, অভিবাদন গ্রহন করার উদ্দেশ্যে উপরে তুলে নাড়তে লাগল একটা হাত।

সবগুলো ক্যামেরার মুখ ঘুরে গেল আগন্তুকের দিকে। মুহূর্তটা ফ্রেমবন্দি করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না কেউ।

পৌঁছে গিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে একটা নিউক্লিয়ার চুক্তি সাক্ষর করতে এসেছেন তিনি।

মূলত তাকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যই প্রাইপিয়াটে আজ এতো হট্টগোল।

প্রেসিডেন্টকে ঘিরে থাকা জটলাটা হোটেলের লবিতে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন নিকোলাস, তারপর আবার সামনে বাড়লেন।

ঠিকঠাকমতোই চলছে সবকিছু।

সূর্যাস্তের আবছা আলোয় চেরনোবিল পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে চোখ বুলালেন তিনি।

আগামীকাল, ঠিক এই সময়ে, পুনর্জন্ম ঘটবে পৃথিবীর।

সন্ধ্যা ৫:৪৯
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

ঢালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সামনের নিচু পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে মঙ্ক। সূর্য ডুবতে শুরু করায় ছায়া নেমে আসছে গোটা উপত্যকা জুড়ে।

"ওটা পাড়ি দিতেই হবে?" জিজ্ঞেস করল ও। "এছাড়া আর কোনও পথ নেই?"

"আছে," মানচিত্রটা ভাঁজ করতে করতে জবাব দিল কনস্টানটাইন। "ঘুরপথে গেলে প্রায় একশো মাইলেরও বেশি হবে। সময়ও লাগবে বেশ কিছুদিন। তবে এদিক দিয়ে এগোলে, লেক করাশয়ের ওপাড়ের মাইনটার দূরত্ব মাত্র বারো মাইল।"

নিচের জলাভূমির দিকে তাকাল মঙ্ক। নদীটা এগিয়ে এসে এই নিচু জলাভূমিতে মিলিত হয়েছে। যাত্রাপথে এমন নিচু এলাকা পেলে সব জলপ্রবাহ-ই তা করে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত জলপ্রপাতগুলোতে রূপালি রঙের ঝলক দেখা যাচ্ছে। নিচের এলাকাটা মাঝারি মাপের আগাছা, ঝোপঝাড় আর ঘাসের দঙ্গলে ভরা, পার হওয়া খুব একটা সহজ হবে না। আর অন্ধকারে এগোলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক। আর কোনও উপায় নেই। জলাভূমিটা পার হতেই হবে। ঘুরে তাকাল সে, পিওতর আর কিস্কা একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছে। ভেজা বেড়ালের এতো জবুথবু অবস্থা দুটো বাচ্চারই। নদীর স্রোতে ভেসে প্রায় মাইলখানেক এগোনোর পর পায়ের নিচে মাটির দেখা পেয়েছিল ওরা। পাহাড়ের নিচে নামতে নামতে আরও প্রশস্ত হয়েছে নদীটা। এখন তাদের পিছু নিতে হলে আরও বেকায়দায় পড়তে হবে বাঘদুটোকে।

গত দু'ঘন্টা একেবারে চুপচাপ হয়ে ছিল পিওতর, কোনও কথাই বলেনি। মার্তার জন্য দুশ্চিন্তা করছিল হয়তো। তবে স্বস্তিদায়ক ব্যাপার হলো, বাঘগুলোর আনাগোনার কোনও পূর্ভাবাস দেয়নি ছেলেটা।

পানি থেকে ওঠার পর সবার কাপড়ই নিংড়ে নেয়া হয়েছে। গত দুঘন্টা যাবত পথ হাঁটতে থাকায় বেশ গরম লাগছিল। তবে এখন আবার জাঁকিয়ে বসছে ঠাণ্ডা। সন্দেহ নেই, শীতল একটা রাত অপেক্ষা করছে।

কনস্টানটাইন ঠিকই বলেছিল। চলা থামায়নি ওরা। এই মুহূর্তে সমতল ভূমিতে থাকা একটুও নিরাপদ নয়, বিশেষ করে যখন পেছনে ধেয়ে আসছে একজোড়া হিংস্র বাঘ। আর কিছু না হোক, লুকিয়ে থাকার মতো আশ্রয় অন্তত যোগাতে পাবে জলাভূমিটা।

ঢালু পথ ধরে এগোচ্ছে মঙ্ক। হাত ধরে পিওতরকে একটা ঝোপ পার হতে সাহায্য করল ও, বোনের হাত ধরে আসছে কনস্টানটাইন। সময়ের সাথে সাথে ক্লান্ত হয়ে আসছে ছোট বাচ্চাদুটো।

ক্রমেই গাছের সারি ঘন হয়ে আসছে। বেশিরভাগই পাইন আর বার্চ। তবে পানির কিনার ঘেঁসে কিছু উইলো গাছও আছে। কুঁজো হয়ে নুয়ে ডালপালা মেলে রেখেছে কাদাপানির উপর।

জুনিপার আর বেরিঝোপের মাঝে রাস্তা বানিয়ে এগিয়ে চলল মঙ্ক। তবে যত এগোচ্ছে, পায়ের নিচের জমি ততোই যেন নরম হচ্ছে। একটু পরই দেখা গেল পায়ের নিচে মাটির চিহ্নমাত্র নেই, শুধুই পিচ্ছিল শৈবাল। পাথর, গাছের গুঁড়ি কোথায় নেই সবুজ শৈবালের দঙ্গল! মনে হচ্ছে যেন আশেপাশের সবকিছুকে মাটির ভেতর টেনে নিতে চাইছে সেগুলো। আর জায়গায় জায়গায় কাদাপানি তো আছেই। পায়ের নিচে পানি বাড়ার সাথে সাথে গতি কমে আসলে লাগল দলটার।

মাথার উপর একটা তীক্ষ্ম চিৎকার শুনে উপরে তাকাল মঙ্ক। একটা ঈগল ডানা মেলে পার হয়ে গেল ওদের। যথেষ্ট বড় পাখিটা, মঙ্কের দুই হাত দুদিকে প্রসারিত করলে যতটুকু জায়গা নেবে, মেলে রাখা ডানা দুটো তার সমান প্রায়।

শিকার খুঁজছে ঈগলটা।

পাখিটাকে দেখে পেছনে ফেলে আসা বিপদের কথা মনে পড়ে গেল মঙ্কের। তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য সবাইকে তাড়া দিল ও। বাচ্চাগুলো যেন একেবারে পরিবেশের জন্য তৈরি। কাদাপানিতে ভেসে ভেসে এগোচ্ছে ওদের হালকা পাতলা শরীরগুলো। উল্টোদিকে ভারী শরীর নিয়ে প্রতিটা পা সাবধানে ফেলতে হচ্ছে মঙ্ককে। নয়তো যে কোনও সময় পা থেকে কাদায় খুলে হারিয়ে যাবে বুট।

পরবর্তী একঘন্টা বিরতিহীনভাবে এগিয়ে চলল ওরা। মঙ্কের হিসাবে প্রায় এক মাইল। আশেপাশের প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা নড়াচড়া মন দিয়ে খেয়াল করছে মঙ্ক। ওদের সামনেই পথ থেকে সরে গেল একটা সাপ। একটা শেয়াল ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েই ছুট লাগালো।

পানি এখন পায়ের গোড়ালি ধুয়ে দিচ্ছে। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। ঝিঁঝি পোকার ডাকে ভারী হয়ে আছে আশেপাশের পরিবেশ। সূর্য পুরোপুরি পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যাওয়ায় ছেয়ে আসছে ঘন অন্ধকার।

হঠাৎ পিওতর হাঁটা থামিয়ে মঙ্কের হাত চেপে ধরল।

গাছের সারির ভেতর থেকে সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে কিছু একটা।

না...

আঁতকে উঠল মঙ্ক, বুঝে ফেলেছে ওটা কী হতে পারে। "পালাও!"

পিওতরকে আঁকড়ে ধরে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতেই গা ঝাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। বোনের হাত ধরে দৌড় শুরু করল কনস্টানটাইন। সামনে এক পা এগোতেই ঘন কাদায় হাঁটু পর্যন্ত এক পা ডুবে গেল মঙ্কের। হ্যাঁচকা টানেও উঠে এল না, মনে হলো যেন আটকে আছে সিমেন্টে।

এগিয়ে আসছে ধাওয়াকারী, ডালপালার বাড়ি খাওয়ার শব্দ কাছে চলে আসছে ক্রমশ।

পিওতরকে নিজের শরীরের পেছনে ঠেকে দিল মঙ্ক, চাইছে আক্রমণের ধাক্কাটা ওর উপর দিয়েই যাক। কিন্তু পানিতে লাফ দিল ছেলেটা, দৌড়ে পালানোর বদলে মঙ্ককে পেছনে ফেলে এগোতে লাগল শব্দের উৎসের দিকে।

"না! পিওতর, পালাও!"

শুনলো না ও, এগোতেই থাকলো। অন্যদিকে জঙ্গল থেকে একটা ছায়া ছুটে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। এগিয়ে এসে পিওতরকে জড়িয়ে ধরল কালো অবয়বটা।

মার্তা।

হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে মঙ্কের হৃৎপিণ্ডে। "পিওতর, আগেই বলতে পারতে।" আস্তে আস্তে টেনে কাদা থেকে পা তুললো ও।

জড়িয়ে ধরে পিওতরের ছোটোখাটো শরীরটা পানি থেকে উপরে উঠিয়ে ফেলেছে বুড়ো শিম্পাঞ্জী। এগিয়ে এল কনস্টানটাইন আর কিস্কা। তাদের থেকে পিওতরকে নামিয়ে দিল মার্তা, তারপর একে একে ছেলেমেয়ে দুটোকে আলিঙ্গন করল। তারপর এগিয়ে এল মঙ্কের দিকে, হাত দুটো দুদিকে ছড়ানো। বাচ্চাগুলোর মতো মঙ্কও জড়িয়ে ধরল ওকে। শরীর গরম হয়ে আছে প্রানিটার। বুঝতে পারল, ওদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বেশ ধকল সইতে হয়েছে ওকে।

কোলাকুলিপর্ব শেষ হতেই নতুন চিন্তা ভর করল মঙ্কের মাথায়। শিম্পাঞ্জীটা ওদের খুঁজে পেল কী করে? তবে এর চেয়েও ভয় লাগল আরেকটা কথা ভেবে। যদি মার্তা নদী পেরিয়ে ওদের খুঁজে বের করে ফেলতে পারে, তাহলে তো বাঘদুটোও...

"চলো, এগোই," বলে সবাইকে সামনে এগোতে ইশারা করল ও।

আবারও শুরু হলো জলাভূমি ধরে পথচলা। মার্তার আগমনে কিছুটা উৎফুল্ল হয়েছে বাচ্চাগুলো। কিন্তু শীঘ্রই প্যাচপ্যাচে কাদা ওদের শক্তি শুষে নিতে লাগল।

আগেআগে চলেছে কনস্টানটাইন। মঙ্কের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে পিওতর। আর মার্তা আসছে পানির উপর নুয়ে থাকা গালের ডালে ঝুলে ঝুলে।

একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সামনের খুব অল্প জায়গাই নজরে পড়ছে শুধু। বামপাস থেকে রাতের আগমন বার্তা ঘোষণা করতেই যেন ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

সামনে থেকে কনস্টানটাইনের উত্তেজিত ভেসে এল। "একটা ইজবা।"

ব্যাপারটাকে খারাপ কিছু ধরে সামনে এগোতেই মঙ্ক বুঝতে পারল, নিচু হয়ে আছে পানির স্তর। একটা উইলোর ডাল মুখের সামনে থেকে সরাতেই সামনে ছোট দ্বীপের মতো উঁচু একটা জায়গা দেখা গেল। তবে খালি নয় ওটা, পুরনো ছোট একটা কাঠের ঘর দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। একমাত্র জানালাটা বন্ধ, শ্যাওলা জমে আছে দেয়ালে। ধোঁয়াহীন চিমনিটা বলে দিল, কেউ থাকে না ঘরটাতে।

দ্বীপটার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করছে কনস্টানটাইন।

এগিয়ে এল মঙ্ক।

আঙুল তুলে ঘরটার দিকে ইশারা করল ছেলেটা। "শিকারীদের থাকার জায়গা। গোটা পাহাড়ি এলাকা জুড়েই এমন অনেক কেবিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।"

"দাঁড়াও এখানেই," বলল মঙ্ক। "আগে আমি দেখে আসি।"

উপরে উঠে ঘরটা প্রদক্ষিণ করল ও। আশেপাশে কোমর সমান লম্বা ঘাসের দঙ্গল বলে দিল, গত কয়েক বছর কারও পা পড়েনি এখানে। কেবিনটা কাঠের তৈরি, শুধু চিমনিটা পাথরের। একমাত্র জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধ। উল্টোদিকে একটা ছোট জেটি চোখে পড়ল। কোনও নৌকা নেই যদিও, তবে পাশের নলখাগড়ার ঝোপের উপর একটা ভেলা উঠিয়ে রাখা আছে। ভেলার প্রায় অর্ধেক শৈবালের চাদরে ঢাকা থাকলেও দেখে মনে হচ্ছে, পানিতে ভাসালে কাজে দেবে বাহনটা।

কেবিনের সামনের দিকে ফিরে এল মঙ্ক। দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। তালা লাগানো না থাকলেও জ্যাম হয়ে আছে কব্জা। জোরে ঠেলা দিতেই ক্যাচকোচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল অবশ্য, তবে খুলে গেল। ভেতরটা মোটামুটি শুকনোই আছে। পাইন কাঠের তৈরি মেঝেতে কিছু খড় ছিটানো। ঘরে আসবাব বলতে খাটো একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার। দেয়ালজুড়ে সারি সারি সাজানো কেবিনেট। এককোনায় অবস্থিত ফায়ারপ্লেসের দেয়ালে কয়েকটা টিনের পাত্র আর কড়াই ঝুলানো, আগের বাসিন্দারা সম্ভবত ফায়ারপ্লেসেই রান্নাবান্নার কাজ সারতো। একপাশে কিছু শুকনো কাঠও চোখে পড়ল।

মন্দের ভালো আর কি!

বাইরে বেরিয়ে বাচ্চাদের ভেতরে চলে আসতে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। যদিওবা থামতে চায় না ও, কিন্তু তাদের সবারই বিশ্রাম প্রয়োজন। শুকনো কাঠ আছে, ছোট করে আগুনও জ্বালানো যাবে। জানালাটা বন্ধ রাখলেই হলো, তাহলে বাইরের কারও চোখেও পড়বে না। আর আগুনের সাহায্যে জামাকাপড়গুলোও শুকিয়ে নেয়া যাবে।

তারপর সকাল হলেই আবার পথচলা শুরু। কপাল ভালো থাকলে হয়তো ভেলাটা ব্যবহার করা যাবে।

একটা ম্যাচ খুঁজে পেল কনস্টানটাইন। কাঠি ঘষতে কোনও সমস্যা ছাড়াই আগুন পাওয়া গেল। শুকনো কাঠ ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল আগুনের স্পর্শ পেয়ে। চিমনি বেয়ে উঠে যেতে লাগল মৃদু ধোঁয়া।

মঙ্ক আগুনটা উস্কে দিতে দিতে দেয়ালের কেবিনেটগুলো হাতড়াতে লাগল কনস্টানটাইন। মাছ ধরার সুতো, কেরোসিন ভরা একটা বাতি, একটা স্টিলের ছুরি, আরেকটা অর্ধেক ভরা শটগানের গুলির বাক্স পাওয়া গেল। যদিও বা কোনও বন্দুক দেখা গেল না। একটা ছোট আলমারি থেকে বেরোলো কিছু অশ্লীল ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন, আগুন ধরাবার কাজে মঙ্ককে সাহায্য করল ওগুলো। তবে উপরের তাকে পাওয়া গেল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস, চারটা ভাঁজ করা কম্বল।

কম্বলগুলো মঙ্কের হাতে নামিয়ে দেয়ার সময় ওর কোমরে আটকানো রেডিয়েশন মনিটরে নজর দিল কনস্টানটাইন। মঙ্কও চোখ নামিয়ে তাকাল কোমরের দিকে। সাদা থেকে গোলাপি রঙ ধারন করেছে ওটা।

"তেজস্ক্রিয়তা," বিড়বিড় করে উঠল মঙ্ক।

মাথা নেড়ে সায় দিল কনস্টানটাইন। "লেক করাশয়।" উত্তর-পূর্ব দিকে ইশারা করল ও। "ধীরে ধীরে বাইরেও মিশছে ওটার পানি।"

বাইরের পানির কথা ভাবল মঙ্ক। সারাক্ষণ শুধু বাঘগুলোর কথাই ভেবেছে ও, তেজস্ক্রিয়তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

সন্ধ্যা ৭:০৪

কম্বল গায়ে দিয়ে আগুনের পাশে বসে আছে পিওতর। জামাকাপড় খুলে মাছ ধরার সুতোটাতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। জুতোগুলো শুকানোর জন্য সারি করে ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখা। কাপড় ঝুলানো সুতোটা এতোই চিকন যে মনে হচ্ছে ওটার কোনও অস্তিত্বই নেই, হাওয়ায় ভাসছে কাপড়গুলো।

আগুনের শিখার নাচানাচি দেখতে ভালো লাগছে ওর, তবে ধোঁয়া পছন্দ না। জ্যান্ত প্রানির মতো চিমনি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার সারি। একটু কেঁপে উঠল পিওতর।

স্কুলে ওদের দেখাশোনার কাজ করতো এক মহিলা। সে প্রায়ই ওদের সবাইকে ডাইনী বাবা ইয়াগার গল্প বলতো। ঘন জঙ্গলে একটা কাঠের কেবিনে থাকতো ডাইনীটা, ওই কেবিনের আবার মুরগির পায়ের মতো কিলবিলে পা ও ছিল। শিকার ধরার জন্য জঙ্গলে হেঁটে বেড়াতো ওটা, আর বাচ্চাদের পেলেই নাকি চিবিয়ে খেতো। বাইরে ওদের কেবিন ঠেস দিয়ে রাখা খুঁটিগুলোর কথা মনে পড়ল পিওতরের। এটাই যদি সেই বাবা ইয়াগার কেবিন হয়? গিলে ফেলে ওদের সবাইকে?

আশেপাশে তাকাতে লাগল ও, দেখছে ডাইনীর কোনও অদৃশ্য চ্যালাপ্যালা চোখে পড়ে কি না। কিছু দেখা গেল না। যাবেই বা কীভাবে, আগুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে গোটা ঘরজুড়ে।

আগুনের দিকে আরেকটু ঘেঁষে এল ও। চোখ রাখল ধোঁয়ার সারির দিকে।

ভয় কাটানোর জন্য চুপচাপ বসে রইল ও। মার্তা এগিয়ে এসে পাশে বসল। শিম্পাঞ্জীটার গায়ে হেলান দিল পিওতর। মার্তাও একহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, আরও কাছে টেনে নিলো।

কোনও ভয় নেই।

কিন্তু তবুও ভয় হচ্ছে পিওতরের। মনে হচ্ছে যেন হাজারটা মাকড়শা কিলবিল করছে ওর খুলির ভেতর। ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও, যেন একমাত্র বিপদ ওই ধোঁয়াটুকুই। বাবা ইয়াগার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্য নীরবে শাসাচ্ছে ওদের।

অশান্ত হয়ে উঠল পিওতরের হৃৎপিণ্ড।

ডাইনীটা আসছে।

বুঝতে পেরেছে ও।

ধোঁয়ার ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে আসবে কিছু একটা। মার্তার হুউ-হুউ শব্দ একবিন্দু স্বস্তি দিতে পারছে না ওকে। জানে, বিপদে আছে ওরা। ডাইনীটা ওদের খেতে আসছে। কাঠ ফাটার পপ শব্দ কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল পিওতর। আর তারপরেই সত্যিটা ধরা দিল ওর চোখে।

বিপদ আসছে।

তবে ওদের না।

অন্য কারও।

ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে রইল ও, একটা আকৃতি নিচ্ছে চিমনি বরাবর উঠতে থাকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেই ধোঁয়াই তাকে জানিয়ে দিল, কে বিপদে পড়েছে।

সকাল ১১:০৭

"ডি.আই.সি.," বাচ্চাটার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলে উঠল লিসা।

তবে কথাটার আগাগোড়া কিছুই ঢুকল না ক্যাটের মাথায়। বিছানার একপাশে হাতদুটো পেটের সামনে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। হাসপাতালের গাউন পরে নিস্তেজ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে ও। কাপড়ের নিচ থেকে তার বেরিয়ে দেয়ালে আটকানো কয়েকটা যন্ত্রপাতির সাথে যুক্ত হয়েছে... রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দনের হার ইত্যাদি দেখাচ্ছে মনিটরে। একটা সরু পাইপ বেয়ে শরীরে ঢুকছে স্যালাইন। তারপরও গত কয়েক ঘন্টায় পরিবর্তন বলতে শুধু আরও পাংশু হয়ে গেছে মেয়েটার চামড়ার রঙ, ঠোঁটের রঙ নীল হয়ে আসছে।

"ডিজেমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন," ব্যাখ্যা করল লিসা।

মেডিক্যাল সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল মঙ্কের, হয়তো ও বুঝতে পারতো ব্যাপারটা, ভাবল ক্যাট। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরল।

ধুর ছাই, কী ভাবছি এসব আমি!

এখনও বাচ্চাটার আঁকা ছবিটাই ঘুরছে ওর মাথায়। একটা টান অনুভব করছে মেয়েটার প্রতি। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় ওর চোখেও নিজের প্রতি ভালোবাসা দেখেছে ক্যাট। সাড়াশব্দ না করলেও ছোট ছোট চোখজোড়া ক্যাটের দিকেই তাকিয়ে ছিল সারাক্ষন।

বিশ্বাস আর ভালোবাসার স্বীকৃতিভরা সেই দৃষ্টিই বাচ্চাটার প্রতি ওর মনকে দুর্বল করে দিয়েছে। নিজেরও একটা ছোট মেয়ে থাকায় ব্যাপারটা উপলব্ধি সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্যাটের জন্য । আর স্বামী হারানোর পর থেকে দিনদিন যেন বেড়ে চলেছে ওর মাতৃত্বসংক্রান্ত অনুভূতি।

"মানে কী?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

লিসার সাথে বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সবেমাত্র গ্রে'র সাথে ফোনে কথা বলে এসেছেন। হামলা শিকার হয়েছিল ওরা। কোনওমতে বেঁচে গিয়ে এখন চলেছে উত্তরদিকে। হামলার পেছনে কে দায়ী, এটা বের করার জন্য ইতিমধ্যে লোক লাগিয়ে

দিয়েছেন পেইন্টার। প্রফেসর মাস্টারসনের উপর হামলার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। গ্রে'র ভারতে যাওয়ার কথা কেউ জেনে গিয়েছে সম্ভবত।

বেশ কয়েক ধরণের রক্ত পরীক্ষা করেছে লিসা। হামলার রহস্য উদ্ঘাটনে লোক লাগিয়ে দিয়ে এখন লিসার রিপোর্ট শুনতে এসেছেন ডিরেক্টর।

পেইন্টারের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকলেন ড. শেন ম্যাকনাইট। স্যুট, টাই খুলে ফেলেছেন। শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। গ্রে'র ডিব্রীফিং-এর ব্যাপারে কয়েকটা ফোনকল সারতে গিয়েছিলেন উনি। পেইন্টার ঘুরে তাকালেন তার দিকে, কিন্তু একটা চেয়ারে বসতে বসতে লিসাকে কথা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তারপর ডিরেক্টর।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলো লিসা। "ডি.আই.সি. এমন একটা রোগ, যার কারণে দেহের নানা অংশে ছোট ছোট রক্তপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। রক্ত তঞ্চনের জন্য দরকারি সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলোকে নিঃশেষ করে ফলে। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ। কারণ অনেক,তবে সাধারণত অন্য কোনও রোগের ফলাফল হিসবে শুরু হয় এই সমস্যা। এই যেমন,সাপে কাটা,ক্যান্সার,দেহের অনেকটা অংশ পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশি হয় মস্তিষ্কে প্রদাহের জন্য। এক্ষেত্রে যেহেতু জ্বর আর..."

হাত বাড়িয়ে মেয়েটার মাথায় লাগানো ডিভাইসটার দিকে ইঙ্গিত করল লিসা। "সব ধরনের পরীক্ষার রিপোর্ট কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করে। কমে আসা অনুচক্রিকা,ফ্রিবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া,রক্ত পাতের সময় বেড়ে যাওয়া...আমি নিশ্চিত। আলাদাভাবে অনুচক্রিকা দেয়া হয়েছে মেয়েটাকে। সেই সাথে অবস্থা একটু নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কিছু ওষুধও দিয়েছি। কিন্তু এসব আসলে কোনওমতে রোগটাকে ঠেকিয়ে রাখা। কোন রোগের কারণে এই ডি.আই.সি. শুরু হলো,তা না জানা আর সেই রোগের চিকিৎসা না করা পর্যন্ত,এর প্রতিকার হবে না। মেয়েটার মাঝে কিন্তু আমি কোনও ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের প্রমাণ পাইনি। রক্ত বা মজ্জারস পরীক্ষা করেও দেখেছি। ভাইরাস জনিত কারণে হতে পারে। তবে আমার মনে হয়,অন্য কিছু একটা এর জন্য দায়ী। এমন কিছু,যে ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। সম্ভবত ওই ইমপ্ল্যান্টের সাথে জড়িত কিছু একটা হবে।"

বড় করে শ্বাস টানলো ক্যাট। "আর ওটা জানা না গেলে তো..."

লিসাও ক্যাটের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে বুকে হাত বাঁধলো। "আস্তে আস্তে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর অবস্থা। ডি.আই.সি.-এর আরেকটা মানেও হয়। ডেথ ইজ কামিং... মৃত্যু আসছে।"

পেইন্টারের দিকে ফিরল ক্যাট। "কিছু একটা করতে হবে আমাদের।"

তার উদ্দেশ্যে নড করে শেনের দিকে তাকালেন ডিরেক্টর। "আর কোনও পথ খোলা নেই। উত্তর চাই আমাদের, যে কোনও মূল্যে। রোগটার ব্যাপারে হয়তো পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও জানতে পারব। তবে কেউ তো একজন আছে, যে বায়োটেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের থেকে বেশি জানে। সেই সাথে মেয়েটার ক্ষেত্রে কী ঘটেছে, তার ব্যাপারেও বিস্তারিত জানে।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শেন। "খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে এখন।"

ক্যাট বুঝতে পারল, এই ব্যাপারে আগেই কিছু একটা আলাপ হয়েছে শেন আর পেইন্টারের। "কী প্ল্যান করছেন আপনারা?"

"বাচ্চাটাকে বাঁচাতে চাইলে"- নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালেন পেইন্টার- "শত্রুর সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে আমাদের।"

সকাল ১১:৩৮

লম্বা হলওয়ে ধরে এগোচ্ছেন ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড। ওয়াল্টার রীড একাডেমীর এই অংশটা মেরামত করা দরকার, ভাবলেন তিনি। জরাজীর্ণ রূপ ধারন করেছে হলওয়ের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরের দেয়ালগুলো। জায়গায় জায়গায় খসে পড়ছে প্লাস্টার। তবে তার গন্তব্য এগুলোর কোনওটা নয়, আরও সামনের মেন্টাল ওয়ার্ডে। ওখানকার সিমেন্টের দেয়াল যথেষ্ট শক্তপোক্ত, ছোট ফোকরওয়ালা দরজাগুলো স্টিলের তৈরী।

একেবারে শেষের সেলের দিকে এগোলেন ট্রেন্ট। দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে একজন গার্ড। একপাশে সরে গিয়ে তার উদ্দেশ্যে চাবির গোছা বাড়িয়ে দিল লোকটা।

চাবিগুলো হাতে নিয়ে দরজার ফোকরে চোখ রাখলেন ট্রেন্ট। বিছানায় শুয়ে আছে ইউরি। জামাকাপড় অবশ্য পরনেই আছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই উঠে বসলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী। বয়সের তুলনায় শরীর এখনও যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ। নিশ্চিতভাবেই, বিভিন্ন অ্যান্ড্রোজেন আর অ্যান্টি এজিং হরমোন ব্যবহারের ফল।

দরজা ঠেকে ভেতরে ঢুকলেন ম্যাকব্রাইড। "কাজে যাবার সময় হয়েছে, ইউরি।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চোখে অদ্ভুত দ্যুতি খেলা করছে। "সাশা?"

"চলো...দেখি কী হয়।"

দরজার দিকে এগোলেন ইউরি। হঠাৎ তার এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠা ভালো ঠেকলো না ম্যাকব্রাইডের। বোঝাই যাচ্ছে, যথেষ্ট অত্যাচারও দমাতে পারেনি লোকটার শারীরিক অবস্থা। তবে আশার কথা হলো, ইউরি এখনও তার কব্জায় আছে।

ছয় ফুটি শক্তপোক্ত দেহের কারণে ইউরির কাছ থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা যদিও করছেন না ম্যাকব্রাইড, তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে অস্ত্রধারী গার্ডকে পেছন পেছন আসতে ইশারা করলেন তিনি।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" জিজ্ঞের করলেন ইউরি।

আর্চিবাল্ডের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে, মনে মনে জবাব দিলেন তিনি। বুড়ো প্রফেসরের মৃত্যুর ব্যবস্থাও ট্রেন্ট নিজেই করেছিলেন। আর এখন সময় এসেছে তার আবিষ্কারকেও ধুলায় মিশিয়ে দেয়ার...সেই গোপন সংস্থা যেটার কথা জেসনদের সাথে কাজ করার সময় মাথায় এসেছিল আর্চিবাল্ডের।

খুনী বিজ্ঞানীদের সেই সংস্থা।

আক্ষরিক অর্থে বলা যায়, *অস্ত্রধারী জেসনস।*

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সিগমাকে কোনওমতেই বাঁচিয়ে রাখা চলবে না ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইডের।

১২
৬ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৭:৩৬
পাঞ্জাব, ভারত

সূর্য পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। রোজারোর গাড়ি পছন্দ করার সিদ্ধান্তটা ঠিকই আছে, ভাবল গ্রে। এবড়োখেবড়ো পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে ওদের এসইউভি। সামনের সিটে বসে এক হাত ছাদে ঠেকিয়ে রেখেছে ও, যেন ঝাঁকির চোটে সিট থেকে পড়ে না যায়। প্রায় এক ঘন্টা হলো, সভ্যতা ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথে ঢুকেছে ওরা।

খামারবাড়ি, আখ খেত, আমের বাগান দেখা যাচ্ছে খানিক পরপর। মাস্টারসন ইতিমধ্যে এই এলাকাটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ওদের। ভারতের অধিকাংশ ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি খাদ্যশস্য এই অঞ্চলেই জন্মে। আক্ষরিক অর্থেই পাঞ্জাবকে ভারতের গোলাঘর বলা চলে।

"আর এসব করার জন্য লোকও লাগে," পেছনের সিট থেকে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কি তার সাথে একই সারিতে বসে আছে। পেছনের সিটে বসে নিজের ছুরিগুলো পালিশ করছে লুকা।

"বামদিকে যান," বললেন মাস্টারসন।

একটা নিচু, প্রায় খাঁড়ির মতো অংশে প্রবেশ করল গাড়িটা। এদিকে এমন নিচু জায়গা অহরহই দেখা যায়। পাঁচটা নদী থাকায় পাঞ্জাবকে 'পঞ্চনদের ভূমি' ও বলা হয়ে থাকে। এদিকের কৃষি সমৃদ্ধির এটাও একটা প্রধান কারণ।

আকাশের দিকে তাকাল গ্রে। খুব নিচু দিয়ে উড়ছে মেঘের রাশি। মনে হয়, রাত শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টি শুরু হবে।

"এগিয়ে যান," বললেন মাস্টারসন। "পরের পাহাড়টাই আমাদের লক্ষ্য।"

ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল এসইউভি। কিছুক্ষণ পর একটা উপত্যকা দেখা গেল। পাম-পাতার ছাউনি দেয়া কিছু মাটির ঘর দেখা যাচ্ছে ঢালের উপরের সমতল জায়গাটাতে, ছোট একটা গ্রাম। ফাঁকে ফাঁকে কিছু পাথরের বাড়িও আছে অবশ্য। কয়েকটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে গ্রামের পাশে, কয়েকজন মানুষ মাঝেমাঝে লাঠি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে আগুন। আবর্জনা পোড়াচ্ছে। আগুনের পাশেই একটা গরুর গাড়ি রাখা, একমাত্র ষাঁড়টা পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওদের গাড়ির দিকে।

"ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোকই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে," বললেন মাস্টারসন। "কিন্তু এখানে থাকে সমাজের একেবারে নিচু পর্যায়ের মানুষেরা। মহাত্মা

গান্ধী এদের 'হরিজন' বলে সম্বোধন করতেন। যার মানে দাঁড়ায়, 'ঈশ্বরের লোকজন'। কিন্তু বর্তমানে এদের *দলিত* বা *অচ্ছুৎ* বলেই ডাকা হয়।

গ্রে দেখল, ছুরি পরিষ্কার করা বাদ দিয়ে মাস্টারসনের কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছে লুকা। অচ্ছুৎ...ওদের গোত্রের শিকড়।

"কারা এরা?" প্রশ্ন করল গ্রে, আরও বিস্তারিত জানতে চায়।

"এর উত্তর পেতে হলে আগে আপনাকে ভারতের গোত্র বা বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে," জবাব দিলেন মাস্টারসন। "বলা হয়ে থাকে যে, এসব বর্ণ একটা অভিন্ন সত্ত্বার দেহ থেকে সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত আর শিক্ষকরা এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, ওই সত্ত্বার মাথা। শাসক আর সৈন্যরা হচ্ছে সত্ত্বার হাত। ব্যাবসায়ীরা হচ্ছে উরু এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন সত্ত্বার পা থেকে উদ্ভূত। প্রায় দু'হাজার বছর পুরনো কিংবদন্তী, মনুর নীতি থেকে পাওয়া গিয়েছে এই বর্ণনা। কী করা যাবে, কী করা যাবে না এসব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে ওখানে।

"আর অচ্ছুৎরা?" জিজ্ঞের করল গ্রে, তাকিয়ে আছে গাড়ির বাইরে জড়ো হতে থাকা লোকজনের দিকে।

"অচ্ছুৎ...বলা হয়ে থাকে, ওই মহান সত্ত্বা থেকে জন্ম হয়নি এই গোত্রের। এরা সমাজচ্যুত। সমাজে থাকার মতো যোগ্যতা এদের নেই। পশুপালক, মেথর, ডোম ইত্যাদি লোকেরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চবর্ণের লোকদের কাছে প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হয় এরা। অন্যদের বাড়ি, মন্দির...কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই তাদের। একসাথে বসে খাওয়া দূরের কথা, কোনও উচ্চবর্ণের লোকের গায়ে হাত লাগলেও খারাবি আছে কপালে। কঠিন নিয়মগুলোর যে কোনও একটার বিন্দুমাত্র অবমাননা করেছো, তো মরেছো। খুন, অত্যাচার, ধর্ষণ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।"

"কেউ আটকায় না ওদের?" সামনে ঝুঁকলো এলিজাবেথ।

নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ঘোঁত জাতীয় শব্দ করলেন মাস্টারসন। "সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে, তবে পুরোপুরি বন্ধ করার উপায় নেই এটা, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এখনও গোটা জনসংখ্যার প্রায় পনেরো শতাংশ লোক এই পরিস্থিতির শিকার। পালানোর কোনও পথ নেই। অচ্ছুৎ-এর ঘরে জন্মানো একটা বাচ্চা চিরকাল অচ্ছুৎ বলেই স্বীকৃতি পাবে। শত শত বছর ধরে চলে আসা নিষ্ঠুর সংস্কৃতির ভুক্তভোগী ওরা। আর আগেই বলেছিলাম, মাঠে কাজ করার জন্যও তো লোকজন লাগে নাকি।"

তাদের গাড়ি দেখে বেরিয়ে আসা লোকজনের দিকে তাকিয়ে নড করলেন মাস্টারসন।

"ঈশ্বর সহায় হোন," বলে উঠল এলিজাবেথ।

"ঈশ্বরের এখানে করার কিছুই নেই," বললেন মাস্টারসন। "পুরোটাই একটা গোলকধাঁধা। তোমার বাবা এদের ব্যাপারে সদয় ছিলেন। এজন্য পরবর্তীতে যোগী-সন্ন্যাসীদের সাহায্য পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল তার জন্য।"

"অচ্ছুৎ-দের সাথে মেলামেশার জন্য?"

"হ্যাঁ...তাদের ডিএনএ স্যাম্পল যোগাড় করার জন্যও। আস্তে আস্তে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, উচ্চবর্ণের অনেক ঘরের দরজাই বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য। আসলে তিনি উধাও হয়ে যাবার পর আমি আন্দাজ করেছিলাম, এ কারণেই হয়তো খুন হতে হয়েছে আর্চিবাল্ডকে।"

আগুনের আলোয় উদ্ভাসিত ছোট গ্রামটার প্রান্তে রোজারোকে থামতে ইশারা করল গ্রে। "এই গ্রামে? এখানেই ড.পোককে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মাস্টারসন। "ফোনে কথা হয়েছিল আমাদের। উত্তেজিত শোনাচ্ছিলো আর্চিবাল্ডের কণ্ঠ। সে আমাকে কিছু একটা আবিষ্কারের ব্যাপারে বলেছিল, তবে সেটা প্রকাশ করতে চায়নি। তারপরই উধাও হয়ে যায় সে।"

"আর এদের ব্যাপারে কী?" প্রশ্ন করল গ্রে। "ভয় পাওয়ার কোনও কারন আছে?"

"বরং উল্টোটাই ধরে নিন।" দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন মাস্টারসন।

তার দেখাদেখি বেরিয়ে এল সবাই। "গাড়ির কাছেই থাকো," সতর্ক করল গ্রে।

গ্রে-কে সাথে নিয়ে আগুনের পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে এগোলেন প্রফেসর। হিন্দিতে কিছু একটা বলা শুরু করলেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় কয়েকটা শব্দ বুঝতে পারল গ্রে, তবে কথাগুলো পুরোপুরি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট দক্ষতা নেই ওর।

অস্ত্রশস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন, যেন একটা দেয়াল।

কথা বলতে বলতে ওদের গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন মাস্টারসন। তার মুখে হিন্দিতে বেটি শব্দটা শুনতে পেল গ্রে। যার অর্থ দাঁড়ায়, মেয়ে।

সাথে সাথে এলিজাবেথের দিকে তাকাল উপস্থিত সবাই। নিচু হয়ে গেল হাতের অস্ত্র। নিজেরা নিজেরা ফিসফাস শুরু করল লোকগুলো, কয়েকজন হাত তুলে দেখালো ওকে। দু'ভাগ হয়ে গেল জটলাটা। স্বাগতম জানাচ্ছে ওদের। দুটো ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে পেছনদিকে দৌড় শুরু করল, কাকে যেন ডাকতে যাচ্ছে।

গ্রে'র দিকে ফিরলেন মাস্টারসন। "আর্চিবাল্ডকে খুব সম্মান করে এরা। তার মেয়ের জন্য যে অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, এতে আশ্চর্যের কী! ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই আমাদের।"

"ডায়রিয়াকে ছাড়া," বাকিদের সাথে সামনে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি। সাথে সাথে পেটে এলিজাবেথের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

সবাইকে নিয়ে গ্রামের দিকে চলল গ্রে। শুধু পেটের অসুখ না, সামনে আরও বড় বিপদ আছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

রাত ৮:০২

প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে রাতে আগুনের আলোই একমাত্র ভরসা। দুটো ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডকে পাশ কাটালো এলিজাবেথ। তীব্র শব্দে ড্রাম বাজাতে শুরু করেছে

কে যেন। শাড়ির আঁচলে অর্ধেক মুখ ঢেকে রাখা এক নারী এসে তাদের গ্রামের মধ্যভাগের দিকে এগোনোর ইশারা করল।

ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখের দগদগে ক্ষত নজরে পড়ল এলিজাবেথের। "কী হয়েছে ওর?"

"তোমার বাবা এই মহিলার কথা ফোনে বলেছিলেন আমাকে। ওর ছেলে গ্রামে উঁচুবর্ণের এক লোকের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল ও। তবে তারা দুজনেই ধরা পড়ে যায়। ছেলেটার ভাগ্যে জোটে বেদম মার আর মহিলার মুখে এসিড ঢেলে দেয় গ্রামের ক্ষিপ্ত লোকজন। তাতে এক চোখসহ মুখের একপাশ পুড়ে যায় ওর।" মহিলার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জবাব দিলেন মাস্টারসন।

ব্যাপারটার গভীরতা আঁচ করতে পেরে ঠাণ্ডা হয়ে এল এলিজাবেথের গলা। "কী বীভৎস!"

"তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আর যাই হোক, লোকগুলো তাকে ধর্ষণ করেনি।"

মহিলার অবস্থা বিবেচনা করে মন খারাপ হয়ে গেল এলিজাবেথের, সেই সাথে এই কষ্ট আর গ্লানি নিয়েও তার বেঁচে থাকার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাও অনুভব করল। চুপচাপ হেঁটে চলল ও।

কয়েকটা গলি পেরিয়ে তাদেরকে গ্রামের একেবারে মাঝখানে নিয়ে এল মহিলা। আরেকটা আগুন জ্বলছে এখানে। একটা কুয়ার চারপাশে কিছু টেবিল সাজিয়ে রাখা। মহিলারা খাবার পরিবেশন করছে টেবিলগুলোতে। খালি পায়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছে বাচ্চারা, বেশিরভাগের পরনেই কিছু নেই।

এলিজাবেথ এগিয়ে যেতেই মাথা নিচু করে সম্মান জানাল তাকে। বাবার প্রাপ্য সম্মানের ভাগই পাচ্ছে ও, ভাবল এলিজাবেথ।

লাঠি উঁচিয়ে তাদের দিকে ইশারা করলেন মাস্টারসন। "গ্রামের লোকজনের অনেক উপকার করেছে আর্চিবাল্ড। উপযুক্ত মজুরি, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে শ্রদ্ধা করতো এদের। বাকি সমাজের মতো নিচু দৃষ্টিতে দেখেনি।"

মাথা নেড়ে সায় দিল এলিজাবেথ।

"এদের বিশ্বাস অর্জন করে নিয়েছিল আর্চিবাল্ড। আর এখানকার পাহাড়েই নিজের সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতো ও।"

"এতো জায়গা থাকতে এখানেই কেন?" অন্য পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"আর্চিবাল্ডের ম্যাপ তো আপনাদের দেখিয়েছিই। তবে আরও কিছু বিস্তারিত প্রমাণ ছিল যা তাকে এখানে টেনে এনেছিল। জেনেটিক একটা ট্রেইল নাকি এই পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে। তবে আমার মনে হয়, ব্যাপারটা তার চেয়ে বেশি কিছু।"

ভ্রূ কুঁচকালো এলিজাবেথ। "কী সেটা?"

"তা তো বলতে পারব না। দু'বছর আগে এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও, আর ভারতের অন্যান্য এলাকায় খোঁজা বাদ দিয়ে এদিকে মনোযোগ দেয়।" পেছন ফিরে লুকার দিকে ইশারা করেন প্রফেসর। "আর জিপসীদের দিকেও।"

দু'বছর আগের কথা চিন্তা করতে লাগল এলিজাবেথ। তখন সে জর্জটাউনে নিজের পিএইচডি প্রোগ্রাম শেষ করছিল। খুব একটা যোগাযোগ ছিল না বাবার সাথে। এই মাঝে মধ্যে দুয়েকবার ফোনালাপ, এটুকুই। তার কাজ সম্পর্কে জানা থাকলে হয়তো সাহায্য করতে পারতো ও।

গ্রামের মাঝখানে পৌঁছতেই আন্তরিক হাসি ভরা কিছু মুখ স্বাগত জানাল সবাইকে। ইতিমধ্যে ওদের জন্য টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। খেতে বসার জন্য পিড়াপিড়ি শুরু করল সবাই। রুটি, ভাত, সিদ্ধ করা সবজি, দুধ আর খেজুরজাতীয় কিছু ফল। সাধারন আয়োজন, কিন্তু আন্তরিকতার কোনও ত্রুটি নেই তাতে। একপাশে অর্ধবৃত্তাকার চুলা সামনে নিয়ে বসে আছেন এক মহিলা, রান্নাবান্না তিনিই করেছেন বোঝা যাচ্ছে। গরুর গোবর দিয়ে তৈরি ঘুঁটের ঝুড়ি পাশে নিয়ে বসে আছে বাচ্চা একটা মেয়ে, জ্বাল দিচ্ছে চুলায়।

এলিজাবেথের দিকে ঝুঁকে এল কোয়ালস্কি। "বার্গার কিং-এর মতো না, কী বলো?"

"গরুর পূজা করে এরা, এজন্যই হয়তো।"

"গরুর পূজা তো আমিও করি, তবে ভালোভাবে রান্না করা অবস্থায়। সাথে খানিকটা আলুভাজা থাকলে তো আরও খাসা।"

তার কথায় হেসে উঠল এলিজাবেথ। কীভাবে যেন সব পরিস্থিতিতেই ওকে হাসাতে পারে বিশালদেহী লোকটা, ভাবল সে। আর সাথে সাথে উপলব্ধি করল, একে অন্যের খুবই কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আস্তে করে সরে দাঁড়াল খানিকটা।

একটু দুরেই সেতার বাজাতে শুরু করল এক লোক, তার সাথে সঙ্গ দিচ্ছে হারমোনিকা হাতে একজন। তবলা নিয়ে পাশে আছে আরেকজন।

তখনই লম্বা গড়নের এক লোক উদয় হলো। বয়স ত্রিশের কোঠায়, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, জলপাইয়ের মতো গায়ের রঙ। ধুতি আর ফুলহাতা শার্ট পড়ে আছে লোকটা। মাথায় কারুকাজ করা একটা টুপি, আঞ্চলিক ভাষায় কুফি বলা হয় এটাকে। এগিয়ে এসে সবার উদ্দেশ্যে বাউ করল সে। তারপর ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করল, কণ্ঠে সামান্য ব্রিটিশ টানও আছে।

"আমার নাম আভি ভাঞ্জি, তবে আপনারা অ্যাবে বলে ডাকলেই বেশি খুশি হব। ভারতের সবখানেই একটা প্রবাদ আছেঃ আতিথি দেবো ভাবা। অর্থাৎ, অতিথিরা আমাদের কাছে দেবতার সমান। আর প্রফেসর আর্চিবাল্ড পোকের মতো একজন সত্যিকারের বন্ধুর মেয়ের সাথে তো কোনওকিছুরই তুলনা চলে না।" বলে টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল ও। "দয়া করে আসুন।"

এক সাথে টেবিলে বসল সবাই। তবে প্রফেসর পোকের মৃত্যুর খবর শুনে লোকটার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

"জানতাম না আমি," আস্তে করে বলল লোকটা। চেহারায় ফুটে উঠেছে ব্যাথার ছাপ। "আমি দুঃখিত, মিস পোক।"

মাথা নাড়লো এলিজাবেথ।

"যতদূর জানি, তাকে শেষবার এই গ্রামেই দেখা গিয়েছিল," বলে মাস্টারসনের দিকে ইশারা করল গ্রে। "প্রফেসরকে এখানে আসার ব্যাপারে বলেছিলেন তিনি।"

"আশা করি, আর্চিবাল্ড কোথায় গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা দিতে পারবেন আপনি," বললেন মাস্টারসন।

"আমি জানতাম, ওখানে একা যাওয়া উচিত হবে না তার পক্ষে, " মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল লোকটা। "কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন তিনি?" প্রশ্ন করল গ্রে।

"তাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই ভুল ছিল। ওটা অভিশপ্ত জায়গা।"

লোকটার হাত স্পর্শ করল এলিজাবেথ, গলায় আশার সুর। "যদি কিছু জানেন আপনি, বলুন আমাদের। যে কোনও কিছু... "

জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা কাপড়ের ব্যাগ বের করল অ্যাবে। "তাকে এগুলো দেখানোর পর থেকেই ব্যাপারটার সূত্রপাত।" বলে ব্যাগটা খুলে টেবিলে উপুড় করল সে। পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া কিছু কয়েন ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে। "চাষ করার সময় আমাদের মাঠে পাওয়া যায় এগুলো।"

একটা কয়েন গড়াতে গড়াতে এলিজাবেথের হাতের সামনে গিয়ে পড়ল। চোখের সামনে তুলে ভালো করে কয়েনটার দিকে তাকাল ও। যতক্ষণ না পৃষ্ঠে ছাপা দৃশ্যটা পরিষ্কার হলো, বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘসতে লাগল আস্তে আস্তে।

একটা মহিলার মাথার আকৃতি বোঝে গেল। মুখের চারপাশে ছোট ছোট কিছু সাপ, মহিলার মাথার চুল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওগুলো। এলিজাবেথ খুব ভালো করে চেনে প্রতিকৃতিটাকে, গ্রীক মিথলজির দেবী মেডুসা।

"প্রাচীন গ্রীক কয়েন," বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠল ও। "এগুলো মাঠে পেয়েছেন আপনারা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল অ্যাবে।

"চমৎকার!" কয়েনটা আগুনের দিকে আরেকটু বাড়িয়ে ধরল এলিজাবেথ। "পার্সিয়ান, আরব, মুঘল, আফগানদের মতো গ্রীকরাও একসময় রাজত্ব করেছে পাঞ্জাবে। এমনকি, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর এই অঞ্চলে যুদ্ধ করার ইতিহাসও আছে।"

গ্রে আরেকটা কয়েন তুলে ধরল। সরু হয়ে এল চোখজোড়া। এক পলক দেখেই কয়েনটা বাড়িয়ে ধরল এলিজাবেথের দিকে। "এটা দেখ।"

হাতে নিয়ে দেখতেই মেয়েটার হাত কেঁপে উঠল। কয়েনের একপাশে তিনটা পিলারে ঘেরা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথ খোদাই করা, সাথে বড় একটা উ ও আছে। মন্দিরের প্রবেশপথ। তবে সাধারণ কোনও মন্দির না ওটা।

"এটা তো ডেলফির মন্দির," বলে উঠল সে।

"তোমার বাবা মিউজিয়াম থেকে যে কয়েনটা চুরি করেছিলেন, এটা অনেকটা তার মতোই দেখতে।"

জট লেগে গেছে এলিজাবেথের মাথায়। "কখন...কখন বাবাকে সর্বপ্রথম এটা দেখিয়েছিলেন আপনি?"

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল অ্যাবে। "সঠিক মনে নেই। বছর দুয়েক আগে হতে পারে। তিনি আমাকে এগুলো লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন। তবে এখন তিনি বেঁচে নেই, আর আপনি তার মেয়ে..."

তবে পরের কথাগুলোর একটাও এলিজাবেথের কানে ঢোকেনি। ঝড়ের বেগে কাজ করতে শুরু করেছে ওর মগজ। দুই বছর আগে... তখনই ওর বাবা ওকে ডেলফির মিউজিয়ামে কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। নিজে এখানে ব্যস্ত থাকায় তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, এলিজাবেথ ব্যাপারটা সমাধান করুক। রাগের একটা হলকা বয়ে গেল ওর গোটা শরীর বেয়ে। তবে গ্রামের লোকদের এতো ভালো ব্যবহারের পর রাগ দেখানো, খুব একটা শোভন দেখাবে না। হয়তো এদের ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বাবার পক্ষে, ভাবল ও।

তারপরও, তিনি ওকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন।

নাকি, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে ওকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তিনি?

মাথা নাড়লো এলিজাবেথ। কী হচ্ছে এসব? উত্তরের আশায় কয়েনটার অন্য পিঠে চোখ বুলালো ও। একটা বড় চিহ্ন আঁকা, তবে গ্রীক বলে মনে হলো না চিহ্নটা।

ওর হতভম্ব অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছে অ্যাবে। কয়েনটার দিকে ইশারা করল ও, আগে থেকেই জানে চিহ্নটার ব্যাপারে। "ওটাকে বলে চক্র, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে খুবই পরিচিত একটা চিহ্ন।"

কিন্তু গ্রীক কয়েনে এটা কী করছে? ভাবল এলিজাবেথ।

"আমি কী দেখতে পারি?" বলে এগিয়ে এল লুকা, এলিজাবেথের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল কয়েনের দিকে। সাথে সাথে টেবিলের কোনায় শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর আঙুলগুলো। "এই...এই চিহ্নটা রোমানিদের পতাকাতেও আছে।"

"কী?" প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

সোজা হয়ে বসল লুকা। "এটা নির্বাচনের কারণ হলো, সংস্কৃতে 'চক্র' মানে হচ্ছে চাকা- যা আমাদের, অর্থাৎ জিপসীদের ওয়াগনের চাকার প্রতীক। এখনও জন্মভূমি

হিসেবে ভারতীয় শাস্ত্র, প্রাচীন ভারতীয় ভাষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি আমরা। তবে গুজব আছে, আরও গভীর কোনও রহস্য আছে এই চিহ্নটার।"

সবার কথার মাঝখানে এলিজাবেথ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েনটার দিকে, অন্তত একটা উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

ওর দিকে ঝুঁকে এল গ্রে, চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে। "কী হয়েছে?"

নিজের দিকে গ্রে'র শীতল দৃষ্টি অনুভব করল এলিজাবেথ। কয়েনটা তুলে ধরে খোদাই করা মন্দিরের দিকে ইশারা করল ও। "এটা দেখা পরই বাবা আমাকে ডেলফির মিউজিয়ামে কাজ পাইয়ে দেন।" তারপর কয়েন উল্টে চক্র চিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করল। "একই সময়ে, তিনি জিপসী আর ভারতে তাদের শিকড় সম্পর্কে খোঁজখবর করা শুরু করেন। আলাদা আলাদা রহস্য লুকিয়ে আছে কয়েনের দুই পাশেই। তবে কথা হচ্ছে, ঘটনা দুটোর পেছনে মিলটা কোথায়? কী সেই যোগসূত্র?"

আভি ভাঞ্জির দিকে ফিরে তাকাল ও। কথা শেষ করেনি লোকটা।

"কোথায় গিয়েছিলেন বাবা?"

কিন্তু উত্তরে আভি মুখ খোলার আগেই এক গ্রামবাসীর চিৎকার তাদের মনোযোগ কেড়ে নিলো। গ্রামের বাইরের দিক থেকে দৌড়ে আসছে লোকটা। গানবাজনার আওয়াজ থেমে গেলেও অস্পষ্ট ড্রামের শব্দ ভেসে আসছে কোথা থেকে যেন। বুকে কাঁপন ধরানো একটা শব্দ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে।

উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথও, একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটছে না তার। শব্দের উৎসের খোঁজে পাহাড়ের দিকে তাকাল ও, তবে মনে হচ্ছে যেন চারদিক থেকেই ভেসে আসছে ধুপ ধুপ আওয়াজটা। ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে আসছে। হঠাৎ আকাশে তিনটা আলো দেখা গেল।

হেলিকপ্টার।

"এসইউভি-তে ফিরে চলো সবাই," চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

হিন্দিতে নিজের লোকদের কিছু একটা আদেশ করল আর্চে। যে যেদিকে পারে, ছুট লাগালো গ্রামবাসী। লোকজনের চাপে গাড়ির দিকে এগোতে থাকা তাদের ছোট দলটা থেকে আলাদা হয়ে গেল এলিজাবেথ।

বাজপাখির মতো গ্রামের দিকে ধেয়ে আসছে হেলিকপ্টারগুলো। কাছাকাছি এসে বৃত্ত রচনা করে প্রদক্ষিণ করতে লাগল গ্রামটাকে। ভীড়ের ভেতর একটা দৃঢ় মুঠো চেপে ধরল এলিজাবেথের হাত, কোয়ালস্কি। অন্য হাত বাড়িয়ে কোমরে ধরে ওকে কোলে তুলে নিলো বিশালদেহী লোকটা।

"চলো, সোনামণি।"

গ্রামের কিনারে এসে স্থির হয়ে বাতাসে ভাসছে হেলিকপ্টারগুলো, পেট থেকে দড়ি বেরিয়ে এসেছে। দড়ির মাথা মাটি স্পর্শ করার আগেই, হেলমেট আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কিছু অবয়ব ঝুলে নামতে লাগল দড়ি বেয়ে।

এসইউভি পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ দেবে না ওদের।

রাত ৮:৩৮
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

হলওয়ে ধরে এগোচ্ছেন নিকোলাস সলোকভ। 'স্লেগুরোচকা' অর্থাৎ, 'তুষারকুমারী' নামে পরিচিত উনিশ শতকের ঐতিহ্যবাহী রাশিয়ান একটা মিউজিক বাজানো হচ্ছে, মৃদু সুর ভেসে এল তার কানে।

পরনের টাক্সিডোর লাইনিং-এ হাত বুলালেন তিনি। আধুনিক পোষাক পরে এসেছে উপস্থিত সবাই। কিন্তু তিনি বিশেষ করে এই উৎসবের জন্যই মিলান থেকে এই পোষাকটা আনিয়েছেন। এক বোতামওয়ালা কাশ্মীরি জ্যাকেটের সাথে চিকন ল্যাপেল, আর মোটা পশমী কলার মিলিয়ে আভিজাত্যপূর্ণ রূপ দিয়েছে তাকে। উইন্ডসরের ডিউক উনিশশো ত্রিশের দশকে এরকম পোষাক পরতেন। নিকোলাসের ব্যক্তিত্বের সাথে খাপে খাপ মিলে গেছে জ্যাকেটটা। তবে পোষাকের বো টাই বদলে সিল্কের একটা টাই লাগিয়ে নিয়েছেন তিনি। ছোট করে ছাঁটা দাঁড়ির সাথে বো টাই জিনিসটা ঠিক মানায় না।

অভিজাত ভঙ্গিতে বলরুমে প্রবেশ করলেন নিকোলাস।

নতুন লাগানো এক ডজন ঝাড়বাতির আলোয় চকচক করছে পালিশ করা মেঝে। একটা দাতব্য সংস্থা স্পন্সর করেছে বাতিগুলো। নাচের ফ্লোরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু টেবিল।

রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রী আর ইউ.এস. প্রেসিডেন্টই উপস্থিতদের মধ্যে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন। ক্রমবর্ধমান পারমানবিক সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনা করছেন দু'জন। এই অনুষ্ঠানের পর সেন্ট পিটার্সবার্গে এ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। চেরনোবিলের রিঅ্যাক্টর সিল করে দেয়াটা আক্ষরিক অর্থেই পারমাণবিক সমস্যা মোকাবিলার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

জনসমুদ্রে বেষ্টিত মানুষ দু'জনের দিকে তাকালেন নিকোলাস। পারমাণবিক দুর্যোগের বিপরীতে দৃঢ়কণ্ঠের কারণে তার নামডাক দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। এই সুপরিচিতির ফলেই জটলাটা দু'ভাগ হয়ে তাকে সামনে যাওয়ার জায়গা করে দেবে।

খুন করার আগে অন্তত হাত মেলাতে ক্ষতি কী!

কিন্তু সেদিকে না যেয়ে ইলেনার দিকে এগোনোর মনঃস্থির করলেন তিনি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, হাতে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস। জানালা আর ইলেনা, দুটো অবয়বের গা থেকেই ভারী সিল্কের আবরণ ঝুলছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

শহরের ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়ে দিগন্তের কাছাকাছি উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি চোখে পড়ল। এখনও কাজ করে চলেছে শ্রমিকরা। রিঅ্যাক্টরের ঢাকনাটা শেষবারের মতো চেক করে নিচ্ছে ওরা, যাতে শেষমুহূর্তে কোনও গোলমাল ধরা না পড়ে। সারা দুনিয়ার নজর ওখানেই থাকবে আগামীকাল।

ইলেনার হাতে আলতো করে স্পর্শ করলেন নিকোলাস।

ঘুরে তাকাল না মেয়েটা। পেছনে কে আছে, জানালার কাঁচে আগেই দেখে নিয়েছে।

"কাহিনী প্রায় শেষপর্যায়ে।"

খবর এসেছে, ইতিমধ্যে কনকাশন চার্জগুলো জায়গামতো লাগানো হয়ে গেছে। আর কেউ রুখতে পারবে না তাদের।

রাত ৮:৪০
পাঞ্জাব, ভারত

গ্রামের শেষপ্রান্তে পৌঁছানোর জন্য ছুটে চলেছে গ্রে, কিন্তু তার আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। গুলির শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে লাগল দৌড়ে পালাতে থাকা লোকজন। মাথার উপর ঢোল পেটাচ্ছে হেলিকপ্টারের রোটরব্লেড। পাথরের একটা দেয়ালের পেছনে আড়াল নিলো ও। একটু সামনেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওদের এসইউভি।

গ্রামটাকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করেছে অস্ত্রধারী সৈন্যরা, আস্তে আস্তে ছোট করে আনছে পরিধি। কালো পোষাক পড়া এক সৈন্য ছুটে গ্রামের ভেতর ঢুকে গেল। গ্রে জানে, ধ্বংসলীলা থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে হলে খুব তাড়াতাড়ি পালাতে হবে ওদের, যাতে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে আসে আক্রমণকারীরা।

রোজারোর দিকে এক হাত এগিয়ে দিল ও। "চাবি দাও।"

চাবি বাড়িয়ে দিতে দিতে একটা দুঃসংবাদও দিল মেয়েটা। "কোয়ালস্কি, এলিজাবেথ। ওরা নেই এখানে।"

পেছন ফিরে গ্রামের অন্ধকার গলিঘুপচির দিকে তাকাল গ্রে। "খুঁজে বের করো ওদের, এখনই, যাও।"

নড করে পেছনদিকে এগিয়ে গেল রোজারো।

লুকার দিকে ফিরল গ্রে। "প্রফেসরকে দেখে রাখো। লুকিয়ে থাকবে, যেন কারও চোখে না পড়ো।"

আর অপেক্ষা করা সম্ভব না গ্রে'র পক্ষে।

মাথা নুইয়ে খোলা জায়গাটা ধরে ছুট লাগালো ও।

চিকন একটা গলি ধরে দৌড়ে চলেছে এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কি। হঠাৎ একটা আবর্জনার নালা নজরে এল।

"এটা অনুসরণ করো," বলে উঠল এলিজাবেথ। "নিশ্চয়ই বাইরের দিকে গিয়েছে নালাটা।"

মাথা নেড়ে সায় দিল কোয়ালস্কি। ইতিমধ্যে হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

"অতিরিক্ত আরও আছে নাকি?" পিস্তলের দিকে ইশারা করে জানতে চাইলো এলিজাবেথ।

"চালিয়েছ কখনও?"

"স্কুলে থাকতে স্কীট শুটিং করেছি।"

"খুব একটা পার্থক্য নেই। শুধু টার্গেটটা এক্ষেত্রে একটু চেঁচামেচি করবে আর কী।" বলে জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পেছনদিকে গোঁজা একটা ছোট পিস্তল বের করে আনলো কোয়ালস্কি, ইস্পাতের তৈরি নীল রঙের একটা বেরেটা। বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

পিস্তলের গ্রিপে চেপে বসল মেয়েটার আঙুল, যেন শক্তি শুষে নিতে চাইছে ঠাণ্ডা ইস্পাত থেকে।

জনশূন্য গলি ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে গেল একটা হেলিকপ্টার। রোটরের বাতাসে উড়তে লাগল পথে পড়ে থাকা পাতা আর আবর্জনার স্তূপ। একটা কুঁড়েঘরের সামনে আসতেই, দরজা দিয়ে খাটের নিচে জবুথবু হয়ে থাকা কয়েকটা বাচ্চাকে দেখতে পেল এলিজাবেথ।

গলির মুখের সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল অস্ত্রধারী এক সৈন্য। আঁতকে উঠে এলিজাবেথের হাত ধরে টেনে ওকে থামালো কোয়ালস্কি। ক্রমেই গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ছে হামলাকারীরা।

"এখানে থাকা যাবে না। পাহাড়ের দিকে এগোবো আমরা," বলে উঠল কোয়ালস্কি।

দুটো বাঁক পেরিয়ে আরেকটা রাস্তায় এসে উঠল ওরা, সোজা পাহাড়ের দিকে গেছে এই রাস্তাটা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মৃতদেহ। মাটিতে শুয়ে থাকা এক সৈন্যকে দেখে পিস্তল উঁচিয়ে তার দিকে এগোলো কোয়ালস্কি। কাছে যেতেই বোঝা গেল ওটা শুধুই একটা লাশ।

অটোমেটিক রাইফেলের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল উল্টোদিক থেকে।

কালো পোষাক পরা সৈন্যের মাথা থেকে হেলমেট খুলে নেয়ার জন্য টান দিল কোয়ালস্কি, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হেলমেটসহ পুরো মাথাটাই হাতে উঠে গেল। লাফিয়ে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ও।

হঠাৎ একটা কালো ছায়া উদয় হলো ওদের ঠিক পেছনে।

আরেকজন সৈন্য।

পিস্তল তুলে এলোপাতাড়ি গুলি করতে লাগল এলিজাবেথ। লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারল না একটাও। কিন্তু আরেকটা কাজ হলো, গুলির তোড়ে ভয় পেয়ে এক কোনায় লুকিয়ে পড়ল লোকটা। পাশ থেকে গর্জে উঠল কোয়ালস্কির পিস্তল, বদ্ধ গলিতে

কামানের আওয়াজের মতো বিকট শোনালো শব্দটা। কাঁধ ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল এলিজাবেথ। গলির অন্যপ্রান্তে আরও দুজন সৈন্য দেখা গেল।

বেশ ভালো ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি, ভাবল ও।

গলির মুখ থেকে খোলা জায়গাটা ধরে ছুটে চলেছে গ্রে। আগুনের পাশে পৌঁছেই ডাইভ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গরুর গাড়ির নিচে ঢুকে গেল ও। গাড়িটার নিচ দিয়ে মাটিতে পেট ঘসতে ঘসতে আগুনের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল গ্রে। মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি, গোলাগুলির শব্দও একচুল নড়াতে পারেনি গাড়ির সামনে বাঁধা ষাঁড়টাকে। এবার তাহলে লেজেই আগুন দিতে হবে আমাকে, ভাবল ও।

গাড়ির নিচ থেকে মাথা আর হাতদুটো বের করল গ্রে, জ্বলতে থাকা আবর্জনার স্তুপ থেকে একটা পোড়া টায়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়িতে থাকা আবর্জনা লক্ষ্য করে। আগুন ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না। আরেক হাতে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তুলে নিলো ও। তারপর আগের মতোই হাচড়ে পাচড়ে এগোতে লাগল গাড়ির সামনের দিকে।

গায়ে অল্প একটু আগুনের আঁচ লাগতেই লাফিয়ে উঠল যেন ষাঁড়টা, তারপর চেঁচিয়ে উঠে ছুট লাগালো। পেছনে বয়ে নিয়ে চলল জ্বলন্ত আবর্জনা ভরা গাড়িটাকেও। গাড়ি চলা শুরু করতেই দু'হাতে সামনের বোর্ড আঁকড়ে ধরল গ্রে। পা ঠেকিয়ে রেখেছে পেছনের রেলিং-এ। গাড়ির সাথে সাথে ওকেও টেনে নিয়ে চলল প্রানিটা।

গাড়ি সমেত সোজা পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে উন্মত্ত ষাঁড়। সামনের বোর্ড ধরে ঝুলে রইল গ্রে, নজর রাখল যেন চাকার সাথে মাথা বাড়ি না খায়। গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছেই হালকা ঝাঁকি গেল গাড়িটা। সাথে সাথে বোর্ড ছেড়ে দিল গ্রে, আছড়ে পড়ল নিচের কাদায়।

একমুহূর্ত সেখানেই স্থির হয়ে পড়ে রইল ও।

পেছনে জ্বলন্ত আবর্জনার ট্রেইল ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। গ্রে আশা করছে, হেলিকপ্টারের কোনও পাইলট হয়তো অনুসরণ করবে ওটাকে।

কাদা থেকে উঠে গ্রাম ঘিরে রাখা অগভীর নালা ধরে ওদের এসইউভি যেদিকে রাখা, সেদিকে এগোতে লাগল ও। কাছাকাছি পৌঁছে দৌড় শুরু করল গাড়ি লক্ষ্য করে। এখন গ্রাম আর ওর ঠিক মাঝখানে আছে ওটা। এক ছুটে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। চাবিটা বের করে বড় করে শ্বাস টানলো।

অপেক্ষা করার মতো সময় নেই হাতে।

দু'দিক থেকেই সৈন্যরা এগিয়ে আসায় ফাঁদে পড়ে গেছে এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কি। তবে সামনে পালানোর রাস্তাও পাওয়া গেল। একটা খোলা জানালা।

"যাও," গর্জে উঠল কোয়ালস্কি।

জানালা টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল এলিজাবেথ। ঘরে কিছু নেই, একেবারে খালি। পেছন পেছন কোয়ালস্কিও ঢুকল। গলির দু'দিক থেকেই বুটের শব্দ শোনা গেল, ক্রমেই কাছে চলে আসছে। ঘরের সামনের দিকে একটা চিকন পথ, আরেকটা

গলিতে গিয়ে থেমেছে ওটা। সেই পথ ধরেই দ্রুত পায়ে এগোলো দু'জন। কিন্তু গলিতে পৌঁছেই একেবারে চার অস্ত্রধারীর সামনে গিয়ে পড়ল।

চমকে উঠেছে দু'পক্ষই। এক সেকেন্ড পরে হাতের রাইফেল তুলে ধরল সৈন্যরা, গুলি করার জন্য প্রস্তুত। তবে ট্রিগার চাপার আগেই স্টিলের কয়েকটা লম্বা ফলা নেচে বেড়াতে শুরু করল তাদের ঘিরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীর উদ্দেশ্যে পিস্তল উঁচু করল একজন, সাথে সাথে ব্লেডের আঘাতে দুই টুকরো হয়ে খসে পড়ল হাতটা। বাকিদের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না।

চোখের পলকেই যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ছোট দলটা।

এতক্ষণে উদ্ধারকারীদের দিকে তাকানোর সময় হলো এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কির।

মোট তিনজন, অ্যাবে আর দু'জন গ্রামবাসী।

আচমকা আবির্ভাবের মতোই অদ্ভুত তাদের হাতে ধরা অস্ত্রগুলো। উরুমি-হাতলওয়ালা চাবুকের মতো দেখতে এক ধরনের তলোয়ার। প্রতিটা অস্ত্রে চারটা করে ফলা, একেকটার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট আর প্রস্থ এক ইঞ্চি। স্টিলের তৈরি ফলাগুলো এতোই পাতলা যে, পাশ থেকে দেখলে সুতো বলে ভ্রম হয়। অনেক আগে বাবার কাছে অস্ত্রগুলো সম্পর্কে শুনেছিল এলিজাবেথ। কালারিপায়াত্তু নামে পরিচিত একধরনের ঐতিহ্যবাহী লড়াইয়ে ব্যবহৃত হয় এগুলো। কব্জির মোচড়ে প্রাপ্ত গতিশক্তির ফলে অন্যান্য যে কোনও ধারালো অস্ত্রের চাইতে গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারে ফলাগুলো। সামনে পড়ে থাকা চার সৈনিকের মৃতদেহ সেই সাক্ষীই দিচ্ছে।

"আসুন!" বলে উঠল অ্যাবে। "আপনাদের বন্ধুরা এদিকে।"

তার পেছন পেছন গলিঘুপচি ধরে হাঁটা শুরু করল এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কি। হঠাৎ পথের এক পাশে একজন সৈন্য দেখতে পেয়ে সাথের দু'জন লোককে নিয়ে এগিয়ে গেল অ্যাবে। ওই ব্যাটার কপাল পুড়লো বলে।

সে সরে যেতেই মুখ খুললো কোয়ালস্কি। "এমন অস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুরলে সমাজে থাকবে কীভাবে ওরা? যাই হোক, জিনিসগুলো খুব কাজের। একটা যোগাড় করতে হবে।"

এক মুহূর্ত পর ফিরে এল অ্যাবে। সাথে সাথে সামনে একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল হাতের তলোয়ার। বিস্ময়মাখা একটা নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল।

"দুঃখিত।"

কোনা থেকে বেরিয়ে এল রোজারো। গাল ধরে রেখেছে এক হাতে, অ্যাবের কুখ্যাত তলোয়ারের চুমু খেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আঙুলের ফাঁক বেয়ে। কিন্তু সাথে সাথে এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল চেহারা।

"অবশেষে পেলাম তোমাদের। চলো, তাড়াতাড়ি!"

একসাথে দৌড় শুরু করল সবাই।

কয়েক মুহূর্ত পর গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছলো ওরা। দুটো কুঁড়েঘরের ফাঁকে নিচু হয়ে বসে লুকা হাত নাড়ছে ওদের দিকে। ঘরের ছায়ায় প্রফেসরকেও বসে থাকতে দেখা গেল।

"গ্রে কোথায়?"

একটু সামনে থেকে গর্জে ওঠা ইঞ্জিনের আওয়াজই লুকার হয়ে জবাবটা দিয়ে দিল।

"তৈরি হয়ে নাও!" চেঁচিয়ে উঠল রোজারো।

তৈরি? কিন্তু কীসের জন্য?

সর্বশক্তিতে গ্যাস পেডালে পা চেপে রেখেছে গ্রে। দুটো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে পাশ কাটালো এসইউভি। সামনের আকাশে হঠাৎ একটা হেলিকপ্টার উদয় হলো। ফড়িংটার গায়ে কোনও অস্ত্র না থাকলেও, দরজার মুখে মেশিনগান হাতে ঝুলে আছে একজন।

গুলি বর্ষণ শুরু হতেই ব্রেক কষলো গ্রে। বাম্পারের একটু সামনে মাটিতে কামড় বসালো এক ঝাঁক বুলেট। ব্যাক গিয়ার দিয়ে গ্যাস পেডাল চাপলো ও। পাঁচশো হর্সপাওয়ারের শক্তিতে পেছনে বাড়লো এসইউভি। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে আবারও গিয়ার বদলালো, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিল একপাশে। বাঁক নিয়ে সোজা এগিয়ে পার হয়ে গেল দুটো জ্বলন্ত আবর্জনার স্তূপ।

রোজারোকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়ে ব্রেক প্যাডেল চাপলো আবার। বাটন চাপতেই খুলে গেল হাইড্রোলিকচালিত পেছনের দরজা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সবাই। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে। রোজারো, লুকা আর প্রফেসরের সাথে এলিজাবেথ এবং কোয়ালস্কিও আছে।

"যাও!" চেঁচিয়ে উঠল রোজারো।

গ্যাস পেডাল চাপার সাথে সাথে এক হাতে হ্যাচ রিলিজ বাটন চেপে দরজাটা বন্ধ করে দিল গ্রে।

খানিকটা সামনে একে অপরের বিপরীত দিক থেকে গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে দুটো হেলিকপ্টার, সাথে আনছে দুটো বুলেটের সারি। তাড়াতাড়ি বাঁক নিয়ে গুলি বৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল গ্রে। এসইউভির নতুন গতিপথ অনুসরন করল হেলিকপ্টার দুটোও।

হঠাৎ পেছনে গ্রামের দিক থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল, গুলি ছুঁড়ছে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে। যার অর্থ দাঁড়ায়, মৃত সৈন্যদের অস্ত্রগুলো কব্জা করে নিয়েছে গ্রামবাসী।

গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এক হেলিকপ্টারের দরজায় ঝুলতে থাকা মেশিনগানধারী। ততক্ষণে দৃষ্টি হারিয়েছে পাইলট, নিভে গেছে ফড়িং-এর সামনে জ্বলতে থাকা সার্চলাইট।

গাড়ির উপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো বাকি দুটো হেলিকপ্টার। হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে গরুর গাড়ির এগিয়ে যাওয়া পথ অনুসরণ করল গ্রে। আশা করছে, গরুর গাড়ি যখন পার হতে পেরেছে, তাহলে এসইউভিও ওই পথেই যেতে পারবে।

অন্ধকারের বুক চিরে এগোচ্ছে গাড়িটা। পেছনে পেছনে আসছে একজোড়া ফড়িং, সার্চলাইট জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওদের। গ্রামের শেষপ্রান্তে খানিকটা উঁচুতে ঝুলে আছে অন্যটা, গ্রামবাসীদের আক্রোশ থেকে বেঁচে যাওয়া কমান্ডোদের তুলে নিতে দড়ি নামিয়ে দিয়েছে।

সামনে ঝুঁকলো রোজারো। "ওরা রাশিয়ান।"

"রাশিয়ান?"

"তাই তো মনে হয়। কমান্ডোদের হাতের এএন-৯৪ মডেলের রাইফেল দেখেছি আমি।"

এএন-৯৪, রাশিয়ান মিলিটারিদের অ্যাসল্ট রাইফেল।

রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে মাটারসনের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেল গ্রে। প্রথমে আমেরিকান মার্সেনারি, এখন রাশিয়ান...আর কত লোক তার মৃত্যু দেখতে চায়?

আস্তে আস্তে মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনছে হেলিকপ্টারগুলো। প্রাথমিক পরিকল্পনায় সফল হয়েছে গ্রে, গোটা দলটাকে নিরাপদে গ্রাম থেকে বের করে আনতে পেরেছে। কিন্তু এখন?

"পরের পাহাড়ের গোড়া থেকে ডানে মোড় নিন," পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, গলায় ব্রিটিশ টান। পেছন ফিরে তাকাল গ্রে। দলে যুক্ত হয়েছে একটা নতুন মুখ।

আভি ভাঞ্জি।

"সে জানে, কীভাবে পেছনের লেজগুলো খসাতে হবে।" ব্যাখ্যা করল রোজারো।

পাহাড়ের নিচে কাদাময় উপত্যকার ধারে পৌঁছে ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘোরালো গ্রে।

"এবার বামদিকে এগিয়ে বেড়াটা পাশ কাটান!" বলে উঠল অ্যাবে।

কীসের বেড়া?

সামনে ঝুঁকলো গ্রে, হেডলাইট বন্ধ থাকায় সামনের দৃশ্য বোঝা যাচ্ছে না। একটু আলো থাকলেই...

একেবারে পাশ ঘেঁষে চলে গেল একটা হেলিকপ্টারের সার্চলাইট। সেই আলোতেই খানিকটা সামনে পাথরের দেয়ালের মতো আবছা কিছু একটা দেখা গেল। তবে কপাল মন্দ, সাথে সাথে সার্চলাইটটা ধরে ফেলল ওদের।

গাড়ির ট্রেইল ধরে ধেয়ে এল বুলেটের সারি, মুখ গুঁজলো পেছনে ফেলে আসা কাদাপানিতে।

বেড়ার সামনে পৌঁছেই বামদিকে বাঁক নিলো গ্রে, কিন্তু কাদায় ফেঁসে গেছে পেছনের চাকা দুটো। অবশ্য এক মুহূর্ত পরই মাটিতে কামড় বসাতে সমর্থ হলো

চাকাগুলো। লাফিয়ে সামনে বাড়লো এসইউভি। ছোট একটা ঢাল বেয়ে উঠেই এক সেকেন্ড ঝুলে রইল বাতাসে। ডানদিকে কালো একটা সাগর অপেক্ষা করছে ওদের গিলে খাবে বলে- পানির না, গাছপালার।

"আম বাগান," পেছন থেকে বলল অ্যাবে। "খুব পুরনো, সেই সাথে ঘনও। আমার পরিবার বিগত বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে কাজ করে আসছে এখানে।"

সরাসরি গাছের সারির দিকে এসইউভি-র মুখ তাক করল গ্রে। আবারও গুলি করা হলো হেলিকপ্টার থেকে। কিন্তু শেষমুহূর্তে বাঁক নেয়ায় গাছে আঘাত হানলো বুলেটের সারি।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা আমগাছগুলো। উপরে ঘন আচ্ছাধন তৈরি করেছে গাছপালা। এতোই ঘন যে, হেলিকপ্টারের সার্চলাইটও পাতা ভেদ করে মাটি পর্যন্ত আসতে পারছে না। ফড়িংগুলোর পক্ষে আর তাদের হদিশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব না।

"বাগানটা কতটুকু বড়?" জিজ্ঞেস করল গ্রে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, কতক্ষণ ওদের সুরক্ষা দিতে পারবে গাছের শাখা-প্রশাখার আড়াল।

"দশ হাজার একরেরও বেশি।"

বিশাল!

বিপদ কেটে যেতেই যার যার সিটে নড়েচড়ে বসল সবাই।

"আরেকটা কারণে অ্যাবে আমাদের সাথে এসেছে," বলল রোজারো।

"কী?"

একটা কয়েন তুলে ধরল মেয়েটা। একপাশে মন্দির, আরেকপাশে চক্র খোদাই করা সেই কয়েনটাই। মন্দিরের দিকে ইশারা করল রোজারো।

"সে জানে, এটা কোথায় আছে।"

রিয়ারভিউ মিররের মাধ্যমে পেছনদিকে চোখ বুলালো গ্রে। একেবারের পেছনের সারিতে, লুকার পাশে বসে আছে আভি ভাঞ্জি। অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও লোকটার চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উধাও হওয়ার ঠিক আগে, আর্চিবাল্ড পোকের যাওয়া সেই জায়গা সম্পর্কে বলা লোকটার আগের কথা মনে পড়ল গ্রে'র।

জায়গাটা অভিশপ্ত।

১৩
৬ সেপ্টেম্বর, রাত ১০:২৬
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

পাহারা দিচ্ছে মঙ্ক।

আগুনের তাপে শুকিয়ে গেছে শরীর আর কাপড় দুটোই। কেবিনের ভেতর বৃত্তাকারে চক্কর দিল কয়েকবার, অতি সন্তর্পণে পা ফেলছে। চেষ্টা করছে কোনও শব্দ না করার। পায়ে বুট গলালেও, জুতোর ফিতে খোলা। কম্বলের ভেতরে ঢোকার আগে বাচ্চাগুলোকে জামা-জুতো পরিয়ে দিয়েছে ও। হঠাৎ কোনও কারণে জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবার প্রয়োজন পড়লে, জামাকাপড় খোঁজাখুঁজির ঝামেলায় না পড়তে হবে না আর।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে কনস্টানটাইন আর কিস্কা। কম্বলের কুণ্ডলিতে পুরোপুরি ঢেকে গেছে ওদের ছোট্ট দেহ দুটো। খুব কমই ঘুমায় ওরা, বিশেষ করে কনস্টানটাইনের ঘুমের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সবার থেকে কম। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর পরিণত কথাবার্তার জন্যে ওকে বেশ বয়স্ক মনে হয়। কিন্তু এখন ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে বোঝা গেল, কোনওমতেই বারোর বেশি হবে না ছেলেটার বয়স।

বাচ্চাগুলোকে পার হবার সময় আরও সাবধানে পা ফেলল মঙ্ক। ও এখন জানে, মেঝের কোন জায়গার কাঠ বেশি নরম, কোথায় সবচেয়ে বেশি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়! তাই সাবধানে ওসব জায়গা এড়িয়ে যাচ্ছে। বুড়ো শিম্পাঞ্জিটাকে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে পিওতর। মেঝেতে বসে ঘুমোচ্ছে শিম্পাঞ্জিটাও, বুকের ওপর নেমে এসেছে মাথা। ঘুমের ঘোরে গভীর শ্বাস ফেলছে। কিছুক্ষণ আগে ওর যমজ বোনের জন্য দুশ্চিন্তা করছিল পিওতর। পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেছে বাচ্চাটাকে শান্ত করতে। কিন্তু সারাদিনের ভ্রমণের ধকলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল ছেলেটা। শেষমেষ ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে ঘুমিয়ে গেছে। ওকে পাহারা দিচ্ছে মার্তা।

মঙ্ক যত সাবধানেই নড়াচড়া করুক না কেন, ওদেরকে পার হয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবারই প্রানিটা মাথা তুলে দেখে নেয়, কে যাচ্ছে। ঝাপসা দৃষ্টিতে মঙ্ককে দেখে চোখ মুদে ফেলে আবার।

ওর দিকে নজর রাখো, মার্তা।

অন্তত কেউ একজন তো বাচ্চাগুলোকে ভালোবাসে।

মঙ্ক দরজার পাশে ফিরে গেল। একটা টেবিল এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রেখেছে সে। সামনে একটা চেয়ারও আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়ল ও।

বসে বসে কান পেতে জলাভূমিতে রাতের পরিচিত শব্দগুলো শুনতে লাগল মঙ্ক। পানি থেকে বুদবুদ উঠার আওয়াজ, ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঝিঁঝিঁ পোকার গুঞ্জন, আর ক্ষণে ক্ষণে শিকাররত প্যাঁচার ডাক মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিছুক্ষণ আগে কেবিনের পাশ দিয়ে বড় কোনও প্রানির চলে যাবার শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল অবশ্য। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা বুনো শুয়োর দেখে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে।

শুয়োরটাকে তাড়িয়ে দেয়নি ও। ভেবেছিল, পাহারাদার হিসেবে কাজে আসবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নিজ থেকেই সরে গিয়েছে প্রানিটা।

রাতের জলাভূমির ছন্দময় আবহে তন্দ্রা এসে গেল ওর। কিছুক্ষণ পরই, বুকের ওপর নেমে এল চিবুক। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য লেগে এল চোখের পাতা দুটো।

এবারও দেরি করে ফেলেছ, মঙ্ক! ওঠো!

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ডাকে ঝট করে মাথাটা সোজা করে ফেলল ও। টেবিলে বাড়ি খেয়ে ব্যাথায় কুঁচকে ফেলল মুখ। মাথা ঝনঝন করছে ব্যাথায়। এক মুহূর্তের জন্য নাকে ধাক্কা মারলো দারুচিনির সুগন্ধ।

তারপর এক নিমিষেই মিলিয়ে গেল ওটা।

স্বপ্ন দেখছিল...

ব্যাথাটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সোজা হয়ে বসে রইল ও। কানের পিছনের ক্ষতটায় হাত বুলাতে লাগল ধীরে ধীরে।

আমি কে?

একটা ডুবন্ত ক্রুজ লাইনার, ভারি জাল, আর সাগর থেকে উদ্ধার পাওয়ার কাহিনী ওকে বলেছিল কনস্টানটাইন। ও কি জাহাজটায় কাজ করত? নাকি জাহাজটার যাত্রী ছিল? স্মৃতি হাতড়ে কোনও জবাব পেল না প্রশ্নগুলোর।

ঘরের ভেতর নজর বুলাতে গিয়ে দেখতে পেল, এক জোড়া চোখ ওর দিকে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পিওতর...টেবিলের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার শব্দে হয়তো ঘুম ভেঙে গেছে ছেলেটার।

কিংবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে!

ভালো করে বাচ্চাটার দিকে তাকাল মঙ্ক। ছেলেটার দু'চোখে গভীর দুঃখের ছাপ দেখতে পেল ও, এই বয়সী কোনও বাচ্চার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্বাভাবিক না, পিওতরের নিস্পলক দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল মঙ্ক। সাধারণ কোনও দুঃখ বা ভয় দেখা যাচ্ছে না চোখ দুটোতে । ছোট মুখটায় ছেয়ে আছে হতাশার ছাপ, কোনও বাচ্চার চেহারায় সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। কাঁপতে কাঁপতে মার্তাকে ঝাঁকি ধাক্কা মারতে লাগল ছেলেটা।

মৃদু স্বরে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে করতে জেগে উঠল মার্তা।

মঙ্ক উঠে ওদের দিকে এগোলো। আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে বাচ্চাটার চোখ দুটো। ওর কপালে হাত রাখল মঙ্ক।

গরম। জ্বর এসেছে।

ধুর! আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছেলেটা।

অল্প একটু বিশ্রামও কি নেই ওর ভাগ্যে?

নীরব প্রশ্নটার জবাব দিতেই যেন একটা মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে এল। কাছেই কোনও জায়গা থেকে আসছে আওয়াজটা। মৃদু গোঙানি দিয়ে শুরু হওয়া শব্দটা ধীরে ধীরে বিকট গর্জনে পরিণত হলো। মঙ্কের মনে হলো যেন করাত দিয়ে কাঠ চিড়ছে কেউ।

কয়েক সেকেন্ড পর বিপরীত দিক থেকে আরেকটা চিৎকার ভেসে এল।

কনস্টানটাইন আর কিস্কা, দুজনেই কেঁপে উঠল পাশবিক সেই চিৎকারে ।

কোনও আগাম সংকেত না দিয়েই গর্জন শুরু করেছে প্রাণী দুটো।

বিশাল বিড়ালগুলোর আগমনের কোনও খবর পায়নি ও। এমনকি কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেনি পিওতরও। সম্ভবত জ্বর বা ক্লান্তির জন্যই এমনটা হয়েছে। আগাম সংকেত পাবে, ভেবে রেখেছিল মঙ্ক।

কেবিনটা নিরাপদ নয়। নদীর তীর থেকে ও আগেই দেখেছে, একেকটা বাঘের ওজন কম করে হলেও সাতশো পাউন্ড হবে। পেশীবহুল শরীর। দরজা বা ছাদ চিড়ে ফেলে ভেতরে ঢুকতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না ওদের। তবে কপাল ভালো, এখনও আক্রমণ করে বসেনি প্রানিগুলো, গর্জন করতে করতে কেবিনটার চারপাশে চক্কর মেরে পরিস্থিতি মেপে নিচ্ছে।

কনস্টানটাইন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করল। বাঘগুলো যদি কেবিনের ভেতর না-ও ঢোকে, ওদের পেছনে নিশ্চয়ই দু'পেয়ে শিকারীরাও আছে। তারা নিশ্চয়ই ওদের ছেড়ে কথা বলবে না।

আর কোনও উপায় না দেখে, দ্রুত তৈরি হয়ে নিলো ওরা।

বেল্টে গোঁজা ধারালো ছুরিটা হাতে নিলো মঙ্ক। কেবিনেই পাওয়া গিয়েছিল জিনিসটা। ছুরিটার কাঠের হাতল দাঁত দিয়ে চেপে ধরল ও। তারপর একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরা তুলে নিলো ফায়ারপ্লেস থেকে। আগেই ছুরি দিয়ে একটা তিন ফুট লম্বা পাইন গাছের ডাল কেটে রেখেছিল ও। পাইনের আঠা অতিমাত্রায় দাহ্য। তাই আগুন জ্বালতেই দারুণ এক মশালে পরিণত হলো ডালটা।

গোটা ঘরে একবার চক্কর কাটলো মঙ্ক। তারপর মশালটা শুকনো ছাদের এক জায়গায় চেপে ধরল। দীর্ঘদিনের অবহেলায় একেবারে শুকিয়ে খটখটে হয়ে ছাদ, আগুনের স্পর্শ পেতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কেবিনে খুঁজে পাওয়া বাতি থেকে খানিকটা কেরোসিনও ছড়িয়ে নিয়েছে ও।

দেখতে না দেখতেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা ছাদ জুড়ে।

ততক্ষণে রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে আরও উচ্চস্বরে গর্জাতে শুরু করেছে বাঘদুটো।

মঙ্কের পেছনে, মেঝে থেকে দুটো পাইন বোর্ড তুলে নিয়েছে কনস্টানটাইন। ছুরি দিয়ে আগেই বোর্ডদুটোকে আলগা করে করে রেখেছিল মঙ্ক। এতে করে কেবিনের নিচে, চারদিক থেকে খোলা একটুখানি জায়গা উন্মুক্ত হয়ে গেল। নিচে নড়াচড়া করার মতো জায়গা খুব কম। নিচের মাটি থেকে কেবিনের মেঝের জায়গাটুকু মঙ্কের

পক্ষে বেশ নিচু, তবে মার্তা আর বাচ্চাদের জন্য মানানসই। সে আশা করল, বাঘদুটোও ওখানে ঢুকতে পারবে না।

দরজার উল্টোদিকে, কেবিনের একমাত্র জানালাটার হুড়কো খুলে ফেলেছে কিস্কা।

প্রায় একই সময়ে লাথি মেরে দরজার সামনে থেকে টেবিলটা সরিয়ে দিল মঙ্ক।

সময় খুব কম। আগুনের উত্তাপ বাড়ছে, ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে আসছে কেবিনটা।

পিওতরকে মেঝের ফোকরটা দিয়ে নিচে নেমে যেতে সাহায্য করল মার্তা। পরমুহূর্তে নিজেও নেমে গেল। তারপর কিস্কা।

মঙ্কের দিকে তাকিয়ে নড করল কনস্টানটাইন। "সাবধানে থেকো।"

ছুরিটা দাঁতের ফাঁকে নিয়ে নড করল মঙ্কও।

বাকিদের দেখাদেখি নিচে নেমে গেল কনস্টানটাইন।

বাঘগুলোর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে এখন। ছাদের আগুন আর ধোঁয়া আরও বাড়িয়ে প্রাণিগুলোকে বিভ্রান্ত করে তুলতে হবে। মশালটা হাতে ধরে ও এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনলো, তারপর সজোরে লাথি মারলো দরজায়। হাট হয়ে খুলে গেল ওটা।

দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাঘ। ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল ওটা। চমকে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শূন্যে থাবা চালিয়ে দিল।

নিজেদের ভাষায় যেন মঙ্ককে গালি দিচ্ছে প্রানিটা।

তেরো ফুট লম্বা ভীতিকর জন্তুটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মঙ্ক। তারপর হাতের মশালটা দুলিয়ে আগুনের বৃত্ত রচনা করল। প্রচণ্ডগতিতে লাফিয়ে চলেছে ওর হৃৎপিণ্ড।

তবুও সে যেমনটি আশা করেছিল, দরজা ভাঙার বিকট আওয়াজ দ্বিতীয় বাঘটার দৃষ্টি এদিকে সরিয়ে দিয়েছে। বামপাশ দিয়ে এগিয়ে এল ওটা। মশাল ধরা হাত বাড়িয়ে বিড়ালটার মুখে আগুনের ঝাপটা মারলো মঙ্ক। আগুনের ঝলকে মুখের কিছু লোম জ্বলে গেল জন্তুটার। যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ গর্জন করে উঠে ঘুরে গেল প্রাণিটা।

বাঘটার বামকানের ক্ষতচিহ্ন বলে দিল, এটা জাখার।

ভাইকে বাঁচাতে গর্জে উঠে লাফিয়ে সামনে এগোলো আর্কাদি।

মঙ্ক জানে, হাতে মশাল থাকুক বা না থাকুক, ওর উপর হামলে পড়তে চলেছে প্রানিটা। হাতের মশালটা বর্শার মতো ছুঁড়ে মারলো ও। উড়ে গিয়ে বাঘটার খোলা মুখে ঢুকে গেল জ্বলন্ত পাইনের ডাল। লাফিয়ে উঠল বাঘটা, শূন্যেই সারা দেহ মোচড়াতে লাগল যন্ত্রণায়।

মঙ্ক এবার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা ছুরিটা হাতে নিলো। তারপর ঘুরে ছুট লাগালো কেবিনের ভেতরের দিকে। এক পলক পেছনে তাকাতেই দেখতে পেল, জাখার সরাসরি ওর দিকেই ছুটে আসছে।

আঁতকে উঠে এক লাফে ধোঁয়াচ্ছন্ন কেবিনে ঢুকে গেল মঙ্ক। টিয়ার গ্যাসের মতো আচরণ করছে উত্তাপ আর ঝুলকালি, সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেল ও। সহজাত

প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে সামনে বাড়তে লাগল। খোলা জানালাটা দরজার ঠিক বিপরীত পাশেই। চোখ পিটপিট করে সামনের দেয়ালে গাঢ় একটা ফোকরের মতো আকৃতি দেখতে পেল সে, হাত দুটো বাড়িয়ে ডাইভ দিল ফোকর বরাবর।

ঠিকঠাকই এগুচ্ছিলো, কিন্তু পেছন থেকে ধেয়ে আসা একটা থাবা আটকে দিল ওকে। যদিও গায়ে নখর বেঁধাতে পারেনি, কিন্তু আঘাতের তীব্রতা বাঁকিয়ে দিল ওর গতিপথ। জানালার এক কোনায় আছড়ে পড়ল ও। অসাড় হয়ে গেল একদিকের কাঁধ। প্রচণ্ড গতির কল্যাণে জানালা পেরিয়ে ওপাশে হুড়মুড় করে পড়ল মঙ্ক। নইলে খারাবি ছিল কপালে। হাত থেকে আগাছার দঙ্গলে ছিটকে পড়ল ছুরিটা ।

ওর পিছনে, দেয়ালে ধাম করে বাড়ি খেল জাখারের ভারি দেহ। বাঘটার আছড়ে পড়ায় থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো কেবিন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে উঠল উপরে। গলা দিয়ে আদিম, জান্তব একটা চিৎকার করে উঠল প্রাণিটা।

কোনওরকমে হাচড়েপাচড়ে উঠে দাঁড়াল মঙ্ক। তারপর সোজা দৌড় দিল পানির উপর দিয়ে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই আবারও হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ল।

দুপুর ২:২০
ওয়াশিংটন, ডি. সি.

"মেনিনজাইটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ওর মধ্যে," স্বীকার করলেন ড. ইউরি রাইভ।

বৃদ্ধ রাশিয়ান বিজ্ঞানীর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছেন পেইন্টার। ড. রাইভের পাশে বসা জন ম্যাপলথোর্প। শেন ম্যাকনাইটের তৈরি ডোশিয়েতে এই লোকের ছবি দেখেছিল পেইন্টার। চমক জাগানো একজন অতিথিও এসেছেন ওদের সাথে আর্চিবাল্ড পোকের নিরুদ্দেশ সহকর্মী ড. ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড।

খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

লোকটাকে প্রশ্ন করার জন্য আকুলিবিকুলি করেছেন পেইন্টার। কিন্তু পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ-এর ক্যাপিটাল গ্রিল-এ এই সাক্ষাতটার আয়োজন করতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। বেঁধে দেয়া হয়েছে ওদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ড. পোককে নিয়ে যে কোনোও ধরনের আলোচনা নিষিদ্ধ, অন্তত এই মুহূর্তে। এখনকার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মেয়েটির স্বাস্থ্য।

সাথে করে নিজস্ব এক্সপার্ট টিম নিয়ে এসেছেন পেইন্টার। লিসা আর ম্যালকম বসে আছেন তার পাশে। এই যুগল ওদের সরবরাহকৃত তথ্য সঠিক কিনা তা বোঝার মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানের অধিকারী।

টেবিলের ওপাশে, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রাশিয়ান লোকটাকে। মিটিং-এ দর কষাকষির জন্য লোকটাকে যেরকম দানবের মতো কল্পনা করেছিলেন পেইন্টার, এখন সে কল্পনার সাথে বাস্তবের লোকটার কোনও মিল পাচ্ছেন না। কুঁচকানো কালো কোট পরা লোকটাকে স্নেহার্দ্র দাদুর মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভয়ানক দৃষ্টি তার চোখ

দুটোতে। মেয়েটার কথা উঠা মাত্রই যেন তার উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেছে, খেয়াল করলেন পেইন্টার। টেবিলের ওপর লিসার রাখা মেডিক্যাল ফাইলটা যত পড়ছেন, ততোই মুখ কুঁচকানোর হার বাড়ছে। পেইন্টারের সন্দেহ, মেয়েটার মৃত্যুভয়ই তার সহযোগিতার একমাত্র কারণ।

"বয়স বাড়ার কারণে ওর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে," আগের কথার খেই ধরে বললেন ইউরি। "তবে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কেন। ওর ডিভাইসের মাইক্রোইলেকট্রোডগুলো কার্বন-প্ল্যাটিনাম ন্যানোটিউব দিয়ে তৈরি। আমাদের ধারণা, সাবজেক্ট যত বেশি নিজের মেধা ব্যবহার করে, ততোই দ্রুত তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। আপনাদের কাছে থাকার সময় সাশা কী কোনও আঁকা-আঁকি করেছে?"

মেয়েটার স্কেচগুলোর কথা মনে পড়ল পেইন্টারের: একটা সেইফ হাউস, তাজ মহল, মঙ্কের একটা ছবি। ধীরে ধীরে নড করলেন তিনি। "আঁকার সময় ওর হাবভাব ঠিক কেমন ছিল?"

এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন ম্যাপলথোর্প, তার গলার স্বরে শীতলতা। "আপনি জানেন, এখানকার আলোচনার বিষয় ওসব না। পাতলা বরফে পা ফেলছেন আপনি, ডিরেক্টর ক্রো।"

ম্যাপলথোর্পের বাধা উপেক্ষা করে বলতে শুরু করলেন ইউরি। "ও এক বিস্ময়কর প্রতিভা। দূর-দর্শন সংক্রান্ত ব্যাপারে ওর দক্ষতা প্রশ্নের অতীত। আর উদ্দীপনা বাড়ানো হলে তো...সেই ক্ষমতা পার করে যায় সব ধরণের সীমারেখা।"

"যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামুন," ধমকে উঠলেন ম্যাপলথোর্প। "নয়তো আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। মরে যাবার পর মেয়েটার দেহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন না হয়।"

কালো হয়ে গেল ইউরির মুখটা, তবে সাথে সাথে চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

লিসা পেছন থেকে উৎসাহিত করল তাকে।"বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহারের সাথে সাশার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার সম্পর্ক কী?"

নরম সুরে বলতে শুরু করলেন ইউরি, গলায় অনুশোচনার সুর। "খুব বেশি উত্তেজিত হলে, ওর মস্তিষ্কের জৈব আর অজৈব ভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী অংশে লিক শুরু হয়।"

নড়ে উঠলেন ম্যালকম। "লিক বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?"

"আমাদেররিসার্চারদেরমতে,মাইক্রোইলেকট্রোডের শেষ প্রান্ত থেকে ন্যানোপার্টিকেল বের হয়ে মস্তিষ্কের মজ্জার সাথে মিশ্রিত হয়েছে।"

লিসা মুখ খুললো এবার। "এজন্যই কিছু ধরতে পারিনি আমরা। ওর ওই মেনিনজাইটিস ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত কোনও রোগ ছিল না। বহিরাগত দূষিত কণার ফলে হয়েছিল ওটা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ইউরি।

"ওকে সুস্থ করে তোলার জন্যে আমাদের তাহলে ওই দূষণটার চিকিৎসা করতে হবে," বলল লিসা।

"হ্যাঁ। প্রতিরোধক ওষুধ তৈরি করতে আমাদের বহু বছর সময় লেগেছে। মূলত মূত্রাশয় ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কেমোথেরাপিউটিক ওষুধের উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করি আমরা। মস্তিষ্ক আর মাইক্রোইলেকট্রোডগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে ওগুলো। চিকিৎসা করার জন্য ঠিক কত মাত্রার ওষুধের মিশ্রন দরকার পড়বে, তা জানতে হবে আগে। আর সেজন্য মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

পেইন্টার লক্ষ্য করলেন, ম্যাকব্রাইডের ঠোঁটের কোনা শক্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ড. রাইভের ওপর অসন্তুষ্ট তিনি। কিন্তু রাশিয়ান বিজ্ঞানী যদি সত্যি বলে থাকেন, তাহলে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন তিনি।

পেইন্টারের হাঁটুতে চেপে বসল লিসার আঙুল। ড. রাইভকে বিশ্বাস করেছে ও, এটা তারই সংকেত। রাশিয়ান বিজ্ঞানী আর বাকি লোক দুজনের মতপার্থক্যের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন পেইন্টারও। ব্যাপারটা কী কোনওভাবে নিজের পক্ষে কাজে লাগানো যায়?

এবার ম্যাকব্রাইড কথা বলে উঠলেন। "আমাদের কাছে ড. রাইভের ওষুধ আছে। আপনারা মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে এলে, আমরা ওর চিকিৎসা শুরু করতে পারব। ওয়াল্টার রিড আর্মি মেডিক্যাল সেন্টারে আনতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।"

মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

ভালো চাল দিয়েছ, বাছা।

লিসা ওকে সমর্থন দিল। "বাচ্চাটা প্রচণ্ড দুর্বল, ওর পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভব না। ডি.আই.সি.-তে ওকে কোনওমতে দেখাশোনা করছি। বাড়তি যেকোনও ধরনের চাপ বর্তমানে নষ্ট করে দিতে পারে ওর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।"

"তাহলে আমাকে ওখনই ওর কাছে যেতে হবে," বললেন ইউরি।

পেইন্টার বুঝলেন, দর কষাকষির সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় চলে এসেছেন তারা। বাচ্চাটা রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন কেট আর শেনের তত্ত্বাবধানে আছে ও। ডারপা'র ডিরেক্টর হিসেবে শেনও পর্দার আড়ালে নিজ ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন।এই গোলটেবিল বৈঠক আসলে কুটনৈতিক পাহাড়ের শুধুমাত্র চূড়ার অংশ, বাকিটা এখনও পর্দার আড়ালে।

ইউরিকে মেয়েটার কাছে না নিয়ে আর কোনও উপায় নেই পেইন্টারের,যা সিগমার নিরাপত্তানীতির লঙ্ঘন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ম্যাপলথোর্পও তা জানেন।আর এখানকার পরিস্থিতি এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মন কষাকষির ফলস্বরূপ আর যাই হোক, ম্যাপলথোর্প অন্তত এখন ইউরিকে একা যেতে দেবেন না।

"ড. রাইভের সঙ্গে একজনকে যাবার অনুমতি দেব আমি," বললেন পেইন্টার।

ওর কথার ভুল অর্থ ধরলেন ম্যাপলথোর্প। "আমরা জানি, সিগমার কমান্ড কোথায় আছে। যদি নিজেদের অবস্থান ফাঁস হওয়ার ভয় পেয়ে থাকেন, তাহলে হতাশ হতে হবে আপনাকে। স্মিথসোনিয়ান ক্যাসলের নিচেই ওটা।"

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, তার চমকে যাওয়া উচিত না। তবুও পেটের ভেতর যেন কিছু একটা মুচড়ে উঠল তার। ওয়াশিংটনে ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সব জায়গা ম্যাপলথোর্পের নখদর্পণে। শেন ওকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলন, ঘটনাটার সাথে কারা জড়িত আর তাদের অবস্থান খুঁজে বের করতে লোকটার বেশিদিন সময় লাগবে না। তবে নিজের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা খাটিয়েও ম্যাপলথোর্প এখনও সিগমার আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। পর্দার পিছনে লোকটা নিশ্চয়ই সেই শেষ দেয়ালটা ভাঙার জন্য তুলকালাম করে ফেলছে। আর শনের লক্ষ্য, তাকে সফল হওয়া থেকে আটকানো।

নিজের কথায় অবিচল রইলেন পেইন্টার। "তা হোক। কিন্তু আমি ড. রাইভের সাথে একজনের বেশি যাবার অনুমতি দেব না।" লোক দুজনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি।

হাত তুললেন ম্যাকব্রাইড। "তাহলে আমি যাব। ইউরিকে সাহায্য করতে পারব আমি।"

রাশিয়ান বিজ্ঞানীর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, এতে রাজি নন তিনি।

সঙ্গীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন ম্যাপলথোর্প। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন। "তবে আমরা সহযোগিতার বিনিময়ে বিশেষ কিছু সুবিধা চাই," বললেন তিনি।

"কী সুবিধা?"

"মেয়েটাকে আপনি আপাতত নিজের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠার পর, যেকোনও সময় যেন ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি আমরা। আসলে, ওর মতো সম্পদ আমরা কোনওমতেই হাতছাড়া করতে পারি না। ব্যাপারটার সাথে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।"

"ফাঁকা বুলি আউড়াবেন না আমার সাথে," জবাব দিলেন পেইন্টার। "বাচ্চাটার সাথে আপনারা যা করেছেন, তা মানবতার সব ধরনের নীতির খেলাপ।"

"প্রজেক্টটা আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা শুধু শেষের দিকে অর্থনৈতিক সাহায্য আর বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিয়েছি। এ কাজটা না করলে, বিরাট ঝুঁকিতে পড়ে যেত গোটা ইউনাইটেড স্টেটস।"

"ফালতু কথা! কোন জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমরা? যারা অসহায় মেয়েটার এই অবস্থা করতে মদদ দেয়, তাদের?"

"আপনি কি আসলেই এতোটা প্রাচীনপন্থী, ক্রো? গর্ত থেকে মুখ বের করে দেখুন, নতুন জমানা এখন।"

"না। শেষবার যখন দেখি, তখনও এটা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকা সেই আগের পৃথিবীই ছিল। একমাত্র পরিবর্তনটা কীসে এসেছে জানেন? এসেছে আমাদের

প্রতিক্রিয়া দেখানোর মাধ্যমে। সীমা লংঘনই শুধু নয়, সেই সীমার কতটুকু বাইরে যেতে প্রস্তুত আমরা, তার মাঝে। তবে এসব থামানোর এখনও সামর্থ্য আছে আমাদের।"

ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন ম্যাপলথোর্প। চোখদুটোতে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ দেখতে পেলেন তিনি। লোকটার দৃঢ় বিশ্বাস, তার কোনও ভুল নেই। যা করেছে ঠিকই করেছে। পেইন্টার ভেবে পেলেন না, এতোখানি আত্মবিশ্বাস লোকটা পায় কোথা থেকে? গোঁড়া দেশপ্রেমের আদর্শ কি তাকে নিজের পাশবিক কাজকর্ম বিচার করতে দিচ্ছে না? এজন্যই কি নিজের অপকর্মগুলো ফাঁকা দেশপ্রেমের বুলির সাহায্যে হালাল করে-নিতে চাইছেন তিনি?"

সব মিলিয়ে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

"আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি তো?" প্রশ্ন করলেন ম্যাপলথোর্প। "তা না হলে আমরা অন্য রাস্তা ধরবো। বাচ্চার কোনও অভাব নেই।"

প্রতিপক্ষকে মেপে নিলেন পেইন্টার। বাচ্চাটাকে সুস্থ করে তুলতে, লোকটার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই এখন। মেয়েটাকে মরতে দিতে পারেন না তিনি। রাজনৈতিক সংঘর্ষ না হয় পরে সামলানো যাবে।

আস্তে করে নড করলেন পেইন্টার। "আপনাদের তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে?"

"ড. রাইভের ওষুধগুলো যোগাড় করতে যতক্ষণ লাগে আর কী, এই ধরুন ঘন্টাখানেক।" জবাব দিলেন ম্যাকব্রাইড।

"আমরা অপেক্ষা করবো," পেইন্টার উঠে দাঁড়ালেন।

ম্যাপলথোর্পও উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। যেন এইমাত্র কোনও রিয়েল এস্টেট চুক্তি করলেন দু'জন। তবে একটা কথা সত্যি, বেচাকেনা তো হয়েছেই। নিজের সত্তার একটা অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন পেইন্টার।

নিতান্ত বাধ্য হয়ে, বিরস মুখে লোকটার সঙ্গে হাত মিলালেন তিনি।

লোকটার পৈশাচিক কথাটা ঘুরছে পেইন্টারের মাথায়।

বাচ্চার কোনও অভাব নেই।

কার কথা বলছিল লোকটা?

রাত ১০:৪২
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

ওকে পালাতে হবে।

খোলা পানির দিকে প্রাণপণে দৌড় শুরু করল মঙ্ক। ওর পিছনে, জ্বলন্ত কেবিন থেকে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। রাতের নীরবতাকে চিরে ফালাফালা করে দিচ্ছে আওয়াজটা।

জাখার।

বিশাল বিড়ালটা জানালার ফোকর দিয়ে লাফিয়ে বেরোতে চেষ্টা করছে।

মঙ্ক দৌড়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

কেবিনের সামনে একটা ছোট ভেলা পড়ে ছিল। আগেই ওটার গা থেকে শ্যাওলার স্তর চেঁছে তুলে ফেলেছিল ও, তারপর নলখাগড়ার ঝোপ থেকে বের করে সুবিধাজনক জায়গায় এনে রেখেছিল। তবে ভেলা থাকলেও কোনও বৈঠা ছিল না। আর কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষমেশ চিকন একটা গাছের গুঁড়িকে লগি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ঠিক করে রেখেছিল মঙ্ক।

আরেকটু সামনে, গভীর পানিতে, ভেলার স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে কনস্টানটাইন। ভেসে ভেসে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। অন্তত তো পালাতে পেরেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, মঙ্ক বাঘগুলোর নজর অন্যদিকে সরিয়ে রাখার সময় কেবিনের নিচের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাচ্চারা। ভেলাটা তীর থেকে একটু দূরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। লাফিয়ে তাতে উঠে যায় ওরা, সরতে থাকে গভীর পানির দিকে।

ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ছিল মঙ্কের। কিন্তু যেভাবে আশা করেছিল, ততোটা সহজে কেবিন থেকে বের হতে পারেনি ও।

দেরি করার জন্য দ্বিতীয় বাঘটা-আর্কাডি, ওকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেছে।

ভারি পায়ের আওয়াজ ছুটে আসছে মঙ্কের পেছনে। পানির কিনারায় পৌঁছানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে ও। হাতে কোনও অস্ত্র না থাকায় পালানো ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়াচ্ছে মঙ্ক।

মাটি কাঁপছে।

ক্রমেই কাছে চলে আসছে একটা নিচু গলার গর্জন।

এগিয়ে আসছে পদধ্বনি।

দম ফলতেও ভয় পাচ্ছে ও।

হঠাৎ একেবারে কানের কাছেই বাঘটার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

তীক্ষ্ণ ফোঁস ফোঁস শব্দ...ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

গভীর পানি এখনও অনেক দূরে।

হতাশায় ঘুরে দাঁড়াল মঙ্ক। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পিঠে ভর দিয়ে পিছু হটলো তারপর।

পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফানোর জন্য একেবারে তৈরি বাঘটা। কিন্তু...

...আগাছার দঙ্গল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেই বাঘের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ল অবয়বটা। একটা রূপালি ঝিলিক ধরা পড়ল মঙ্কের চোখে। যেভাবে ঝড়ের বেগে এসেছিল, সেভাবেই আচমকা উইলো গাছের ভিড়ে হারিয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

মার্তা।

শিম্পাঞ্জিটা তাহলে বাচ্চাদের সাথে যায়নি।

চলন্ত পথে বাধা পাওয়ায় ধাক্কাটা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করেছে আর্কাডিকে। সামনের থাবায় ভর করে পিছিয়ে গেল বাঘটা। ততক্ষণে কোনওরকমে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মঙ্ক। টলমল পায়ে কয়েক পা এগিয়েই আবারও বাঘটা গর্জন করে উঠল। তবে আওয়াজটাকে ঠিক গর্জন বলা যাবে না। কেমন যেন ভয়ার্ত ঘড়ঘড় শব্দ।

দূর থেকে দেখে মনে হলো কেউ যেন কালিমা লেপে দিয়েছে বাঘটার গলায়।

রক্ত।

বাঘটার চোয়ালের নিচে একটা ছুরি বিঁধে আছে। শুধু বেরিয়ে আছে কাঠের হাতল, ছুরিটার বাকি অংশ পুরোপুরি গলার ভেতর।

কেবিন থেকে পাওয়া সেই ছুরি ওটা।

জানালা গলে পড়ার সময় অস্ত্রটা মঙ্কের হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল।

জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে মার্তা, তারপর ওটা ব্যবহার করে জীবন বাঁচিয়েছে মঙ্কের।

হঠাৎ মাথায় এল, সহজাতভাবেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা থাকে শিম্পাঞ্জিদের। গাছের ডাল দিয়ে উইপোকা ধরে ওরা। মঙ্ক ভেবে পেল না, কোত্থেকে কথাগুলো মনে হলো ওর!

আর মার্তা কোনও সাধারণ শিম্পাঞ্জি না।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাঁপছে আর্কাডি, রক্তের ধারায় ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে পশুটার গলার তীব্রতা।

এবার নতুন আরেকটা গর্জন ভেসে এল।

জাখার।

জান্তব আওয়াজটা শুনে ভয়ে দাঁত কপাটি লেগে গেল মঙ্কের।

হাচড়েপাচড়ে কোনওমতে লাফিয়ে গভীর পানিতে নামলো ও, সাঁতরাতে শুরু করল সামনের দিকে।

পেছন পেছন ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

মঙ্ক ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে লাগল। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে কিছুটা কমে এসেছে ওর আতঙ্ক। তবে পানির নিচেও শোনা যাচ্ছে জাখারের চিৎকার। দম ধরে রেখে গভীর পানির দিকে ডুব-সাঁতার দিয়ে এগুতে থাকলো মঙ্ক।

দম ফুরিয়ে ফুসফুসে আগুন ধরে যাওয়ার উপক্রম হতেই, নিঃশব্দে পানির ওপর মাথা তুললো ও। পেছন ফিরে কেবিনের দিকে তাকাল। অন্ধকারের বুক চিরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা। আগুনের আভায় দেখতে পেল, জ্বলন্ত কেবিন থেকে অবশেষে বেরিয়ে আসতে পেরেছে জাখার। এখন ভাইয়ের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে ও। অবশ্য কোনও নড়াচড়া করছে না আর্কাডি।

গাছের শাখা-প্রশাখা ঠেলে মার্তার এগিয়ে আসার আওয়াজ পেল মঙ্ক। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল,লাফিয়ে ভেলায় নামছে প্রাণিটা।ওর মাথার কাছ থেকে প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ভেলাটা।

সাঁতরে এগিয়ে গেল ও,টেনেহিঁচড়ে ভেলার ওপর তুললো নিজেকে। তারপর চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

ওর পাশে মার্তা শুয়ে আছে,অল্প অল্প নড়ছে।গলা দিয়ে মৃদু গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে প্রাণিটার। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে পিওতর।

মঙ্ক কনুইয়ের ওপর ভর করে কেবিনের দিকে একপলক তাকিয়েই আবার মার্তার দিকে নজর দিল।

বন্ধ হয়ে গেছে জাখারের চিৎকার। শিম্পাঞ্জিটার কাঁধে এক হাত রাখল মঙ্ক। শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে ওর।

এমনটাই হওয়ার ছিল।

গায়ে হাত বুলিয়ে মার্তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল মঙ্ক।

অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছে আর্কাডির উপর। অর্ধ-উন্মাদ এক দানবে পরিণত করা হয়েছিল ওকে।

মৃত্যু এসে বাঁচিয়ে দিয়েছে প্রানিটাকে।

তবুও, মার্তার শোক থামছে না।

খুন করা সহজ কোনও কাজ নয়।

স্টার্নে দাঁড়িয়ে লগি বাইছে কনস্টানটাইন, ধীরে ধীরে জলাভূমির কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

মঙ্ক উঠে বসল। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে, সবার ব্যাগ গুছিয়ে ভেলায় এনে রেখেছিল ও। ব্যাগের জিপার থেকে ঝুলন্ত একটা ব্যাজের দিকে নজর পড়ল ওর। রেডিয়েশন মনিটর।

আগুনের আভায় স্পষ্ট দেখা যাছে সবকিছু।

গোলাপি রঙটা আরও গাঢ় হয়েছে।

সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ফিকে হয়ে আসছে ওদের আশা।

বিকেল ৪:৩১
ওয়াশিংটন, ডি. সি.

আইভি ব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে নল বেয়ে নামতে থাকা তরলের প্রবাহের মাত্রা ঠিক করে দিলেন ইউরি। কাজ করতে গিয়ে হাতদুটো কাঁপছে তার। দারুণ উৎকণ্ঠা বোধ করছেন বিছানায় শোয়া সাশাকে নিয়ে। মেয়েটার ছোট্ট দেহের প্রায় পুরোটাই কম্বলের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি যা ভেবেছিলেন,তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ওর।

ম্যাকব্রাইড আর ম্যাপলথোর্পের জন্য অপেক্ষা করে নষ্ট হওয়া সময়টুকুর জন্য আফসোস হচ্ছে তার,ওই সময়টুকুতে সাশার চিকিৎসা শুরু করতে পারতেন তিনি। ওই দুজন ব্যক্তিগত কাজে বাইরে যাওয়ায়, তখন এফবিআই অফিসে বন্দি হয়ে বসে থাকতে হয়েছে তাকে। শেষ পর্যন্ত ইউরির হোটেল রুম থেকে ওষুধপত্র নিয়ে ফিরেছেন ম্যাকব্রাইড।

পায়ে হেঁটে মল পার হন তারা। স্মিথসোনিয়ান ক্যাসলের বাইরে তাদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয় ইউরির। সেখান থেকে তাদের এসকর্ট করে, প্রাইভেট এলিভেটরের সাহায্যে নিচের নিরাপদ ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে আসে অস্ত্রধারী গার্ড। প্রথমে তাদের তল্লাশি করা হয়, গোটা শরীর স্ক্যান করা হয় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে। তারপর বেঁধে ফেলা হয় দু'চোখ। মাটির নিচের গোলক ধাঁধায় হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে চলতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন ইউরি। অবশেষে একটা রুমে পৌঁছান তারা। বন্ধ হয়ে যায় পেছনের দরজা। ক্লিক করে দরজাটার লক হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান তারা।

চোখের পট্টি খোলার পর নিজেকে একটা ছোটখাটো হাসপাতালে আবিষ্কার করেন ইউরি। একপাশের দেয়ালের বেশিরভাগ অংশই আয়না দিয়ে ঢাকা, সম্ভবত একটা ওয়ান-ওয়ে মিরর। ওপাশ থেকে নজর রাখা হচ্ছে তাদের উপর। দুজন মেয়ে বাচ্চাটাকে পাহারা দিচ্ছিলো। নিজেকে ক্যাট ব্রায়ান্ট নামে পরিচয় দেন লালচে চুলওয়ালা তাদের একজন। আর অন্যজন হলেন ড. লিসা কামিংস, তার সাথে রেস্টুরেন্টেই পরিচিত হয়েছিলেন ইউরি। লিসার হাতে একগাদা মেডিক্যাল রিপোর্ট।

"আমরা আপনাকে সাহায্য করবো," লিসা বলল। "বলুন কী করতে হবে।"

কাজে লেগে গেলেন ইউরি। সবগুলো রিপোর্ট পড়লেন, সাম্প্রতিক ব্লাড টেস্টগুলো খতিয়ে দেখলেন। ওষুধের মাত্রা হিসেব করে নেয়ার জন্য আরও দশ মিনিট সময় নিলেন তিনি। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন ম্যাকব্রাইড। তিনিও হাত লাগাতে চাইছিলেন কাজে।

লোকটার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন ইউরি। "আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন।"

সাশার চিকিৎসাপদ্ধতি জানা নেই আমেরিকানদের, জানানোর কোনও ইচ্ছাও নেই ইউরির।

জটিল পদ্ধতিটা খাটানোর ফলে প্রচণ্ড ধকল যাবে মেয়েটির দেহের ওপর দিয়ে। কিন্তু সাশাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিতে পারেন না তিনি।তাই বাধ্য হয়ে ম্যাকব্রাইডের সামনেই কাজ শুরু করতে হয়েছে তাকে।তবে সাশা যদি সুস্থ হয়ে উঠে...

তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো ক্যাটের কণ্ঠ। জিজ্ঞেস করল, "ও কি সুস্থ হবে?"

ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকা তরলটার নলে মৃদু টোকা মারলেন ইউরি। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার চোখে চোখ রাখলেন। লালচে চুলগুলো মাথার পেছনে টেনে বাঁধা। সাশার জন্য দুশ্চিন্তার আভাস দেখা যাচ্ছে ওর মুখে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সত্যিটা বললেন তিনি। "আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবই করেছি। প্রতি ঘণ্টায় কিডনি পরীক্ষার ফলাফল জানতে হবে আমার। এসব দেখলে ওর স্বাস্থ্যের সম্পর্কে কিছু ধারণা পাব। কিন্তু মেয়েটা বাঁচবে কিনা, সেটা জানতে আরও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় লেগে যাবে।"

শেষ কথাগুলো বলতে গিয়ে ভেঙে এল তার গলা। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি,অচেনা মানুষের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান না। ম্যাকব্রাইডকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন ইউরি। কেমন একটা উদাসীনতা ভর করেছে লোকটার দু'চোখে। জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। দরজার কাছে একটা চেয়ার পেতে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে লোকটা।

"এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের," অস্ফুট স্বরে বললেন ইউরি। তারপর বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বিছানার ওপরে বাচ্চাদের একটা বই খোলা পড়ে আছে।

ক্যাট এগিয়ে এসে বইটা তুলে নিলো। "আমি ওকে এটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম।"

নড করলেন ইউরি। বিমান ভ্রমণের সময় তার কোলে মাথা ঠেকিয়ে বসেছিল বাচ্চাটা, আর তিনি ওকে রাশিয়ান রূপকথা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। সেই স্মৃতি মনে পড়ায় মুচকি হাসলেন তিনি। অন্য লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সবগুলো বাচ্চাকে, কিন্তু সাশা সাধারণ কোনও মেয়ে নয়।

বিছানার চাদরের নিচ দিয়ে বেরিয়ে থাকা সাশার আঙুলগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ইউরির হাত। রক্তচাপ মাপার মনিটর লাগিয়ে রাখা হয়েছে আঙুলগুলোতে। আস্তে আস্তে হাতটা স্পর্শ করলেন তিনি, ঠিক যেন একটা নিষ্প্রাণ পুতুল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ইউরি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। জুতো দিয়ে মেঝেতে তাল ঠুকছেন ম্যাকব্রাইড। কয়েক মিনিট পর প্যাথোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লিসা। বেডের উল্টো দিকে রাখা আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ল ক্যাট।

খুব ধীরে ধীরে পার হয়ে গেল প্রথম ঘণ্টা। বিছানার পাশে রাখা টেবিলে, কাগজপত্রের একটা স্তূপ লক্ষ্য করলেন ইউরি। একটা পৃষ্ঠার কোনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কালো মার্কার দিয়ে দাগ কাটা কাগজটায়। এক পলক দেখেই ইউরি বুঝে ফেললেন, ওটা সাশার কাজ। পাতার পর পাতা উল্টে চললেন তিনি, কিন্তু একটা আঁকিবুকিরও অর্থ ধরতে পারছেন না। একদম শেষ কাগজটায়, পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পেলেন তিনি। বিস্ময়ে চেয়ারের হাতলে কামড় বসল অন্যহাতের আঙুলগুলো।

ছবিটা চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে ওদের হাতে বন্দী থাকা লোকটার।

ছবিটা চোখের সামনে সোজা করে ধরলেন তিনি। আমেরিকান লোকটার বন্দি হবার ব্যাপারে কিছু জানেন না ম্যাকব্রাইড। ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে ইউরির তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা লক্ষ্য করল ক্যাট।

"আমার স্বামী," বিছানার ওপাশ থেকে বলে উঠল সে। "সাশা এঁকেছে। আমার ওয়ালেটে সম্ভবত ওর ছবি দেখেছিল মেয়েটা।"

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটা উল্টে রাখলেন ইউরি।

ওর স্বামী?

"মেয়েটা এমন কেন করল?" প্রশ্ন করল ক্যাট। উত্তরের আশায় আগ্রহ নিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল ইউরির দিকে।

পেছন ফিরে বাচ্চাটার দিকে তাকালেন ইউরি। হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে গেছে তার, সরু হয়ে এসেছে দৃষ্টি। সাশার আঁকা ছবিটাই লোকটার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আর এখন, সেই লোকটার স্ত্রীও উপস্থিত এখানে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় হতে পারে না।

কী হচ্ছে এসব?

"ড. রাইভ?" ক্যাটের ডাকে সম্বিত ফিরল তার।

সাথে সাথে একটা খসখস আওয়াজ তাকে উত্তর দেয়ার ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিল। চোখ মেলেছে সাশা। নীল চোখ দুটোতে যেন সাগরের গভীরতা। আরেকটু কাছে ঘেঁষে বসলেন ইউরি, উঠে দাঁড়াল ক্যাট।

দুর্বলভাবে নড়াচড়া করছে বাচ্চাটা, অস্থির দৃষ্টি চোখে। কিন্তু ওর মুখটা ইউরির দিকে ঘুরে গেল। রাশান ভাষায় কথা বলে উঠল সাশা, "উখি পিপে?"

সেই নাম।

থমকে গেলেন ইউরি, যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে তার শরীরে। চার্চের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া অন্ধকার, সরু একটা পথের ছবি ভেসে উঠল তার স্মৃতিতে। একটা বাচ্চা বসে আছে পাথরের বেদীর সামনে, একহাতে জীর্ণ একটা পুতুল। একইরকম নীল চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল চার্চের সেই বাচ্চাটা।

এখানেও চোখে সেই একই অভিযোগ, একই আওয়াজ।

উভিখ পিপে...

অশউইৎযের কসাই, জোসেফ মিংগ্রেলের ডাক নাম।

সাশার হাতের তালু নিজের হাতে তুলে নিলেন ইউরি।

না, মনে মনে ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি।

আর কখনও না।

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ইউরির।

সাশার শীর্ণ আঙুলগুলো দুর্বলভাবে তার হাত আঁকড়ে ধরল। "পাপা...পাপা ইউরি...?"

"হ্যাঁ," ফিসফিস করে বললেন তিনি। "আমি এখানেই আছি, মামণি। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।"

আবার ঘুমে ঢলে পড়ার আগে নড়ে উঠল ওর ঠোঁট দুটো, "মার্তা...মার্তা ভয় পেয়েছে..."

রাত ১১:৫০
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

মৃতদেহটা এখনও গরম, তবে জমাট বেঁধে গেছে রক্তের ধারা।

তার মানে, এক ঘণ্টা কিংবা তারও আগে হয়েছে খুনটা।

মৃত বাঘটার পাঁজর থেকে হাত সরিয়ে নিলো লেফটেন্যান্ট বরসাকোভ। মাথার কাছে পৌঁছে একহাতে উল্টেপাল্টে দেখল কানদুটো, কোনও ক্ষত নেই। অর্থাৎ, এটা আর্কাডি।

উঠে দাঁড়াল লেফট্যানেন্ট।তার অন্যহাতে একটা এমপি-৪৪৩ পিস্তলের রাশিয়ান সংস্করণ। জাখারকে খোঁজে আশেপাশে তাকাল সে,বাঘটার কোনও চিহ্নই চোখে পড়ল না।

পেছনে ধোঁয়া উঠছে পুড়ে যাওয়া কেবিনের ধ্বংসাবশেষ থেকে।

সবকিছু দেখা শেষ করে এয়ারবোটের দিকে ফিরে চলল সে। অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে একজন পাইলট আর দুজন সৈনিক ওকে কাভার দিচ্ছিলো এতোক্ষণ। অন্ধকারের বুক চিরে সামনের দিকে জিহ্বা তাক করে আছে এয়ারবোটের হেড লাইট।

এয়ারবোটে চড়ে সামনের দিকে এগোনোর ইশারা করল বরসাকোভ। তার সংকেত পেয়ে সাথে সাথে ইঞ্জিন চালু করে দিল পাইলট। শিকারির লজের ধ্বংসাবশেষ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল এয়ারবোট। ইনফ্রারেড স্কোপ বা নাইট-ভিশন গগলস ব্যবহার করতে পারলে শিকার আরও সহজ হতো। কিন্তু গতকাল ওগুলো আনতে গিয়ে দেখা যায়, কে বা কারা যেন নষ্ট করে দিয়েছে ওদের সরঞ্জামগুলো।

হয় আমেরিকানটা, আর নয়তো বাচ্চাগুলো।

ওরা জানতো, ওদের পিছু নেয়া হবে।

"জেনারেল-মেজর মারতোভের কাছে রিপোর্ট করা উচিত না?" রেডিওর দিকে ইঙ্গিত করল তার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মাথা নেড়ে মানা করে দিল বরসাকোভ।

ব্যর্থতার খবর শুনতে পছন্দ করেন না জেনারেল-মেজর।

জলাভূমির উপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে এয়ারবোটটা।

আমেরিকানটাকে খুন করে তারপর জেনারেল-মেজরকে ফোন করবে সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফেলে আসা দ্বীপটার দিকে তাকাল বরসাকোভ। আমেরিকান লোকটার চেহারা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে।

কে এই লোক? আর ট্রেনিং-ই বা পেয়েছে কোথায়?

সন্ধ্যা ৬:০২
ওয়াশিংটন, ডি. সি.

ফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকালেন ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড। ওরা তাকে একটা ওয়াল ফোন ব্যবহার করতে দিয়েছে, আর সেই সাথে ম্যাপলথোর্পের অফিসের সাথে লাইনও পাইয়ে দিয়েছে। একান্তে কথা বলতে দেয়া হবে না তাকে, এটা খুব ভালো করেই জানতেন ট্রেন্ট। নিশ্চয়ই কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে,তাকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না কেউ।

ম্যাপলথোর্পকে পাওয়া গেল লাইনে। দায়সারা গোছের কিছু কথা সেরে আসল কথা তুললেন ট্রেন্ট। "মেয়েটা মনে হয় এ যাত্রা বেঁচে যাবে।"

মারা গেলে তো আর কোনও কথা নেই...খেল খতম।

"খুব ভালো," জবাব দিলেন ম্যাপলথোর্প।এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন।"নিশ্চিত হতে কতক্ষণ লাগবে?"

ঘড়ি দেখে মনে মনে সময় আন্দাজ করলেন ট্রেন্ট। "প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো।"

তার মানে, মাঝ রাত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ম্যাপলথোর্প। "খুবই ভালো খবর।"

সবুরে মেওয়া ফলে।

১৪
৬ সেপ্টেম্বর, রাত ১১:০৪
পাঞ্জাব, ভারত

"আর সামনে যেতে পারব না আমরা," বলে উঠল আভি ভাজ্জি।

তর্ক করল না গ্রে। আসলে তর্কে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই ও, খুবই ক্লান্ত। মার্সিডিজ এসইউভির অ্যাক্সেলের নিচের পুরো অংশ ডুবে আছে কাদাপানিতে। এক টুকরো পাথুরে মাটি দেখতে পেয়ে সেদিকে গাড়ির মুখ ঘোরালো গ্রে।

মূষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে গত দু'ঘন্টা যাবত। মেঘের ভেতর এতো পানি জমা ছিল কী করে, ভেবে অবাক হলো ও। অনেকক্ষণ আগেই আম বাগানটা পেরিয়ে এসেছে, দূরত্বের হিসাবে প্রায় ত্রিশ মাইলের মতো হবে। তারপর থেকে এগোতে হচ্ছে দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে। এলাকাটা একদম জনশূন্য। প্যাঁচানো পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে জায়গা করে নিয়েছে উঁচু উপত্যকা। বৃষ্টির পানিতে নিচু খাঁড়িগুলো ভরে একেবারে উপচে পড়ছে, অঝোরে কাঁদছে যেন গোটা আকাশ।

কিন্তু এই বৃষ্টি অন্তত হেলিকপ্টারগুলোকে আটকে দিতে পেরেছে। হাজার হাজার একর বিস্তৃত এই বুনো এলাকায় তাদের হারিয়ে ফেলার পর, শিকারের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ফড়িংগুলো। ফিরে গেছে তাই অনেক আগেই। তবে আশার কথা হচ্ছে, গোটা এলাকাটা ভালো করে চেনে অ্যাবে। সে-ই ওদের পথ দেখিয়ে আম বাগান থেকে বের করেছে, এখন এগিয়ে যাচ্ছে খাড়া একটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে।

এদিকে কেউ আসে না, বলছিল সে। *কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত নয় এলাকাটা*।

গ্রে ব্রেক কষতেই আবারও মুখ খুললো অ্যাবে। "গন্তব্য আর বেশি দূরে নেই। এক কিলোমিটারও হবে না, তবে এখান থেকে বাকি পথটুকু হেঁটে এগোতে হবে।"

এসইউভিটা একটা বটগাছের নিচে লুকালো গ্রে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সামনের পাহার চূড়ার দিকে তাকাল। মনে ভেসে উঠল গ্রীক কয়েনে ছাপা মন্দিরটার ছবি। অ্যাবের মতে, এখানেই কোথাও আছে মন্দিরটা। আর উধাও হওয়ার আগে ড. পোক এদিকেই এসেছিলেন। গ্রামের অল্প কয়েকজন মানুষই জানে জায়গাটার ব্যাপারে। অ্যাবের লোকজন মন্দিরটাকে একইসাথে পবিত্র বলে শ্রদ্ধাও করে আবার ভয়ও পায়। এলাকাটা অচ্ছুৎ-দের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

ড. পোক এখানে এসেছিলেন কেন? কীসের টানে এমন উদগ্রীব হয়ে এখানে ছুটে এসেছিলেন প্রফেসর?

"এই আবহাওয়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে," প্রস্তাব করলেন মাস্টারসন। "বৃষ্টি থামলে না হয় খোঁজা যাবে মন্দিরটা।"

ঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে, প্রায় মাঝরাত। সকালে এই এলাকার ধারেকাছেও থাকতে চায় না সে। দিনের আলোয় নিশ্চয় আবার ওদের খুঁজতে বের হবে হেলিকপ্টারগুলো। খোলা আকাশের নিচে ট্যাঙ্ক সাইজ মার্সিডিজ এসইউভিটা খুঁজে পেতে তাদের কোনও কষ্টই হবে না। ইতিমধ্যে ট্রাকের জিপিএস ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে গ্রে। সম্ভবত জিপিএসের মাধ্যমেই রাশিয়ান সৈন্যরা দিল্লী থেকে অনুসরণ করেছে ওদের।

অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরছে গ্রে'র মাথায়,তবে একটা বিষয়ে ও নিশ্চিত। আর তা হলো,ড.পোকের শেষ পদক্ষেপগুলো ট্র্যাক করতে চাইলে,এখনই উপযুক্ত সময়।

বাকিদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। "অ্যাবের সঙ্গে আমি যাচ্ছি। তবে তোমরা চাইলে গাড়িতে থাকতে পারো।"

হাত তুললো এলিজাবেথ। "আমিও যাব তোমার সাথে। সত্যিই যদি ওখানে কোনও মন্দির থাকে তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি।"

নড করল কোয়ালস্কি। "আর ও যেখানে যাবে,আমি সেখানে যাব।"

ওর দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল এলিজাবেথ,কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই স্বাভাবিক হয়ে এল মুখভঙ্গি।

"আমাদের একসাথেই থাকা উচিত," মত দিল রোজারো।

লুকাও মাথা নেড়ে সায় দিল।

ভ্রূ কুঁচকালেন মাস্টারসন। "তাহলে মনে হচ্ছে,ভিজতে হবে সবাইকেই।"

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। এসইউভি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে গাদাগাদি করে দাঁড়াল সবাই। সবার আগে সামনে বাড়লো গ্রে। কাপড়চোপড় ভিজে যাওয়ায় দেহের ওজন যেন হঠাৎ বিশ পাউন্ড বেড়ে গেছে ওর।

বিড়বিড় করে বৃষ্টিকে অভিশাপ দিতে দিতে এসইউভির দিকে করুণ দৃষ্টিতে দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। কিন্তু এলিজাবেথ এগিয়ে যেতেই তাকে অনুসরণ করল বিশালদেহী লোকটা।

"এদিক দিয়ে," গাছপালার আড়াল থেকে শুরু হওয়া খাড়া একটা ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাবে। পাথড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে গাছের শিকড়। যেন শিকড় নয়, বৃদ্ধ মানুষের দাঁড়ি ওগুলো। বিদ্যুতের ঝলকানি চিরে দিল গোটা আকাশ, সেই সাথে বজ্রপাতের কান ফাটানো আওয়াজ।

আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে ঝড়।

প্রচণ্ড ক্লান্ত গ্রে'র এবার নিজের প্ল্যান নিয়ে সন্দেহ হতে লাগল। দিল্লী ছাড়ার আগে থেকেই সিগমার সাথে যোগাযোগ নেই ওর। হোটেলে আক্রমণের সময় টিমের স্যাটেলাইট ফোনটা হারিয়ে গিয়েছিল। এই বিরান এলাকায় নেটওয়ার্ক কাভারেজ পাচ্ছে না দিল্লী থেকে কেনা প্রিপেইড ফোনটা।

সম্পূর্ণ নিজেদের ওপর ভরসা করে চলোতে হচ্ছে ওদের। চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এগোতে লাগল গ্রে, যেন কোনও কিছু চোখ এড়িয়ে না যায়। কিন্তু সাথে

বেসামরিক লোকজন থাকায় তাদের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হচ্ছে ওকে। এতে বাধা পড়ছে ওর নজরদারিতে।

সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকার পথ ধরল অ্যাবে। উপত্যকার ঠিক মাঝখান সামনে এগিয়েছে অগভীর একটা খাঁড়ি, বৃষ্টির পানির ধারা বইছে সেখান দিয়ে। খাঁড়িটার পাশ দিয়েই সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ। উপত্যকার দু'পাশেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল।

অ্যাবের পিছু নিলো গ্রে। উন্মত্ত বাতাসের ঝাপটা পাহাড়ের গা ভেদ করে আসতে পারছে না ভেতরে, বৃষ্টির ঝাপটাও কম এখানে। তবে পানি পড়ছে পাথুড়ে দেয়াল বেয়ে। আস্তে আস্তে পানির ধারা উঁচু হচ্ছে সংকীর্ণ গিরিখাতের তলায়।

একজন একজন করে সামনে এগোতে লাগল ওরা।

বজ্রপাতের আকৃতিতে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গিরিখাতটা। সামনে এগোনোর সাথে পাল্লা দিয়ে যেন আরও সরু হয়ে আসছে। সেই সাথে উঁচু হচ্ছে দেয়ালগুলোও।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগল অ্যাবে। "দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগলে এখানে আশ্রয় নেয় আমাদের লোকজন। দাদার মুখে ছোটবেলায় গল্প শুনতাম আমরা। অচ্ছুৎ-দের উপর হামলা করতো উঁচুবর্ণের লোকজন। জ্বালিয়ে দেয়া হতো গ্রামের পর গ্রাম। আগুন থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিতো হতভাগা গ্রামবাসীরা।"

অচ্ছুৎরা যে জায়গাটা গোপন রাখবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভাবল গ্রে।

"কিন্তু পুরোপুরিভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না এই দেয়ালগুলো," চাপা গলায় বলে উঠল অ্যাবে। "অন্তত চিরকালের জন্য নয়।"

সামনে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে পথ, সেদিকেই এগোলো অ্যাবে। একপাশের দেয়ালে হাত বুলালো ও, যেন কোনও কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে- তারপর বাঁ দিকের রাস্তা ধরল।

সামনে এগিয়ে অ্যাবে যেখানে স্পর্শ রেখেছিল সেখানে আঙুলো ছোঁয়ালো গ্রে। দেয়ালে কিছু একটা খোদাই করা। তবে বৃষ্টির কারণে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে লেখাগুলো, শুধু ছায়া বোঝা যাচ্ছে।

এগিয়ে এসে লেখাগুলো খুব ভালো করে পরখ করল এলিজাবেথ। "হরপ্পান," বলে উঠল সে, গলায় বিস্ময়ের সুর। চারপাশে একবার বুলালো ও। "ইন্দুস উপত্যকার বাইরের অংশে আছি আমরা। এক সময় এখানে বসতি স্থাপন করেছিল মহান এক সভ্যতা।"

মাথা নেড়ে ওর সাথে একমত পোষণ করলেন মাস্টারসন। "প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইন্দুস নদীর তীরে বাস করতো হরপ্পানরা। পুরো এলাকা জুড়েই ওদের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাবে তুমি- শহরের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা মন্দির ইত্যাদি। আমাদের তরুণ হিন্দু বন্ধু বোধ হয় প্রাচীন হরপ্পান ধ্বংসাবশেষকেই কয়েনে খোদাইকৃত মন্দির ভেবেছে।"

কথা না বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চলল গ্রে। "কে ভুল আর কে ঠিক, সেটা বোঝার উপায় একটাই।"

আরও দুটো বাঁক নেয়ার পরে ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে ছোট একটা গর্তে পরিণত হয়েছে গিরিখাতটা। চারপাশ থেকে পানি এসে জমা হচ্ছে সেই জলাশয়ে।

থেমে দাঁড়িয়ে গর্তটার দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাবে। "চলে এসেছি।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল গ্রে। গিরিখাতটা তো শূন্য! তখনই হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে আলোকিত হয়ে উঠল বেসিনের মতো দেখতে পুরো জায়গাটুকু। রূপালি আলোতে পরিষ্কার চোখে পড়ল পাহাড় চূড়া আর মাঝে বসে থাকা জলাশয়।

জলাশয়ের চারপাশে, বেলেপাথর কেটে কয়েকটা ধাপ তৈরি করা হয়েছে। ধাপগুলোর শেষ মাথায়, পাহাড়ের ঠিক চূড়ায় ঘরবাড়ির মতো কিছু আকৃতি চোখে পড়ল। সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা কাঠামোগুলোর কাছে পৌঁছলো ওরা। শত শত বছর ধরে রোদবৃষ্টিতে জ্বলেপুড়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলো। কাঠামোগুলো দেখে আনাসাযি ইন্ডিয়ান-দের বসতবাড়ির কথা মনে পড়ল গ্রে'র। কিন্তু স্থাপত্যকৌশল বলে দিচ্ছে, এই বাড়িগুলো কোনও ইন্ডিয়ানের হাতে তৈরি হতে পারে না, এমনকি নেটিভ আমেরিকানদেরও হতে পারে না।

গ্রেআগে বাড়লো, বৃত্তাকারে চক্কর দিল চারপাশে। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি বাড়িগুলোর সামনের অংশ, যেন দ্যুতি ছড়াছে আশেপাশের কালো প্রকৃতির মাঝে। কালের আঁচড়ে নরম আর ভঙ্গুর হয়ে গেছে বেলেপাথর কুঁদে তৈরি করা ছাদ। দেখে মনে হলো, যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে আকৃতিগুলো। পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা কংকালের কথা মনে করিয়ে দিল গ্রে-কে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঝড়-তুফানের ঝাপটা সহ্য করে ক্ষয়ে এসেছে সবগুলো দেয়াল। তবুও মূল স্থাপত্যকাঠামো বোঝার জন্য যথেষ্ট। থামের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিকোনাকার ছাদ। জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে কার্নিশ।

স্থাপত্যরীতির উৎস সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ থাকলো না এলিজাবেথের।

"এটা গ্রীক," সবিস্ময়ে ঘোষণা করল ও। "একটা গ্রীক মন্দির লুকিয়ে আছে এখানে।"

পাশে এসে দাঁড়ালেন মাস্টারসন। ভেজা হ্যাটটা খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছেন, এখন ভেজা পাকা চুলে চিরুনির মতো আঙুলো চালাচ্ছেন তিনি। "অসাধারণ। আর্চিবাল্ড...বুড়ো ভাম! কেন বললে না আমাকে..."

হাঁ হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল গ্রে। ক্লান্তি দূর করে মনে জায়গা করে নিয়েছে নিখাদ বিস্ময়।

আঙুল তুলে সামনে দেখালো এলিজাবেথ। "অ্যান্টিস নামে পরিচিত গ্রীক স্থাপত্যকলার খুব সাধারণ একটা রীতি এটা। গোলাকার কলামগুলো দেখুন,নিশ্চিতভাবেই মন্দিরের কাঠামো ইঙ্গিত করছে প্রতিটা স্থাপনা।"

এলিজাবেথ যখন কথা বলছে, গ্রে'র নজর তখন জলাশয় ছাড়িয়ে একটু দূরে,সামনের একটা কাঠামোর দিকে। দ্রুত হয়ে এসেছে ওর হৃৎস্পন্দন। গিরিখাত পেরিয়ে সামনে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। বড় বড় পাথরের চাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাঠামোটার গোড়ায়। পাথরগুলোর পাশেই পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল, বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে মন্দিরের সামনের ওই ফাটল দিয়ে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে আর্দ্র, মোহনীয় এক পরিবেশ।

জায়গাটা চিনতে বিন্দুমাত্র দেরি হয়নি ওর।

একটা ত্রিকোনাকার ছাদের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে গোলাকার ছয়টা কলাম। মুখ হাঁ করে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে মন্দিরের অন্ধকার প্রবেশপথ।

"কয়েনে ঠিক যেমনটা আঁকা ছিল," বলে উঠল রোজারো। গ্রে'র বিস্ময় ওকেও স্পর্শ করেছে।

লম্বা গড়নের মন্দিরটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাবে। "আরও আছে।"

প্রচণ্ড কৌতূহল বুকে নিয়ে দলবলসহ ওর পেছন পেছন এগোলো গ্রে।

পাথরের স্তূপগুলোর কাছে পৌঁছে এক পাশে সরে দাঁড়াল অ্যাবে, ওকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। আস্তে আস্তে পাথর টপকে ওপরে উঠতে লাগল ও। জানে, কোনদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

হিন্দু লোকটাকে অনুসরণ করল গ্রে সহ বাকি সবাই ।

নিজেদের ভেতর কথা চালিয়ে যাচ্ছে এলিজাবেথ আর মাস্টারসন। "ওরা মন্দিরটা এখানে বানিয়েছিল কেন, বলতে পারেন? তাও এমন প্রাচীন রীতিতে?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

"নিশ্চয়ই এখানে লুকিয়েছিল ওরা," উত্তর দিলেন মাস্টারসন। "এ জায়গাটা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বিশেষ করে এরকম খাড়া দেয়ালের ফাঁকে খুঁজতে আসা তো আরও কঠিন। তবে ইন্দুস উপত্যকায় এমন আরও হরপ্পান বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ আছে। পাথরের এই খিলানগুলো খুব সম্ভবত কোনও বিলুপ্ত হরপ্পান স্থাপনার ওপর তৈরি, ওদের নিজস্ব রীতিতে পরিবর্তন করে নিয়েছে গ্রীকরা।"

"হতে পারে। এক সভ্যতার ওপর নতুন আরেকটা সভ্যতা গড়ে উঠা নতুন কিছু নয়।"

এদিকে মন্দিরটার চারপাশে নজর বোলাচ্ছে গ্রে। এখন কাছ থেকে দেখে বুঝলো, ও যেগুলোকে মার্বেল পাথরের থামগুলোর ওপর পড়া ছায়া মনে করেছিল, সেগুলো আসলে রোদের প্রচণ্ড তাপে পাথর ঝলসে যাওয়ার দাগ। অসংখ্য ফাটল আর চিড় নষ্ট করে ফেলেছে মন্দিরের বহির্ভাগ। ওপরের ছাদের বড় একটা অংশ ভেঙে পড়েছে অনেক আগেই।

গ্রে আন্দাজ করল, ক্ষতিগুলো শুধু কালের থাবার আঘাতেই হয়নি। পাথরের উপর আঁচড়ের দাগ দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধ হয়েছিল এখানে।

সামনের পাথর পেরিয়ে দুটো পিলারে চড়তে শুরু করেছে অ্যাবে। তার পেছন পেছন মন্দিরের মার্বেল পাথরের মেঝেতে উঠে দাঁড়াল গ্রে। যাক বাবা, বৃষ্টির হাত বাঁচা গেল অবশেষে। প্রবেশপথের বাইরে ছয়টা পিলারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ছাদের কারণে, বারান্দার মতো একটা আকৃতি পেয়েছে কাঠামোটা। অন্যদের জায়গা করে দিতে সরে দাঁড়াল ওরা। এলিজাবেথ আর মাস্টারসনকে উপরে উঠতে সাহায্য করল কোয়ালস্কি আর লুকা। সবার শেষে,পিঠে ব্যাগ নিয়ে উঠে এল রোজারো। সবাইকে সাথে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো গ্রে। ভেতরে ঢোকার আগে হাঁটু গেঁড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল অ্যাবে। লোকটার জন্য অপেক্ষা করল ওরা, তাকে ছাড়া ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।

প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়াল অ্যাবে।

পকেট থেকে ছোট একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে সুইচ টিপলো গ্রে। সবার আগে সে-ই ঢুকল ভেতরে। শত শত বছরের জমাট অন্ধকারকে মুহূর্তেই দূর করে দিল ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

বর্গাকার কাঠামোর কামরাটা আকারে বিশাল। দৈর্ঘ্য,প্রস্থে বিশ ফুটের মতো হবে। উচ্চতাও প্রায় সেরকমই। সার বেঁধে আরও অনেকগুলো থাম দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে, তার মাঝে কয়েকটা আবার ভেঙে গিয়ে পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছে। অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হতো মেঝের একেবারে মাঝখানে, এখনও সেখানে পড়ে আছে মিশমিশে কালো কয়লার স্তূপ। দুপাশে ধনুকাকৃতির খিলান উন্মুক্ত হয়ে পাশের ছোট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছে, অনেকটা গির্জার চ্যাপেলের মতো।

গ্রে লক্ষ্য করল, ছোট ছোট প্রকোষ্ঠগুলোতে গাদা করে কী যেন রাখা। আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য সামনে বাড়লো সে। একপাশে সরে তাকে জায়গা করে দিল অ্যাবে। হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকে ধরে আছে লোকটা, ভয় পেয়েছে কোনও কারণে। গ্রে'র পিছু নিলো না ও।

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে চারপাশে নজর একবার চোখ বুলাতেই হিন্দু লোকটার এখানে আসতে অনিচ্ছার কারণ বুঝতে পারল গ্রে। ঘরটা হাড়গোড়ে ভর্তি। হাড়ের স্তূপের উপর শ'য়ে শ'য়ে পড়ে আছে মাথার খুলি-মানুষের।

কামরার পরিবেশ আর হলদেটে খুলিগুলো দেখে বোঝা গেল, অনেক পুরনো কঙ্কালগুলো।

মন্দিরের বাইরে দেখা, পাথরের দাগের কথা মনে পড়ল গ্রে''র।

মুখ খুললো অ্যাবে। "ছোটবেলা থেকেই এখানকার গল্প শুনে বড় হয়েছি আমরা। বংশ-বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে কাহিনীগুলো। হাজার বছর আগে নাকি এখানে বিশাল এক যুদ্ধ হয়েছিল। আমার দাদাও বলে গিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই হাড়গুলো এখানে দেখে আসছেন তারাও। অনেক আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা মন্দিরের বাইরে খুঁজে পেয়েছিলেন এই হাড়গুলো, সে গল্পও বলতেন আমাদের বাপ-

দাদারা। তারপর মৃতদের সম্মানে দেহাবশেষগুলো মন্দিরের ভেতরে এনে সমাহিত করেন তারা," বলে বাইরের জলাশয়ের দিকে ইঙ্গিত করল ও। "আরও অনেক হাড়গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাইরে।"

ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল গ্রে। এখানে লুকিয়ে থাকা লোকগুলোকে খুঁজে বের করে ফেলেছিল কেউ, তারপর চালানো হয় নির্বিচারে গণহত্যা। কিছুক্ষণ আগে বলা অ্যাবের কথাগুলো মনে পড়ল ওর।

পাথরের দেয়ালগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। অন্তত, চিরকালের জন্য নয়।

আসলে কঙ্কালগুলো ছিল অ্যাবের লোকদের জন্য সতর্কবার্তা, ভাবল গ্রে। জায়গাটা লুকানোর জন্যে ভালো, কিন্তু বাকি দুনিয়ার চোখের আড়ালে এখানে চিরদিনের জন্য লুকিয়ে থাকতে পারবে না কেউ।

ঘরের আরেকটা বৈশিষ্টের দিকে এগোলো ও।

মন্দিরের প্রবেশপথের মতো, এই বৈশিষ্ট্যটাও খোদাই করা ছিল কয়েনে।

পেছনের দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল গ্রে। সাদা পাথরের দেয়ালের গায়ে কালো পাথর বসিয়ে একটা আকৃতি আঁকা আছে। গোটা দেয়াল জুড়েই বিস্তৃতি ওটার, লম্বা-চওড়ায় প্রায় বিশ ফুটের মতো হবে।

"চক্র চিহ্ন," বলে উঠল এলিজাবেথ, গলায় নিখাদ বিস্ময়। একটা পকেট-সাইজ ক্যামেরা বের করে দেয়ালের ছবি তুলতে শুরু করল সে। "কয়েনের অন্য পিঠের মতোই একেবারে।"

দেয়ালে হাত বুলালো লুকা। ওর মনের ভাবনা বুঝতে পারছে গ্রে।

প্রাচীন এই চিহ্নটাই কী রোমানি প্রতীকের উৎস?

আর্চিবাল্ড পোকও কি এরকমটাই ভেবেছিলেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোয়ালস্কি। ঘরটা দেখে মোটেও খুশি হয়নি ও। "কী বিচ্ছিরি অবস্থা।"

"কী বলছো তুমি?" ওকে তিরস্কার করল এলিজাবেথ। "শতাব্দীর সেরা যুগান্তকারী আবিষ্কার এটা।"

শ্রাগ করল কোয়ালোস্কি। "তা বুঝলাম, কিন্তু তাতে কী? সোনাদানা আর গয়নাগাটি কোথায়?"

ব্যাপারটা স্বীকার করতে যদিও অস্বস্তি হলো গ্রে'র, কিন্তু কোয়ালস্কির সঙ্গে একমত না হয়ে পারল না সেও। খানিকটা সরে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা রুমের চারপাশে

বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আনলো গ্রে। কী যেন একটা জিনিসের অভাব বোধ করছে ও, কিন্তু সেটা সোনা কিংবা কোনও মূল্যবান রত্ন নয়।

রোজারো এগিয়ে এসে যোগ দিল ওর সাথে। "কী হয়েছে?"

"কিছু একটা নেই এখানে," অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল গ্রে।

"কী সেটা?"

ওদের কথা শুনে এবার এদিকে ফিরে তাকাল অন্যরাও।

গ্রে আরেকবার চারপাশে ঘোরালো লাইটটা। "কয়েনটায়...ইংরেজি E-এর মতো একটা অক্ষর ছিল, গ্রীক...এপসিলন।"

"ঠিকই তো," পাশ থেকে বলল এলিজাবেথ।

মুখ থেকে বৃষ্টির পানির ফোঁটা মুছলো গ্রে। "কয়েনে যা যা খোদাই করা ছিল, তার সবই পাওয়া গেছে এখানে-মন্দিরের সামনের অংশ, চক্র চিহ্ন। তাহলে গ্রীক অক্ষরটা কোথায়?"

"ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়," জবাব দিলেন মাস্টারসন। "ওটার থাকা না থাকায় কী কিছু আসে যায়?"

"অক্ষরটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ," প্রতিবাদ জানাল এলিজাবেথ। "ডেলফির মন্দিরের প্রতিলিপি বানানোর জন্য অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে এখানকার অধিবাসীদের। বাইরে আমরা যা দেখেছি...অ্যান্টিস স্থাপত্যশৈলী, ডেলফির স্থাপনার আকৃতিতে বানানো ঘরবাড়ি, আর ভেতরের এই জায়গাটা। এখানকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন পুরোপুরি ওরাকলের মন্দিরটার মতোই। আর E বর্ণটা হলো ওই মন্দিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি।"

পেইন্টারের সাথে হওয়া কথোপকথন মনে পড়ল গ্রে'র। কীভাবে ডেলফির ভবিষ্যৎবাণীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অক্ষরটা, সে সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত বলেছিলেন তিনি।

লুকা সামনে এগিয়ে এল। "আমি জানি এই বর্ণটার ব্যাপারে।"

জিপসী সর্দারের দিকে ফিরে তাকাল গ্রে।

"আমাদের কাছ থেকে অপহরণ করা বাচ্চাগুলোর সম্পর্কে বলেছিলাম আপনাদের," বলতে লাগল সে। "সেই ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ক্যাম্প আবিষ্কার করা জিপসীরা একটা চার্চের কথা বলেছিল। চার্চের দরজাটা ভাঙা থাকলেও, চূর্ণ-বিচূর্ণ পাল্লার ওপর ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল একটা E অক্ষর পাওয়া যায়। কেউ এর মানে জানতো না। যারা জানতো, খুন হয়ে গিয়েছিল তারা সবাই। রহস্যটাও ওদের সাথেই কবরে চলে যায়। এটি সেই একই E হতে পারে।"

শোভহানিস-দের চিহ্ন, ভাবল গ্রে। জিপসী ভবিষ্যৎবক্তা।

"সবকিছুই ঠিক আছে," ক্লান্ত গলায় বলে উঠলেন মাস্টারসন। "সামান্য একটা অক্ষর, E না থাকলে কী আসে যায়?"

"হয়তো কিছুই না," স্বীকার করল গ্রে, কিন্তু গলায় জোর নেই। অ্যাবের দিকে ফিরল ও। "ড. পোককে এ জায়গায় প্রথম কবে দেখিয়েছিলেন?"

শ্রাগ করল লোকটা। "এক বছর আগেপ্রথম এখানে নিয়ে আসি উনাকে। তিনি চারপাশটা ঘুরে দেখেন, নোট নেন, তারপর ফিরে যান।"

ম্লান দেখালো এলিজাবেথকে। "তিনি আমাকে এ আবিষ্কারের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।"

"কারণ আমাদের গোপনীয়তাকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি," দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল অ্যাবে। "একেবারে সোনার মানুষ।"

মাস্টারসনের তিক্ত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করল গ্রে। প্রথমে এই আবিষ্কারে অবাক হয়েছিলেন মানুষটা, বুঝতে পেরেছিল ও। কিন্তু বিস্ময় কেটে যাবার পর যখন দেখলেন, নিজস্ব রিসার্চে কানাকড়িও মূল্য নেই এটার,তখনই আগ্রহে ভাটা পড়তে শুরু করে তার। ড.পোক ও কি একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন? প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারটা তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তার নিজের গবেষণার সাথে এর কোনও সংযোগ করতে না পেরেই হয়তো,অচ্ছুৎদের গোপন রহস্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে নীরবে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

যদি তা-ই হয়, তাহলে উধাও হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে আবার কেন এখানে এসেছিলেন তিনি? নিশ্চয়ই পরবর্তীতে কোনও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। এমন কিছু,যা তার গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত।

অ্যাবেকে প্রশ্ন করল ও, "এমন কী ঘটেছিল, যার জন্য হন্তদন্ত হয়ে এখানে ছুটে এসেছিলেন ড. পোক? অস্বাভাবিক কোনও কিছু?"

মাথা নাড়লো লোকটা। "একদিন গ্রামে আসেন তিনি। তখন আমরা আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলাম। সেই নির্বাচনে মেয়র পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল এক অচ্ছুৎ লোক। মাঠে একটা নতুন কয়েন পেয়েছিলাম আমি। সেটা তাকে দেখাতেই বুঝতে পারি, জিনিসটার প্রতি বিশেষ আগ্রহ নেই তার। মন্দিরের ছবিওয়ালা কয়েনটা আবার দেখতে চান তিনি, তবে ওটাও তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। টেবিলের উপর কয়েনটা রেখে ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ চোখ বড় হয়ে যায় তার, আচমকা লাফিয়ে ওঠেন চেয়ার ছেড়ে। তখনই একবার এখানে আসতে চান তিনি, কিন্তু নির্বাচনের কাজ থাকায় সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে তার সাথে আসা সম্ভব ছিল না। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম তাকে। কিন্তু..."

মিইয়ে গেল তার গলার স্বর। মুখ খুললো এলিজাবেথ, "বিন্দুমাত্র ধৈর্য ছিল না তার!"

নড করলেন মাস্টারসন। "সেদিনই ওর কাছ থেকে ফোনকলটা পাই আমি। উত্তেজিত কণ্ঠে দাবী করে, এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে, যা মানব মনের ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারার ভিতকে নাড়িয়ে দেবে।"

ততোক্ষণে আরেকটা ব্যাপার খোঁচাতে শুরু করেছে গ্রে'র মাথায়। রোজারোর দিকে ফিরে তাকাল ও, "কয়েনটা আরেকবার দেখাও তো।"

ব্যাগ থেকে বের করে কয়েনটা গ্রে'র হাতে তুলে দিল মেয়েটা।

গ্রে কয়েনটা খুব ভালো করে উল্টেপাল্টে দেখল। একপাশে মন্দির, অন্য পাশে চক্র চিহ্ন। "এলিজাবেথ, তুমি বলেছিলে ড. পোক তোমার জন্য ডেলফির মিউজিয়ামে একটা অবস্থান তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাতে তার গবেষণায় সাহায্য করতে পার তুমি। ডেলফির ইতিহাস সম্পর্কে তাকে ঠিক কতটুকু বলেছিলে তুমি?"

"একদম প্রাথমিক বিষয়গুলো," জবাব দিল এলিজাবেথ। "বাবা ডেলফির ইতিহাসের চেয়ে মন্দিরের এথিলিন গ্যাসের আবিষ্কার নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ওরাকলের আচার-অনুষ্ঠান, তার ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কিত ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চাইতেন তিনি।"

"ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী না হলে, গ্রীক এপসিলন-এর তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কেন?"

"আমি এ সম্পর্কিত একটা নোট পাঠিয়েছিলাম তাকে।"

"কবে?"

"নিরুদ্দেশ হওয়ার এক মাস আগে..."

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। হাঁটু গেড়ে বসে ফ্ল্যাশলাইটটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে। তারপর কয়েনটা আঙুলের আগায় ধরে মেঝেতে রেখে টোকা মারলো। লাইটের আলোয় ঝিলিক তুলে মেঝের ওপর ঘুরতে শুরু করল জিনিসটা।

সামনে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে কয়েনটা দেখছে গ্রে।

ঝাপসা, রূপালি একটা গ্লোবের আদল গঠন করেছে ঘূর্ণায়মান কয়েনটা। কয়েনের মাঝের অবস্থিত E অক্ষরটা এখন ঘূর্ণনরত গ্লোবের কেন্দ্রে চলে এসেছে। অক্ষরটার স্বরূপ ধরতে পারল গ্রে। পেইন্টার বলেছিলেন, ধরণীমাতা গাইয়া-র প্রতিনিধিত্ব করে এই E। আর এখন, রূপালি গোলকের ঠিক মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে ওটা। যেন বোঝাতে চাইছে, দেবী গাইয়া-ই হলেন পুরো পৃথিবীর মাতৃরূপ। তবে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক অনুভূতিও প্রকাশ করে অক্ষরটা, মানুষের দেহের একেবারে গভীরতম অংশ- মন থেকে যার উৎপত্তি।

মনোযোগ দিয়ে ভাবতে লাগল গ্রে।

কী উপলব্ধি করেছিলেন আর্চিবাল্ড পোক?

রূপালি রঙের এক আদিম রহস্য বুকে নিয়ে ঘুরছে কয়েনটা।

কিন্তু কী সেটা...?

বিদ্যুতের ঝলকের মতোই গ্রে'র মাথায় চলে এল প্রশ্নটার উত্তর।

ঘূর্ণনরত কয়েনটাকে থাবা মেরে মেঝেতে শুইয়ে দিল সে।

অবশ্যই!

রাত ১১:৩৫
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

"সাশা আমেরিকানদের হাতে," বেডরুমে ঢুকে ধারালো গলায় বলে উঠল নিকোলাস। এই ঠাণ্ডাতেও তার পরনে শুধু পাতলা একটা রোব। কিন্তু প্রচণ্ড রাগে উষ্ণ হয়ে আছে শরীর।

নগ্ন শরীরে বিছানায় শুয়ে আছে ইলেনা, অপেক্ষা করছে নিকোলাসের জন্য। অনুষ্ঠান শেষ করে চেরনোবিলের বিপজ্জনক এলাকার বাইরে নিজেদের হোটেলে ফিরে এসেছে ওরা। অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির থাকার ব্যবস্থাই করা হয়েছে এই হোটেলে, যাতে আগামীকালের অনুষ্ঠানে পৌঁছতে কোনও ঝামেলা না হয়।

বিগত দুই ঘণ্টা স্যাটেলাইট ফোন কানে ধরে কাটিয়ে দিয়েছে নিকোলাস। নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, কাল সকালে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে যেন কোনও খুঁত না থাকে। সবশেষে ওয়ারেনে, তার মায়ের কাছে ফোন করতেই খারাপ খবরটা পায় সে। কেজিবির সাথে ভালো সম্পর্কের সূত্র ধরে ওয়াশিংটন ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তার মা। গত বিশ ঘণ্টা ধরে একটা মেয়ের খোঁজে তোলপাড় করে ফেলা হয়েছে গোটা ওয়াশিংটন। মেয়েটা নিশ্চয়ই সাশা। তারপর হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে আসে পরিস্থিতি। এমনকি ইউরি-ও চুপ হয়ে গেছেন। নিকোলাস আর তার মা- ব্যাপারটার মানে বুঝতে পেরেছেন দুজনেই।

মেয়েটাকে পেয়ে গেছে কেউ।

আর সেটা কে বা কারা হতে পারে, অনুমান করতে পারছেন নিকোলাস।

মুঠোর মধ্যে শক্ত হয়ে এঁটে বসল তার আঙুলোগুলো।

ওই সংগঠনটাই তো ভারতে বিরক্ত করছিল ওদের, খোঁচাখুঁচি করছিল ড.পোকের গবেষণা নিয়ে। নিকোলাস ভেবেছিলেন, লোকটার মৃত্যুর সাথে সাথে ব্যাপারটারও অবসান ঘটেছে। কিন্তু সেই ক্ষতেই আবার ঘাঁটাঘাঁটি করছে ওরা। একবার ওদের চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি।

ব্যর্থ হয়েছে ধাওয়াকারীরা।

ভারতে একটা গুপ্তরহস্য সবার কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন ড.পোক। সেই রহস্য উন্মোচনের খুবই কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সংগঠনটা। প্রফেসরের গবেষণার সাথে ব্যাপারটার সম্পৃক্ততা আছে। বাচ্চাগুলোর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা। প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা কী?

নড়ে উঠল ইলেনা, কণ্ঠে উদ্বেগ। "সাশার কী হবে?"

নিকোলাস জানে, বাচ্চাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ইলেনা। ওয়ারেনে একসাথে বেড়ে উঠায় একজনের সাথে আরেকজনের খুবই ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে সবার। বড় বাচ্চাগুলো প্রায়ই ছোটদের বাবা-মায়ের ভূমিকা নিত, দেখাশোনা করত ওদের। অবশ্য সাশা আর তার ভাইকে একটু বেশিই পছন্দ করত ইলেনা।

নিকোলাসের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বাচ্চা দুটো।

বিছানায় উঠে গেলেন তিনি। সাথে সাথে বুকের সাথে লেপ্টে এল ইলেনা। একটু যেন রেগে আছে মেয়েটা। ওকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন নিকোলাস।

বুনো বিড়ালের মতো আদিম বন্যতায় নিকোলাসের উরুতে নখ বিঁধিয়ে দিল ও। রক্তের চিকন একটা ধারা বেরিয়ে এল উরু বেয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যাথা সহ্য করলেন নিকোলাস। "ওকে ফিরে পাওয়ার জন্য যা করা দরকার, সবই করছি আমি।" কোনওমতে বললেন তিনি।

রাত ১১:৪৫
পাঞ্জাব, ভারত

ঝড়টা থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে। সেই সাথে চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ চমকানো তো আছেই। গ্রে'র পেছন পেছন মন্দিরের দেয়ালের চক্র চিহ্নের দিকে এগোলো এলিজাবেথ। চক্রটার ওপর হাত রাখল গ্রে। কয়েনটা ঘোরানোর সময় কিছু একটা বুঝতে পেরেছে ও।

কী সেটা?

মুখ খুললো গ্রে। "অল্পবিস্তর ভারতীয় দর্শন পড়া আছে আমার। ওখান থেকেই জেনেছি, সাধারণত চক্র চিহ্নের কেন্দ্রে একটা কিছু থাকে, যা গোটা চক্রটার প্রতিনিধিত্ব করে। মূলধারা বলা হয় ওটাকে। চক্রের গোলাকৃতি অক্ষরেখাকে বলা হয় মানিপুরা, আর মাঝের গোল বৃত্তের ভেতরের অংশটুকুর নাম আনাহাতা। উপরের দিকে তাকাল সে। "কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই। পুরোপুরি ফাঁকা।"

"কয়েনেও ঠিক এমনটাই আঁকা আছে," দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে যোগ করল এলিজাবেথ। বুঝতে পারছে এসব কথার মানে টা কী।

"ঠিক।" কয়েনটা তার হাতে দিল গ্রে। "ঘুরিয়ে দেখ এটা। চক্র চিহ্নের কেন্দ্র বরাবর ওপাশে তাকালে কী দেখতে পাবে?"

এলিজাবেথ উল্টেপাল্টে দেখল জিনিসটা। মন্দিরের উপরে আঁকা এপসিলন, একেবারে কয়েনের মাঝ বরাবরই আছে ওটা। কিন্তু চক্র চিহ্নের অপর পাশে। "E" বিড়বিড় করে জবাব দিল সে।

"হ্যাঁ। অক্ষরটা চক্র চিহ্নের কেন্দ্র বরাবর ঠিক উল্টো পাশে।" বলে মাস্টারসনের দিকে ফিরল গ্রে। "আপনার লাঠিটা দেবেন একটু?"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাঠিটা এগিয়ে দিলেন প্রফেসর।

লাঠি উঁচিয়ে দেয়ালের দিকে এগোলো গ্রে। তারপর কালো মার্বেলে গঠিত চক্রের কেন্দ্রে ধাক্কা দিল আলতো করে। একটা উলম্ব অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করল গোটা চক্রটা, গোলাকার একটা প্রকোষ্ঠ খুলে গেল একেবারে মাঝখানে।

"গোপন দরজা," চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টারসন।

হাতছানি দিয়ে কোয়ালোস্কিকে ডাকলো গ্রে। "উপরে উঠব আমি। সাহায্য করো।"

হাঁটু গেঁড়ে বসে দুহাত একসাথে সামনে পেতে দিল কোয়ালোস্কি। বাড়িয়ে রাখা হাতের ওপর উঠে লাঠির মাথা দিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রে আরেকটু জোরে ঠেলা দিল গ্রে। মার্বেলের দরজাটা আরেকটু ফাঁক হয়ে গেল। গোপন দরজাটা নিচের মেঝে থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে। কোয়ালোস্কির হাতের তালুতে ভর দিয়ে দরজাটার ভেতরে উঁকি মারলো গ্রে।

"এখানে সিঁড়ি আছে," বলে টেনেহিঁচড়ে দরজার ভেতর ঢুকে গেল। "নিচে নেমে গেছে সিঁড়িটা! বেলেপাথর কেটে বানানো!"

এলিজাবেথ আর থাকতে পারল না। কোয়ালাস্কির দিকে এগিয়ে গেল ও। "আমাকে সাহায্য করো।"

গ্রে'র মতো ওর হাতের তালুতে উঠতে চাইলে মেয়েটাকে থামিয়ে দিল বিশালদেহী লোকটা। তারপর দু'হাতে কোমড় আঁকড়ে ধরে দরজার দিকে তুলে ধরল ওকে।

অবাক হয়ে কোয়ালস্কির মুখের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। অনেক শক্তি ধরে তো লোকটা!

ভেতরে উঁকি দিয়ে গ্রে-কে দেখতে পেল ও, দেয়ালে আলো জেলে কিছু একটা দেখছে সে। বিভিন্ন আকৃতি আর অক্ষর বিক্ষিপ্তভাবে আঁকা রয়েছে দেয়ালটাতে। প্রাণপণে দরজার গোড়া আঁকড়ে ধরে উপরে উঠার চেষ্টা করল ও, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারল না। মেয়েটার এই অবস্থা দেখে এক হাতে পায়ের হাঁটু চেপে ধরল কোয়ালস্কি, নিজের কাঁধের উপর বসিয়ে দিল ওর পায়ের গোড়ালি। এবার কাজ হলো, পায়ের জোড় এক ধাক্কায় উপরে উঠে এল এলিজাবেথ।

"দেখে তো মনে হচ্ছে হরপ্পানই হবে," গ্রে'র পাশে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ও।

"এদিকটাও একটু দেখ," বলে কালো মার্বেলের দরজার অপর পাশে আলো ফেলল গ্রে। পাথরের দেয়ালে বড় একটা এপসিলন খোদাই করা।

ক্যামেরা বের করে দেয়ালের কয়েকটা ছবি তুলতে তুলতে তাদের সাথে যোগ দিল রোজারো আর লুকা।

নিচের দিকে তাকাল গ্রে। "ড. মাস্টারসন?"

"এই বয়সে চড়াই-উৎরাই আর সহ্য হয় না, বুড়িয়ে গেছি কিনা," জবাব দিলেন তিনি। একেবারেই বিধ্বস্ত লাগছে তাকে, লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার ঠিক নিচেই। "কী পেলেন সেটা আমাকে জানাবেন শুধু।"

"আমিও এখানেই থাকি না হয়," বলে উঠল অ্যাবে, তবে ওর কণ্ঠে ক্লান্তির চেয়ে ভয়ের ছাপই বেশি। এলিজাবেথের মনে পড়ল, এখানে আসার সময় কী পরিমাণ ভয় পেয়েছিল সে।

হাঁক ছাড়লো গ্রে। "কোয়ালোস্কি, তুমিও এখানেই থাকো। বলা যায় না, ভেতরে আবার কোন সমস্যায় পড়ি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে," উত্তর দিল বিশালদেহী লোকটা। "তাছাড়া ওখানে আমার শরীর আঁটবে বলে মনে হয় না।"

বলে আড়চোখে এলিজাবেথের দিকে তাকাল কোয়ালস্কি। মৃদু মাথা নোয়ালো, ইশারায় ওকে সতর্ক থাকতে বলছে।

এমন সময় খুব কাছেই একটা বজ্রপাত হলো।

"চলো এবার," চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পথ দেখিয়ে এগোতে লাগল ওরা। সবার আগে গ্রে, তারপর এলিজাবেথ, তার পেছনে লুকা আর রোজারো। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে এলিজাবেথ। পুরোটা দেয়াল জুড়েই হরপ্পান অক্ষর আঁকা। এখনও পর্যন্ত এর সবগুলোর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুরনো শিলালিপিতে খোদাই করা অক্ষরগুলো নিয়ে কাজ করে চলেছে আর্কিওলজিস্টরা, যদি কোনও সূত্র পায় এই প্রাচীন বর্ণের অর্থোদ্ধারের।

আশেপাশে নজর বোলালো ও। এগুলো ওই দুর্বোধ্য অক্ষরই।

উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে বুক ধড়ফড় করছে এলিজাবেথের। একিসাথে মনের চোখে দেখতে পেল, এই সিঁড়িগুলো বেয়েই একসময় নেমে গিয়েছিল তার বাবা। আবেগে ঝাপসা হয়ে এল চোখ দুটো।

বেশিক্ষণ সিঁড়ি ভাঙতে হলো না ওদের। শীগগিরই বেলেপাথর কেটে বানানো একটা কামরায় পৌঁছে গেল সবাই। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে বদ্ধ জায়গাটায়। দেয়ালের একটা গর্ত বেয়ে বেরিয়ে এসেছে প্রাকৃতিক একটা ঝর্ণা। তারপর মেঝের একটা ফাটল দিয়ে ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে সেই পানির ধারা।

"হরপ্পান গুহা-কুয়া," বলে উঠল এলিজাবেথ। "ইন্দুস নদীর তীরে বাস করতে করতে সেচকাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল এ সভ্যতার লোকজন।"

জায়গাটার চারপাশে আলো ফেলল গ্রে। প্রায় বৃত্তাকার ঘরটা। পাথরের মেঝেতে খোদাই করা আরেকটা চক্র চিহ্ন চোখে পড়ল ওর। তবে এটার কেন্দ্র ফাঁকা নয়। বড় একটা ডিম্বাকৃতির পাথর রাখা ওখানে।

"ওম্ফালোসের প্রতিলিপি," বলে উঠল এলিজাবেথ।

পাথরটার কাছে এগিয়ে গেল সবাই। উচ্চতায় এলিজাবেথের পেট পর্যন্ত হলেও প্রস্থে ডেলফি জাদুঘরে রাখা পাথরটার চেয়ে দ্বিগুণ বড় এটা। গাছ আর লতাপাতা খোদাই করা আছে গম্বুজাকৃতির পাথরের গায়ে।

ভালো করে নজর বুলিয়ে চারপাশটা দেখে নিল এলিজাবেথ। ওরাকলের দেবালয়ের হুবহু অনুলিপি তৈরি করেছে কেউ। এমন একটা ঘরে বসেই ভবিষ্যৎবাণী করতেন কিংবদন্তীর সেই ওরাকল।

তিন পা ওয়ালা একটা নড়বড়ে ব্রোঞ্জের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল এলিজাবেথ। "এই যে সেই তেপায়া চেয়ারটা, ওরাকলের নির্ধারিত আসন।"

"অথবা ওর‍্যাকলদের," কয়েক কদম দূরে পায়চারি করছিল গ্রে। আরেকটা তেপায়া চেয়ারের ওপর আলো ফেলল সে।

মোট পাঁচটা চেয়ার।

ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল এলিজাবেথ। এই জায়গাটা কী ছিল? কী হতো এখানে? এই আসনগুলোই বা এখানে কেন?

দেয়ালের কাছ থেকে ওদের ডাক দিল রোজারো। "এদিকে দেখ।"

দেয়াল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লুকা। এক হাত উপরের দিকে উঠিয়ে রেখেছে, তবে দেয়ালের কিছু স্পর্শ করছে না। ছায়ার মধ্যে ওর হাতের কাঁপুনি লক্ষ্য করল এলিজাবেথ।

রোজারোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ও। কালের থাবায় কালো হয়ে থাকা মোজাইকে ঢাকা আছে পুরো দেয়াল। নিচে মেঝেতে কিছু ভাঙা টাইলস গাদা হয়ে আছে। উপরে মোজাইকের এক অংশে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমে থাকা শ্যাওলাগুলো সম্প্রতি পরিষ্কার করেছে কেউ একজন। এলিজাবেথ কল্পনা করল, কাপড় ঘসে ঘসে জায়গাটা মুছছেন তার বাবা। দেখতে চাইছেন, নিচে কী লুকানো আছে।

ভালো করে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলো ও।

মেঝে থেকে উপরের সিলিং পর্যন্ত খোদাই করা কিছু ছবি।

"পারনাসাস," অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল এলিজাবেথ। "রোমানদের আক্রমণ। ডেলফির মন্দিরের পতনের দৃশ্য এঁকে রাখা হয়েছে এখানে।"

ওরা যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেরকমই আরেকটা ঘর দেখা গেল পরের দৃশ্যে। এমনকি মেঝেতে একটা ওম্ফালোস ও আছে। একটা বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে গম্বুজাকৃতির পাথরের নিচের ফোকরে লুকিয়ে আছেন এক মহিলা। গোটা ঘরজুড়ে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে এক রোমান সৈনিক।

পেছন ফিরে ওম্ফালোস-টার দিকে তাকাল এলিজাবেথ। এ হতে পারে না...

আবারও দেয়ালের দিকে তাকাল ও। গাধা আর ঘোড়ার গাড়ির একটা কাফেলা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পরের ছবিতে। কাফেলার সামনে সামনে হাঁটছেন সেই একই মহিলা, বাচ্চাটা তার কোলেই আছে। একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে সবাই। সবার শেষের গাড়িটা টানছে দুটো হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া, অগ্নিশিখার ছাপ আঁকা আছে ওদের গায়ে। দেখেই বোঝা গেল, দেবতা অ্যাপোলোর সূর্য-রথ টানা ঘোড়া দুটোর প্রতিনিধিত্ব করছে প্রাণী দুটো। তবে এক্ষেত্রে সূর্য-রথ টানছে না ঘোড়াগুলো। মহিলা আর বাচ্চাটাকে আড়াল করে রাখা গম্বুজাকৃতির পাথরটা বসে আছে গাড়ির পেছনে, ডেলফির ওম্ফালোস।

আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে মেঝেতে রাখা পাথরটার দিকে তাকাল এলিজাবেথ। কাঁপতে লাগল ওর গোটা শরীর। অনুলিপি নয়, বরং এটাই সেই আসল ওম্ফালোস। এটার বর্ণনাই করে গেছেন প্লুটার্ক আর সক্রেটিস।

"এটা দেখ," বলে এলিজাবেথকে পরের ছবিটার কাছে টেনে নিয়ে গেল রোজারো। একটা গিরিখাতের দৃশ্য। গিরিখাতের চূড়ায় বসে আছে এই গ্রীক মন্দিরটা। পরের দৃশ্যটা এই ঘরের, কিন্তু একজনের পরিবর্তে তেপায়ায় বসে আছেন পাঁচজন ওরাকল। ওম্ফালোসটা ঘিরে বৃত্তাকারে বসে আছেন তারা। পাথরের উপরের ছিদ্রটা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, যেন একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ওটা। উপরে উঠতে

উঠতে একটা ছেলের আকৃতি তৈরি করছে রাশি রাশি ধোঁয়া। শরীরের দু'পাশে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে ছেলেটা। আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ দুটো দিয়ে, হাতের তালু থেকেও লক লক করছে অগ্নিশিখা।

শুধু কী দৈব-বাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে ছেলেটা? নাকি ইঙ্গিত দিচ্ছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ কোনও কিছুর?

যাই হোক, নিজের উপর জ্বলন্ত চোখদুটোর দৃষ্টি অনুভব করতে পারল এলিজাবেথ।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে গ্রে'ও দেখছে ছবিগুলো। "রোমানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সমর্থকদের নিয়ে এখানে চলে আসেন সর্বশেষ ওরাকল, সাথে নিয়ে আসেন বাচ্চাটাকেও। এখানে হরপ্পান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন করে বসতি গড়ে তোলে তারা। এখানেই লুকিয়ে কাটিয়ে দেয় বাকি জীবন।"

জায়গাটা সম্পর্কে অ্যাবের বলা গল্পটা মনে পড়ে গেল এলিজাবেথের। "স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকদের ভিড়ে মিশে যায় তারা, নিরাপদে কাটিয়ে দেয় প্রায় সাতশো বছর। ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেয় নিজেদের।"

"তারপর ফেঁসে যায় ধর্মীয় টানাহ্যাঁচড়া আর ভারতের নিষ্ঠুর বর্ণপ্রথার গ্যাঁড়াকলে," বলে উঠল গ্রে। "হাড়গুলো...গণহত্যা চালানো হয়েছিল এখানে।"

ঘরের শেষ মাথা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লুকা, "আর তারপর, আবার পালায় ওরা।"

তার সঙ্গে যোগ দিল বাকি সবাই। পানির ধারাটা থেকে এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। এখানে দেয়াল খোদাই-এর পাশাপাশি ছবি আঁকতে কালো রঙও ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দির আক্রমণের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে আঁকা ছবিটাতে। দিগ্‌বিদিক দৌড়ে পালাচ্ছে লোকজন। তবে বড় বড় চাকাওয়ালা ওয়াগনে করে এগোতে দেখা গেল কিছু মানুষকে। গাঢ় কালি আঁকা হয়েছে দৃশ্যটা। আস্তে আস্তে ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে দেয়ালের প্রান্তে মিলিয়ে গেছে কাফেলার ছবিটা।

ওয়াগনগুলোতে আলতো করে আঙুলো ছোঁয়ালো লুকা। আবেগে গলা বুজে এল ওর। "আমাদের লোক ওরা," প্রায় ফিসফিস করে বলল সে। "রোমানি, আমাদের পূর্বপুরুষ।"

পিছিয়ে এল গ্রে, স্তম্ভিত হয়ে গেছে শেষের দৃশ্যটা দেখে।

সর্বশেষ ওরাকল আর ওম্ফালোসটা নিয়ে এই উপত্যকায় এসে লুকিয়েছিল গ্রীকরা। তারপর দীর্ঘ সাত শতাব্দী ধরে ভারতীয় জীবনধারার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয় ওরা, ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে। তবে সেই জীবনধারাই একসময় কাল হয়ে দাঁড়ায় ওদের জন্য। বাধ্য করে আবার পথে নামতে। কিন্তু এবার এক নতুন নামে।

জিপসী।

দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। "একটা জেনেটিক লাইন নির্দেশ করেছে এখানে আঁকা ছবিগুলো, যা কিনা শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে ইতিহাসের

পাতায়। প্রথমে গ্রীসে, তারপর এখানে, আর সবশেষে আবার বাইরে। অসাধারণ প্রতিভা সম্বলিত এক জেনেটিক লাইন।"

"এজন্যই আমরা যাযাবর," বলে উঠল লুকা, এখনও তাকিয়ে আছে কাফেলাটার দিকে। "অ্যাবে ঠিকই বলেছে, কোনও জায়গাই চিরকালের জন্য নিরাপদ নয়। তাই গোত্রের রহস্যটাকে নিরাপদ রাখার জন্যই দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাদের।"

"রহস্যটা তোমাদের কাছ থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত," যোগ করল গ্রে।

মাথা নেড়ে সায় দিল এলিজাবেথ। "এমন এক রহস্য এটা, যার মূল প্রোথিত আছে সুদূর ডেলফিতে।"

ওয়াশিংটনের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ল গ্রে'র। মেয়েটা কি সত্যিই ডেলফির সর্বশেষ ওরাকলের বংশধর?

ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল রোজারো, ইঙ্গিত করল আক্রান্ত মন্দির থেকে বিভিন্ন দিকে পলায়নরত লোকগুলোর দিকে। "শরণার্থী," এলিজাবেথের উদ্দেশ্যে বলল ও। "এখান থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে যায় লোকজন, সেজন্যই জেনেটিক ট্রেইলটা তোমার বাবাকে টেনে এনেছিল এই এলাকায়, বিশেষ করে নিচু গোত্রের লোকজনের মাঝে। শরণার্থী হিসেবে সমাজে উঁচু গোত্রে জায়গা হয়নি গ্রীক বংশধরদের, অচ্ছুৎ হিসেবে পরিচিত হয় তারা।"

ওদের কথা বলার সময়টুকুতে দেয়ালটা আরেকবার ভালো করে দেখল গ্রে। অগ্নিস্নানরত ছেলেটার প্রতিমূর্তি আঁকা মোজাইকের সামনে পৌঁছলো ও। "এখানে কিছু একটা লেখা আছে।"

এগিয়ে এল এলিজাবেথ। তিনটা লাইন দেখা যাচ্ছে। উপরের লাইনটা হরপ্পান, মাঝেরটা সংস্কৃত, আর সবচেয়ে নিচের লাইনটা গ্রীক ভাষায় লেখা। লেখাগুলোর নিচে আরেকটা চক্র চিহ্ন আঁকা আছে।

"হরপ্পান হায়ারোগ্লিফ পড়তে পারি না আমি," বলল ও। "কেউই পারে না। নিচের সংস্কৃত আর গ্রীক লেখাগুলোর প্রথম কয়েকটা শব্দের অর্থ বুঝতে পারছি, শুধু বাকিটুকু ক্ষয়ে গেছে। যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তার অর্থ করলে দাঁড়ায়, "*জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে পৃথিবী...*" বলে ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল সে। ছেলেটার ছবি তুললো বেশি করে।

নিচু হয়ে লেখাগুলোর নিচে খোদাই করা চক্র চিহ্নটা স্পর্শ করল গ্রে। "চক্রটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। বার বার এই জিনিসটা খোদাই করা হয়েছে এখানে।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেঝের বড় চক্রটার কাছে এগোলো ও। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের ওম্ফালোস। গ্রে'র মনের কথা বুঝতে পেরেছে এলিজাবেথ।

চক্রটা যদি এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে চক্রের কেন্দ্রে থাকা জিনিসটার গুরুত্ব আরও কয়েকগুণ বেশি হবে।

পাথরটার চারপাশে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে।

"তোমার বাবা মিউজিয়ামের পাথরটার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন মাথার খুলিটা। হয়তো কোনও কারণ আছে এর পেছনে।"

গম্বুজাকৃতির ওম্ফালোসটার ওপরে উঠে দাঁড়াল গ্রে।

"সাবধানে," এলিজাবেথের কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। খেয়াল রাখছে, যেন কোনও ক্ষতি না হয় প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্নটার। পাথরের গোড়ার দিকে ভালোভাবে তাকাতেই কয়েকটা লাইন দেখতে পেল এলিজাবেথ। হরপ্পান, সংস্কৃত আর গ্রীক -এই তিনটে ভাষায় কিছু লেখা আছে এখানেও, আরও কিছু ছবি উঠিয়ে নিলো সে।

ওম্ফালোসের উপর দাঁড়িয়ে উপরের গর্তের ভেতর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল গ্রে।

"কিছু আছে?" জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

"সোনার মূর্তি...দুটো ঈগল।"

দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হলো যেন ওর। "পাখি দুটো কি পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে?"

ওর দিকে ফিরে তাকাল গ্রে। "হ্যাঁ।"

"ডেলফি থেকে হারিয়ে যাওয়া আরেকটা প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট। জিউসের কাঁধে বসে থাকা একজোড়া ঈগলের প্রতীক ওটা। মিথলজী অনুসারে, এই পাখি দুটোকে পৃথিবীর দুই দিকে পাঠান জিউস, পৃথিবীর কেন্দ্র খুঁজে বের করার জন্যে। গোটা পৃথিবী চক্কর দেয়ার পর ঈগল দুটো ডেলফিকে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে, বাসা বাঁধে ওখানে।"

গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল গ্রে। "নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাজ এটা। এগুলো এখানে লুকিয়ে রাখার পেছনে কোনও কারণ থাকতে পারে। একই কারণে হয়তো তিনি মিউজিয়ামের ওম্ফালোসের ভেতর লুকিয়েছিলেন মাথার খুলিটা।"

পাথরের গোড়ায় খোদাই করা লেখাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে লাগল এলিজাবেথ।

"পাখি দুটোর নাগাল পেয়ে গেছি বোধ হয়...আর একটু।"

প্রতিটা অক্ষরের ওপর আঙুল রেখে আস্তে আস্তে পড়ছে এলিজাবেথ। "লোভ আর ঈশ্বরের নিন্দাই সবার ধ্বংস ডেকে আনবে।"

থমকে গেল ও।

না!

"পেয়েছি।" সোনার মূর্তি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে গ্রে'র হাত।

লাফিয়ে উঠে ওর অন্যহাতটা টেনে ধরল এলিজাবেথ। "ধরো না।"

কিন্তু ততোক্ষণে যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে।

চমকে উঠে পাথরটা থেকে পিছলে পড়ে গেল গ্রে।

ধুপ করে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হলো ওম্ফালোসটার ভেতর। বজ্রের মতো আওয়াজ করে ফাটলো ধরল পায়ের নিচের মেঝেতে। চেম্বারের পেছনভাগ থেকে গম্ভীর নিচু স্বরের আওয়াজ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে সেই শব্দের তীব্রতা, যেন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে কোনও মালবাহী ট্রেন।

এক মুহূর্তের জন্য জমে গেল সবাই। পরক্ষণেই সিঁড়ির দিকে আঙুলো তুললো গ্রে। "বেরোও সবাই!"

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কাঁপতে লাগল ফেয়াল, সরু ধারায় পানি আসতে থাকা ছিদ্রটা আচমকা দুই ফুট চওড়া নালায় পরিনত হলো। তীব্রবেগে পানির স্রোত আসতে লাগল সেই ফাঁক দিয়ে।

গতির তীব্রতায় ছিটকে অন্যপাশের দেয়ালে আঘাত করছে পানি। যে হারে আসছে, যেই হারে মেঝের ফাটলটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না পানির ধারা। ফলে আস্তে আস্তে পানিতে ভরে উঠতে লাগল গোটা ঘর। স্রোতের তোড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

হতভম্ব হয়ে অন্যদের সাথে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রইল এলিজাবেথ, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কনুই ধরে ওকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল গ্রে।

"ফাঁদ..." কাশতে কাশতে বলল মেয়েটা। "প্রেসার সুইচ! মিউজিয়ামের ওম্ফালোসের ভেতর খুলিটা রেখে বাবা আমাদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন..."

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে। "বেরোও সবাই। তাড়াতাড়ি!"

সিঁড়ির প্রথম কয়েকটা ধাপ হাত-পায়ে ভর করে উঠল এলিজাবেথ। ওর পেছনে লুকাকে টেনে পানি থেকে উঠিয়ে আনলো গ্রে। ইতোমধ্যে উরু পর্যন্ত উঠে গেছে পানির স্তর, প্রতি সেকেন্ডে আরও বাড়ছে। বাকিদের সাথে সিঁড়িতে উঠে এল না গ্রে, রয়ে গেল নিচে। খুঁজছে কিছু একটা।

কী খুঁজছে তা বুঝতে পেরেছে এলিজাবেথ।

রোজারো...

ওকে হারিয়ে ফেলেছে গ্রে। দেয়াল বিস্ফোরিত হয়ে পানি বেরিয়ে আসার সময় ঝরনাটার সবচেয়ে কাছে ছিল রোজারোই। গুহাটার ভেতর ঘূর্ণিস্রোতের মতো পাক খাচ্ছে পানি। অশান্ত পানির স্রোতের নিচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যে গ্রে'র কোমর অব্দি উঠে এসেছে পানির স্তর। তবুও তো রোজারোর দাঁড়িয়ে থাকতে পারার কথা। পানির তোড়ে ছিটকে পড়লেও তো ভেসে উঠার কথা এতোক্ষণে।

যদি না...

লুকার দিকে ফিরে ওর হাত টেনে ধরল গ্রে। "তোমার ছুরিটা দাও তাড়াতাড়ি।"

রূপালি ঝিলিক তুলে কব্জির ভেতর দিক থেকে একটা ছুরি বেরিয়ে এল জিপসি লোকটার হাতে। ওটা গ্রে'র হাতে চালান করে দিল সে। ফ্ল্যাশলাইটটা লুকার হাতে ধরিয়ে দিল গ্রে।

"পানির দিকে তাক করে রাখো।" বলে আস্তে করে পানির নিচে ডুব দিল গ্রে।

প্রচণ্ড স্রোত ঘরের এক প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলল ওকে। স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনও দরকার নেই। শরীর ঢিল দিয়ে ভেসে রইল স্রোতের মাঝে, চলে গেল গুহার একেবারে শেষ মাথায়। দেয়ালের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর পা ছুঁড়ে উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে রওনা হলো ও।

শুধু একটা জিনিসই রোজারোকে পানির নিচে ধরে রাখতে পারে,

চাপ।

মেঝের পানি বেরিয়ে যাওয়ার ফাটলটা যেখানে ছিল, সেখানে পৌঁছে ডুব দিল গ্রে। ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয়, মোটা ফাটলটায় আটকে যাওয়া একটা দেহাবয়ব দেখতে পেল ও...রোজারো। ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা। বেরোতে চাওয়া পানির চাপে ফাটলে আটকে আছে ও, এক হাত ঢুকে গেছে পাথরের ফাঁকে। সুইমিংপুলের পাইপে মানুষ আটকা যাওয়ার কথা আগেও শুনেছে গ্রে। পানির টান বড়ই শক্ত জিনিস।

রোজারোর অন্য হাতটা ধরে টানতে শুরু করল ও। পা দুটো ভালো করে আটকে নিলো মেঝেতে, যাতে টানতে সুবিধা হয়। পানি ভেদ করে আসা ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোতেও রোজারোর চেহারায় নিখাদ আতংক দেখা যাচ্ছে।

ছুরি চালালো গ্রে। ইতিমধ্যেই পানিতে ডুবে তার এক সতীর্থ হারিয়ে গেছে, আরেকজনকে হারাতে চায় না। ধারালো ফলা দিয়ে চিরে দিল মেয়েটার কাঁধের ব্যাগের ফিতা। এতোক্ষণ যেখানে আটকে ছিল রোজারো, পানির চাপে সেই গর্তের ভেতর চলে গেল ব্যাগের অর্ধেকটা। দুটো ফিতাই কাটা হয়ে গেলে দু'হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরল গ্রে, তারপর পা চালানো শুরু করল ওপরে উঠার জন্যে।

এক মুহূর্ত আটকে রইল রোজারো। পরক্ষণেই গর্তে হারিয়ে গেল ওর পুরো ব্যাগ। বাধা ছুটে যেতেই রোজারোকে সাথে নিয়ে হুড়মুড় করে উপরে উঠে এল গ্রে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলো লক্ষ্য করে।

আর মাত্র এক ফুট বাকি, তারপরই গুহার ছাদ স্পর্শ করবে পানির স্তর।

পাথর ভাঙার শব্দ হলো কোথাও। সেই সাথে আরও বেড়ে গেল স্রোতের বেগ।

হাঁপাতে হাঁপাতে লুকার বাড়িয়ে দেয়া হাতে রোজারোর হাত ধরিয়ে দিল গ্রে, তারপর নিজেও উঠে এল উপরে। কাশছে রোজারো, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ওর। ছলকে ছলকে পানি বেরোতে লাগল মেয়েটার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্প্যানিশে অভিশাপ দেয়া শুরু করল মেয়েটা। আর গালির ভাষা এতোই মধুর যে, শুনলে কোয়ালস্কির কানও লাল হয়ে যেত লজ্জায়।

পেছনে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পানির স্তর।

"যাওয়ার সময় হয়েছে," বলে উঠল গ্রে।

রোজারোকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ও। তারপর এলিজাবেথ আর লুকাকেও এগোবার ইঙ্গিত করল। দুর্বল পায়ে দৌড় শুরু করল সবাই।

পেছন পেছন ধেয়ে আসছে উন্মত্ত পানির ধারা।

দরজার সামনে পৌঁছে কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে মেঝেতে নেমে গেল এলিজাবেথ।

লুকাকে এক মুহূর্ত দ্বিধা করতে দেখে খেঁকিয়ে উঠল গ্রে, "যাও!"

ওর আদেশ মেনে নিয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপসী সর্দার।

রোজারোর হাত ধরে মার্বেল পাথরের দরজাটা বেয়ে নামতে সাহায্য করল গ্রে। অক্ষত হাতটা বাড়িয়ে দরজার কোনা ধরে ঝুলে পড়ল মেয়েটা, তারপর লাফিয়ে পড়ল। ততক্ষণে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পৌঁছে গেছে পানি, ছুঁয়ে ফেলেছে গ্রে'র গোড়ালি।

লাফিয়ে নামার সময় এক হাতে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিল গ্রে। সাথে সাথে ওপাশে পাল্লার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানির তীব্র স্রোত। মেঝেতে পা রেখে দরজার দিকে তাকাল ও। পাথরের দরজাটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে শুধুমাত্র ভেতর দিকেই খুলতে পারে ওটা। আর এখন ভেতর থেকে পানির চাপের কারণে বাইরের দিকে শক্ত ভাবে লেগে গেছে পাথরের ভারী দরজা।

বন্ধ হয়ে গেছে নিজে নিজেই।

ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। শুনতে পেল, প্রচণ্ড গর্জন ভেসে আসছে বাইরের গিরিখাত থেকে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গোটা গিরিখাত উপচে পড়ছে বৃষ্টির পানিতে।

এখন বুঝতে পারছে, কেন পাহাড় কুঁদে বানানো হয়েছিল এই দালানগুলো।

আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারল গ্রে। লুকা-ও আন্দাজ করতে পেরেছে ব্যাপারটা। ফিসফিস করে প্রশ্ন করল ও, "বাকি সবাই কোথায়?"

যেন তার প্রশ্নের জবাব দিতেই লাঠি ভর দিয়ে হাজির হলেন মাস্টারসন। বাইরের পোর্চে ছিলেন তিনি। সম্ভবত বন্যার পানি দেখছিল অন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," বলে উঠলেন প্রফেসর। "আপনাদের দেরি দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। যাক গে,কী পেলেন ভেতরে?"

উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এল এলিজাবেথ। "সবকিছুর জবাব।"

"তাই নাকি?"

সাথে সাথে মাস্টারসনের পেছনে উদয় হলো কয়েকটা ছায়ামূর্তি।

পাশের ঘরগুলো থেকেও বেরিয়ে এল কয়েকজন। সবার পরনেই কালো পোশাক, কাঁধে অ্যাসল্ট রাইফেল।

রাশিয়ান কমান্ডো!

"যা জেনেছো বলো আমাকে, এলিজাবেথ," বলে উঠলেন মাস্টারসন। "তোমার বাবা অবশ্য অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তোমরা তা করবে না বলেই মনে হয়।"

বাইরের দরজায় কোয়ালোস্কিকে দেখা গেল, ওর হাত মাথার ওপরে তোলা। ডান ভুরু কেটে গেছে, ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে গাল, ঠোঁট। ওকে জোড় করে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে রেখেছে রাশিয়ান সৈন্যরা।

"অ্যাবেকে খুন করেছে ওরা," গর্জে উঠল কোয়ালোস্কি। "কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে ওকে।"

শ্রাগ করলেন মাস্টারসন। "মারবে না তো করবে টা কী? ব্যাটা অচ্ছুৎ কোথাকার, কুকুরের চেয়েও অধম ওরা।"

ওদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল রাশান সৈন্যরা।

প্রফেসের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে ও, কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। তবুও বিশ্বাসঘাতকতার এই নমুনা দেখে আর চুপ থাকতে পারল না।

দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে রাগে ফেটে পড়ল ও। "আপনি! আপনিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বাবার সাথে।"

"এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার, এলিজাবেথ। সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ও।"

শান্ত হয়ে আছে গ্রে। ষড়যন্ত্রের এ খেলায় কী চাল চালা হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছে ও। ড. পোকের গবেষণার ওপর নজর রাখা আর তথ্য পাচারের জন্য টাকা খাওয়ানো হয়েছে মাস্টারসনকে। কিন্তু এলিজাবেথের বাবা লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পরপরই দৃশ্যপট থেকে উধাও করে ফেলা হয় তাকে।

সবকিছুর জন্য দায়ী কে?

গ্রে'র চোখে শীতল ক্রোধ টের পেলেন মাস্টারসন। কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। যদিও জানেন, এই মুহূর্তে তার একটা চুলও স্পর্শ করা সম্ভব না সিগমা কমান্ডারের পক্ষে। লাঠি দোলাতে লাগলেন প্রফেসর। "কমান্ডার পিয়ার্স, আপনাকে আর আপনার বাকি সঙ্গীদের আপাতত বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে ওই মোটা ভালুকটাকে আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।"

কোয়ালোস্কির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

"মেরে ফেলো ওকে।"

বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল বিশালদেহী লোকটার দু'চোখ।

আগে বাড়তে চাইলো গ্রে, সাথে সাথে তিনটে রাইফেলের ব্যারেল ধাক্কা মারলো ওর বুকে।

চিৎকার করে উঠল এলিজাবেথ, "প্লিজ, হেইডেন, না! তোমার পায়ে পড়ি।"

ওর গলায় কোয়ালস্কির জন্য হাহাকার অনুভব করতে পারল গ্রে, প্রফেসরও ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা।

এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কির দিকে পালা করে চোখ পাকিয়ে তাকালেন মাস্টারসন। "বেশ। শুধুমাত্র তোমার বাবার কাছে ঋণী বলে ছেড়ে দিলাম ওকে। তবে কেউ সামান্য নড়াচড়ার চেষ্টা করলেই, বিনা দ্বিধায় গুলি চালাবে সৈন্যরা।"

গ্রে'র দিকে তাকালেন মাস্টারসন। "আর্চিবাল্ড কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইছিলেন না?" বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। "কোনওকিছু চাওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নেয়া উচিত।"

তৃতীয়
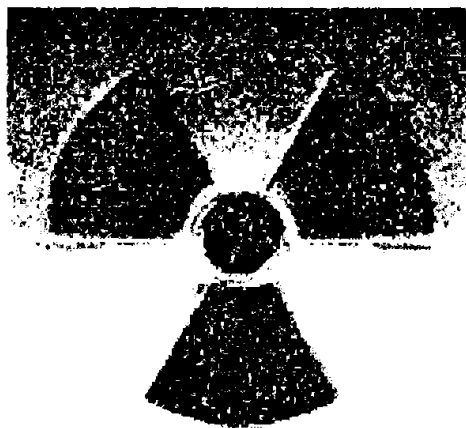
১৫
৭ সেপ্টেম্বর, ভোর ৫:০৫
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও,এক হাতে যতটা সম্ভব দ্রুত জলাভূমি উপর দিয়ে ভেলা বেয়ে চলেছে মঙ্ক। বাঘের হামলার পর রাতের বাকি অংশটুকু এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে ওরা, তাড়া খেয়ে। ভালো হাতটা দিয়ে লগির একমাথা ধরে, কাটা হাতের কব্জি দিয়ে নিচের দিকে ঠেলা দিল ও। ছোট্ট একটা বাঁক নিলো। তারপর আবার দাঁড় বাইতে শুরু করল। ভোরের নিস্তব্ধতার সাথে তাল মিলিয়ে ভেলাটাও এগিয়ে চলেছে জলাভূমির উপর দিয়ে।

চাঁদের নিস্তেজ আলোয় রাতের আধার এখন ওর চোখে সয়ে এসেছে। ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রন করতে পারছে ভেলাটাকে। তবে বেশ কয়েকবার তো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিল। জলাভূমিতে তল্লাশি চালাচ্ছে একটা এয়ারবোট। সেটার ফ্যানের তীব্র শব্দ আর সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলো অনেক দূর থেকেই টের পাওয়া যায়, তাই ধাওয়াকারীরা কাছাকাছি চলে আসার আগে পালানোর সুযোগ বের করা খুব একটা কঠিন হয়নি। আর জলাভূমির উপর ঝোপঝাড়ের পাশাপাশি হালকা কুয়াশা থাকায় লুকিয়ে পড়তেও সুবিধা হয়েছে।

তারপরেও, মঙ্কের ভুলের কারনে বেশ বড় ধরণের বিপদ হয়ে গিয়েছিল একবার, বেখায়ালিতে একটা গাছের সাথে ধাক্কা লেগে যায় ভেলা। ফলে গাছে পাখি গুলো কিচিরমিচির করে উঠে। আর এই শব্দ শুনে তীব্র বেগে ধেয়ে আসে এয়ারবোটটা। নুয়ে থাকা একটা উইলো গাছের ডালপালার নিচে লুকিয়ে পড়ায় রক্ষা, তবে এয়ারবোটটা আরেকটু কাছ থেকে অনুসন্ধান চালালেই নির্ঘাত ধরা পড়ে যেত ওরা।

তবে রক্ষা পাওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ ছিল।

এয়ারবোটের ইঞ্জিনের শব্দ কাছে চলে আসতেই, হাত দুটো কায়দা করে মুখের সামনে তুলে ধরে কিস্কা। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিচু স্বরে বন্য হরিনের মতো ডেকে ওঠে মেয়েটা। এই ডাকটাই গোটা রাতভর কিছুক্ষণ পর পর শুনছিল ওরা। মঙ্কের মনে পড়ল, নিখুঁত ভাবে পশুপাখির ডাক নকল করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে কিস্কার। হরিনের ডাক শুনে বিভ্রান্ত হয়ে যায় ধাওয়াকারীরা, তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সামনের দিকে চলে যায়।

ভাগ্য যে বারবার সদয় হবে না, সেটা মঙ্ক ভালো করেই জানে। আর এটাও জানে, ধীরে ধীরে করাশয় লেকের তেজস্ক্রিয়তার কালো ছায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ধাওয়া করে এসে ওদের আরও কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে

এয়ারবোটটা। এখন ওদের যাওয়ার পথ বলতে ওই একটাই-জলাভূমি বেয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া।

বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রতি ঘন্টা পর পর একটা করে ম্যাচের কাঠি ধরাচ্ছে মঙ্ক, ডোসিমিটারের রং পরিবর্তন হওয়া দেখছে। ইতিমধ্যে গোলাপি থেকে গাঢ় লাল রঙ ধারণ করেছে মনিটরটা। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে মঙ্ককে বলেছিল কনস্টানটাইন, পুরো একদিন এই রেডিয়েশনে থাকা মানেই মৃত্যু। মঙ্কেরও এখন তাই মনে হচ্ছে। জ্বালাপোড়া করছে ত্বক। বুঝতে পারছে, নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে বিষক্রিয়া।

ওরই যখন এই অবস্থা, সেখানে বাচ্চারা তো আরও সংবেদনশীল।

মার্তার চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে বাচ্চাগুলো, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠা পেঁচা আর অন্যান্য নিশাচর প্রানির ডাকেও শিউরে উঠছে। আবারও গাছে চড়ে গেল মার্তা। বেশ কয়েকবারই এমনটা করেছে প্রাণিটা। এমনকি একবার পিছু নেয়া শিকারিদের দাঁত ভেংচিয়ে, বিকট শব্দ করে টেনে নিয়ে গেছে উল্টো দিশায়। আর এতে করে ভেলা বেয়ে দূরে সরে যাওয়ার অবকাশ পেয়ে গেছে মঙ্ক।

মার্তাকে আর দশটা সাধারন শিম্পাঞ্জীর সাথে মেলাতে গেলে ভুল করা হবে, খুবই বুদ্ধিমতী প্রাণিটা। মঙ্ক মনে মনে পার্থনা করছে ওর জন্যেও। শিপাঞ্জীটা বুদ্ধিমতী ঠিকই তবে তার জন্য তেজস্ক্রিয়তার চেয়েও বড় বিপদ ওঁত পেতে আছে সামনে।

পূব আকাশের গা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অন্ধকারের চাদর, এখন অপেক্ষা শুধু সূর্য উঁকি দেবার। আর অন্ধকার কেটে গেলে লুকিয়ে থাকা দুষ্কর হয়ে যাবে ওদের সবার জন্য। বাঁচতে হলে, সবার আগে পেছনের লেজটা খসাতে হবে।

অর্থ্যাৎ, ফাঁদ তৈরি করতে হবে ওদের জন্য।

প্রোটিন বারের মোড়ক আর পানির খালি বোতলগুলো একত্র করেছে কনস্টানটাইন আর কিস্কা। মঙ্ক একটা ঝোপের সামনে এসে মোড় নিতেই, কাগজ আর বোতলগুলো পানিতে ফেলে দিল ওরা।

"এক জায়গায় ফেলো না," ফিসফিস করে বলে উঠল মঙ্ক। "ছড়িয়ে দাও চারপাশে।"

অনেকক্ষণ ধরেই একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিল ও, এতোক্ষণে পেয়েছে। নুয়ে থাকা কালো কুচকুচে দেবদারু গাছ আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা জায়গা। এখন শুধু সময়কে ঠিক মতো কাজে লাগাতে হবে। তবে সুযোগও একটাই। তীরে পৌঁছতে এখনও দুই মাইলের মতো পথ বাকি। সকালও হয়ে আসছে। হয় ঝুঁকিটা এখনই নিতে হবে, নয়তো কখনওই না।

ভেলার একেবারে মাঝখানে বসে আছে দলের সর্বশেষ সদস্য, পিওতর। পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে ছেলেটা। দৃষ্টি ভেলার পেছনদিকে, যেন বন্ধুদের দেখছে। তবে মঙ্ক জানে, ছেলেটার দৃষ্টি সেদিকে না। আরও দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে ও।

অবশেষে ঝোপে আড়ালে থাকা জায়গাটায় আসতেই, ভেলা সামনের দিকে ঘুরিয়ে লম্বা লগিটা ভালো করে নিচের কাদায় গেঁথে নিলো মঙ্ক। এখানেই ফাঁদ তৈরি করবে ওরা।

এয়ারবোটের উঁচু সিটে, পাইলটের পাশে বসে আছে বরসাকোভ। সামনের দিকের দুই দু'জন সৈন্য বসা। এয়ারবোটের সামনে থাকা সার্চলাইট নিয়ন্ত্রন করছে একজন, আর অন্যজন রাইফেল আগলে তৈরি হয়ে আছে, গুলি করার জন্য সদা প্রস্তুত।

টানা পাঁচ ঘন্টা যাবত অনুসন্ধান চালিয়ে আসছে ওরা। প্রচণ্ড শব্দে কান ব্যাথা করছে বরসাকোভের। ওর পিছনেই বোটের ইঞ্জিন আর পাখা, একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে জিনিস দুটো। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে জুটেছে পাখার উপরের ভাঙ্গা ইস্পাতের ফ্রেম। সারাক্ষনই খটখট শব্দ করে ওটা, কোনও পাশে মোড় নিলে আরও বেড়ে যায় আওয়াজ।

বোটে থাকা একমাত্র ইয়ারফোনটা পাইলটের কানে গোঁজা। এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল, অন্য হাতে থ্রটল ধরে রেখেছে ও। ডিজেল পোড়া গন্ধের কাছে হার মেনেছে জলাভূমির দূর্গন্ধ। অগভীর পানিতে এসে গতি কমিয়ে দিল পাইলট। পাড়ের দিকে সার্চলাইট তাক করল সামনে থাকা সৈন্য।

ঘুরতে ঘুরতে এতোক্ষণ বন্য শুকর, হরিণ, নীড়ে ভেতর নিশ্চুপ বসে থাকা ঈগল ছাড়াও আরও অনেক পশু-পাখি চোখে পড়েছে ওদের। প্রানিগুলোর চোখে সার্চলাইটের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হয়েছে যেন আগুন জ্বলছে সবার চোখেই।

এতক্ষণেও পলাতকদের কোনও নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া গেল না, ভাবল বরসাকোভ।

এদিকে জ্বালানিও ফুরিয়ে আসছে, আর হয়তো কয়েক ঘন্টা...

হঠাৎ ইঞ্জিনের গর্জন চিরে আরেকটা আর্ত-চিৎকার কানে এল, খুব সম্ভবত বানর-সদৃশ্য কোনও প্রানির। ডান পাশ থেকে এসেছে আওয়াজটা। সামনের সৈন্য দুজনও শুনতে পেয়েছে সেটা। সাথে সাথে সার্চলাইট আর রাইফেল দুটোই সেদিকে তাক করে ধরল ওরা। পাইলটকে আওয়াজের উৎসের দিকে এগোতে ইশারা করল বরসাকোভ।

সার্চলাইটের আলোতে মনে হলো, গাছের ডালের ফাঁক গলে বনের ভেতর ঢুকে গেল বড় কিছু একটা। বরসাকোভ বুঝে গেছে জিনিসটা কী হতে পারে। ল্যাবরেটরি থেকে একটা পশুও পালিয়ে এসেছে বাচ্চাগুলোর সাথে, একটা শিম্পাঞ্জী।

পাইলট থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিতেই পূর্ণশক্তিতে গর্জে উঠল ইঞ্জিন, বাতাস কেটে এগিয়ে চলল সামনে। কিছু দূর যেতেই আবার গতি কমিয়ে দিতে হলো, সরু হয়ে এসেছে ঝোপঝাড়ের মাঝের ফাঁক। তবে আশার কথা হচ্ছে, স্বাভাবিকের চেয়ে

ফাঁকা জায়গাটা একটু বেশিই। নিশ্চিতভাবেই, এইদিক দিয়ে নৌকা নিয়ে এগিয়েছে কেউ।

অবশেষে...

সামনে এগোনোর নির্দেশ দিল বরসাকোভ।

আবারও বেড়ে গেল বোটের গতি, চারপাশের অন্ধকার চিরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সার্চলাইটের আলো। কিছুদূর এগোতেই একটা বাঁকের অন্যপাশে সরু আরেকটা পথ নজরে পড়ল। দু'দিকে ঘন ঝোপঝাড়, পানিতে ভেসে আছে কিছু খালি বোতল আর প্যাকেট। পানি থেকে একটা বোতল তুলে আনলো এক সৈন্য।

এখন পুরোপুরি নিশ্চিত বরসাকোভ, এই পথ ধরেই এগিয়ে গেছে ওদের শিকার।

পাইলটকে আরও গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিল ও, শিকারের নাগাল হারাতে চায় না। সার্চলাইটের আলোয় পানিতে আরও কিছু ময়লা আবর্জনা, খাবারের প্যাকেট, আর বোতল ভেসে থাকতে দেখা গেল। কিছু একটা সমস্যা আছে। ওদের শিকার অন্তত এতোটা বোকা নয়। সন্দেহ জাগলো বরসাকোভের মনে, পাইলটকে গতি কমানোর নির্দেশ দিল ও।

ইঞ্জিনের গতি কমে যাবার শব্দ মঙ্কও শুনতে পেয়েছে।

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে আছে ও। বোটটা ওদের একটু সামনেই। গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে সামনে এগুচ্ছে ওটা।

লক্ষণ ভালো না।

চারপাশে আলোর পরশ বুলাচ্ছে সার্চলাইট। যেকোনও মুহূর্তেই ধেয়ে আসবে ওদের দিকে। এখন একমাত্র ভরসা...

বামপাশের অন্ধকার বনের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরোলো একটা কালো অবয়ব। এয়ারবোটের উপর দিয়ে ওপাশে চলে গেল ওটা। বোটের পিছন দিকে পৌঁছেই, কিছু জিনিস ছুঁড়ে দিল পাখার দিকে।

খটখট শব্দ করে উঠল এয়ারবোটের বিশাল পাখা।

কেবিনে পড়ে থাকা শটগানের কার্তুজ ওগুলো।

শব্দটা মঙ্কও শুনতে পেয়েছে। পাখার সাথে লেগে চিরে যাচ্ছে কার্তুজগুলো। যদিও এখনও আগুন ধরেনি, তবে চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে বিস্ফোরিত গুলির টুকরো।

কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল এয়ারবোটের কো-পাইলট। চিরে যাওয়া কার্তুজগুলো আঘাত হানছে ওদের শরীরে। ভয় পেয়ে গেছে বোটের পাইলটও। আঁতকে উঠে থ্রটল সামনে বাড়িয়ে দিতেই তীরবেগে এঁকেবেঁকে সামনে এগুলো এয়ারবোট।

এমন সময় হঠাৎ করেই ওদের উপর এসে পড়ল সার্চলাইটের আলো, তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠল পাইলট।

কিন্তু...দেরি হয়ে গেছে বাছা।

হঠাৎ হাওয়ায় উড়াল দিল সামনে বসা সৈন্য দু'জন। পেছনে ব্যকিদের গায়ের উপর গিয়ে পড়ল ওরা। সামনের দিক থেকে পেছনদিকের ভার বেশি হয়ে যাওয়ায়, সামনের বো উপরের দিকে উঠে গেল এয়ারবোটের। পাক খেয়ে জলাভূমিতে আছড়ে পড়ল বাহনটা।

আধভাঙা ফ্রেমসহ তীব্র বেগে ঘুরতে থাকা পাখার উপর উলটে পড়ল এয়ারবোটের যাত্রীরা। যন্ত্রণা আর বিস্ময় মিশ্রিত চিৎকারে কেঁপে উঠল চারপাশের পরিবেশ। সেই সাথে শোনা গেল মাথার খুলি আর হাড় ভাঙার বীভৎস আওয়াজ। চারপাশে ছড়িয়ে গেল দলা পাকানো হাড়-মাংস আর পাখার ভাঙা ফলা। আস্তে আস্তে কালো পানির ভেতর ডুবে যেতে লাগল এয়ারবোটের ধ্বংসাবশেষ।

বাচ্চাদের সাহায্যে, কেবিনে থাকা মাছ ধরার সুতো পাকিয়ে চিকন করে দড়ি বুনেছিল মঙ্ক। পরে সেটা নালার উপর বুক সমান উচ্চতায় আড়াআড়ি ভাবে শক্ত করে বেঁধে দেয় ও। ওই দড়িতে আটকেই পেছনে গিয়ে পড়ে সামনের দুই সৈন্য।

বনের ভেতর থেকে ছুটে এসে ভেলার উপর লাফিয়ে নামলো মার্তা। সাথে সাথে ওকে জড়িয়ে ধরল পিওতর। ভেলায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে হাপাতে শুরু করল প্রানিটা, আঁকড়ে ধরে রেখেছে পিওতরকেও। অবশ্য ওর চোখ মঙ্কের দিকেই আবদ্ধ, চোখদুটোতে আলো খেলা করছে যেন।

দুর্বল ভাবে মাথা নোয়ালো মঙ্ক।

ও চেয়েছিল এয়ারবোটটা যাতে এদিকেই আসে। তাই পানিতে বোতল আর মোড়ক ফেলে আকৃষ্ট করে ওদের। আর মার্তার গোলা-বর্ষন ছিল আরেকটা ফাঁদ, যাতে নালার উপর আড়াআড়ি ভাবে থাকা দড়িটা কারও নজরে না আসে।

খুবই নিপুণ ভাবে নিজের কাজ সেরেছে মার্তা।

পিওতরকে পরিকল্পনাটা বুঝি দেয়া হলে, কার্তুজগুলো নিয়ে মার্তাকে দেয় ছেলেটা। ধীরে ধীরে প্রাণিটাকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলে ও। যদিও রাশিয়ান ভাষায়, তবে মঙ্ক বুঝতে পেরেছিল ওদের দুজনের মাঝের সম্পর্কটা যেকোনও ভাষার উর্ধ্বে। অবশেষে গুলির পুঁটলি নিয়ে বনের মাঝে ঢুকে পড়ে মার্তা।

আবারও ভেলা বাইতে শুরু করল মঙ্ক। কিছুদূর এগুতেই স্রোতের টানে পড়ে সামনে এগোতে শুরু করল ভেলা। পরিকল্পনা সফল হওয়ায় এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত ও। তবে এও জানে, সামনে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

মানুষগুলোর মৃত্যুতে খুব একটা ভালো লাগেনি ওর। তবুও, এছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না। বিশেষ করে যখন ঝুঁকিতে আছে লক্ষ কোটি মানুষের জীবন।

মার্তা আর বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল মঙ্ক। অতীতের কোনও স্মৃতিই মনে নেই, এখন এরাই ওর সমস্ত জগত। এদের রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে ও।

স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে ভেলা। একটু বিশ্রাম পেয়ে পাটাতনে গা এলিয়ে দিল মঙ্ক। এমন সময় হঠাৎ মনের জানালায় উঁকি মারলো এক টুকরো স্মৃতি।

দারুচিনির স্বাদ...নরম ঠোঁট...

চিরতরেই কী চুরি হয়ে গেছে ওর সমস্ত অতীত? আর কখনও কী ফিরে পাবে না সেগুলো?

রাত ১২:০৪
ওয়াশিংটন ডি.সি.

মাঝরাতের একটু পর, ফোনকলটা কেটে দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাট। তারপর উঁকি দিল পাশের হাসপাতাল কেবিনের জানালায়, ওয়ান-ওয়ে গ্লাস লাগানো থাকায় ভেতর থেকে কেউ দেখতে পাবে না তাকে। সবেমাত্রই ডিরেক্টর ক্রো আর শেন ম্যাকনাইটের সাথে ফোনে কথা হয়েছে ওর। এই মুহূর্তে পেইন্টারের অফিসে বসে অন্যান্য এজেন্সিগুলোকে সামলাতে ব্যস্ত দুজনই।

সবকিছুই মেয়েটার ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য।

নিজের ক্ষমতাবলে যতটুকু করা সম্ভব, করেছে ক্যাট। এখন ম্যাপলথোর্পকে আটকানোর ভার তাদের দুজনের কাঁধে।

পরিস্থিতির বিচারে বর্তমানে তাকে কোন জায়গায় থাকা দরকার, ভালো করেই জানে ক্যাট।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ও, গন্তব্য- হাসপাতালের ওই রুমটা। অস্ত্র হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক গার্ড, পাহারা দিচ্ছে রুমটাকে। জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, তাকাল ভেতরের দিকে।

বিছানার উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে সাশা। কোলের উপর একটা ড্রয়িং খাতা আর এক বাক্স রঙ পেন্সিল। হাতে আইভি লাইন লাগানো থাকা স্বত্তেও, খাতাটায় আঁকিবুঁকি করছে মেয়েটা।

হঠাৎ জানালার দিকে তাকাল ও। যদিও ভেতর থেকে বাইরের কিছু দেখা যায় না, তবুও ক্যাটের মনে হলো, ওকেই দেখছে মেয়েটা।

বিছানার এক পাশে বসে আছেন ইউরি। সাশাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। মেয়েটাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে তিনিও ক্যাটের মতোই নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। সন্তুষ্টি আর ক্লান্তি, দুটোই লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মুখে।

গার্ডের দিকে তাকিয়ে নড করল ক্যাট। অবশ্য তাকে দেখে লোকটা আগে থেকেই দরজা খুলে রেখেছে। ঘরের ভেতর ঢুকে গেল ও। ম্যাকব্রাইড এখনো আগের চেয়ারটাতেই বসে আছেন। শুধু মাত্র ফোন করতে আর বাথরুমে যাওয়ার জন্য কয়েকবার বাইরে গিয়েছিলেন তিনি, অবশ্য প্রতিবারেই গার্ড ছিল সাথে।

ইউরির অপর পাশে, বিছানার সামনে চার্ট হাতে দাঁড়িয়ে আছে লিসা আর ম্যালকম।

হাসিমুখে ক্যাটের দিকে তাকাল লিসা। "অবিশ্বাস্য ভাবে সেরে উঠছে ও।"

"তবে এটা শুধুমাত্র সাময়িক উপশম।" ইউরির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো ক্যাট। "পুরোপুরি সুস্থ হওয়া নয়।"

চুপসে গেল লিসা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। "তা অবশ্য ঠিক।"

সাশার রোগের পরিণতি সম্পর্কে জানেন ইউরি। অসাধারণ প্রতিভার কারণে দিনকে দিন কমে আসছে ওর আয়ু। এটা অনেকটা জ্বলতে থাকা মোমের মতো। আগুন যত বড় হয়, মোমও ততো তাড়াতাড়ি গলে। ঠিক তেমনিভাবেই ধীরে ধীরে ওর জীবনিশক্তি শুষে নিচ্ছে বুদ্ধিমত্তা।

আর কত দিন বাঁচবে মেয়েটা, ইউরিকে জিজ্ঞেস করল ক্যাট। উত্তর শুনে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর।

এমন উচ্চমাত্রার প্রতিভা অনুযায়ী, খুব বেশি হলে আর চার কী পাঁচ বছর।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল ক্যাট।

তবে, কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হলো ম্যাকব্রাইডকে। তার হাবভাব দেখে মনে হলো যেন আমেরিকানরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে সাশার আয়ু দ্বিগুন করে ফেলতে সক্ষম। তবে এতেও তেমন কিছুই হবে না। বিশতম জন্মদিন পালন করতে পাবে না মেয়েটা।

"ডিভাইসটা সরিয়ে ফেললে হয়তো বাঁচানো যাবে ওকে। যদিও এতে বিশেষ ক্ষমতা হারাবে ও, কিন্তু প্রাণে তো বাঁচবে।" বলে উঠল লিসা।

পিছন থেকে ধমকে উঠলেন ম্যাকব্রাইড। "বুঝলাম, বেঁচে যাবে ও। কিন্তু ওভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী? বুদ্ধিমত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি, ওর প্রতিবন্ধীতাজনিত অক্ষমতাও সামাল দিচ্ছে ইমপ্ল্যান্টটা। এটা সরিয়ে ফেলা মানে মেয়েটাকে সমাজের কাছে, পৃথিবীর কাছে অথর্ব করে দেয়া।"

"মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার চেয়ে তো ভালো।" কাটা কাটা স্বরে জবাব দিল ক্যাট।

"তাই নাকি?" ম্যাকব্রাইডের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর। "এটা বলার আপনি কে? যদিও আর অল্প ক'টা দিন বাঁচবে ও, কিন্তু সময়টা উপভোগ করছে মেয়েটা। আপনার সেটা সহ্য হচ্ছে না বুঝি? কত শিশুই তো জন্ম থেকে অনিরাময়যোগ্য অনেক রকমের অসুখ-বিসুখ নিয়ে জন্মায়। যেমন ধরুন লিউকেমিয়া, এইডস, বিকলাঙ্গতা ইত্যাদি। তাদের ক্ষেত্রে আমরা কী করি? বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা? নাকি বেঁচে থাকার দিনগুলো যেন ভালোভাবে কাটে ওদের, সেই চেষ্টা?"

মুখ বাঁকাল ক্যাট। "আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েটাকে ব্যবহার করা।"

"একে অপরের কাজে সাহায্য করাকে খারাপ বলা হয় কবে থেকে?"

আর কিছু বলল না ক্যাট, লোকটার সাথে তর্ক করার ইচ্ছে নেই ওর। লোকটার অমানুষিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে গেছে ও। একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন-মরণের প্রশ্নে কোনও মানুষ এতোটা নির্দয় হতে পারে কীভাবে?

খাতাটায় আঁকিবুঁকি করে চলেছে সাশা। এই মুহূর্তে ওর হাতে একটা সবুজ রঙের পেন্সিল।একবার এই কোনায়, তো আরেকবার আরেক কোনায়, এভাবে অগোছালো ভঙ্গিতে কাগজের উপর হাত চালিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

"ওকে আঁকাআঁকি করতে দেয়া কী ঠিক হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

নড়ে উঠলেন ইউরি, ওদের কথায় তার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেছে। "এই মুহূর্তে শান্ত থাকাটাই ওর জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। এতে ওর ভেতরকার চাপ কিছুটা কমে আসবে। আর আঁকাআঁকি করার ফলেই শান্ত রয়েছে মেয়েটা।"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ওকে দেখেও খুব খুশি বলেই মনে হচ্ছে," স্বীকার করল ক্যাট।

সাশাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে, একটু হাসিও লেগে আছে ঠোটের কোণে। হঠাৎ গুটি গুটি আঙুলগুলো বাড়িয়ে ক্যাটের হাত আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। কিছু একটা বলল রাশিয়ান ভাষায়।

ভাষাটা বুঝতে না পেরে ইউরির দিকে তাকাল ক্যাট।

মুচকি হেসে অনুবাদকের ভূমিকা পালন করলেন ইউরি। "ও আপনাকেও খুশি থাকতে বলছে।"

ড্রয়িং খাতাটা ক্যাটের দিকে বাড়িয়ে দিল সাশা। যেন বলতে চাইছে, সেও ওর সাথে বসে খাতায় রঙ করুক। খাতাটা হাতে নিয়ে মেয়েটার পাশে বসল ক্যাট। পৃষ্ঠাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ও, ভেবেছিল আন্দাজেই হয়তো কিছু একটা আঁকিবুঁকি করছিল সাশা। কিন্তু ওর ধারণা ভুল, পূর্নাঙ্গ একটা ছবিই এঁকে ফেলেছে মেয়েটা।

কালো, ঘন একটা বনের মাঝে পানির উপর দিয়ে ভেলা বাইছে একটা লোক, তার পেছনে আরও কয়েকটা ছোট ছোট মানুষের অবয়বকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

কেঁপে উঠল ক্যাটের হাত। ছবির লোকটা দেখতে হুবহু মঙ্কের মতো। কিন্তু মঙ্ককে তো কখনও ভেলা চালাতে দেখেনি ও। স্মৃতি সাথে যুদ্ধ করেও এমন কিছু মনে করতে পারল না ক্যাট। তাহলে এই দৃশ্যটা পেল কোথায় সাশা?

ক্যাটের উদ্বিগ্নতা আঁচ করতে পেরেছে সাশা। বিহ্বল হয়ে গেল ওর চেহারা, হাসি মিলিয়ে গিয়ে কাঁপতে শুরু করলো ঠোঁটজোড়া। ক্যাটের চেহারা দেখে আন্দাজ করে নিয়েছে, বড় কোনও ভুল করে ফেলেছে ও। এই ছবিটা আঁকা উচিত হয়নি তার।

প্রথমে ইউরির দিকে, আর তারপর ক্যাটের দিকে তাকাল মেয়েটা। রাশিয়ান ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলতে লাগল। যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভয়ে পেয়েছে, ক্ষমা চাইছে।

দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন ইউরি। মুখের অনুভূতি লুকিয়ে ফেলল ক্যাট, চায় না মেয়েটা কষ্ট পাক। অবশ্য, ওর মনে গভীর দাগ কেটেছে ছবিটা। মনে পড়ল, ছবিটার দিকে তাকিয়ে এক পলক তাকিয়েই কেমন যেন থমকে গিয়েছিলেন ইউরি। তখন এক মুহূর্তের জন্য ক্যাটের মনে হয়েছিল, ছবির লোকটাকে হয়তো চেনেন তিনি। কিন্তু তা তো প্রায় অসম্ভব!

চেয়ার ছেড়ে বিছানার সামনে ঝুঁকে এলেন ম্যাকব্রাইড, ব্যাপারটা তার মনেও কৌতুহল জাগিয়েছে।

লোকটাকে পাত্তাই দিল না ক্যাট। ইউরির দিকে তাকিয়ে রইল ও। সাশার মাথার ওপাশ থেকে ইউরিও মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। সাশার মতোই তার অভিব্যক্তিতেও ক্ষমা চাওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট।

এসবের মানে কী?

এমন সময় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো ভবন। উপর থেকে এসেছে শব্দটা। তারস্বরে এলার্ম বেজে উঠল। সকলের দৃষ্টি সিলিং এর দিকে, তবে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাট। চোখের পলকেই যেন ঘটে গেল পরের ঘটনাগুলো।

সামনে ঝাঁপিয়ে লিসার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন ম্যাকব্রাইড। দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল দুজনেই। সাথে সাথে লিসাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাটও, কিন্তু অল্পের জন্য ছুটে গেল ওর হাত।

এক হাতে লিসাকে ধরে রেখে, অন্য হাতে পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন ম্যাকব্রাইড। একপাশের বোতাম চাপ দিতেই মাঝখান থেকে ঘুরে গেল ফোনটা, ছোট একটা পিস্তলের নল বেরিয়ে এল। লিসার গলায় ওটা চেপে ধরলেন তিনি।

"এক পাও নড়বে না," লিসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠল লোকটা।

আজকাল সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে সেলফোন-পিস্তল নতুন কিছু না। তবে ম্যাকব্রাইডকে দেয়া ম্যাপলথোর্পের এই অস্ত্রটা আরও আধুনিক। সেলফোনের মতো কলও করা যায় এটা দিয়ে। কোনও সিকিউরিটি স্ক্যানারেও ধরা পড়ে না .২২-ক্যালিবারের বুলেটওয়ালা এই জিনিস।

"এতে পাঁচটা বুলেট আছে!" চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যাকব্রাইড। "আগে ডাক্তারকে মারবো, তারপর ওই বাচ্চাটাকে।"

গার্ডও রাইফেল তাক করে রেখেছে তার দিকে, কিন্তু কোনও লাভ নেই। নিজের শরীরের ঠিক সামনেই ঢাল হিসেবে লিসাকে ধরে রেখেছেন ম্যাকব্রাইড।

"অস্ত্র ফেলে দাও," প্রহরির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি।

জায়গা ছেড়ে নড়লো না গার্ড, রাইফেলও নামালো না।

"কাউকেই মারবো না আমি," বললেন ম্যাকব্রাইড। মাথা নেড়ে সাশার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "আমরা শুধু বাচ্চাটাকে চাই। তো বাছা, ফেলে দাও রাইফেলটা।"

এতক্ষণ ম্যাকব্রাইডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ক্যাট। ঘাড় ঘুরিয়ে গার্ডকে রাইফেল ফেলে দেয়ার ইঙ্গিত করল ও।

"নিচে ফেলে লাথি মেরে আমার দিকে এগিয়ে দাও অস্ত্রটা," আদেশ করলেন ম্যাকব্রাইড।

তাই করল গার্ড।

ম্যাকব্রাইডের কাজটা খুবই সহজ- ম্যাপলোথোর্প আর তার দলবল আসার আগ পর্যন্ত বাচ্চাটাকে নজরে রাখা।

"এখন শুধুই অপেক্ষা," ঘোষণা করল লোকটা। "তবে কোনও চালাকি করার চেষ্টা করো না কেউ, নড়েছো তো মরেছো।"

বিকট শব্দে ভবনটা কেঁপে উঠতেই, বামপাশের দেয়ালে ঝোলানো মনিটরের দিকে তাকালেন পেইন্টার। সাশার ঘরের ভিডিও দেখা যাচ্ছে তাতে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। কেঁপে উঠল তার বুক, চাপা একটা রাগ ফুটে উঠল চোখেমুখে। শব্দ শোনার জন্য কী-বোর্ডের নির্দিষ্ট বোতামটা চাপতেই কানে ভেসে এল...

"কোনও চালাকি করার চেষ্টা করো না কেউ, নড়েছো তো মরেছো।"

ডেস্কের অপর পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন শেন। গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে উপর থেকে। অন্য একটা বাটন টিপে দিলেন পেইন্টার, উপরের লেভেলের ছবি ভেসে উঠল আরেকটা মনিটরে। লিসার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পরের মনিটরের দিকে তাকালেন তিনি। ধোঁয়ায় ভরে আছে পুরো করিডোর। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরা মুখ ঢাকা কিছু অবয়ব এগিয়ে আসছে, সবার কাঁধেই অ্যাসল্ট রাইফেল ঝোলানো।

"এতো বড় সাহস হলো কী করে শুয়োরটার," বলে উঠলেন শেন।

নাম উল্লেখ না করলেও তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছেন, বুঝে গেছেন পেইন্টার।

ম্যাপলথোর্প।

"ওরা মেয়েটার জন্য আসছে," গর্জে উঠলেন শেন।

উপর তলা থেকে বুলহর্ণের আওয়াজ ভেসে এল। "মেঝেতে শুয়ে পড়ো সবাই! কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেই মৃত্যু অবধারিত।"

পেইন্টারকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুলেন শেন। "মুখ বুজে বসে থাকার কোন মানে হয় না, কিছু একটা করতেই হবে। পাগল হয়ে গেছে শুয়োরটা।"

ঘুরে পেইন্টারের দিকে তাকালেন শেন। "তুমি তো জানোই কী করতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। পরক্ষণে আবার লিসার দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। মেয়েটার গলার উপর, থুতনির একটু নিচে পিস্তল ধরে রেখেছে ম্যাকব্রাইড। রোজ সকালে ঐ জায়গাটাতেই চুমু খান পেইন্টার।

শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটা ফেইল-সেফ ব্যবস্থা রয়েছে সিগমার। তবে এই মুহূর্তে, নিজের লোকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। এই যুদ্ধটা শুধু পেইন্টার আর ম্যাপলথোর্পের, বাকিদের না। ফোনটা কানে ঠেকালেন তিনি। "ব্রান্ট।"

"স্যার!" উত্তেজিত গলায় জবাব দিল তার সহকারী।

"প্রটোকল আলফা চালু করো।"

"ঠিক আছে।"

একটা নতুন অ্যালার্ম বেজে উঠল, সবাইকে নিকটস্থ ইমারজেন্সি এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সংকেত ওটা। আসলে, কোনও রকম বাধা ছাড়াই মেয়েটাকে হাসিল করতে চায় ম্যাপলথোর্প। ওকে সেই রাস্তাই বানিয়ে দিচ্ছেন পেইন্টার। অবশ্য, নিজের লোকদের রক্ষার স্বার্থেই কাজটা করতে হচ্ছে তাকে।

দরজার দিকে এগোলেন শেন। "আমি উপরে যাচ্ছি। দেখি কথা বলে কোনও ফল পাওয়া যায় কী না, ব্যর্থ হলে..."

"বুঝতে পেরেছি।" ড্রয়ার খুলে একটা সিগ সাওয়ার পি-২২০ পিস্তল বের করলেন পেইন্টার। "এটা সাথে রাখুন।"

মাথা নাড়লেন শেন। "এটা নিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে।"

তিনি বেরিয়ে যেতেই আবার মনিটরের দিকে তাকালেন পেইন্টার। সিগমার প্রতি নিজের সর্বশেষ দায়িত্বটা পালন করতে চলেছেন এখন। কম্পিউটার ফেইল-সেফ কোডটা টাইপ করলেন তিনি, তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারে চেপে ধরলেন বুড়ো আঙুল।

কম্পিউটারের পর্দায় একটা লাল চারকোণা ঘর ভেসে উঠল, উপরে নীল রঙের আরও কিছু হিজিবিজি রেখা আঁকা। এই ভবনের এয়ার-ভেন্টিলেশন সিস্টেম ওটা। প্রাথমিক কাউন্টডাউন পনেরো মিনিটের হলেও, সেটাকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দিলেন পেইন্টার। তারপর সময়টা মিলিয়ে নিলেন হাতঘড়ির সাথে। পর্যায়ক্রমে দরজা আর মনিটরের দিকে তাকালেন তিনি। হাতে সময় খুব কম, আর এই অল্প সময়ের ভেতরেই অনেক কিছু করতে হবে তাকে।

দ্রুত শেষ কোডটাও টাইপ করলেন পেইন্টার। সাথে সাথে সময় গণনা শুরু করে দিল কম্পিউটার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিস্তলটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সকাল ৭:০৫
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

পাহাড়ের কোণ থেকে সূর্যের আলো উঁকি দিয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। সামনের ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে ভেলা চালিয়ে দিল মঙ্ক, এক মুহূর্ত পর নরম মাটিতে ধাক্কা খেলো ভেলার সামনের অংশ। স্যাঁতসেঁতে হোক আর যা হোক, অবশেষে মাটি তো পাওয়া গেছে, ভাবল মঙ্ক।

"ভেলাতেই থাকো," বাচ্চাগুলোর উদ্দেশ্যে বলে উঠল ও।

লগি দিয়ে মাটিতে চাপ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, পা ফেলার মতো শক্ত কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে নিজে আগে নামলো, তারপর পিওতর আর কিস্কাকেও নামতে সাহায্য করল মঙ্ক। টলমল পায়ে একা একাই নেমে এল কনস্টানটাইন। ক্লান্তিতে কালো দাগ পড়ে গেছে ছেলেটার চোখের নিচে। সবার শেষে মার্তা।

মঙ্ক ইশারায় সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল সবাইকে। আরও আধ মাইল চলার পর, শক্ত মাটির দেখা পেল ওরা। সামনেই সবুজ মাঠ, পাহাড়ি ফুলে ছেয়ে আছে গোটা এলাকা।

এক মাইলের দূরে, পাহাড়ের নিচু ঢালে একটা ছোট্ট শহর দেখা যাচ্ছে। সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপালি পানির ধারা বলে দিল, ওটা একটা খাল। ভালো করে জায়গাটা দেখে নিলো মঙ্ক। মনে হচ্ছে, অনেক আগে থেকেই জায়গাটা পরিত্যক্ত। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই বেয়ে উপরে উঠে গেছে পাথর আর কাঠের তৈরি ঘড়বাড়ি। পাহাড়টাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যই মনে হয় একটা কারখানাও তৈরি করা হয়েছিল, সেটাও পরিণত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে। আরও কিছু ভাঙা কাঠামো চোখে পড়ল আশেপাশে। ঝোপঝাড় জন্মে বুনো চেহারা নিয়েছে পুরো এলাকাটা।

"পুরনো খনি এলাকা," ঘোষণা করল কনস্টানটাইন। মানচিত্র খুলে নিজেদের বর্তমান অবস্থান দেখে নিলো ছেলেটা। "এখন আর কেউ থাকে না ওখানে। খুব একটা নিরাপদ নয় জায়গাটা।"

"মাইন শাফটটা আর কত দূরে?" জানতে চাইলো মঙ্ক।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখল ছেলেটা, তারপর আঙুল উঁচিয়ে ইঙ্গিত করল সামনের দিকে। "খুব একটা দূরে না। শহরটা পেরিয়ে আরও আধ-মাইল।"

শহরটার দিকে তাকিয়ে রইল। বদলে গেল ওর মুখের অভিব্যক্তি। গাঢ় সবুজ পানির বিশাল এক জলাশয় দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের আড়ালে অর্ধেকটা লুকানো।

লেক করাশয়।

মনিটর চেক করল মঙ্ক, লাল হয়ে আছে এখনও। কিন্তু শহরে পৌঁছাতে হলে তেজস্ক্রিয়তায় ভরা এই লেকটা পার হতেই হবে ওদের।

"জায়গাটা কতখানি বিপজ্জনক?" লেকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

মানচিত্রটা ভাঁজ করে রাখল কনস্টানটাইন। "পিকনিক করার জন্য উপযুক্ত নয় মোটেই।"

মঙ্ক ছেলেটার দিকে ঘুরে তাকাল, রসিকতাটা ভালো লেগেছে ওর। তবে হাসলো না দুজনের কেউই। সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল ওরা। কনস্টানটাইনের কাঁধে এক হাতে আলতো চাপ দিল মঙ্ক। উত্তরে মুচকি হাসলো ছেলেটা।

ওদের দুজনের পেছন পেছন এগোচ্ছে পিওতর আর কিস্কা। মার্তা সবার পেছনে।

এতো দূর যখন আসতে পেরেছে, তাহলে বাকিটাও পাড়ি দিতে পারবে।

পিছু হটার কোনও ইচ্ছেই নেই ওদের।

আধমাইল পেছনে, শিকারদের পাহাড়ের ঢালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল লেফটেন্যান্ট বরসাকোভ। ওদের ফেলে যাওয়া ভেলার উপর হাটু গেঁড়ে বসে পড়ল ও, কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল রাইফেলটা। আবার যাত্রা শুরু করার আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে অস্ত্রটা। লম্বা একটা সময় ধরে জলাভূমিতে সাতার কাটতে হয়েছে ওকে, ফলে পানি আর কাদা ঢুকে গেছে রাইফেলটায়। আস্তে আস্তে অস্ত্রটা পুরোপুরি খুলে ফেলল ও: ব্যারেল, বোল্ট অ্যাসেম্বলি, ম্যাগাজিন। প্রতিটা অংশই খুলে ভালো করে ধুয়ে মুছে নিলো। সবশেষে আবার জোড়া লাগালো সবকিছু।

কাজ শেষ হতেই, রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল বরসাকোভ।

রেডিওটা হারিয়ে যাওয়ায় এখন একাই পথ চলতে হবে তাকে। এয়ারবোট দুর্ঘটনায় সে-ই একমাত্র বেঁচে যাওয়া লোক। পাখায় আছড়ে পড়ে কচুকাটা হয়েছে পাইলট। ঘাড় ভেঙে মারা গেছে দুই সৈন্যের একজন। বোটের খোলের নিচে চাপা পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে মরেছে আরেক সৈন্য।

কোনওমতে বেঁচে গেলেও, এক পায়ের হাঁটুর পেছনদিকের মাংসপেশি কেটে হাড় পর্যন্ত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বরসাকোভের। মৃতদের একজনের শার্ট ছিড়ে ক্ষতটা বেঁধে নিয়েছে ও। ওর এখন উচিত, যাতে জলাশয়ের পানিতে পায়ে সংক্রমণ না হয় সে ব্যবস্থা করা।

কিন্তু হাতের কাজটা শেষ করতে হবে আগে।

কোনওভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না।

কাটা পা নিয়েই শিকারের পিছু ধাওয়া শুরু করল বরসাকোভ।

১৬
৭ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮:১১
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

"ওঠো!"

শব্দগুলো কান দিয়ে ঢুকলেও মাথায় ঢুকতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল গ্রে'র। ঠাস করে কেউ একজন গালে চড় বসাতেই আস্তে আস্তে ঝিমানো ভাবটা কেটে এল ওর। মাথার ভেতর হঠাৎ অসংখ্য আলো জ্বলে উঠল, সাথে সাথেই সব ঝাপসা হয়ে এল আবার।

ওর উপর ঝুঁকে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল লুকা।

কেশে উঠে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল গ্রে, তারপর একা একাই উঠে দাঁড়াল কোনওমতে। আশপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল, একটা সেলে রাখা হয়েছে ওদের। চারপাশের দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে অনেক আগেই। দরজার রঙ কটকটে লাল। একপাশের দেয়ালে, অনেক উপরে থাকা একটা জানালার ফাঁক গলে আলো আসছে। জানালাটার নিচে ছাতা পড়া এক মাদুরের উপর বসে আছে কোয়ালস্কি। দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে বমি ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশালদেহী লোকটা।

বড় করে শ্বাস টেনে নিজেকে ধাতস্থ করল গ্রে। তারপর আগের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করল। আবছা আবছা মনে পড়ল বন্দুকের নলের মুখে ক্যানিয়নের সেই কষ্টসাধ্য আরোহণ, স্বল্পসময়ের সেই হেলিকপ্টার ভ্রমণ, তারপর বৃষ্টিভেজা রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা এক কার্গো প্লেনের কথা। কাঁধের আঘাতটার উপর আঙুল বুলালো ও। প্লেনে চড়ার পর চেতনানাশক ওষুধ দেয়া হয়েছিল তাদের সবাইকে।

কোথায় আছে বুঝতে পারছে না গ্রে।

"এলিজাবেথ...রোজারো...?" ভাঙাস্বরে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়লো লুকা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে ও। "জানি না ওরা কোথায়। হয়তো অন্য কোনও সেলে।"

"আমরা কোথায় আছি, এ ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে?"

শ্রাগ করল লুকা। পেছন থেকে অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

উঠে দাঁড়াল গ্রে, এগোতে লাগল জানালার দিকে। এখনও মাথা ঘোরানো থামেনি। জানালা পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না ওর মাথা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কোয়ালস্কির দিকে।

নিজের দিকে গ্রে'র দৃষ্টি লক্ষ্য করল বিশালদেহী লোকটা। "পিয়ার্স, তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মজা নিচ্ছো!"

"উঠে দাঁড়াও," হুকুম দিল গ্রে, "সাহায্য করো আমাকে।"

পেট চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। দুই হাত মুঠো করে সামনে বাড়িয়ে ধরল।

"আমাকে কী মনে করো তুমি? নিজের ব্যক্তিগত মই?"

"মই হলে আর তো অভিযোগ করতে না!"

কোয়ালস্কির হাতের উপর ভর করে জানালার নিচের তাক পর্যন্ত পৌঁছালো গ্রে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে। একটা শহর, তবে প্রায় অর্ধেকটাই ঝোপজঙ্গলে ঘেরা। ক্ষয়ে গেছে পুরো এলাকাটা। ভবনের ছাদগুলো শ্যাওলায় ঢাকা, কিছু কিছু আবার ধ্বসেও পড়েছে। ভাঙা জানালা আর ফায়ার এস্কেপের ফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আগাছা। রাস্তার ওপাশে নাগরদোলা ও আরও কিছু রাইডের ছবি ছাপা একটা অস্পষ্ট বিলবোর্ড। কোনও একটা পার্কের বিজ্ঞাপন ওটা, ভাবল ও। নাগরদোলার পেছনদিক থেকে রাইডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা পরিবার।

একটু দূরে, খোলা আকাশের নিচে সেই নাগরদোলাটাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল গ্রে। হারানো ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে একাকী টিকে আছে এখনও। দৃশ্যটা দেখে অসাড় হয়ে আসতে লাগল গ্রে'র গোটা শরীর। বুঝতে পেরেছে, তারা কোথায় আছে। পরিত্যক্ত এই নাগরদোলাটাই একসময় পরিণত হয়েছিল গোটা শহরের প্রতীকে।

"চেরনোবিল," বিড়বিড় করে বলে উঠল ও, তারপর নেমে এল মেঝেতে।

কিন্তু ওদের এখানে আনা হয়েছে কেন?

ডক্টর পোকের মৃতদেহ সম্পর্কে প্যাথলজিস্টের রিপোর্টের কথা মনে পড়ল গ্রে'র। শরীরে থাকা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রমাণ করে যে, এখানেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রফেসর। যদিও পরবর্তীতে ম্যালকম জেনিংসের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

কী হচ্ছে এখানে?

পরবর্তী দশ মিনিট পুরো সেল জুড়ে খোঁজাখুঁজি করল গ্রে, পরীক্ষা করে দেখল দরজাটা। মরচে পড়া গেলেও এখনও যথেষ্ট শক্ত। বাইরে গার্ডেরমৃদু পদশব্দ আর খুকখুক কাশির আওয়াজ শোনা গেল। খুব সম্ভবত, তাদের কথা বলতে শুনে বড় কর্তাদের খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল লোকটা। কারণ, কিছুক্ষণ পরই কতগুলো বুটের এগিয়ে আসার শব্দ ভেসে গেল, এগিয়ে আসছে সেলের দিকে।

পায়ের আওয়াজ বলে দিচ্ছে, আক্রমণ করার পক্ষে সংখ্যায় একটু বেশিই ওরা!

দরজাটা খুলে যেতে দেখে পিছিয়ে দাঁড়াল গ্রে। রাইফেল হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে সেলে ঢুকল কালো-ধূসর ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন সৈন্য। দুপাশে সরে গিয়ে সবার পেছনে থাকা লম্বা এক ব্যক্তির জন্য জায়গা করে দিল ওরা। যে ঢুকল, তার অবয়ব অনেকটা বাইরের ঝাপসা বিলবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ওই বাবার মতোই। ধারালো চেহারা, ছোট করে ছাঁটা দাঁড়ির আড়াল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে শক্ত চিবুক। গায়ে শরীরের আকৃতির সাথে মিল রেখে চমৎকারভাবে সেলাই করা নেভী ব্লু স্যুট আর সিল্কের লাল টাই। এমনকি তার নিচের দিকেও...

"দারুন তো জুতোগুলো!" মন্তব্য করল কোয়ালস্কি।

মাথা নুইয়ে পায়ের চকচকে অক্সফোর্ড জুতোজোড়ার দিকে তাকাল লোকটা। এই মুহূর্তে নিজের বেশভূষার এমন অপ্রত্যাশিত মূল্যায়ন আশা করেনি।

"আসলেই!" সাফাই গাওয়ার সুরে আবারও বলে উঠল কোয়ালস্কি।

গ্রে'র দিকে স্থির হলো নবাগতের চোখ। "শুভ সকাল, কমান্ডার পিয়ার্স। আপনি আমার সাথে এলে খুব ভালো হয়। কিছু ব্যবসায়িক আলাপ-আলোচনা সেরে নিতাম। হাতে সময় নেই একেবারেই।"

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল গ্রে। "যতক্ষণ না আপনি বলছেন আমাদের সাথের মেয়ে দু'জন..."

কথার বাকি অংশটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো লোকটা। "এলিজাবেথ পোক আর ড. শে রোজারো তো? আমি নিশ্চিত করছি, সুস্থ আছেন তারা। আসলে, সত্যি বলতে, তাদের থাকার ব্যবস্থা এর থেকেও ভালো। কী করবো বলুন, প্রস্তুতি নেয়ার জন্য খুব বেশি সময় পাইনি আমরা। এখন দয়া করে যদি একটু এদিকে আসেন...।"

রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের বদৌলতে কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে আমন্ত্রণের আন্তরিকতা। হলওয়ে ধরে সামনে এগোনোর সময় চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল গ্রে। দু'পাশেই অসংখ্য সেল, নিঃসন্দেহে এটা একটা পরিত্যক্ত জেলখানা। কোনও কোনও সেলের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে মরচে পড়া উল্টানো বিছানা আর কোনায় জমে থাকা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ নজরে এল। সেসবের তুলনায়, ওদের সেলের অবস্থা রীতিমত রাজকীয়ই বলা চলে।

গার্ড স্টেশনে এসে শেষ হয়েছে লম্বা হলওয়ে। আগাছায় ঘেরা জেলের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। দূর দিগন্তে চেরনোবিল রি-অ্যাক্টরের ভেন্টিলেশন টাওয়ারটা দেখতে পেল গ্রে।

কাছেই, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে উঠল একটা চেয়ার।

ঘুরে তাকাল ও। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার পেছনে রাখা একটা চেয়ারে নড়চড়ে বসলেন মাস্টারসন। আবারও মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোষাক চড়িয়েছেন গায়ে। দেখে মনে হচ্ছে, বেশ আরামেই আছেন তিনি। লাফিয়ে পড়ে ওই শুয়োরটার ঘাড় মটকে দেয়ার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করল গ্রে। সবার আগেকিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার। সহযোগিতা ছাড়া তা আদায়ের অন্য কোনও উপায় চোখে পড়ছে না আপাতত।

টেবিলের অন্য পাশের একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে। মাথার পেছনে রাইফেল তাক করে রাখল এক গার্ড।

আরও একজন আছে ঘরে, একটা মেয়ে। টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে। কালো চুলের মাঝখানে স্থির হয়ে থাকা চেহারায় একটুও আবেগের ছাপ নেই মেয়েটার। গ্রে'কে এখানে নিয়ে আসা লোকটার মতোই কালো স্যুট পরনে। মাস্টারসনকে অগ্রাহ্য করে টেবিল ঘুরে ওপাশে বসল মেয়েটা।

হাত ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন প্রথম কালো স্যুটধারী। "আমি সিনেটর নিকোলাস সলোকভ। নামটা শুনেছেন হয়তো।"

জবাব দিল না গ্রে। হতাশায় মুখ কুঁচকে ফেলল লোকটা।

"শোনেননি? তাহলে এখন শুনবেন," বলে উঠলেন তিনি। তারপর চিকন মেয়েটির উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। দ্রুততার সাথে গ্রে'র দিকে এগিয়ে এল ও, হাঁটু গেড়ে গ্রের পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দিল ওর হাতের দিকে। তাকে স্পর্শ করার আগে ভ্রূ উঁচু করে অনুমতি চাইছে।

শ্রাগ করল গ্রে। সম্মতি পেয়ে আস্তে করে গ্রে'র হাতটা তুলে নিজের হাতের তালুর উপর রাখল মেয়েটা। কব্জিতে এঁটে বসল সরু আঙুলগুলো। গভীর মনোযোগের সাথে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা।

"ইতিমধ্যে এলিজাবেথ পোকের সাথে কথা হয়েছে আমাদের," বলে উঠলেন নিকোলাস।

"ভারতে আপনাদের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন তিনি। আসলেই অসাধারণ। কেবল এই তথ্যটাই আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট ছিল। ভাবতেই ভালো লাগছে, আমাদের ঐতিহ্য সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে সুদূর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত।"

গলা খাঁকারি দিল গ্রে। "আপনাদের ঐতিহ্য?"

মেয়েটার দিকে হাত নাড়লো লোকটা। "এবং ইলেনা'র-ও। আমরা সবাই জেনেটিক্যালি একই বংশের সন্তান।"

লুকার কাহিনী মনে পড়ল গ্রে'র। "হারিয়ে যাওয়া জিপসী।"

"হ্যাঁ। ডক্টর মাস্টারসন আমাকে বলেছেন যে, ওই শিশুদের দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু প্রয়োজনীয় অপহরণ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন আপনি। প্রকৃতপক্ষে আমার বাবাও ওই জিপসী শিশুদের একজন। আর আমার বিশ্বাস, আপনি এর আগে আমাদের বিশাল পরিবারের আরেকজন সদস্যের দেখাও পেয়েছেন। প্রতিভাধারী ছোট্ট সাশা।"

কার কথা বলা হচ্ছে, আগেই বুঝতে পেরেছে গ্রে। কিন্তু চেহারায় কোনও ভাব ফুটে উঠতে দিল না ও। এমন ভাব করল, যেন জানে না কিছুই।

নিকোলাসের দিকে ঘুরে মৃদুস্বরে রাশিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল ইলেনা।

মাথা নাড়লেন সিনেটর। "সাশার সাথে আপনার দেখা হয়েছে তাহলে। দয়া করে মিথ্যা বলার কষ্ট করতে যাবেন না।"

গ্রে'র পায়ের কাছে বসা মেয়েটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "ইলেনার অনুভূতিশক্তি বেশ প্রবল, খুবই স্পর্শকাতর ও। আপনার চামড়ার উষ্ণতা আর হৃদস্পন্দন পরিমাপ করার ক্ষমতা আছে ওর। পাশাপাশি নজর রাখছে আপনার চোখের মণি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরও। তার চোখকে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব। আমার ব্যক্তিগত লাই ডিটেক্টর ও।"

বলে মেয়েটার কানের দিকে ইশারা করলেন নিকোলাস। অন্য হাত দিয়ে কানের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিল ইলেনা। মাথার পাশে সার্জিক্যাল স্টিলের ওই আকৃতিটা চেনে গ্রে। সাশার মতোই, একই ধরণের ডিভাইস ওটা। ইলেনাকে সাশারই প্রাপ্তবয়স্ক সংস্করণ বলা যায়, তবে শুধু প্রতিভাটুকু ভিন্ন।

"অসাধারণ ক্ষমতাবান ও," গর্বিত স্বরে বলে উঠলেন নিকোলাস। তবে গূঢ় কিছু একটা লুকিয়ে আছে তার বলার স্বরে।

কিছু একটার অভাব অনুভব করল গ্রে। "তোমার ডিভাইসটা কোথায়?"

চোখ সরু করে আবার তার দিকে তাকালেন নিকোলাস। লোকটার চেহারায় বিরক্তির ভাবটা উপভোগ করল গ্রে। নিশ্চিতভাবেই তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে ও। ডান কানের উপর দিয়ে ঘুরে এল লোকটার হাত। "আমার পথ আসলে ওদের থেকে ভিন্ন।"

গ্রে বুঝতে পারল, সে কী বলতে চাচ্ছে। নিকোলাসকে ইমপ্ল্যান্ট লাগানো হয়নি। তার মানে, কোনও সুপ্ত প্রতিভা ছাড়াই জন্মেছিল ও। তবুও তাকে রাশিয়ার এক ক্ষমতাশালী অবস্থানে বসিয়েছে কেউ।

কেন? কী পাবার আশায়?

বলতে থাকলেন নিকোলাস, "আমরা সাশার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ওয়াশিংটনের টালমাটাল অবস্থার কারণে আমরা তার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছি না আমরা। এ কারণেই মূলত আপনাদের ভারত থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।"

নয়তো আভি ভান্স্কির মতোই দেখামাত্র গুলি করা হতো ওদের।

"সাশার সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত আমরা। আমরা চাই সে ফিরে আসুক আমাদের মাঝে। তার পরিবারের কাছে। এজন্যই প্রথমে জানতে হবে, কোথায় আর কার কাছে আছে ও?"

সোজাসুজি নিকোলাসের চোখের দিকে তাকাল গ্রে। "জানি না আমি।"

পাশ থেকে মাথা নাড়লো ইলেনা।

"আপনি কি আবার একটু চেষ্টা করে দেখবেন? আমি বেশ ভদ্রভাবেই জানতে চাচ্ছি। নয়তো...আপনার আরও চার বন্ধু আছে আমাদের হাতে।"

"আসলেই জানি না আমি," জবাব দিল গ্রে। "তাকে শেষবার যখন দেখি, তখন সে আমাদের প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে ছিল।"

উপর-নিচে মাথা দোলালো ইলেনা। তার মানে, সত্যি বলছে ও।

"আর আমার ধারণা, জন ম্যাপলথোর্পের হয়ে কাজ করছেন না আপনারা। ওই বিশ্বাসঘাতক তো আপনাকে আর ডক্টর মাস্টারসনকে আগ্রার হোটেলে খুন করার চেষ্টাও করেছিল।"

"না। আসলে, বাচ্চাটাকে ওর হাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি আমরা।"

"খাসা কাজ করছেন। ওই লোকটা দুমুখো সাপের মতো। তাহলে আশা করি, আমরা একটা রফায় আসতে পারব। যেহেতু এখন আমাদের হাতে বিনিময় করার মতো মূল্যবান কিছু আছে।"

"তার আগে বলুন, ওই মেয়েটার কাছে কী চান আপনারা?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"ওর জায়গা এখানে, ওর পরিবারের সাথে। আপনার দেশের যে কারও চেয়ে ওর বেশি খেয়াল রাখবো আমরা।"

"হতে পারে। কিন্তু আপনারা কেন চান ওকে? ওকে পাওয়ার জন্য আর কতটুকু করবেন?"

চতুর দৃষ্টিতে গ্রে'র মতলব বোঝার চেষ্টা করছে নিকোলাস। তার ধূর্ততার গভীরতা টের পাচ্ছে গ্রে। নিজেকে প্রমাণ করতে চাওয়ার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে লোকটার ভেতর, সম্ভবত প্রতিভার ঘাটতিকে পুষিয়ে নেয়ার জন্য।

সেই দুর্বলতাকেই পুঁজি করার চেষ্টা করল গ্রে। "সাশার এতো বাচ্চাদের নিজের স্বার্থে কাজে লাগানোর বাইরেও কি অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে আপনাদের?"

চকচক করে উঠল নিকোলাসের চোখ। "আমাদের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখার কিছু নেই। কারও ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের লক্ষ্য মানবতার বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ, পৃথিবীটাকে সবার জন্য আরও সুন্দর করে তোলা। পৃথিবীজুড়ে প্রতিদিন যে অনাচার হয় সে তুলনায় অল্প কিছু শিশুর আত্মত্যাগ খুবই সামান্য।"

লোকটার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার পিছনে যুক্তি খুঁজতে লাগল গ্রে। "কী উদ্দেশ্য?"

"মানবজাতির গতিপথ পরিবর্তনের থেকে কোনও অংশে কম না সেটা।"

তার চেহারায় দম্ভ ফুটে ওঠতে দেখা গেল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে বসলেন গ্রে'র দিকে।

"প্রতি শতাব্দীতেই এমন কারও আবির্ভাব ঘটে, যিনি রাতারাতি পাল্টে দিতে পারেন মানবজাতির ইতিহাস। বড় বড় মনীষীর কথা বলছি আমি... যেমন বুদ্ধ, মুহাম্মাদ(সঃ), যীশু খ্রিস্ট। সবার থেকে ভিন্ন তাদের চিন্তাধারা, তারা পৃথিবীকে দেখতেন নিজের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। তাদের প্রভাবেই নতুন দিকে ধাবিত হয় মানব সভ্যতা। কোথা থেকে আসেন এমন মানুষ? তাদের এই অনন্য মানসিকতার উদ্ভব হয় কোথা থেকে?

নড়েচড়ে বসে আড়মোড়া ভাঙলেন মাস্টারসন।

মানবজাতির ইতিহাসে প্রতিবন্ধিতার ভূমিকা নিয়ে প্রফেসরের লেকচারের কথা মনে করল গ্রে। এ বিষয়ে করা তার উক্তিটিও মনে পড়ল তার।

'যদি কোনওভাবে পৃথিবী থেকে প্রতিবন্ধীতা পুরোপুরিভাবে দূর করে দেয়া যেত, তাহলে এখনও কোনও গুহার সামনে বসে আগুন পোহাতো মানুষের পূর্বপুরুষ।'

"কেন উপযুক্ত জেনেটিক বিন্যাসের জন্য অপেক্ষা করবো আমরা," জানতে চাইলেন নিকোলাস। "যখন এই অনন্য প্রতিভাদের খুঁজে বের করে সবার কল্যাণের কাজে লাগানো সম্ভব? ভেবে দেখুন, এদের থেকে নতুন প্রজন্মের কত কিছু পাওয়ার আছে। বিশেষত তাদের প্রতিভাকে যদি অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় তো!"

কথা শেষ করে ইলেনার দিকে তাকালেন নিকোলাস।

এই প্রজেক্টের অপার সম্ভাবনা বুঝতে পারল গ্রে। এটা নিছক কোনও স্পাই প্রোগ্রাম না। এই অতিমানবীয় শিশুদের সাহায্য মানব সভ্যতার হাওয়া নিজেদের পালের অনুকূলে নিতে চাচ্ছে নিকোলাসের সংগঠন। তাকে কেন এতো উচ্চপদে আসীন করা হয়েছে, এখন কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে গ্রে। পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ। এতো অসংখ্য প্রতিভার পরিচালক হিসেবে একজনকে কল্পনা করার চেষ্টা করল গ্রে।

নিজের চেহারা থেকে ভয়ের ছাপ লুকাতে পারলনা ও। "কীভাবে ভাবলেন যে...?"

"যথেষ্ট হয়েছে!" ধমকে উঠলেন নিকোলাস। "যেহেতু এখন আপনি আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানেন, সুতরাং আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছেন, সাশাকে কেন

আমাদের ফেরত পাওয়া দরকার। এই কাজের জন্য, বিশেষত আমার জন্য সে অপরিহার্য।"

তার চোখে কিছু একটা ধরতে পারল গ্রে। "আপনার তাকে কেন দরকার?"

"কেন?" কড়া দৃষ্টিতে গ্রে'র দিকে তাকাল লোকটা। "কারণ আমার কাছে ও কোনও গিনিপিগের চাইতেও বেশি, আমার মেয়ে ও।"

গ্রে'র কব্জিতে চেপে বসল ইলেনার নখ, ঝট করে নিকোলাসের দিকে ঘুরে তাকাল সে। সম্ভবত তার জন্যও খবরটা নতুন। নিকোলাস কেন গ্রে আর বাকিদের চেরনোবিলে তুলে এনেছে, সে ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ রইল না ওর মনে।

"আজকের দিনটা ফুরোনোর আগেই জানতে পারবেন আমার দৌড় কতখানি।" গ্রে'র দিকে ঝুঁকে বলে উঠলেন নিকোলাস। প্রতিজ্ঞা জ্বলজ্বল করছে তার দু'চোখে। "যেভাবেই হোক, আমার মেয়েকে আমি ফিরিয়ে আনবোই।"

সকাল ৮:২০
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

অপারেশন স্যাটার্নের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল-মেজর সাভিনা মারতোভ। তার পিছনে দাঁড়িয়ে তেল আর ধোঁয়ার গন্ধ ছড়াচ্ছে খনির ভাঙাচোরা ট্রেনটা। মাইন কমপ্লেক্স ৩৩৭-এ, রেললাইনের একশো গজ সামনেই অবস্থিত অপারেশনের স্যাটার্নের এই হেডকোয়ার্টার। আগে অবশ্য এটা একটা ইউরেনিয়ামের খনি ছিল। চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে থাকা বন্দীরা এখানেই দিনের ১৮ ঘন্টা সময় কাটাতো, কাজ করতো অন্ধকার সুড়ঙ্গে আর ধীরে ধীরে আক্রান্ত হতো বিষক্রিয়ায়।

এখন খনির ভাঙা যন্ত্রাংশ আর অপারেশন স্যাটার্নের পাথরের স্তুপ রাখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে জায়গাটা। গত পাঁচ বছরে মাইনার আর ডেমোলিশন এক্সপার্টদের ছোট একটা দল খনির বেশ কয়েকটা শাফটই ভরে ফেলেছে জঞ্জাল দিয়ে।

রেল লাইন থেকে দূরে, মানুষের তৈরি ছোট একটা গুহায় লুকিয়ে আছে অপারেশন স্যাটার্ন-এর প্রধান কন্ট্রোল রুম। হোটেলের লবি আকৃতির ঘরটা কনভেয়ার বেল্ট, হাইড্রলিক কপিকল, পানির পাম্প, হোস পাইপ ইত্যাদি মাইনিং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ছিল। যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেয়া হয়েছে যন্ত্রপাতিগুলোর বেশিরভাগ, কিছু অবশ্য ট্রেনে করে নিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে বাইরে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন সাভিনা, একটা মালবাহী বগিতে পাথর তোলা হচ্ছে। শেষবারের মতো এমসি ৩৩৭-এ চালান নিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা।

সময়সীমা অনুযায়ীই চলছে সবকিছু।

তবুও কোমরে হাত চেপে পুরো সাইটটায় একবার নজর বুলিয়ে নিয়েছেন সাভিনা। নিকোলাসের সাথে তর্কাতর্কিতে খেপে গিয়েছিলেন তিনি। নিকোলাসকে খুব ভালোভাবেই চেনেন তিনি। ও একটা মাথামোটা। শুধু আছে মাথা গরম করে উল্টাপাল্টা সিদ্ধান্ত নেয়ার তালে। সাশার ব্যাপারে জানানো উচিত হয়নি ওকে। ভাবতে পারেননি,

নিকোলাস এভাবে বোকার মতো একটা কাজ করবে। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি ওর?

হাতে এখনও দশটা ওমেগা সাবজেক্ট আছে, মস্কোতে নতুন বেস স্থাপনের জন্য পরিমাণটা যথেষ্টর চাইতেও বেশি। পৃথিবীকে তার হাতের মুঠোয় এনে দেয়ার জন্য, মানবজাতিকে নতুন রেনেসাঁর দিকে ধাবিত করার জন্য এই দশজনই যথেষ্ট। ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের পরামর্শদাতা হিসেবে একজন নয়, বরং দশজন রাসপুটিন পাবে সে। তার হয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেলতে পারবে দশজন প্রডিজি।

সেটা কী তার চোখে পড়ছে না?

একটা বাচ্চা কী তার লক্ষ্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

নিকোলাসের ছেলে পিওতরকে সহ ধরলে অবশ্য দু'জন। তবে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছেলেটার প্রতিভা-সহমর্মিতার তো কোনও ভূমিকা নেই। কেবল পথের কাঁটাই হবে ও। আর বর্তমানে হাতের কাছেও নেই ছেলেটা, পালিয়ে গিয়ে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ঝামেলা। ও হারিয়ে যাওয়ায় ক্ষতির মাত্রাটা অনেক বেশি, কিন্তু অপূরণীয় কিছু না। অবশ্য ছেলেটাকে উদ্ধারের সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, আসানভ জলাভূমিতে ওদের ধাওয়া করছিল লেফটেন্যান্ট বরসাকোভ। অন্ধকারে কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন ওখানে। তবে এখন যেহেতু সূর্য উঠে গেছে, যেকোনও মুহূর্তে ভালো খবর চলে আসতে পারে। তেমনটাই নিকোলাসকে জানিয়েছেন তিনি।

সাদা পোষাক পড়া একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এল। "আইরিসসহ বাকি সব চেক করার জন্য তৈরি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সাভিনা।

গত দুইদিন ধরে সবকিছু তৈরি করছে এখানকার কর্মীরা। আজ নিকোলাসের অপারেশনের ঠিক দুই সপ্তাহ পর তার অপারেশন শুরু করার কথা। কিন্তু ম্যাপলথোর্পেরবিশ্বাসঘাতকতার পর এগিয়ে আনা হয়েছে সময়সূচি। এখন একই দিনে ঘটবে দুটো অপারেশন।

"কোনও সমস্যা আছে?" জিজ্ঞেস করলেন সাভিনা।

"না। সব ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ। জায়গামতো স্থাপন করা হয়েছে এক্সপ্লোসিভ চার্জ। আপনার আদেশ পাওয়ামাত্রই প্রাথমিক সুড়ঙ্গের আইরিস খুলে দেব আমরা, ঘটিয়ে দেব বিস্ফোরণ।"

"খুব ভালো।"

লোকটার পিছু পিছু এগোলেন সাভিনা। পাথর খোড়ার যন্ত্রপাতিগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গুহার উপরে তাকালেন তিনি। সিলিং-এ ড্রিল করে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। সোজাসুজি উপরদিকে, লেক করাশয়ের তলের দিকে এগিয়েছে ফোকরটা। মাইলখানেক বিস্তৃত সেই সুড়ঙ্গের উপরের দিকে গেঁথে দেয়া হয়েছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এএনএফও সুপারচার্জ। এখন সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হলেই টানেলের ছাদের মোটা একটা অংশ ধ্বসে পড়বে, মাঝখানে থাকবে শুধু পাথরের পাতলা

আরেকটা স্তর। সেই স্তরেও স্থাপন করা হবে পঞ্চাশটা এক্সপ্লোসিভ চার্জ। অপারেশন শুরু হলে ফাটিয়ে দেয়া হবে সেগুলোও, সাথে সাথে ফাটল বেয়ে নেমে আসবে লেক করাশয়ের বিষাক্ত পানির ঢল। মেঝেতে লাগানো তিন মিটার চওড়া সাইলো ডোর দিয়ে নিচে নেমে যাবে স্ট্রনটিয়াম আর সিজিয়াম মিশ্রিত সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্যুপ। আইরিস আকৃতির মোটা ছয়স্তর বিশিষ্ট স্টিলের তৈরি এই দরজাটা মারমানাস্কের ন্যাভাল শিপইয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করেছেন সাভিনা। একটা লিভার টেনে খোলা আর বন্ধ করা যায় ওটা। তবে এখন আর তার কোনও দরকার নেই। খোলাই রয়েছে দরজাটা।

কন্ট্রোলরুমে পৌঁছে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন তিনি। মাথার উপরে লাগিয়ে রাখা হয়েছে বেশকিছু মনিটর। টানেলের বিভিন্ন অংশে লাগিয়ে রাখা ক্যামেরা থেকে দৃশ্যগুলো সরাসরি সম্প্রচার করছে ওগুলো।

ওয়াকিটকি মুখের সামনে ধরে কথা বলে উঠল প্রধান টেকনিশিয়ান। "আমরা তৈরি। দশ সেকেন্ড পর প্রাথমিক বিস্ফোরণ।"

"...তিন...দুই...এক...শূন্য, শুরু করো।"

গুড়ুগুড়ু শব্দে কেঁপে উঠল গোটা মাইন। ক্যামেরায় দেখা গেল, গভীর একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে টানেলের ছাদে। ধীরে ধীরে আকারে বেড়ে যাচ্ছে ওটা। কয়েক মুহূর্ত পর ধ্বসে পড়ল ছাদের একটা অংশ।

আর মাত্র একধাপ বাকি। তারপরই শুরু হবে অপারেশন স্যাটার্ন।

ইউরাল পর্বতের এই খনিগুলোর নিচ দিয়ে বেশ কয়েকটা ভূগর্ভস্ত নদী বয়ে চলেছে। আর্কটিক সাগরে উন্মুক্ত হয়েছে সেগুলো। এখন টানেলে তেজস্ক্রিয় পানির স্রোত বইয়ে দিতে পারলেই সাইলো ডোর দিয়ে সুড়ঙ্গ বেয়ে নিচের ঐসব নদীতে ছড়িয়ে পড়বে বিষাক্ত জলধারা। আর সেই সাথে বিষাক্ত করে তুলবে পুরো আর্কটিক সাগর। ক্রমেই অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে তেজস্ক্রিয়তা। কেঁপে উঠবে গোটা পৃথিবী। মরবে লাখ লাখ মানুষ।

আগুন জ্বলে উঠবে গোটা বিশ্বে।

আর সেই ছাই থেকেই ঘটবে নবজাগরণ।

ওয়ারেনে গোটা জীবন মাতৃভূমির সেবায় কাটিয়েছেন সাভিনা। বদলে কী পেয়েছেন? দুর্নীতি, দুর্যোগ, অনাচারে জর্জরিত রাশিয়া।

অনেক হয়েছে, আর নয়।

আর কেউ আটকাতে পারবে না তাদের।

খেল দেখানোর জন্য প্রস্তুত অপারেশন স্যাটার্ন।

টেকনিশিয়ানদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন তিনি। কাজে লেগে গেল লোকগুলো। টানেল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে ধ্বসে পড়া মাটি-পাথরের স্তূপ।

ঘুরে ট্রেনের দিকে এগোতে লাগলেন সাভিনা। শেষ কয়েকটা কাজ সারার জন্য চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে ফিরে যেতে হচ্ছে তাকে। মাথা নিচু করে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। আর ঘন্টাখানেকের ভেতর চেরনোবিলের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে নিকোলাস। মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কাজ করা সত্ত্বেও, সবকিছু নিজের

নিয়ন্ত্রনে রাখতে পেরেছে ও। সবকিছুরই সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। এখন অবশ্য তার আর কিছু না করলেও চলবে, আপনাআপনিই ঘটবে সব। কারও পক্ষেই আসন্ন বিপর্যয়টা ঠেকানো সম্ভব না।

এগিয়ে এসে ট্রেনে উঠে গেলেন তিনি। দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন অপারেশন স্যাটার্ন-এর কেন্দ্রের দিকে। লাখ লাখ লোক মারা যাওয়ার দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করলেন সাভিনা। ট্রেনের সামনের দিকে তাকালেন তারপর। আস্তে আস্তে গতি বাড়ছে বাহনটার, এগিয়ে যাচ্ছে চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে অবস্থিত ওয়ারেনের দিকে। এতোক্ষণে হয়তো গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে শিক্ষক আর রিসার্চাররা। প্যাক করে ফেলা হচ্ছে কম্পিউটারগুলো, জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে সব রেকর্ড। বাচ্চাগুলোকেও হয়তো তৈরি করা হয়ে গেছে, তবে উদ্ধার করার জন্য নয়। শেষ যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ওরা।

অবশ্য তার সাথে নেয়ার জন্য বাছাই করা দশজন বাদে।

সাভিনার চোখের সামনে ভেসে উঠল বাকি বাচ্চাগুলোর মুখ, শিশু-কিশোর মিলিয়ে মোট চৌষট্টি জন। সংখ্যাটা শুনতে ছোট মনে হলেও ওজনে খুবই ভারী। বেশিরভাগ বাচ্চাদেরকেই নাম আর চেহারা ধরে চেনেন তিনি। এক হাতে ট্রেনের দেয়াল আঁকড়ে ধরলেন সাভিনা। হাঁটু কাঁপছে তার, আবেগের স্রোত বয়ে যাচ্ছে গোটা শরীর বেয়ে। কষ্টের একটা দলা বুক থেকে গলা বেয়ে উঠে এল তার, চোখে কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু। কান্না থামালেন না তিনি, যেন চোখের পানির সাথে বের করে দিতে চাচ্ছেন মনের সব আবেগ।

তবে খুব অল্প সময়ের জন্য।

ধীরে ধীরে কমে আসছে ট্রেনের গতি। নিজেকে সামলে নিলেন সাভিনা, মুছে নিলেন চোখ দুটো। বড় করে কয়েকটা শ্বাস টানলেন। আর পেছন ফেরার কোনও সুযোগ নেই।

প্রয়োজন বড়ই নিষ্ঠুর।

আর এখন, নিষ্ঠুর হতে হবে তাকেও।

সকাল ৯:৩২
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

ইলেনার সাথে লিমুজিনে চড়ে বসলেন নিকোলাস। এক ঝাঁক গাড়ি বেরিয়ে গেল পলিসিয়া হোটেলের আঙিনা থেকে। রাজনীতিবিদ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার যার দেহরক্ষীরা। মাঝরাত থেকে স্যাটেলাইট এন্টেনাওয়ালা ভ্যান আর ক্যামেরা সেট করে চলেছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা সাংবাদিকরা। সূর্য ওঠার পর থেকেই এখানে হাজির হওয়া রথী-মহারথীদের ছবি তোলা আর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যাবে সবার মধ্যে।

পরবর্তী কয়েক ঘন্টা সবার চোখ আটকে থাকবে চেরনোবিলের দিকে। চিরতরে বন্ধ হতে চলেছে সেই কুখ্যাত চার নম্বর রিঅ্যাক্টর। পুরনো পারমাণবিক যুগ পেরিয়ে পৃথিবী যাবে নতুন এক ভবিষ্যতের দিকে।

তবে অনেক একটা ব্যাপার ভাবচ্ছে নিকোলাসকে।

লিমুজিনের দরজা বন্ধ হতেই ইলেনার সাথে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেলেন তিনি। মেয়েটার দিকে ঘুরে মুখ খুললেন, "আমি দুঃখিত। সাশা আর পিওতরের কথাটা আগেই তোমাকে জানানো উচিত ছিল আমার।"

ক্ষুব্ধ হয়ে হালকা মাথা নাড়লো ইলেনা। আমেরিকানদের জিজ্ঞাসাবাদের পর থেকে নিকোলাসের সাথে একটা কথাও বলেনি ও। এমনকি এখনও তাকিয়ে আছে লিমুজিনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। সাশা আর পিওতর ওর মনে একটা বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। সচরাচর মায়া-মমতার থেকে একটু বেশি-ই ভালোবাসে সে ওদের। বাচ্চাগুলোর সাথে ইলেনার একটা পারিবারিক সম্পর্কও আছে। তার বড় বোন নাতাশা-ই হচ্ছে সাশা আর পিওতরের মা, বাচ্চাগুলোকে জন্ম দেয়ার সময় মারা যায় ও।

"তুমি তো ওয়ারেনের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানোই," লিমুজিনটা রাস্তায় উঠে আসতেই আবারও বলে উঠলেন নিকোলাস। "লুকিয়ে রাখা হয় জন্মসংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো।"

শুরু থেকেই এ মূলনীতি অনুসরণ করে আসছিল ওয়ারেন। সব বাচ্চাদের বংশপরিচয়ই গোপন রাখা হত। তবে নিজেদের মধ্যে অযাচিত মিলন এড়ানোর জন্যই ভাইবোন সম্পর্কে জানানো হতো ওদের, কেবল এটুকুই। প্রজননসংক্রান্ত সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করতো বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা।

তবে নিকোলাস কোনও সাধারণ লোক ছিলেন না। প্রতিষ্ঠাতার সন্তান হিসেবে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল তার জন্য। ইয়েকাতেরিনবার্গে স্থানীয় একটি হাসপাতালে সলোকভ ছদ্মনাম নিয়ে তাকে জন্ম দেন সাভিনা। শুরু থেকেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করা হতে থাকে নিকোলাসকে। বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও দেয়া হয়।

"আমি একদিন জন্মসংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো চেক করে দেখেছিলাম," বললেন তিনি। "খোঁজ নিতে চেয়েছিলাম, আমার কোনও সন্তান আছে কিনা। তখনই জানতে পারি, সাশা ও পিওতর আমার নিজের সন্তান। কিন্তু ব্যাপারটা কাউকে বলার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল আমার।"

ইলেনার হাঁটুতে হাত রাখতে গেলেন তিনি। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন মেয়েটাকে স্পর্শ করতে। "অবশ্য, এমন প্রতিভাবান শিশুদের জন্মদানের জন্যই আমাদের মিলিত হওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন মা, যাতে এমন জেনেটিক ক্রস আবার হয়।"

তার দিকে তাকাচ্ছে না ইলেনা। নিকোলাস অবশ্য এই শীতল আচরণ কিছুটা উপভোগ-ই করছেন। স্পর্শ করতে চাচ্ছেন মেয়েটাকে, কিন্তু এখনও তাকে সেই অনুমতি দেয়নি ও।

"প্লিজ, ডার্লিং, ক্ষমা করো আমায়।"

পাত্তা দিল না ইলেনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালেন নিকোলাস।

চেরনোবিলের পারমাণবিক কেন্দ্র দেখা যাচ্ছে জানালার ওপাশে। মেইনটেইনেন্স হ্যাচওয়ালা লম্বা ভেন্টিলেশন টাওয়ারটা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। সিমেন্টের তৈরি বিশাল কাঠামোর উপর থেকে মাথা উঁচু করেছে জিনিসটা। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছিল কালো স্টিল আর কংক্রিটের এক বিশাল সমাধি। ভেজা ভেজা দেখাচ্ছে অর্ধবৃত্তাকার বিশাল ডোমটা, দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘামছে। এই স্থাপনাটিকে কেন সার্কোফ্যাগাস বা সমাধি বলা হয় তা কোনও রহস্য না। লম্বা কাঠামোটা দেখতে অনেকটা বিশালাকায় সমাধির মতোই। আর এর ভেতরের দিকেই আছে রিঅ্যাক্টর নম্বর চার-এর ধ্বংসাবশেষ।

ভেতরের ছবি দেখেছেন নিকোলাস, পুড়ে যাওয়া সিমেন্ট আর বেঁকে যাওয়া স্টিলের এক প্রামাণ্যচিত্র যেন। একটা ঘরে আছে আধপোড়া, অর্ধেক গলে গিয়ে থেমে যাওয়া একটা ঘড়ি, যাতে আজীবনের জন্য খচিত হয়ে গেছে সেই বিস্ফোরণের সময়টা। সার্কোফ্যাগাসের ভেতর জমাট বেঁধে যাওয়া দুইশ টনেরও বেশি ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়ামও আছে, ঠিক যেন শক্ত হয়ে যাওয়া লাভার স্তূপ। এই লাভা তৈরি হয়েছিল পারমাণবিক জ্বালানী, কংক্রিট আর দুই হাজার টন দাহ্য পদার্থের তেজস্ক্রিয় মিশ্রণে। দেয়ালের বাইরে সবখানেই ছড়িয়ে গিয়েছিল রিঅ্যাক্টরের বিস্ফোরিত মজ্জার অংশবিশেষ। বৃষ্টির পানি আর জ্বালানির তলানি মিলে তেজস্ক্রিয় তরলের এক পুকুর তৈরি হয়েছে ফ্যাসিলিটির নিচের অংশে।

নতুন সমাধান খোঁজা যে দরকার, এ বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই?

উত্তরটা ছিল হাতের নাগালেই।

আশ্রয়, জীবনের দিশারী, নতুন সার্কোফ্যাগাস ইত্যাদি বেশ কিছু নামেই ডাকা হয় ধনুকের আকৃতির ডোমটাকে। বিশাল হ্যাঙ্গারের মতো দেখতে জিনিসটা প্রায় সাইত্রিশ তলা উঁচু। বিশ হাজার টনের বেশি ওজনের এ ঢাকনাটা প্রায় সোয়া কিলোমিটার চওড়া আর অর্ধেক কিলোমিটার লম্বা। এটা দেখতে এতোই বড় যে প্রকৌশলীরা ধারনা করেছিলেন, ভেতরে মেঘ জমে বৃষ্টিও হতে পারে। ডোমের নিচের দিক থেকে পুরনো আবরণটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলার অপেক্ষায় ছিল ক্রেনসহ রবোটিক ট্রলি। বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে যন্ত্রপাতিগুলোকে পরিচালনা করছিল টেকনিশিয়ানরা।

অবশেষে ঘুরতে শুরু করেছে ঘটনার চাকা।

গ্রিজ মাখা ইস্পাতের চাকার উপর বসানো ছিল বিশালাকায় ঢাকনাটা আর এখন বিরাট দুটো হাইড্রলিক জ্যাকের মাধ্যমে আস্তে আস্তে লাইনের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটাকে। মানুষের হাতে তৈরি সব থেকে বড় চলন্ত স্থাপনা এটাই। আজ সকাল এগারোটার মধ্যে পুরো ধ্বংসাবশেষটা ঢাকা পড়বে সমাধির নিচে। আর সেই সাথে চিরতরে ঢাকা পড়বে রাশিয়ার সবচেয়ে নোংরা ইতিহাসগুলোর একটি। হবে নতুন এক সূচনা।

এরকম যুগান্তকারী ঘটনার শুরুটা ঠিক এমনই হওয়ার কথা। কিন্তু আফসোস, যা ভাবা হচ্ছে, আসল ঘটনা তার থেকেও অনেক বেশি গুরুতর।

সার্কোফ্যাগাসের দক্ষিণ পাশের স্ট্যান্ডের সামনে এসে থামল তাদের লিমুজিন। আমন্ত্রিত ভিআইপিরা ইতোমধ্যেই আসন গ্রহণ করেছেন। বক্তব্য শুরু হয়ে গেছে। শুরুতেই যৌথ বিবৃতি দিল যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ান প্রতিনিধি, যারা একজোট হয়েছে চেরনোবিল চিরতরে বন্ধের জন্য। পুরো ঘটনাটাই সাজানো হয়েছে বিশাল ঢাকনাটা বসানোর সময়কে কেন্দ্র করে। নিকোলাসের প্ল্যান-ও ওটাকে ঘিরেই।

এক মুহূর্তের জন্য ভয় দানা বেঁধে উঠল তার মনে। সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আততায়ীর প্রাণঘাতী গুলিটা মোকাবেলা করার মতোই। তবে আঁজ সকালে ঝুঁকির মাত্রাটা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি।

সিটে রাখা তার হাতের উপর হাত রাখল কেউ একজন, ইলেনা। এখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। বোঝাতে চাইছে, এখনো মীমাংসা হয়নি তাদের মধ্যকার ঝামেলাটার। নিকোলাসের হাতের তালুতে শক্তভাবে চেপে বসল তার নখ। বোঝাচ্ছে, পরে এ অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে তাকে।

পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসলেন নিকোলাস, আরও শক্ত হয়ে এল ইলেনার ধারালো মুঠো।

ব্যাথাটা তার মনোযোগ আরও গাঢ় করতে সাহায্য করল।

আস্তে আস্তে চেরনোবিলের উপর উঠে আসছে বিশালাকায় ঢাকনাটা।

খুব ভালো করেই জানেন, কি ঘটতে যাচ্ছে।

সকাল ১০:০৪

সেলের ভেতর পায়চারি করছিল গ্রে। এমন সময় হঠাৎ দরজায় ধপ করে ভারী কিছু আছড়ে পড়তেই লাফিয়ে উঠল ও। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল লুকা, শিরদাঁড়া টানটান করে ফেলল জিপসী সর্দার।

"এখন আবার কী?" বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কি।

লোহার বার ঘষা খাওয়ার কর্কশ শব্দের সাথে খুলে গেল দরজা।

মেঝেতে পড়ে থাকা গার্ডের পা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল একজনকে।

"তাড়াতাড়ি করুন," হাতের লাঠি নাড়িয়ে ঘোষণা করল আগন্তুক। "আমাদের বেরোতে হবে এখান থেকে।"

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না গ্রে।

ড. হেইডেন মাস্টারসন!

গ্রে এক মুহূর্ত ভাবল, লোকটার সাথে হাত মেলাবে নাকি দাবিয়ে দেবে নাকটা।

তার অভিব্যক্তি পড়তে পেরেছেন মাস্টারসন। "কমান্ডার, আমি এম.আই.সিক্স.-এর হয়ে কাজ করি।"

"ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স?"

ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন তিনি। "ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরে হবে। আমাদের যেতে হবে, এখনই।"

সবাইকে নিয়ে হলওয়ের দিকে এগোলেন মাস্টারসন। এক সেকেন্ডের জন্য থেমে পড়ে থাকা গার্ডের পিস্তলটা উঠিয়ে নিলো গ্রে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে লোকটা, ভেঙে গেছে নাক। মাস্টারসনের হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা লাঠিটা নিছক ভাব দেখানোর জন্যে না, উপলব্ধি করতে পারল ও।

এক ছুটে মাস্টারসনের পাশে চলে এল গ্রে, তার গলায় সন্দেহের সুর। "আপনি? আপনি এম.আই.সিক্স.-এর হয়ে কাজ করেন?"

অস্ফুট স্বরে পেছন থেকে বলে উঠল কোয়ালস্কি, "বুড়োকে তো জেমস বন্ড বলে মনে হচ্ছে না!"

দৌড়াতে দৌড়াতেই গ্রে'র দিকে তাকালেন মাস্টারসন। "অবসরপ্রাপ্ত এম.আই.সিক্স.।" তারপরই শ্রাগ করলেন। "অবশ্য এটাকে যদি অবসর বলা যায়।"

সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, ভাবল গ্রে। তাদের মুক্ত করার পেছনে লোকটার স্বার্থ বুঝতে পারছে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে আবারও মুখ খুললেন মাস্টারসন। "অক্সফোর্ড থেকে পাশ করার পরপরই আমাকে এম.আই.সিক্সে. নিয়োগ দেয়া হয়। আমার পোস্টিং ছিল ভারতে, যখন আফগানিস্তানকে দখল করে নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। দশ বছর আগে অবসর নিই আমি। তারপর ভালো টাকার বিনিময়ে আর্চিবাল্ডের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে পড়ে গেলাম এই ফ্যাসাদে। খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারি, এর পেছনে হাত আছে রাশিয়ানদের। তাই এম.আই.সিক্স.-এর সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টা জানাই। তখন ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি কেউ। আর্চিবাল্ডের কর্মকান্ডকে বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করেনি কেউ। সত্যি বলতে, আমারও তা মনে হয়নি। যতক্ষণ না অপহরণ করা হয় তাকে আর পরবর্তীতে লাশ পাওয়া যায় ওয়াশিংটন ডিসিতে। আমি এম.আই.সিক্স.কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আজকাল বুড়ো মানুষের কথাকে শোনে বলুন? আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। আমার সহজাত প্রবৃত্তি বলতে পারেন এটাকে। বুঝতে পেরেছিলাম, ঘটতে চলেছে বড় ধরণের কিছু একটা। এজন্য আপনাদের সবাইকে ব্যবহার করেছি আমি।"

"ব্যবহার!" বলে উঠল কোয়ালস্কি। "অ্যাবেকে মেরে ফেলেছে ওরা।"

ভুরু কুঁচকালেন মাস্টারসন। "আমি ওদের থামানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার আগেই নিজের তলোয়ারে হাত দিয়ে ফেলে আমাদের বন্ধু।" দুঃখের সাথে মাথা নাড়লেন তিনি। "অল্প বয়সীদের চঞ্চলতা।"

"দাঁড়ান!" হঠাৎ মনে পড়ল কোয়ালস্কির। "আপনি তো আমাকেও গুলি করতে যাচ্ছিলেন।"

"অভিনয় করছিলেন তিনি," তর্কে না গিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিল গ্রে।

নড করলেন মাস্টারসন। "আমাকে ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে হতো।"

"ওদের না হলেও আমাকে ঠিকই বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলেন!" যোগ করল গ্রে।

"সৌভাগ্য যে সফল হতে পেরেছিলাম আমি," বলে ওর দিকে ঘুরলেন মাস্টারসন। "আজ পৃথিবীর অর্ধেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে শুয়োরটা।"

"কী?"

পুরনো গার্ড স্টেশনের কাছের সিঁড়ির দিকে ইশারা করলেন মাস্টারসন, "নিচে আরও লোক আছে। আমাকেও আপনাদের মতোই এখানে আটকে রেখেছে ওরা। এলিজাবেথ আর ড. রোজারোকে মুক্ত করতে যাচ্ছি আমি।" গার্ড স্টেশন থেকে সামনে ইশারা করলেন তিনি। "আপনার স্বাস্থ্যবান সঙ্গীকে ধার দিন, কোনওভাবে একটা ফোন যোগাড় করে এখান থেকে ভাগবো আমরা।"

"লুকাকেও সাথে নিয়ে যান," জবাব দিল গ্রে। আসলে সে চাচ্ছিলো, যাতে কোনও ক্ষতি না হয় বেসামরিকদের। পাশাপাশি জিপসি নেতার উপস্থিতি রোজারোকে মাস্টারসনের ভূমিকা প্রমাণে সাহায্যে করবে।

তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো লুকা।

"বেশ, তার সাহায্যও আমার দরকার হবে," বললেন মাস্টারসন। একটা রাশিয়ান আর্মি ওয়কিটকি জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে গ্রে'র হাতে দিলেন তিনি। "কিন্তু এর মধ্যে-"

গ্রে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। "-সিনেটর সলোকভকে থামাতে হবে আমার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মাস্টারসন। "আপনার হাতে এক ঘন্টারও কম সময় আছে। যদিও জানি না তার পরিকল্পনা সম্পর্কে, কিন্তু এর সাথে চেরনোবিলের অনুষ্ঠানের কোনও সম্পৃক্ততা আছে অবশ্যই।"

"কী অনুষ্ঠান?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলেন মাস্টারসন, ভাঁজ খুলে গ্রে'র হাতে দিলেন ওটা। "ওরা চেরনোবিলের চার নম্বর রিঅ্যাক্টরকে চিরতরে ঢেকে দিচ্ছে, বিশাল এক স্টিলের হ্যাঙ্গারের নিচে।"

গ্রে কাগজটা দেখতে দেখতে, অনুষ্ঠানে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আর রাজনৈতিক নেতাদের নাম বলতে শুরু করলেন মাস্টারসন। দ্রুত গোটা অনুষ্ঠানের ধাপগুলোর একটা ধারণাও দিলেন তাকে। "নিকোলাসের প্ল্যান সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে কেবল নামটাই জানি, অপারেশন ইউরেনাস।"

"অপারেশন ইয়োর অ্যানাস?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি। "নাম শুনে বেশ পীড়াদায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে।"

তাকে পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো গ্রে। "সলোকভ কোথায় এখন?"

"চেরনোবিলের দিকেই গেছে।"

কোয়ালস্কিকে নিয়ে নামতে নামতে উঁচু ভেন্টিলেশন শ্যাফটটার কথা ভাবল গ্রে। ওই বেজন্মাটা যাই পরিকল্পনা করে থাকুক না কেন, তার সাথে রিঅ্যাক্টরের যোগাযোগ আছে অবশ্যই। তবে অপারেশন ইউরেনাস নামকরণের কারণটা বোধগম্য হলো না। আর্মি রেঞ্জার্সের হয়ে প্রশিক্ষণের সময় গ্রে স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস ক্লাসে নামটার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে শিখেছিল। অপারেশন ইউরেনাস ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার একটা অভিযানের নাম, যার পরিণতি ছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী একটা সংঘর্ষ-স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ।

সেই নামই কেন?

কিছু একটা খোঁচাতে লাগল গ্রে'কে, কিন্তু এখন দুশ্চিন্তা করার সময় না। আপাতত মাথা থেকে ব্যাপারটা সরিয়ে রাখল ও। সামনে জেলগ্রেট পাহারা দিচ্ছে দু'জন গার্ড। গ্রের দিকে পিছনে ফিরে আছে তারা।

চুরি করে আনা রাশিয়ান পিস্তলটা তাক করল সে।

দুশ্চিন্তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

১৭
৭ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০:০৭
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

ভোরের সূর্য পূর্ণোদ্যমে ঝলসে উঠেছে। জনহীন নগরের কাঁকর বিছানো পথ ধরে এগোচ্ছে মঙ্ক। কোমর পর্যন্ত উঠে আসা ঝোপঝাড় পেরোতে গিয়ে নদীর স্রোত কেটে এগোনোর অনুভূতি হচ্ছে ওর...সবুজরঙা এক কাল্পনিক স্রোত। কনস্টানটাইন ওর পাশেই হাঁটছে, পেছন থেকে অনুসরণ করছে পিওতর, কিস্কা আর মার্তা। তবে মার্তাকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সবুজ সাগরে ভেসে বেড়ানোর আনন্দে আনমনা হয়ে পড়েছে সে।

"এদিকের পর্বতে খুব বেশী কয়লা নেই," বড়সড় একটা হাই তুললো কনস্টানটাইন। "খনিগুলোতে ধাতু আর আকরিকের ছড়াছড়ি।"

মঙ্ক জানে, ছেলেটাকে ভেতরে ভেতরে ক্লান্তি আর আতঙ্কের এক মিশ্র অনুভূতি পেয়ে বসেছে। নিজেকে জাগিয়ে রাখতে আর ভয় তাড়াতে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে সে।

"কোবাল্ট, নিকেল, টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, বক্সাইট, প্ল্যাটিনাম..."

সেদিকে কান না দিয়ে দুপাশে বিস্তৃত শহরের দিকে তাকাল মঙ্ক। বিল্ডিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে বেশ তাড়াহুড়া করে বানানো। একচালা একটা স্কুল ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল ওরা। জানালাগুলো এখনও অক্ষত, ভেতরে কাঠের ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে সোভিয়েত আমলের কয়েকটা মরিচা ধরা ট্রাক পড়ে আছে। একমাত্র ইটের বাড়িটার বহির্ভাগেসিরিলিক হরফে কী যেন লেখা, মঙ্ক সেটা পড়তে পারল না। তবে ভেতরে সাজানো তাকগুলো দেখে মনে হলো, এককালে কোনও দোকান অথবা ডাকঘর ছিল এখানে। ঠিক তার পাশে একটা সেলুন, তাকের ওপরে থরে থরে সাজানো রয়েছে ধুলো মাখা বোতল।

এই শহরের লোকেরা যেন হঠাৎ একদিন সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে, একবারও পিছু ফিরে তাকায়নি।

এমন অদ্ভুত আচরণের কারণটা অনুমান করার প্রয়োজন নেই মঙ্কের। কর্দমাক্ত তীরের বেষ্টনীতে ঘেরা করাশয় লেক-কে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। বিষাক্ততাকে আড়াল করে রেখেছে পানির বুকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি । ব্যাগ থেকে ঝুলন্ত ব্যাজটার দিকে তাকাল মঙ্ক। ঈষৎ লালচে রঙ বদলে টকটকে রক্তিম আভা ধারণ করেছে। একটু পর পর জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে।

ওর এই সতর্কভাবটা কনস্টানটাইনের চোখ এড়ালো না। "আমাদের আর ঘন্টাখানেকের বেশী থাকা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খনিতে ঢুকে যেতে হবে।"

মাথা নাড়তে নাড়তে সামনের দিকে তাকাল মঙ্ক। খনিতে ঢোকার প্রবেশপথ ওদের থেকে আরও এক মাইল দূরে। পর্বতের গা ঘেঁষে স্টিলের ঘর আর ডেরিক দেখতে পেল ও। বড়সড় দুটো ধাতব চাকা কেন্দ্রীয় ভবনের দু'পাশে লাগানো। নীচের খননকৃত অংশ থেকে ধ্বংসাবশেষ তুলে আনার জন্য ব্যবহৃত হতো এই কাঠামো।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মঙ্ক। সামনে তিনতলা উঁচু একটা কারখানা দেখা যাচ্ছে। এখানকার সবচেয়ে উঁচু ভবনটা কাঠের গুড়ি নির্মিত, তবে ছাদটা টিনের। কালের পরিক্রমে মস আর শৈবালের আস্তরণ পড়ে সবুজ রঙ ধারণ করেছে সেটা।

কারখানার দিকে পা বাড়াতেই, কিস্কা চিৎকার করে উঠল।

মঙ্ক ঘুরে তাকাল। পিওতর থমকে দাঁড়িয়ে আছে, আতঙ্কের ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ওর বিস্ফারিত চোখে।

নিশ্বাস আঁটকে এল মঙ্কের। না..এখানে না।

ছেলেটার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরলো মার্তা, ভয়ের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। অবশ্য মঙ্কের মতো সে বুঝতে পারেনি, আপদটা কোনদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

ছুটে আসা বাঘটার কথা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠল মঙ্ক।

জাখার।

এই বিস্তৃত জলাভূমি পেরিয়ে ওদেরকে খুঁজে পাবার কথা না হিংস্র জন্তুটার। তবে বাঘ সাঁতারে পটু। স্রোতযুক্ত পানিতে অনীহা থাকলেও, শান্ত পানির ক্ষেত্রে বিশেষ অরুচি নেই ওদের। শিকারের উন্মত্ততায় হন্যে হয়ে জলাভূমি সাঁতরে পার করেছে পশুটা। তারপর আক্রমণ চালানোর অপেক্ষায় এখানে লুকিয়ে আছে। জাখারের কাছ থেকে এতোটা ধূর্ততা আশা করেনি মঙ্ক।

ঘাসপালা আর বাড়িঘরের স্তূপের আড়ালে ভালোভাবে খোঁজার চেষ্টা করল মঙ্ক। পশুটা যেকোনও স্থানে লুকিয়ে থাকতে পারে। আড়াল থেকে এক হিংস্র শ্বাপদ ওকে চোখে চোখে রাখছে, কথাটা ভাবতেই দাঁড়িয়ে গেল ওর শরীরের লোম। একদম নিরস্ত্র অবস্থায় উন্মুক্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মার্তা আর্কাডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর, ওদের একমাত্র ছোরাটাও খোয়াতে হয়েছে।

"পেছাও," ইটের বিল্ডিংয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল মঙ্ক। "আস্তে আস্তে পা চালাও। দোকানঘরের দিকে এগোতে হবে।"

অনেকগুলো জানালা থাকা সত্ত্বেও ঘরটা আশ্রয়ের জন্য নিরাপদ। নিজেদের রক্ষা করার জন্য বড় বড় তাকগুলোতে কিছু পাওয়া যেতে পারে। পিওতরকে নিজের পাশে টেনে নিলো মঙ্ক, দলবদ্ধভাবে তারা কিছুক্ষন আগে পেরোনো পথে ফিরে যেতে লাগল তারা।

পিওতরের সাথে সাথে মঙ্কও একটু পর পর পেছনে তাকাচ্ছে। ছেলেটার অনুমান শক্তির ওপর আস্থা আছে ওর। কারখানার দিকে নির্দেশ করছে ওদিকের রাস্তাটা। বড়সড় পাথরের চাই, উঁচু গাছের ডাল, সুউচ্চ পাহাড়ের খাঁজ-এসব উঁচু জায়গা বাঘের পছন্দ। এমন কোনও জায়গা, যেখানে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করে, একটা ডোরাকাটা অবয়বের দেখা মিলল। কারখানার পেছন দিকের কাছাকাছি ওপরতলার জানালার ফাঁক দিয়ে বাঘটাকে এক ঝলক দেখতে পেল মঙ্ক। সতর্ক দৃষ্টি না থাকলে চোখে পড়তো না অবশ্য। সাথে সাথে আবার ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা।

"দৌড়াও," কিস্কা আর কনস্টানটাইনকে তাড়া দিল সে। এক হ্যাঁচকায় কোলে তুলে নিল পিওতরকে।

বাচ্চারা আতঙ্কিত অবস্থায় সামনে দৌড়াতে লাগল। মঙ্ক অনুসরণ করল ওদের, মার্তা পাশেই আছে।

পেছন থেকে ভারী একটা শব্দ কানে ভেসে এল। দোকানঘরের দরজাটা খোলা, আর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। মঙ্ক মনে মনে প্রার্থনা করল, ভেতরে যেন লুকানোর কোনও জায়গা থাকে।

হঠাৎ রাইফেলের গুলির আওয়াজ ওর চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে গেল। বিস্ফোরণের দমকে ছিটকে গেল পায়ের কাছের নুড়িপাথর।

ঘাসের ওপর গড়াতে গড়াতে একপাশে ছিটকে গেল মঙ্ক, নিজের শরীরের আড়ালে পিওতরকে লুকিয়ে রেখেছে। একটা জরাজীর্ণ পুরনো ট্রাকের পেছনে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সে গড়াতেই থাকল।

রাস্তার নিম্নভাগে লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে স্নাইপার। রাশিয়ান কোনও সৈনিকের কাজ নিশ্চয়!

কনস্টান্টাইন আর কিস্কাকে দোকানঘরের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখল মঙ্ক। মার্তা ওদের পেছনেই আছে। রাইফেলের গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে একটা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল। এরিমাঝে নিরাপদে ঢুকে পড়তে পেরেছে তিনজন।

ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে থেকে আরও ঝুঁকে গেল মঙ্ক। উন্মুক্ত পথ না পেরিয়ে ওর পক্ষে দোকানঘরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

রাস্তার দিকে তাকাল ও।

বাঘের কোনও নামগন্ধ নেই। একটা ঘাসের ডগাও যেন নড়ছে না। গুলির শব্দে জাখারও ভয় পেয়েছে। ওদের মতোই তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করেছে ওকেও।

মঙ্ক হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোলো। একদিকে হিংস্র বাঘের ভয়, আরেকদিকে স্নাইপার। তবে আপদের এখানেই শেষ নয়। অন্য আরেকটা বিপদ তাড়া করে ফিরছে ওদের। শহরের ধার ঘেষে সূর্যের আলোতে ঝিলমিল করছে বিষাক্ত করাশয় লেক। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও মৃত্যুর শামিল।

রাত ১২:৩০
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ইলেক্ট্রিক অ্যালার্ম একনাগাড়ে বেজে চলেছে। সাশা'র বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ইউরি, ম্যাকব্রাইডের সামনে থেকে ওর দেহটাকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। চিৎকার চেঁচামেচি আর অ্যালার্মের উচ্চশব্দে কানে হাত দিয়ে বিছানার ওপর কুঁকড়ে আছে অতিসংবেদনশীল বাচ্চাটা। ওর দিকে এগিয়ে গেল ক্যাট, মাথায় হাত রেখে চেষ্টা করল স্বান্তনা দিতে। মেয়েটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে প্যাথলজিস্ট ম্যালকম জেনিংস আর এক প্রহরী।

ম্যাকব্রাইডের দিকে তাকালেন ইউরি। ঘরের কোনার দিকে পিঠ রেখে লোকটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। এক হাতে ওর জিম্মি ড. লিসা কামিংসের সোনালী চুল মুঠো করে ধরা, অন্যহাতে মেয়েটার গলায় ধরে রেখেছে সেলফোন-পিস্তলের নল।

একেবারে কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে গিয়েছে তারা সবাই।

এদিকে কমান্ডো বাহিনীর সাথে নীচে নেমে এসেছে ম্যাপলথোর্প। ওর তেলতেলে হাতগুলো সাশার শরীর স্পর্শ করবে, কথাটা ভাবতেই ইউরির মাথায় রক্ত উঠে গেল। কিছুতেই এমনটা হতে দেবেন না তিনি।

যন্ত্রপাতি রাখার স্টেইনলেস স্টিলের টেবিলের দিকে এগোলেন ইউরি। সাশার চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের শিশিগুলোর ভেতর থেকে একটা সিরিঞ্জ হাতে তুলে নিলেন।

"ইউরি, খবরদার!" ম্যাকব্রাইড চিৎকার করে ওকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করলেন।

ম্যাকব্রাইডকে রাশিয়ান ভাষায় জবাব দিলেন তিনি। "তুমি কিছুতেই সাশাকে হাতের নাগালে পাবে না," বলতে বলতে এক খোঁচায় সুঁইটাকে বাচ্চাটার আইভি লাইনে ঢুকিয়ে দিলেন ইউরি।

সিরিঞ্জ টেনে বের করার সময় দেখতে পেলেন, জিম্মির দিক থেকে সরিয়ে ওর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছেন ম্যাকব্রাইড। আসলে ধোঁকা দেয়ার জন্য সাধারণ স্যালাইন ভরা একটা সিরিঞ্জ তুলে নিয়েছিলেন ইউরি। তাল সামলে নিয়ে বদমাশটার দিকে লাফ দিলেন তিনি। এক মুহূর্ত দেরী না করে লোকটার পায়ের পাতায় সজোরে লাথি কষালো লিসা। তারপর মাথা দিয়ে ঠুকে দিল লোকটার মুখ।

অতর্কিত গর্জে উঠল পিস্তল। ছোট্ট ঘরটাতে বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হলো সে আওয়াজ।

কাঁধে গুলির আঘাত লাগতেই আধপাক ঘুরে গেলেন ইউরি। তারপরও ব্যাথাকে গ্রাহ্য না করে সোজা ম্যাকব্রাইডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, সরিয়ে দিলেন লিসাকে। কিছুক্ষণ আগে যন্ত্রপাতির টেবিল থেকে আরেকটা সিরিঞ্জ হাতিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সরাসরি ম্যাকব্রাইডের ঘাড়ে জুগুলার শিরা বরাবর ঢুকিয়ে দিলেন

সেটা। সিরিঞ্জের ভেতর সাশার একগাদা ওষুধের মিশ্রণ ভরা। একসাথে কেমোথেরাপিউটিক৬৬, এপিনেফ্রিন৬৭ আর স্টেরয়েডের মিশ্রণ।

একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দুজনই। ইউরির পেটে পিস্তলের বাকি গুলিগুলো চালান করে দিলেন ম্যাকব্রাইড। ইউরির মনে হলো, কানের কাছে সশব্দে তালি বাজাচ্ছে কেউ। পেটের ভেতর তীব্র ব্যাথার অনুভূতি হলো তার। গায়ের জোরে সিরিঞ্জের বাকিটা খালি করে দিলেন তিনি, শিরা বেয়ে বিষাক্ত মিশ্রণের পুরোটা পৌঁছে যেতে লাগল শত্রুর হৃৎপিণ্ডে।

চিৎকার করে উঠলেন ম্যাকব্রাইড।

লোকটাকে সাথে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ইউরিও। জানেন, ম্যাকব্রাইডের কেমন লাগছে এখন। শিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তরল আগুন, মাথার ভেতরটা অসহ্য ভারী হয়ে উঠেছে, আতঙ্কের চোটে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে সরে গেলেন ইউরি। ক্যাটকে দেখতে পেলেন তিনি, সাশাকে জড়িয়ে ধরে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছে। ঘুরিয়ে রেখেছে বাচ্চাটার মাথা।

এদিকে, খিঁচুনি শুরু হয়েছে ম্যাকব্রাইডের শরীরে। জিহ্বায় কামড় লেগে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে মুখ থেকে। শরীরটা হয়তো জীবন্ত থাকবে, কিন্তু মানসিক ভাবে আর কোনওদিন স্বাভাবিক হতে পারবেন না তিনি। ওষুধের মিশ্রণটা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে বোধ-বুদ্ধিহীন এক প্রাণিতে পরিণত করছে তাকে।

লিসার দিকে ঝুঁকে এলেন ইউরি। "আমাকে সাহায্য করুন!"

সাথে সাথে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল অনেকগুলো হাত। পেটের ওপর ক্ষতস্থানটা শক্ত করে চেপে ধরল একজন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। এগিয়ে এসে ইউরির মাথাটা নিজের কোলে রাখল ক্যাট। ততোক্ষণে কাশতে শুরু করেছেন তিনি। আরও রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। মেয়েটার দিকে সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

"সাশা...," অনেক কষ্টে মুখ খুললেন ইউরি।

"আমরা ওকে রক্ষা করব," আশ্বাস দিল ক্যাট।

মাথা নাড়লেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী। জানেন, একেবারে মন থেকেই কথা দিয়েছে মেয়েটা। "আরও..আরও রেবিয়ঙ্কা..."

চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিশক্তি-সবকিছু ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল তার। পৃথিবী জুড়ে নেমে আসছে অন্ধকার। সব ব্যাথা দূরীভূত হয়ে কেমন যেন শীতল আবহ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে চারপাশে।

আবার কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি, "চেলা...ইনস্ক..." মেঝের ওপর ঘুরতে লাগল একটা কাঁপা হাত, নিজের রক্তে দিয়ে দুটো সংখ্যা লিখলো ৮৮।

ঘন হয়ে এল আঁধার, সব আওয়াজ মিলিয়ে গেল চারপাশ থেকে। শেষ নিশ্বাসের সাথে শুধুমাত্র একটা জিনিসই রেখে যেতে পারলেন ইউরি।

আশা।

ক্যাটের হাত আঁকড়ে ধরে শেষ বারের মতো মুখ খুললেন তিনি। "সে বেঁচে আছে।"

হতবিহবল অবস্থায় ইউরির মাথা কোলে আগলে বসে রইল মেয়েটা। ঠিক শুনেছে তো? প্রাণহীন চোখদুটোর দিকে ভালো করে তাকাল সে। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন লোকটা, যেন কোনও কিছুর জন্য অনুশোচনা করতে চাইছিলেন। এমনকি রাশিয়ান ভাষাতেও কথা বলে উঠেছেন একবার। আগে নৌবাহিনির গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার সুবাদে ভাষাটা ভালোই জানা আছে ক্যাটের, কিছুটা বুঝতে পেরেছে এখন।

আরও রেবিয়ঙ্কা।

আরও শিশু।

সাশার মতো!

বিছানায় শোয়া বাচ্চাটার দিকে ঘুরে তাকাল ক্যাট। ওকে এখন পাহারা দিচ্ছেন ম্যালকম।

মেঝেতে কিছু একটা লেখার চেষ্টা করেছেন ইউরি, আপাতদৃষ্টিতে সেটা অর্থহীন। তবে একেবারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় বলা কথাটার মানে কী?

লিসার দিকে ঘুরলো ক্যাট।

রক্তমাখা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মেয়েটা। "আমার জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি," বিড়বিড় করতে করতে ইউরির বুকে হাত রাখল সে। শেষ বাক্যগুলো শুনতে পায়নি।

ওদিকে ম্যাকব্রাইডের খিঁচুনি থেমে গিয়েছে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন, তবে বুক ওঠানামা করছে এখনও।

উঠে দাঁড়াতে পারছে না ক্যাট, ঠায় বসে রইল সে। দৃষ্টি নিবদ্ধ সাশার দিকে।

ওর অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে ইউরির শেষ কথাগুলো।

'সে বেঁচে আছে।'

কথাটা শুধুমাত্র ক্যাটের উদ্দেশ্যেই বলা।

কার কথা বলেছে, ভালো করেই জানে ও। কিন্তু, তা তো অসম্ভব।

তারপরও যেন আড়ষ্টভাব অনেকটাই কেটে গেল ক্যাটের মনের ভেতর থেকে। ভারী হয়ে এল নিশ্বাস। প্রতি নিশ্বাসে যেন নতুন শক্তিতে আগুন জ্বলে উঠছে, যার প্রকোপে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সব সন্দেহ। হৃদয়ের গহীন অন্ধকারে আলোর দিশা খুঁজে পাচ্ছে একটু একটু করে। চেতনার একটা অংশ ওকে অন্ধকার তাড়াতে বাধা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে ছায়ার মাঝে লুকায়িত নিরাপত্তার। কিন্তু এই নবপ্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে কিছুতেই নিভতে দেবে না সে।

নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াল ক্যাট। মেঝে থেকে প্রহরীর বন্দুকটা উঠিয়ে নিলো। তড়িঘড়ি করে ঘরের সবার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করল এরপর, "জায়গাটা নিরাপদ

নয়। দ্রুত এখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজতে হবে... তা না হলে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আমরা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি।"

বাচ্চাটার শরীর থেকে আই.ভি. লাইন খুলে দিল লিসা। বিছানার পাশের টেবিলে রাখা রঙ করার খাতাটায় চোখে পড়ল ক্যাটের। হিজিবিজি করে একটা ছবি আঁকা, সবুজ জলাভূমিতে ভেলায় ভাসছে এক লোক।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, তবে ক্যাট এখন ব্যাপারটার সত্যতা জানে।

মঙ্ক...

বেঁচে আছে সে।

সকাল ১০:২০
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

আমেরিকান লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

লক্ষচ্যুত গুলিটাকে অভিশাপ দিল বরসাকোভ। খনি এলাকার একটা খুপরির ছায়ায় রাইফেল হাতে শুয়ে আছে সে। অস্ত্রের স্টকের সাথে ঠেকিয়ে রেখেছে গাল।

শিকারের কাছ থেকে এমন পাল্টা প্রতিক্রিয়া একেবারেই আশা করেনি সে। নিশানা ঠিক করে নেয়ার জন্য একবার পরীক্ষামূলক ভাবে গুলি ছুড়ে নেয়া দরকার ছিল। কিন্তু তাতে করে আগেই সতর্ক হয়ে যেত ওরা। কোনও প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে তাই লক্ষচ্যুত হতে হলো।

দোকানের ভেতর লুকিয়েছে দুটো বাচ্চা আর শিম্পাঞ্জিটা। আরেকটা বাচ্চাকে সাথে নিয়ে ট্রাকের পেছনে লুকিয়েছে আমেরিকান লোকটা। ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে করে পেছনে সরে এল বরসাকোভ। শুধু রাস্তাটা পার হতে পারলেই হবে, আমেরিকানটাকে আবার দৃষ্টিসীমার ভেতর পাওয়া যাবে তাহলে।

এবার আর কোনও ভুল করা যাবে না।

নিজেকে ছায়ায় আবৃত রেখে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোতে লাগল সে। আরেক মাথায় পৌঁছে একটা উল্টানো জারের পেছনে উপুড় হয়ে বসল। রাইফেল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

এখান থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ট্রাকের পেছনের জায়গাটা।

রাইফেলের গায়ে শক্ত হয়ে চেপে বসল বরসাকোভের আঙুলগুলো। একই সাথে উন্মত্ত আর বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে সে।

কেউ নেই ওখানে। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে আমেরিকান লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে যেন!

ট্রাকের ভেতর কুঁকড়ে আছে পিওতর। ওকে উঁচু করে ট্রাকের আধখোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছিল মঙ্ক। তারপর নিজে পেছনের দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝে হারিয়ে যায়। চলে যাবার আগেপিওতরকে ট্রাকের সিটের সামনের ফাঁকা জায়গায়

নিচু হয়ে বসে থাকতে বলেছে সে। বাচ্চাটা সেই কথামতো গাছের পাতা আর গুবরে পোকায় ভরা জায়গাটায় চুপচাপ বসে আছে এখন।

মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহীনে, এমনভাবে লুকিয়ে থাকার স্মৃতি আবছা আবছা মনে পড়ছে ওরঃ আতঙ্কিত, রুদ্ধশ্বাস, ধরা পড়বার ভয়! অন্য এক জীবনের কথা সেটা, ওর নিজের নয়। মরিচা পড়া স্টিলের বদলে পাথরে ঘেরা অবস্থায় আটকে থাকতে হয়েছিল তখন।

অতীত আর বর্তমান নিয়ে ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে এক ঝলক আলোর দিশা খুঁজে পেল ছেলেটা। রাতের আকাশে তারার মেলা বসেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, তারাগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে ওর চোখে, নেমে আসবে নীচের দিকে। কিন্তু, রাতের আকাশকে ও বরাবরই ভয় পেয়ে এসেছে। তাই এই মুহূর্তের কথা ভেবে সংযত করে নিলো নিজেকে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। ঠিক আগের মতোই, এই ক্ষুধাটাও ওর নিজের নয়। পিওতরের দুর্বল হৃদস্পন্দনকে ছাপিয়ে, কাছেই কোথাও একটা বড়সড় হৃৎপিণ্ড যেন উচ্চনিনাদে স্পন্দন করে যাচ্ছে। অদ্ভুত কিছু অনুভূতির অস্তিত্ব টের পেল পিওতরঃ ভেজা ঘাসের গন্ধ, বাতাসে তাজা রক্তের ফিসফিসানি, পায়ের নিচে নুড়িপাথরের অস্তিত্ব। নিজের ছোট্ট বুকের অনুপাতে অনেক বড়সড় একটা শ্বাস নিলো সে। শিকারের গন্ধ আঁচ করতে পারছে সেই বড় হৃদয়টা।

নতুন একটা গন্ধ পাচ্ছে এখন। আরেকজন শিকারী এসে হাজির হয়েছে ওদের মাঝে।

তবে ঝাঁঝালো গন্ধের চাইতেও বেশী কিছু একটা আছে এই গন্ধের মাঝে। অনুভূতিহীন করে দেয়া নিদারুণ যন্ত্রণার স্মৃতি বয়ে আনছে গন্ধটা।

মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত অনুভূত হলো ওর, আতঙ্কের আগুন পুড়িয়ে দিল ক্ষুধার অনুভূতিকে।

আরও জড়সড় হয়ে বসল পিওতর। গম্ভীর অথচ তীব্র হৃৎস্পন্দনটা আস্তে আস্তে আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

রাস্তার ধার ঘেঁষা বিল্ডিংগুলোর পেছন দিকে চলে গেল মঙ্ক, এগোতে লাগল নিচের সড়কের দিকে। তড়িঘড়ি করে পিছলে বেরোতে গিয়ে বুকে আর পিঠে ঘষা লেগেছে, জ্বালাপোড়া করছে সেখানে। পিওতরকে ট্রাকে রেখে এসেছে। আপাতত বাঘের হাত থেকে নিরাপদ-তবে স্নাইপারের কবল থেকে নয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাচ্চাটার কাছ থেকে অস্ত্রধারীকে দূরে সরিয়ে দেয়া। যাতে করে লোকটা ওর পেছনে ধাওয়া করতে শুরু করে, আর সেই ফাঁকে বিল্ডিং-এর ধ্বংসস্তূপের ভেতর হারিয়ে যাবে মঙ্ক।

বিল্ডিংয়ের ধার ঘেঁষে নিচু হয়ে দৌড়াতে লাগল সে। একেবারে শেষের বিল্ডিং পার করে, প্রধান সড়কের মাথায় পা দিল। যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে পেরেছে কী?

দম আটকে রেখে কোনা থেকে একবার ভালোভাবে দেখে নিলো রাস্তাটাকে। ইটের দোকানঘর, মরিচা পড়া ট্রাক, ঘাসে ঢাকা পায়ে চলা পথ-সবকিছু স্থির হয়ে আছে। হঠাৎ এক পশলা বাতাস এসে ঘাসের ডগায় কাঁপন জাগিয়ে গেল।

সবকিছু আগের মতোই আছে, শুধু স্নাইপারের কোনও চিহ্ন নেই।

লোকটা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের খুঁজতে বেড়িয়েছে। স্নাইপার যদি একটা বাচ্চাকেও জিম্মি করতে পারে, তবে মঙ্ক আর পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। যে করেই হোক, বিভ্রান্ত করতে হবে ওকে। নুড়িপাথরের ওপর পা ঘষলে অনেক জোরে শব্দ হবার কথা।

বড় একটা শ্বাস নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল মঙ্ক। নুড়িপাথরের মেঝেতে পায়ের ঘষায় কর্কশ আওয়াজ তুলে চিৎকার করে উঠল, "দৌড়াও!" একই সাথে হাত তুলে নির্দেশনা দিল কাল্পনিক কোনও শিশুর উদ্দেশ্যে। "দৌড়াতে থাকো। থামলে চলবে না।"

স্নাইপার ভাবুক, বাচ্চাগুলো ওর সাথে...

-ক্র্যাক-

একটা গুলি এসে আঘাত করল মঙ্কের উরুতে। বাম পা'টা অবশ হয়ে গেল সাথে সাথে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়তো আরেকটু হলেই, হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনওমতে সামলে নিলো। পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে হাতের তালুর চামড়া ছিলে গিয়েছে। রাস্তায় গড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে সরিয়ে নিলো নিজেকে। শিসের মতো শব্দ করে ওর মাথার সামান্য ওপর দিয়ে ছুটে গেল আরেকটা গুলি।

মাটির সাথে লেপ্টে শুয়ে রইল মঙ্ক। ঘাসের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, উঠে দাঁড়িয়েছে অস্ত্রধারী। সড়কের আরেক পাশে লুকিয়ে ছিল লোকটা, ইটের দোকানঘরে যাওয়ার মাঝামাঝি দূরত্বে। রাইফেল কাঁধে সরাসরি মঙ্কের দিকে নিশানা করল সে।

ওর গতিপথ আগেই বুঝতে পেরেছিল সৈনিক। লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছিল যাতে সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তবে আজ ওর সাথে শিকারে নেমেছে আরেকজন।

রাস্তার পঞ্চাশ গজ সামনে থেকে সরাসরি সৈনিকের দিকে ছুটে এল আরেক শিকারি, যেন পানির ভেতর ছুটে চলেছে টর্পেডো।

নির্বিকার মুখে থাকলেও, অদ্ভুত এক প্রশান্তি হচ্ছে বরসাকোভের মনে। আমেরিকান লোকটাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধরাশায়ী করতে পেরেছে ও। অনেক বোঝাপড়া বাকি রয়ে গিয়েছিল। এয়ারবোটে ওর লোকদের মৃত্যুর মূল্য এখনই কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নেয়া যাবে। ভুগিয়ে ভুগিয়ে মারবে ওকেঃ একটা বুলেট হাঁটুর ভেতর, পরেরটা কাঁধে..

এক পা সামনে এগোতেই পেছন থেকে কেমন যেন একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল বরসাকোভ। ঘাসের ডগায় শোঁশোঁ শব্দ হচ্ছে।

না, বাতাসের শব্দ নয় ওটা।

সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে কী হতে পারে জিনিসটা।

সাথে সাথে পেছনে ঘুরলো ও। কোনওদিকে লক্ষ্যস্থির না করে গুলি ছুড়তে শুরু করল এলোপাতাড়ি। স্বয়ংক্রিয় রাইফেল গর্জে উঠেছে, চারদিকে গুলির বৃষ্টি। সবকিছু উপেক্ষা করে ঘাসের আড়াল থেকে ভেসে এল ক্রোধ মিশ্রিত পাশবিক চিৎকার। পরক্ষণেই এক লাফে সরাসরি বরসাকোভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাখার।

গুলি চালিয়েই যাচ্ছে ও। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে শুরু করেছে হিংস্র পশুটার ডোরাকাটা পশমের চাদর থেকে। তবে বরসাকোভ জানে, কোনওভাবেই আর থামানো যাবে না এই নরখাদক-কে।

আতঙ্ক আর ক্লেশ, প্রতিশোধ আর ক্ষুধা, লালসা আর দৃঢ়সংকল্প-সবকিছুর মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটছে প্রাণিটার।

আতঙ্কে বরসাকোভের গলা চিরে কান ফাটানো আর্তনাদ বেরিয়ে এল। অকৃত্তিম আর আদিম প্রবৃত্তিজাত হাহাকার সেই আর্তনাদে।

সব দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামলো বাঘটা, লুটিয়ে পড়ল বরসাকোভ নিজেও।

মঙ্ক ওপরে উঠে দেখতে পেল, সৈনিকের কী হাল করেছে বাঘটা। নেকড়ের দলের ওপর গতকাল ভালুকের ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল ওর। হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ কানে এল, তারপরই থেমে গেল লোকটার বুকফাটা আর্তনাদ। সৈনিকের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে, রক্তে ভেসে গিয়েছে চারদিক।

বাঘের দিকে তাকিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল মঙ্ক। বাম পায়ে যেন আগুন জ্বলছে, রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে ক্ষত থেকে।

জাখারের আটশ পাউন্ডের ভারী শরীরের নীচে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বরসাকোভের শরীর। হাতের অস্ত্রটা দূরে ছিটকে পড়েছে, মঙ্ক আর বাঘের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে ওটা। মঙ্ক ভাবল, রাইফেলটা হাতে না পেলে এই হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে বাঘটা ওর দিকে তাকিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে শুরু করেছে, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। মঙ্ক বুঝতে পারল, নিজের ভাইয়ের হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছে প্রানিটা। সৈনিকের লাশ পেছনে ফেলে রেখে গুটি গুটি পায়ে সামনে এগোতে শুরু করল বাঘটা। বুক আর কোমর থেকে রক্ত ঝরে অস্পষ্ট করে দিয়েছে পশমের উপরের ডোরা। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে এখনও বেঁচে আছে এই হিংস্র শ্বাপদ।

অস্ত্রের কাছাকাছি পৌঁছে, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হাতের নাগালে ওটা ধরার চেষ্টা করল মঙ্ক। এক হাতে অস্ত্রটা বাগে পাওয়া বেশ দুরুহ কাজ। স্ট্র্যাপ টেনে ধরে রাইফেলটা কাছে এনে ট্রিগার খোঁজার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল সে।

এরকম চলতে থাকলে সময়মতো করা যাবে না কাজটা।

জাখার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, চোখেমুখে হিংস্রতার ছাপ...

এমন সময় রাস্তার আরেক পাশ থেকে আরেকটা হিংস্র গর্জন প্রতিধ্বনিত হলো। খুব বেশী জোরে নয়, তবে তাতে আতঙ্ক আর ক্রোধের ছাপ সুস্পষ্ট। মঙ্ক চিনতে পারল, গতরাতেই শুনেছে এই আওয়াজ।

জাখারের ভাই, আর্কাডি'র মৃত্যু ক্রন্দন।

ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে লাফিয়ে উঠল জাখার, হাঁটতে শুরু করল উল্টো পথে। এখনও কিছুটা ফোঁসফোঁস শব্দ করছে, তবে আতঙ্কের চেয়ে তাতে বিভ্রান্তির সুর বেশী।

এই সুযোগে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলো মঙ্ক।

ওদিকে, হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের খোঁজে দিশেহারা হয়ে উঠেছে জাখার। কোনওদিকে না তাকিয়ে এগোনো শুরু করেছে আনমনে।

কানের পেছনে আটকানো স্টিলের টুকরোটার দিকে আন্দাজে নিশানা ঠিক করে নিলো মঙ্ক, চেপে ধরল ট্রিগার। কানে তালা লেগে গেল গুলির শব্দে।

একবার কেঁপে উঠল বাঘটা, নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এক মুহূর্ত পর।

প্রাণিটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মঙ্ক। মাথার খুলির একেবারে গোড়ায় লক্ষ্যভেদ করেছে খুলিটা। এতোক্ষণে নিজের ক্ষতস্থানের দিকে তাকানোর সুযোগ পেল ও। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল, সৈনিকের গুলির আঘাতে অগভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে উরুতে। তবে কপাল ভালো, গুলিটা শুধু ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে।

জীবনটা বাঁচলো তাহলে!

কয়েকবার লম্বা শ্বাস নিলো মঙ্ক, তারপর উঠে দাঁড়াল।

রাস্তার ওপাড়ে কনস্টানটাইন আর কিস্কা-কে দেখা যাচ্ছে। জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য কিস্কা'র কাছে কৃতজ্ঞ মঙ্ক। বাচ্চাটা অবিকল নিখুঁতভাবে আর্কাডির গর্জন অনুকরণ করেছে, উচ্চস্বরে বিবর্ধন ঘটিয়েছে টিনের পাকানো শিটের সাহায্যে। জিনিসটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলল কনস্টানটাইন।

দোকানঘর থেকে বেরিয়ে ট্রাকের দিকে ছুটল মার্তা। পিওতরকে বের করে নিয়ে আবারও যাত্রা শুরু করবে ওরা। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ওপরে খনি এলাকার দিকে তাকাল মঙ্ক। অনেক দূর যেতে হবে এখনও, তবে তার আগে একটা কাজ এখনও বাকি। জাখারের মৃতদেহের কাছে গিয়ে প্রানিটার রক্তমাখা কাঁধে হাত রাখল মঙ্ক। মনে মনে ওর আত্মার শান্তি কামনা করল। জীবদ্দশায় কখনও সুখের দেখা পায়নি পশুটা।

"যা ব্যাটা...ফিরে যা তোর ভাইয়ের কাছে।"

রাত ১২:৪৩
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ফাঁকা হলওয়ে থেকে দৌড়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছালেন পেইন্টার। অ্যালার্মের সাথে সাথে বাজতে শুরু করেছে প্রোটোকল আলফা সাইরেন। জরুরী নির্গমন পথের সবকটিই ভূগর্ভস্থ পার্কিং গ্যারেজে এসে থেমেছে। ম্যাপলথোর্পের লোকেরা যে বেরোনোর রাস্তায় পাহারা বসিয়ে রেখেছে, এ ব্যাপারে পেইন্টারের মনে কোনও সন্দেহ নেই। বাচ্চাটাকে কিছুতেই পালাতে দেবে না ওরা। কিন্তু জিম্মীরা ছাড়া হেডকোয়ার্টারের বাকি লোকগুলো অন্তত এই মুহূর্তে বের হয়ে যাওয়া দরকার।

ফেইল-সেফ প্রোগ্রামটা চালু করার পর সেন্টার কমান্ডের কমিউনিকেশন নেস্ট-এর সামনে থেমেছিলেন তিনি। বাইরার সাথে সব ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাপলথোর্পের লোকেরা, কিন্তু ভেতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও চালু আছে। বিল্ডিং-এর উপরের তলার কয়েকটা ক্যামেরায় দেখা গেল-এক ডজনেরও বেশি কর্মচারীকে জিম্মী করেছে সৈনিকরা। প্লাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে রেখেছে সবার হাত।

পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ হতে পারতো। এই সময়টায়, সিগমাতে কর্মীর সংখ্যা কিছুটা কম। অবশ্য বর্তমানে যা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই ব্যবস্থাই করেছেন পেইন্টার। কাজ শেষ করে আসন্ন বিপদের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। একটানে খুলে ফেললেন সিঁড়ির দিকের দরজাটা, আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেতো ক্যাটের গায়ে।

সাশাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

ক্যাটের পেছনে ম্যালকম জেনিংস সহ আরেকজন প্রহরীকে দেখা যাচ্ছে।

"কী? কীভাবে?" চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

ম্যালকমের পেছন থেকে দ্রুত সরে এল লিসা। রক্তমাখা শরীর নিয়ে পেইন্টারের দিকে এগোল ও। প্রথম দর্শনে ভয়ে কেঁপে উঠলেও পেইন্টার বুঝতে পারলেন, মেয়েটার শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। কথা না বলে প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল লিসা। স্বস্তি ফিরে এল পেইন্টারের মনে। পরক্ষণেই আবার আলাদা হয়ে গেল তারা।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

কোনওরকম বাহুল্য না করে সংক্ষেপে সবকিছু বলে গেল ক্যাট। "পালাতে যাচ্ছি আমরা," বলে কথা শেষ করল।

"সাশাকে সাথে নিয়ে কিছুতেই বেরোতে পারবে না। সবগুলো পথেই পাহারা বসানো আছে।"

"তাহলে কী করবো এখন?" জিজ্ঞেস করল লিসা।

পেইন্টার ঘড়ি দেখলেন। "আসলে, নিজে থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছো তোমরা।" পেছন দিকে নির্দেশ করলেন তিনি। "সাশাকে নিয়ে জিমের লকার রুমে চলে যাও, লুকিয়ে থাকো ওখানে... সবাই।"

"আপনি কী করবেন?" জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

লিসার গালে চুমু খেয়ে দরজার দিকে ঘুরে গেলেন পেইন্টার। বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "একটা কাজ এখনও বাকি-শেষ করেই যোগ দিচ্ছি তোমাদের সাথে।"

"সাবধানে থেকো," বলে উঠল লিসা।

ক্যাট পেছন থেকে ডাকলো তাকে। "ডিরেক্টর! মঙ্ক বেঁচে আছে!"

থমকে গেলেন পেইন্টার। পিছনে ঘুরতে ঘুরতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কী বলল ক্যাট? ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবার মতো সময় এখন নেই, পরে দেখা যাবে। হলওয়ে ধরে দৌড়াতে শুরু করলেন তিনি। ফিরে গেলেন আগের জায়গায়, কমিউনিকেশন নেস্ট-এ। নাকে এসে ধাক্কা মারলো হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ, আস্তে আস্তে পুরো সেন্ট্রাল কমান্ডে ছড়িয়ে পড়ছে বিশেষ একটা গ্যাস।

ফেইল-সেফ প্রোগ্রামের প্রথম ধাপ এটা। দাহ্য একটা গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে ভেন্টিলেশন সিস্টেম দিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট লাগেজিনিসটা পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়তে। কয়েকঘন্টা শ্বাস প্রশ্বাস নিলেও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না গ্যাসটা। কিন্তু তার কোনও দরকার নেই আর। দশ মিনিট পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে, জ্বলে উঠবে দাহ্য গ্যাস। আক্ষরিক অর্থেই, আগুনের একটা ঝড় বয়ে যাবে গোটা সেন্ট্রাল কমান্ড জুড়ে। কয়েক সেকেন্ড পর চালু হয়ে যাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি ছিটানো শুরু হবে সিলিং-এ বসানো নল থেকে।

কমিউনিকেশন নেস্ট-এর দেয়ালে সারি করে ঝোলানো মনিটরগুলোর উপর চোখ বুলালেন পেইন্টার। আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক তলার সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে।

ভালোভাবে খুঁজতে লাগলেন তিনি। অবশেষে দেখতে পেলেন কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য। একটা মনিটরে দেখা যাচ্ছে, শেন ম্যাকনাইটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাপলথোর্প। শেনের পিঠে একটা পিস্তল ধরে রেখেছে শুয়োরটা। তাদের পেছনের দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করেছে অস্ত্রধারী সৈনিকরা।

ক্যামেরার অডিও বাটনে চাপ দিলেন পেইন্টার।

"-পাগলামি," শেনের গলা শোনা গেল। "আকাশ-কুসুম কল্পনা পুরোটাই। একটা গোটা এজেন্সিকে এভাবে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারবেন আপনি? আর তারপর আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে কর্তৃপক্ষ?"

"এমনটা আগেও করেছি আমি," গর্জে উঠলেন ম্যাপলথোর্প।

"বাঁচতে পারবেন না আপনি। ইতিমধ্যে মারা গেছে দু'জন।"

"এই ব্যাপার! একটু আগেই তো বললাম, এমনটা আগেও করেছি আমি। দেশে, বিদেশে সবখানেই।"

ওদের কথোপকথনে বাদ সাধলেন পেইন্টার, হাতে তুলে নিলেন মাইক্রোফোন। "ম্যাপলথোর্প!" স্পিকারের সাহায্যে আওয়াজটা পৌঁছে গেল যথাযথ স্থানে।

লাফিয়ে উঠল লোকটা, তবে পিস্তলটা ঠিকমতোই ধরে রেখেছে। চারপাশে খুঁজে অবশেষে দেয়ালে লাগানো ক্যামেরাটা দেখতে পেল। আবারও আত্মবিশ্বাস ফিরে এল চোখেমুখে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক চিলতে ক্রূর হাসি। "ওহ, ডিরেক্টর সাহেব! এখনও লেজ গুটিয়ে ভাগেননি দেখছি। খুব ভালো। তাহলে চলুন, হিসাবটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেয়া যাক। মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিন, কারও শরীরে একটা আঁচড়ও পড়বে না আর।"

"তোমার লোকদের ঘোল খাইয়ে দিতে পেরেছি আমরা, ম্যাপলথোর্প। এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাচ্চাটাকে, যেখানে তোমরা কিছুতেই পৌঁছাতে পারবে না।"

"তাই নাকি?" ভ্রূ কুঁচকালেন ম্যাপলথোর্প। "সিগমার ফেইল-সেফ প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছেন দেখছি আপনি।"

আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। এই গোপন ব্যাপারটাও জানে সে! অবশ্য শেন আগেই বলেছিলেন, ওর হাত বেশ লম্বা।

ম্যাপলথোর্পের কথায় সম্বিত ফিরল তার। "আর এটাও বেশ বুঝতে পারছি, ফেইল-সেফ এর সময়সীমাও একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন আপনি। প্রোগ্রামটা থামাবার কোড অবশ্য হাতে পাইনি, তবে তার কোনও দরকার আছে কী? আপনার বিশজন লোককে জিম্মি করেছি আমি। এখন আমাকে থামাতে গিয়ে ওদের জীবন, ওদের পরিবারের ভবিষ্যতের বলিদান দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি-"

কথা শেষ না করে পিস্তলটা শেনের মাথার পেছনে চেপে ধরলেন ম্যাপলথোর্প।

"-আপনার মতো এতোটা সদয় নই।"

বাক্যটা শেষ করে ট্রিগার টেপে দিলেন তিনি। স্পিকারে ভেসে এল গুলির বিকট আওয়াজ। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লেন শেন, তারপর লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।

গুলির আওয়াজে দম আটকে এল পেইন্টারের। বিশ্বাস হচ্ছে না এইমাত্র চোখের সামনে ঘটতে দেখা ব্যাপারটা। এক মুহূর্তের জন্য পুরো ঘটনাটা স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। এই তো, এখুনি আবার উঠে দাঁড়াবেন শেন। কিন্তু পরক্ষণেই ঘোর কেটে গেল তার, উপলব্ধি করতে পারলেন বাস্তবতা। লোকটার আস্পর্ধা আর নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি।

ম্যাপলথোর্পের কণ্ঠ শোনা গেল আবারও। "মেয়েটাকে নিতে আসছি, ডিরেক্টর। পারলে আটকান আমাকে।"

১৮
৭ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০:৩৮
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

রাশিয়ান জ্যাকেটের উপর বেল্টটা শক্ত করে বাঁধলো গ্রে। তারপর বেঁধে নিলো জুতোর ফিতা। কোয়ালস্কি তার দিকে ফারের একটা ক্যাপ এগিয়ে দিতেই মাথায় পরে নিলো টুপিটা। একেবারে খাপে খাপ মিলে গেছে ছদ্মবেশ। চুরি করা ইউনিফর্মটা গ্রে'র গায়ে ভালোমতো ফিট হলেও কোয়ালস্কিকে দেখে মনে হচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে কাপড়ের বাঁধন ফেটে বেরিয়ে আসবে তার বিশালবপু শরীর। চুরি করে আনা ইউনিফর্মের মালিক-দুই রাশিয়ান সৈন্য এখন শুধু আন্ডারওয়্যার পরে শুয়ে আছে জেলখানার ভেতর। ভোজবাজির মতো সামনে উদয় হওয়া গ্রে আর কোয়ালস্কিকে দেখে তারা নড়ে উঠার আগেই হাতের কাজ সেরে ফেলেছে দু'জন। তারই পুরস্কার হিসেবে, বিন্দুমাত্র দাগ ফেলা ছাড়াই পাওয়া গেছে ইউনিফর্মজোড়া। সেই সাথে কপালে দুটো অস্ত্রও জুটেছে-রাশিয়ান এ.এন-৯৪ মডেলের অ্যাসল্ট রাইফেল।

"চলো," বলে সামনে থাকা মোটরসাইকেলের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে।

আইএমজেড ইউরাল মডেলের মোটরসাইকেলটার পাশে আটকানো সাইডকারে চড়ে বসল কোয়ালস্কি। "আহা! একসময় কতই না শখ ছিল এগুলোতে চড়ার।"

হাতে থাকা রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিল গ্রে, তারপর উঠে পড়ল বাইকে। স্টার্ট দিয়ে পুরনো জেলখানার প্রাঙ্গণ ছেড়ে উঠে এল প্রাইপিয়াটের এবড়োখেবড়ো রাস্তায়।

হ্যান্ডেলবার ধরে রাখার একফাঁকে হাতঘড়ির দিকে নজর দিল গ্রে। আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি।

গিয়ার পাল্টাতেই বেড়ে গেল বাইকের গতি। প্রতিটা বাঁক ঘোরার সাথে সাথে উন্মোচিত হতে থাকলো শহরের ধ্বংসস্তুপ। ফেটে চৌচির হয়ে আছে কংক্রিটের রাস্তা, জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যানবাহনের কঙ্কাল। বাড়ির ভেঙে পড়া কাঠামো বেয়ে উঠে যাচ্ছে লতানো আগাছা। হ্যাজার্ড চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে।

রিঅ্যাক্টরের ভেন্টিলেশন টাওয়ারের দিকে বাইকের নাক তাক করল গ্রে। ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে কানে ভেসে আসছে জমায়েত হওয়া লোকজনের কোলাহল। মাস্টারসনের বক্তব্য অনুযায়ী, সিনেটর নিকোলাস সলোকভ কুটিল কোনও চক্রান্ত এঁটেছে ওই রিঅ্যাক্টরটা ঢেকে ফেলা অনুষ্ঠানকে ঘিরে।

তবে প্ল্যানটা কী?

অপারেশন ইউরেনাস-ই বা কী?

ভাবতে ভাবতে রিঅ্যাক্টরের আরও কাছে চলে এল ওরা। এখানে রাস্তার হাল তুলনামূলক ভালো। রাস্তার একপ্বাশে চেরনোবিল কমপ্লেক্স নজরে পড়ল গ্রে'র। সেই সাথে দাঁড়িয়ে আছে স্টিলের বিশাল একটা হ্যাঙ্গার।

নড়ছে বিশালাকায় কাঠামোটা!

পুরো কমপ্লেক্স ধূসর রঙের কংক্রিটে তৈরি হলেও একপাশের পুড়ে যাওয়া, কালো রঙের কংক্রিট সাক্ষী দিচ্ছে- এই সেই কুখ্যাত চার নম্বর রিঅ্যাক্টর। সূর্যালোক প্রতিফলিত হচ্ছে চকচকে স্টিলের গায়ে। আস্তে আস্তে গোটা রিঅ্যাক্টরকে ঢেকে ফেলছে ঢাকনাটা। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনা বিভীষিকাকে গিলে নিচ্ছে একপাশ খোলা অর্ধবৃত্তাকার কফিন।

আরও কাছে এগিয়ে আসতেই বেশ কিছু সম্ভাবনা খেলা করতে লাগল গ্রে'র মাথায়। আর্চিবাল্ড পোক এখান থেকেই তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। নিকোলাস যা ই প্ল্যান করে থাকুক, নিশ্চয়ই ওটা রিঅ্যাক্টর সংক্রান্ত কিছু হবে।

মাস্টারসন বলেছিলেন, বিশ্বের তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকায় গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের নিরাপত্তা স্বাভাবিকভাবেই খুব কড়াকড়ি হবে। রিঅ্যাক্টর থেকে পৌনে এক মাইল দূরে অবস্থিত গ্র্যান্ডস্ট্যাণ্ডটা। গ্রে বুঝতে পারছে না, কোনদিকে যাবে। রিঅ্যাক্টরের দিকে, নাকি গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে? রিঅ্যাক্টরের ব্যাপারে তার ধারণা ভুলও হতে পারে। এমনও হতে পারে., আসল বিপদ গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডেই। হয়তো বোমা পেতে রাখা হয়েছে মঞ্চের কোথাও।

প্রাইপিয়াট আর চেরনোবিলের মাঝের খোলা অংশটুকু পার হওয়ার সময় গ্রে'র কানে বিশেষ একটা কণ্ঠ ভেসে এল। নতুন বিশ্বে তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছে ওটার মালিক। গ্রে পরিষ্কার চিনতে পারল কণ্ঠটা। হোয়াইট হাউজে আগেও এই বক্তব্য শুনেছে সে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

সাথে সাথে পরবর্তী করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেল গ্রে। প্রেসিডেন্টকে সবসময় ছায়ার মতো অনুসরণ করে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা। তারা অবশ্যই অনুষ্ঠান শুরুর আগে গোটা মঞ্চ একাধিকবার তল্লাশি করেছে। পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে প্রেসিডেন্টকে কোথাও যেতে দেয় না তারা। পাশাপাশি রিঅ্যাক্টরের দিকেও হয়তো লোক লাগানো আছে। তবে স্বভাবতই, প্রেসিডেন্টের থাকার জায়গাকে বেশি গুরুত্ব দেবে সিক্রেট সার্ভিস।

স্ট্যান্ডের আশেপাশে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর দিকে নজর দিল গ্রে। গোটা মঞ্চটাকে ঘিরে রেখেছে সারি সারি নিরাপত্তাকর্মী। তারা কিছুতেই ওকে ধারেকাছে ঘেঁসতে দেবে না। তাছাড়া ওর কাছে অনুষ্ঠানের পাস বা নিজের আইডি কার্ড, কোনওটাই নেই।

ততোক্ষণে নিজের লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে যাচ্ছে স্টিলের কফিনটা। বিশাল হাইড্রোলিক ক্রেনে ভর করে চার নম্বর রিঅ্যাক্টরের সামনে পৌঁছে গেছে ওটা।

বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা করে ফেলছে কুখ্যাত কাঠামোটাকে। আকারে এতোই বড় যে, মাটিতে দাঁড়িয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিও হ্যাঙ্গারের ছাদের নাগাল পাবে না।

বিশাল কাঠামোর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল কোয়ালস্কি। "আমরা যদি..."

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল গ্রে। প্রেসিডেন্টের গলা ছাপিয়ে আরেকটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। প্রথমে রাশিয়ান, আর তারপর ইংরেজি ভাষায় আগত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে নতুন কণ্ঠের মালিক- সিনেটর নিকোলাস সলোকভ।

গমগম করছে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কণ্ঠ। "এই যে আমরা, রাশিয়ান ইতিহাসের অন্যতম একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের স্বান্তনা দিচ্ছি। যেন কখনও ঘটেনি কিছুই, এটা শুধুই একটা ইস্পাতের টুকরো। কিন্তু একবার কী ভেবেছেন, দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া সেই লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের কথা? কখনও ভেবেছেন ক্যান্সার আর লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষগুলোর কথা? ভেবেছেন বিকলাঙ্গ নিষ্পাপ শিশুগুলোর কথা? কী হবে তাদের? কে কথা বলবে তাদের হয়ে? কে শুনবে তাদের ফরিয়াদ?"

স্ট্যান্ডের আরও কাছে পৌঁছে গেল গ্রে। এখন বোঝা যাচ্ছে দাড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর ক্ষুদ্র অবয়ব। তবে কষ্ট করার দরকার নেই, জায়ান্ট স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেখানে ঘটতে থাকা ঘটনাপ্রবাহ। স্ট্যান্ডের দুইপাশে আলাদা আলাদা মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমেরিকার আর রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট। আর একেবারে মাঝে আরেকটা মঞ্চের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছেন সিনেটর নিকোলাস সলোকভ। গার্ডরা চাইছে অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য দান থেকে তাকে বিরত রাখতে, স্টেজ থেকে নামিয়ে দিতে। কিন্তু আরেকদল ভক্ত গার্ডদের আটকানোর চেষ্টা করছে, যেন নিজের ভাষণ শেষ করতে পারেন নিকোলাস।

অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ঘিরে রেখেছে কালো স্যুট পরা তার বডিগার্ডরা।

কাজ শুরু করে দিয়েছে নিকোলাসের প্ল্যান, ভাবল গ্রে। তারপর গিয়ার পাল্টে মুচড়ে ধরল থ্রটল, গর্জে উঠে স্ট্যান্ডের দিকে এগোনো শুরু করল বাইকটা।

বলে চলেছেন নিকোলাস, "আপনারা ভাবছেন, সুন্দর একটা ঢাকনা লাগিয়ে দিলেই কাহিনী শেষ...কিন্তু না! ইতিমধ্যে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র পশু। এখন যত ভারী তালা লাগান, যতই পাহারা দিন, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। এর একমাত্র সমাধান হতে পারে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো। অনাগত ভবিষ্যতকে রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা। তা না করে কী করছি আমরা? এই লোক দেখানো অনুষ্ঠান...সম্মেলন। লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের। লজ্জা..."

অবশেষে নিকোলাসের কাছে পৌঁছে গেল গার্ডরা। হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো মাইক্রোফোন, স্টেজ থেকে নামিয়ে আনা হলো তাকে।

ক্ষমা চেয়ে আবারও বক্তব্য শুরু করলেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও সমর্থন দিলেন তাকে। তুচ্ছ কোনও রাজনীতিবিদের আপত্তিতে কান দিয়ে এরকম একটা অনুষ্ঠান ব্যর্থ হতে দেয়া উচিত না কখনওই।

তাদের পেছনে, আস্তে আস্তে চার নম্বর রিঅ্যাক্টরের উপর নেমে আসতে লাগল অন্ধকার।

বাইকের গতি কমিয়ে দিল গ্রে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে-স্ট্যান্ডের দিকে যাবে নাকি রিঅ্যাক্টরের দিকে। নিকোলাসের বক্তব্য, মঞ্চ থেকে নাটকীয় প্রস্থান, সবই লক্ষ্য করেছে সে। নিকোলাসের চরিত্রের সাথে এরকম বোকামি মানায় না। একটাই রহস্য থাকতে পারে এর পেছনে-পুরোটাই সাজানো ব্যাপার। কোনও কারণে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দূরে চলে যাওয়া দরকার তার। সেজন্যই এতো নাটক। যারা তাকে স্টেজ থেকে নামিয়েছে অবশ্যই সবাই তারই লোক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্ল্যানটা কী?

এমন সময় দাঁড়িয়ে থাকা টিভি ভ্যানের ভিড়ের ভেতর থেকে একটা সবুজ রঙের আর্মি জিপ বেরিয়ে এল। স্ট্যান্ড এরিয়া থেকে রিঅ্যাক্টর কমপ্লেক্সের দিকে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে চলল গাড়িটা। স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে পেছনে সিটে বসে থাকা ব্যক্তির দিকে নজর পড়ল গ্রে'র।

নিকোলাস।

চমকের রেশ কাটতে না কাটতেই পথের বাঁক ঘুরে কমপ্লেক্সের দিকে চলে গেল জিপ। ঢাকনাটার দিকে তাকাল গ্রে। আর প্রায় পনেরো মিনিট পরেই রিঅ্যাক্টরটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে বিশাল হ্যাঙ্গার। তার ঠিক এক মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড। এখন রিঅ্যাক্টরের দিকে কেন যাচ্ছে লোকটা?

যদি না...

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে গ্রে'র।

বাইকের মুখ রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিল ও। গিয়ার পাল্টে মুচড়ে ধরল থ্রটল, লাফিয়ে সামনে বাড়লো বাইকটা। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠল কোয়ালস্কি। "পিয়ার্স...কোথায় যাচ্ছো?"

"প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে।"

"কিন্তু অনুষ্ঠানের মঞ্চ তো ওদিকে," বলে উল্টোদিকে ইশারা করল বিশালদেহি লোকটা।

তাকে অগ্রাহ্য করে গতি আরও বাড়িয়ে দিল গ্রে। খোলা এলাকা জুড়ে যেন উড়ে চলল বাইক। পেছনে উড়তে লাগল ধুলো আর মরা ঘাসপাতা।

ওদের থেকে প্রায় চারশো গজ সামনে আছে জিপ। আর কয়েক মহূর্ত পরই সোজা রাস্তা পেরিয়ে শেষমাথায় বাঁকের সামনে পৌঁছে যাবে ওটা। জিপের আরোহীরাও ততোক্ষণে দেখে ফেলেছে ওদের। তবে রাশিয়ান ইউনিফর্ম পরে থাকায় খুব সম্ভবত চিনতে পারেনি এখনও।

ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে, "কোয়ালস্কি!"

"কী?"

"বাঁক ঘোরার আগেই জিপের একটা টায়ার উড়িয়ে দিতে পারবে?"

"এই চলন্ত অবস্থায়? মাথা ঠিক আছে তো তোমার?" বাইকের আওয়াজের চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে আপত্তি জানাল কোয়ালস্কি।

"দাঁড়াও," বলে ব্রেক কষলো গ্রে। গতির তীব্রতায় রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে গেল বাইকটা। "চালাও গুলি।"

ততোক্ষণে রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে কোয়ালস্কি। অস্ত্রের সাথে ওকে বিড়বিড় করতে শুনলো গ্রে। "সোনামণি... ভেলকি দেখাও।"

সরাসরি সামনে, বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে জিপ। গতি না কমিয়ে বাঁক নিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ড্রাইভার।

সাইডকার থেকে দু'বার পপ-পপ আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে। সাথে সাথে ভারসাম্য হারালো জিপটা। পেছনের বামপাশের টায়ার থেকে ধোঁয়া উড়ছে, এদিক সেদিক ছিটকে যাচ্ছে রাবারের টুকরো। তাল সামলাতে না পেরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কংক্রিটের পিলারে গিয়ে আঘাত হানলো গাড়িটা। ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ কানে এল।

উল্লসিত হয়ে রাইফেলে চাপড় বসালো কোয়ালস্কি। "সাবাশ ব্যাটা!"

সাথে সাথে আবারও থ্রটল খুলে দিল গ্রে। গর্জে উঠে সামনে বাড়লো বাইক।

পিলারে ধাক্কা লাগায় তৎক্ষণাৎ পটল তুলেছে জিপের ড্রাইভার। বাকি তিন আরোহী কোনওমতে বেরিয়ে কংক্রিটের ফ্রেমের পেছনে আড়াল নিলো। সামনে এগোতে এগোতে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে ভেসে আসা করতালির শব্দ শুনতে পেল গ্রে। আশুসমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে গোটা অনুষ্ঠান।

এমন সময় কোলাহল ছাপিয়ে কানে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। ফেটে গেল বাইকের সামনের চাকা, তবে ভারসাম্য হারালো না গ্রে। একেবারে জিপের পেছনে পৌঁছে স্কিড করে থাএল।

বাইক থামার সাথে সাথে লাফিয়ে নামলো দু'জনই, গাড়ির পেছনে আড়াল নিলো। সামনের দিক থেকে আরও গুলি ধেয়ে আসছে। মাথা নিচু করে সামনের দিকে তাকাল গ্রে। স্যুট পরা একটা অবয়ব দৌড়ে যাচ্ছে রাস্তা ধরে।

কংক্রিটের রাস্তা ধরে ছুটে চলেছেন নিকোলাস সলোকভ। তিনশো গজ দূরত্ব গাড়িতে এলেও বাকি পথটুকুর জন্য পায়ের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে তাকে। গুলি করে লোকটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল গ্রে। তবে মাথা উঁচু করতেই ঠং করে একটা গুলি এসে আঘাত করল বাম্পারে, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তপ্ত সীসার টুকরোটা। গুলিটা চালিয়েছে লম্বা কালো চুলওয়ালা একটা কাঠামো।

ইলেনা।

গালি দিয়ে পেছনে সরে এল গ্রে।

কোয়ালস্কিও অস্ফুটস্বরে কিছু একটা বলে উঠল।

আরেকজন সৈন্যকে সাথে নিয়ে তাদের আটকে রাখার চেষ্টা করছে মেয়েটা।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে।

দশ মিনিট।

পেছনে গুলির আওয়াজ শুনে ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন নিকোলাস। কিন্তু গাড়িটা কংক্রিটে ধাক্কা খাওয়ার সময় তার বাম হাঁটু মচকে যাওয়ায় খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। এখন ইলেনার উপরই ভরসা, তাকে আড়াল দেবে মেয়েটা।

স্টিলের কাঠামোর পেছনদিকে হাইড্রোলিক কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করছে শ্রমিকরা। ক্রেনের উপর ভর করে মিনিটে এক ফুট করে সামনে বাড়ছে বিশাল হ্যাঙ্গারটা। হ্যাঙ্গারের গায়ে একটা গ্যারেজের দরজা আকৃতির সার্ভিস হ্যাচ। হ্যাঙ্গারের অন্যপাশে থাকা সীসায় মোড়া আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে হলে, এই দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে ভেতরে। এই কারণেই মূলত গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে পালিয়েছেন নিকোলাস। অপারেশন ইউরেনাস চলাকালীন, বাইরে থেকে মরতে চান না।

মচকানো পা নিয়ে হাচড়ে-পাঁচড়ে এগিয়ে চললেন তিনি। ঢাকনাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরোতে হবে।

এখন আর পেছনে ফেরার কোনও পথ নেই। কোনওভাবেই বন্ধ করা যাবে না অপারেশন ইউরেনাস।

যা করণীয় তা হচ্ছে, পালিয়ে গিয়ে নিজের গা বাঁচানো।

উনিশশো নিরানব্বই সালে যখন এই রিঅ্যাক্টরটা পুরোপুরিভাবে ঢেকে ফেলার প্রস্তাব করা হয়, তখনই পরিকল্পনা করা হয় অপারেশন ইউরেনাসের। প্রকৌশলীরা বারবার সতর্ক করছিলেন, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে চার নম্বর রিঅ্যাক্টর। আর তাহলে, আবারও নতুনভাবে দেখা দিত বিভীষিকা। দুইশো টন তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম বর্জ্য ছড়িয়ে পড়তো আশেপাশের পরিবেশে। জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল রিঅ্যাক্টরকে ঢেকে রাখা আগের কংক্রিটের আবরণ। জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হওয়ার পাশাপাশি ফেটেও গিয়েছিল কিছু স্থানে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রথমে ঠেকানো হবে আগের আবরণের ক্ষয়ে যাওয়া। ওই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, ছিদ্রগুলো যথাসম্ভব বন্ধ করা হয়। পাশে অবলম্বনের জন্য দাঁড় করানো হয় কংক্রিট পিলার। সেই সাথে, শুরু করা হয় এই বিশাল অর্ধবৃত্তাকার স্টিল কফিনের নির্মাণকাজ।

নির্মাণকাজ শেষ হতে খুব একটা দেরি হয়নি। তবে এরপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় পুরো রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে দুর্নীতি। বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় প্রজেক্টটা ঘিরে।

নতুন তৈরি করা পিলারগুলোর ভেতর চারটা কনকাশন[৩] চার্জ স্থাপন করা হয়। তারপর থেকে গতকাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করছিল বিস্ফোরকগুলো, একটা নির্দিষ্ট সিগন্যালের অপেক্ষায়। অবশেষে গতকাল রাতে নিকোলাসের লোকেরা সক্রিয় করে তুলেছে সেগুলোকে। বিস্ফোরন ঘটার একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তারা।

ঢাকনাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক দু'মিনিট আগে খুবই কম শব্দ করে বিস্ফোরিত হবে ওগুলো। কারও কানেই ধরা পড়বে না সেই ক্ষুদ্র আওয়াজ।

বিস্ফোরণের ফলে ধ্বসে পড়বে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে মুখ করে থাকা কংক্রিটের **দেয়াল**। আর ঢাকনা পুরোপুরি বন্ধ হতে হতে প্রাণঘাতী মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের প্রতিটা লোক। তৎক্ষণাৎ কোনও ক্ষতি হবে না যদিও, এমনকি কেউ কিছু অনুভবও করবে না। তবে তাদের আছু নেমে আসবে মাত্র কয়েক সপ্তাহে।

তারপরের কিছু দিনের ব্যবধানে নেতা হারাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিটা দেশ। সবগুলো দেশের সরকার ব্যবস্থাকে টালমাটাল করে দেবে ব্যাপারটা।

আর তারপর চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-তে তার মায়ের অপারেশনের ফলে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিউক্লিয়ার বর্জ্য। ঘনিয়ে আসবে দুর্যোগ। বিশ্বের সেই ক্রান্তিকালে, ঠিক তখনই উত্থান ঘটবে এমন এক নেতার, সে নিজের গোটা জীবন ব্যয় করেছে তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে। সবাই মুখ তুলে তাকাবে তার দিকে, অপারেশন ইউরেনাস এর কবল থেকে বেঁচে ফিরে আসা একমাত্র লোক-সিনেটর নিকোলাস সলোকভের দিকে।

পরবর্তী কয়েক মাসে, বিশেষ প্রতিভাধারী বাচ্চাগুলোর সাহায্যে অসীম ক্ষমতা আর বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন নিকোলাস। হাল ধরবেন রাশিয়ার, আর ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতার প্রভাব ছড়িয়ে দেবেন গোটা বিশ্বে। নবজাগরণের কাণ্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন নিজেকে। তেজস্ক্রিয় ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে নতুন পৃথিবী।

এই স্বপ্নটাই এখন শক্তি যোগাচ্ছে তাকে।

হ্যাঙ্গারের দরজাটার মুখে কাজ করতে থাকা দু'জন শ্রমিককে পেরিয়ে এলেন তিনি। তারপর পকেট থেকে বের করলেন পিস্তল। মাথার পেছনে বুলেট নিয়ে লুটিয়ে পড়ল দু'জনই। তার কাজের কোনও সাক্ষী থাকা চলবে না।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগলেন নিকোলাস। স্টিলের কফিনের দেয়াল প্রায় বারো মিটার চওড়া, সেই সাথে দরজাটাও। বেশ কয়েক সেকেন্ড চলে গেল ভেতরে ঢুকতে।

ভেতরে ঢুকে উপরের দিকে তাকালেন নিকোলাস। বিশালতার কি আশ্চর্য নমুনা! প্রায় একশো মিটার উঁচুতে অবস্থিত হ্যাঙ্গারটার ছাদ, প্রশস্তে তারও আড়াইগুণ। আকাশে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা তারার মতো ছাদের লাগিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কিছু ফ্লোরোসেন্ট বাতি। সেই সাথে হলুদ রঙের গোলকধাঁধার মতো কিছু ক্রেন-ল্যাইনও আটকানো আছে দেয়ালের ভেতরদিকে। লাইন ধরে অপেক্ষা করছে হাইড্রোলিক ক্রেন, রিঅ্যাক্টরের পুরনো কংক্রিটের আবরণ ভেঙে ফেলা হবে এগুলো দিয়েই।

সার্ভিস হ্যাচ বন্ধ করার লাল রঙের বাটনটা টিপে দিলেন নিকোলাস। ধীরে ধীরে উপর থেকে নেমে আসতে লাগল দরজার পাল্লা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাঙ্গারের অন্যপাশে সীসায় মোড়া একটা কন্ট্রোল বুথ আছে। ওখান থেকে ভেতরের ক্রেনগুলোও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কফিনটা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগেই অন্যপাশের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ওই বুথে আশ্রয় নেবে নিকোলাস আর ইলেনা। বিস্ফোরকগুলো যে

দিকে স্থাপন করা, তার উল্টোদিকে অবস্থিত হওয়ায় বিস্ফোরণ বা তেজস্ক্রিয়তা কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তাদের।

এখন যেভাবেই হোক, ওই বুথে পৌঁছাতে হবে নিকোলাসকে। তবে হ্যাঙ্গারের বাইরে আটকে আছে ইলেনা, মেয়েটাকে তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাতে হবে তার। তেজস্ক্রিয়তার গতিপথ গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে সরাসরি মুখ করা হলেও, আশেপাশে কিছুটা এলাকাতেও তার প্রভাব পড়বে। প্রাণঘাতী না হলেও, সুস্থ-সবল বাচ্চা জন্মদানের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ইলেনার।

তাই অন্তত নিজের বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য হলেও, মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে নিকোলাসের। তাছাড়া ইলেনার জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে তার মনে। তার মা যদিও কখনও এসব আবেগকে প্রশ্রয় দেন না, কিন্তু নিজের মনের দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব না নিকোলাসের পক্ষে।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে সার্ভিস হ্যাচের পাল্লা। সামনে বাড়লেন নিকোলাস।

"ইলেনা," জিপের পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে। "আমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে তোমার।"

কোনও জবাব এল না।

"পিয়ার্স, এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা তোমার শোভা পায় না," পাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। তার কাঁধে আঁচড় কেটে গেছে ইলেনার বুলেট, রক্ত গড়াচ্ছে সেখান থেকে। "ও একটা পাগল মেয়ে। তবে ভাবতে অবাক লাগে, পাগলরা এতো সুন্দর নিশানা কীভাবে করে!"

"আমার মনে হয় না ও পাগল," অস্ফুটে বলল গ্রে।

সাশা যে নিকোলাসের মেয়ে, কথাটা জানার পর ইলেনার মুখভঙ্গি মনে পড়ল গ্রে'র। অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সেই সাথে চেহারায় খেলে গিয়েছিল এক চিলতে আশার আলো। সাশা আর ইলেনার মাঝে আলাদা কোনও সম্পর্ক না থেকেই পারে না।

গ্রেপ্রার্থনা করল, তার ধারণা যেন সঠিক হয়।

"আমার কাছে এসেছিল সাশা," আবারও চেঁচিয়ে উঠল ও। "এখানে আসার পথ সাশাই দেখিয়েছে আমাদের, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও না কোনও কারণ আছে।"

নীরবতা ভেঙে কোমল একটা কণ্ঠ ভেসে এল- ইলেনা, "কীভাবে? কীভাবে সাশা এখানকার পথ দেখালো তোমাদের?"

গ্রে-কে বাজিয়ে দেখতে চাইছে মেয়েটা।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস টানলো গ্রে। তারপর হাতের রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে।

"পিয়ার্স...," গুঙিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "যদি ভেবে থাকো আমিও তোমার মতো অস্ত্র ফেলে দেব, তাহলে তুমিও ওর মতোই পাগল।"

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

সাথে সাথে ইলেনার সাথে থাকা রাশিয়ান সৈন্যও ফেলে দিল হাতের অস্ত্র। লোকটার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল ইলেনা, তার সামনে থাকতে বলছে ওকে। যেন গুলি ওর গায়ে না লাগে। তারপর সামনে এগিয়ে এল দু'পক্ষই। সাশার ব্যাপারে আরও জানতে চায় মেয়েটা।

মুখ খুললো গ্রে। "সাশা কীভাবে আমাদের পথ দেখালো? ছবি এঁকে। প্রথমে সে জিপসীদের নিয়ে আসে আমার কাছে। তারপর তাজমহলের ছবি এঁকে আমাদের ভারতে যাওয়ার ইঙ্গিত করে। ওখানেই তোমাদের আসল শিকড় সম্পর্কে জানতে পারি আমরা। নিজেকেই প্রশ্ন কর তো, সাশা কেন করল এগুলো? ওর মতো প্রতিভাধর মেয়ের পক্ষে বিনা কারণে এসব করার তো কোনও মানে নেই, তাই না?"

জবাব দিল না ইলেনা। শীতল, কালো চোখদুটো দিয়ে একদৃষ্টিতে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে রইল সে।

মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে বলে চললে গ্রে। "কেন আমাদের ভারতে পাঠালো ও? কেনই বা আমাদের টেনে আনা হলো গোটা ব্যাপারটার ভেতর? আজ আমরা এখানে কেন? সবগুলো প্রশ্নের জবাব একটাই হতে পারে। সচেতন বা অবচেতন মনে- যাই হোক না কেন, সাশার উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই- তোমরা যা-ই করছো এখানে, তা আটকানো... তোমাদের থামানো।"

চুপ করে রইল ইলেনা। তবে এখনও গ্রে'কে গুলি না করায় বোঝা যাচ্ছে, কথাগুলো মনে গাঁথছে ওর।

"তোমাদের অতীত অনুসন্ধান করতে আমাদের পাঠিয়েছে সে- সেই ডেলফির ওরাকল থেকে বর্তমান জিপসী পর্যন্ত। আমার মনে হয়, তোমাদের এই বংশধারা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে গুঢ় কোনও রহস্য আছে। হয়তো অসম্পূর্ণ কোনও ভবিষৎবাণীকে সফল করার জন্যই ঘটছে সবকিছু।"

"কোন ভবিষ্যৎবাণী?" জিজ্ঞেস করল ইলেনা।

স্বীকৃতি আর ভয়, মেয়েটার চোখে পালাক্রমে দুটো অনুভূতি খেলা করতে দেখল গ্রে। ভারতের গিরিখাতে, সেই গ্রীক মন্দিরের ভেতর খোদাই করা মোজাইকের দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। সর্বশেষ মোজাইকে একটা দৃশ্য ছিল-ওম্ফালোসের ছিদ্র বেয়ে ওঠা ধোঁয়ায় ভাসছিল একটা অবয়ব। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লো গ্রে। সংক্ষেপে বর্ণনা করল দৃশ্যগুলো, আর কথা শেষ করল বাক্যটা দিয়ে। "অবয়বটা দেখতে ছিল, আগুনের চোখওয়ালা একটা ছেলের মতো।"

ইলেনার পিস্তলধরা হাতটা কাঁপতে লাগল। তবে তাই বলে, গ্রে'র বুক থেকে নিশানা সরে যায়নি। তাকে পিটার এর মতো একটা নাম উচ্চারণ করতে শুনলো গ্রে।

"পিটার কে?"

"পিওতর," সংশোধন করে দিল ইলেনা। "সাশার ভাই। প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙতো ওর। বলতো, ওর চোখে নাকি আগুন জ্বলছে। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?" তাড়া দিল গ্রে। সময় বয়ে চলেছে।

"ও যখন জেগে উঠতো, এক মুহূর্তের জন্য আমরা দেখতে পেতাম, ছেলেটার গায়ে জ্বলজ্বল করছে আগুনের আভা।" মাথা নাড়লো ইলেনা। "তবে ওর প্রতিভা ছিল সহানুভূতি বিষয়ক। অন্যদের মন পড়তে পারতো পিওতর। অতিমাত্রায় ক্ষমতাশীল ছিল ও। আমরা ভাবতাম, স্বপ্নটা হয়তো ওর প্রতিভারই বিচ্ছুরণ। সহানুভূতির একটা প্রতিরূপ।"

"এটা পিওতরের প্রতিভার প্রতিরূপ না," বুঝতে পেরেছে গ্রে। "একেবারে শুরুর প্রতিরূপ এটা, সেই ওরাকলের সময়কার।"

কিন্তু এর শেষ কোথায়?

ইলেনার দিকে তাকাল গ্রে। "যা ই ঘটতে চলেছে, সাশা চাইতো না ঘটনাটা ঘটুক। তুমিও ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে এটা হতে দিতে পারো না ইলেনা। আমাদের এখানে পাঠিয়েছে ও। যদি সাশা চাইতো, নিকোলাসের প্ল্যান সফল হোক, তাহলে অন্তত চুপ থাকতো মেয়েটা। এখন সিদ্ধান্ত তোমার হাতে-সাশার ইচ্ছার দাম দেবে? নাকি ব্যর্থ করে দেবে ওর সকল প্রচেষ্টা?"

এক মুহূর্ত ভাবল ইলেনা, তারপরই শক্ত করে ফেলল চোখমুখ। পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। বুলেট ঢুকল সোজা রাশিয়ান সৈন্যের মাথায়। লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

এতেই যা বোঝার বুঝে ফেলেছে গ্রে। "অপারেশন ইউরেনাস বন্ধ করার উপায় কী?"

"পারবে না তুমি," জবাব দিল ইলেনা। কাঁপছে মেয়েটার কণ্ঠ।

গ্রে'র হাতে নিজের পিস্তলটা ধরিয়ে দিল ও, তারপর সামনে এগোনোর ইঙ্গিত করল। মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। অপারেশন ইউরেনাস বন্ধ করার উপায় ইলেনার জানা না থাকলেও নিকোলাসের জানা আছে অবশ্যই।

"তাড়াতাড়ি চলো, তোমাকে...তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি। একটা পথ খোলা আছে এখনও," বলে পেছনে কমপ্লেক্সের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। ওদিকেই গিয়েছিল নিকোলাস।

মোটরসাইকেলের সিকে ইশারা করল গ্রে। সামনের টায়ার ফাটা হলেও পায়ে হাঁটার চেয়ে দ্রুত এগোবে ওটা। "কোয়ালস্কি, সাহায্য করো ওকে।"

"কিন্তু আমাকে গুলি করেছে ও!"

তর্ক করার সময় বা ইচ্ছা, এখন কোনওটাই নেই গ্রে'র হাতে। কোয়ালস্কি আর ইলেনা মোটরসাইকেলের দিকে যাওয়া শুরু করতেই কংক্রিটের ফ্রেমের দিকে এগোলো ও। বিশালাকায় স্টিলের কফিনের গায়ে একটা দরজা আছে, এদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে নিকোলাসকে। দ্রুত পা চালালো গ্রে, বন্ধ হয়ে আসছে দরজাটা।

আর মাত্র ছয় মিনিট বাকি।

জেল থেকে তো পালাতে পেরেছে, এখন?

রোজারোর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে এলিজাবেথ। লাঠিতে ভর দিয়ে ওর পাশে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মাস্টারসন। এক হাত ধরে বৃদ্ধ লোকটাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে সে। সবার পেছনে পিস্তল হাতে ছুটছে লুকা হার্ন।

তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল, কোনওভাবে একটা ফোন যোগাড় করে হেডকোয়ার্টারে খবর দেয়া। তবে ভাঙাচোরা বিল্ডিং, জায়গায় জায়গায় আগাছার দঙ্গলভরা এই মৃত শহরে ফোন মিলবে কোথায়!

"পরের বাঁকটা," লাঠি উঁচু করে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টারসন। "বাম দিকে। পলিসিয়া হোটেলটা পরের ব্লকের মাথায়ই থাকার কথা।"

মাস্টারসনই তাদের জানিয়েছেন হোটেলের ব্যাপারে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য নতুন সাজে সাজানো হয়েছে পুরনো হোটেলটাকে।

কিন্তু তারা তো সেখানে অবাঞ্চিত অতিথি।

এলিজাবেথ চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, একটা মোটরসাইকেল নিয়ে ছুটে চলেছে গ্রে আর কোয়ালস্কি। তারা যেন থামাতে পারে নিকোলাসকে, প্রার্থনা করল ও। বাকিদের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটে চললেও ভয় আর দুশ্চিন্তা বেশ ভালোভাবেই জেঁকে বসেছে এলিজাবেথের মনে।

"আমি দুঃখিত, এলিজাবেথ," দৌড়ানোর ফাঁকে বলে উঠলেন মাস্টারসন।

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল ও। বুঝতে পেরেছে, কোন ব্যাপারে মাফ চাইছেন তিনি।

"আমি আসলেই বুঝতে পারিনি, এতোটা বিপদে ছিলেন তোমার বাবা। গোটা ব্যাপারটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের অংশ ভেবেছিলাম আমি। মনে করেছিলাম, রাশিয়ানরা হয়তো তার কাজের তথ্য চুরি করতে আগ্রহী। ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রফেসরের আগের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারছে এলিজাবেথ, সেই সাথে বর্তমান পরিস্থিতিও মাথায় খেলা করছে তার। কিন্তু তারপরও, লোকটাকে ক্ষমা করতে সায় দিচ্ছে না মন। তার বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য না, ওদের সবাইকে এই ফ্যাসাদে টেনে আনার জন্যও না। আসলে তার বাবা আর এই লোকটার ক্রমাগত লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছে এলিজাবেথ।

বাঁকের সামনে পৌঁছাতেই দু'জন রাশিয়ান সৈন্য উদয় হলো। ওদের দেখার সাথে সাথে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বুট দিয়ে পিষে ফেলল একজন। অন্যজন ততোক্ষণে হাতের রাইফেল উঁচু করে ফেলেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে রাশিয়ান ভাষায় খেঁকিয়ে উঠল রাইফেলধারী।

"কাক তেবিয়া যাভুত?" *"কারা তোমরা?"*

"আমাকে সামলাতে দাও," বলে আগে বাড়লেন মাস্টারসন। সেই সাথে লুকা আর রোজারোকে ইশারা করলেন হাতের অস্ত্র নামিয়ে ফেলতে।

"দোবরায়ে উতরো," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রফেসর। কথাটা বুঝতে পারল এলিজাবেথ- লন্ডন টাইমস। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে পার পেতে চাইছেন মাস্টারসন।

সৈন্য দুজনও তাদের হাতের অস্ত্র নিচু করল। "তোমরা ইংরেজ?" ভাষা বদলে ইংরেজী হয়ে গেছে এবার।

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর। "চমৎকার ইংরেজী বলেন তো আপনি। আমরা আসলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। পলিসিয়া হোটেলটা কোনদিকে, বলতে পারেন?"

একজনের ভ্রূ কুঁচকানো দেখে বোঝা গেল, কথাটা তার মাথায় ঢোকেনি। তবে বাকি কথা না বুঝলেও হোটেলের নামটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে রাইফেলধারী। "পলিসিয়া গোসতিনেতসা?"

"ডা! এই তো কাজ হয়েছে। দয়া করে আমাদের ওখানে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দেবেন কী?"

হড়বড় করে নিজেদের ভেতর রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে লাগল সৈন্য দু'জন। কয়েক মুহূর্ত পর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শ্রাগ করল একজন, আরেকজন মাথা নেড়ে সায় দিল। রাজি হয়েছে সে।

তখনই পেছনদিকে শোরগোল শোনা গেল। জেল গেট থেকে লাল নীল আলোর স্ফূলিঙ্গ তুলে বেরিয়ে এল একটা বাইক। রাশিয়ান ভাষায় তাদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল আরোহীরা। ধরা পড়ে গেছে ওরা।

থমকে গেল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্য দু'জন।

"বিপদ," চিৎকার করে উঠলেন মাস্টারসনও, এলিজাবেথকে ঠেলে দিলেন সামনে। "দৌড়াও।"

তবে বাকি সবার আগে নড়ে উঠল রোজারো। একপায়ে ভর করে ঘুরে দাঁড়াল সে, প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি চালালো সামনে থাকা সৈন্যের মুখে। নাকের হাড় ভাঙার বিশ্রী আওয়াজ হতেই লুটিয়ে পড়ল লোকটা, আর নড়াচড়া কোনও লক্ষণ দেখা গেল না তার শরীরে। বিহ্বলভাব কাটিয়ে রাইফেল উঁচু করল অন্যজন। তবে তার আগেই পিস্তলের ট্রিগারে নিজের ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে লুকার আঙুল। কাঁধে জোড়ালো ঘুসির মতো আঘাতে ঘুরে গেল রাইফেলধারী। তবে ততোক্ষণে ট্রিগারে আঙুল বসিয়ে দিয়েছে সে ও। অটোমেটিক মোডে থাকা রাইফেল থেকে একঝাঁক গুলি ছুটে এল তাদের দিকে। ঝাঁপিয়ে এলিজাবেথের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন মাস্টারসন। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলেন মেয়েটাকে, তারপর দুজনেই গড়িয়ে পড়লেন রাস্তায়। ততোক্ষণে শুয়ে পড়েছে লুকা আর রোজারোও। জিপসী সর্দারের হাতের পিস্তলটা আরেকবার কেশে উঠতেই রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ থেমে গেল।

এলিজাবেথের উপর থেকে সরে গেলেন মাস্টারসন। কংক্রিটের ভাঙাচোরা রাস্তা লাল হয়ে উঠতে লাগল তার রক্তে।

"হেইডেন!"

প্রায় নিস্তেজভঙ্গিতে এলিজাবেথকে ঠেলা দিলেন প্রফেসর। "যাও!"

কাছে চলে আসছে রাশিয়ান মোটরসাইকেল।

টেনে এলিজাবেথকে দাঁড় করালো রোজারো।

আরোহীদের দিকে দু'টো গুলি পাঠালো লুকা। জবাবে আগুনের ঝলক দেখা গেল সাইডকারে বসা সৈন্যের রাইফেলের মাজলেও। তাদের পায়ের কাছে কংক্রিটে মাথা গুঁজলো লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

"আমি দুঃখিত, এলিজাবেথ, পারলে ক্ষমা করে দিও আমায়," কোনওরকমে বলে উঠলেন মাস্টারসন, রক্ত গড়াচ্ছে ঠোঁটের কোণা বেয়ে।

"হেইডেন...," একহাতে নিজের মুখ চাপা দিল এলিজাবেথ। লোকটাকে মাফ করে দিয়েছে সে। তবে কী বলবে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন মাস্টারসন। সম্মতির ভঙ্গিতে আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি। তারপর বন্ধ করে ফেললেন চোখের পাতা, মুচকি হাসি হেলে গেল রক্তাক্ত ঠোঁটে। "যাও..."

এলিজাবেথের হাত ধরে টেনে বাঁকের দিকে নিয়ে চলল রোজারো। পেছন থেকে বাইকের উদ্দেশ্যে গুলি করতে করতে তাদের কভার দিতে লাগল লুকা। হঠাৎ খট করে তার পিস্তলের স্লাইড খুলে গেল, গুলি শেষ হয়ে গেছে।

এদিক থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবারও গর্জে উঠে সামনে বাড়লো রাশিয়ান মোটরবাইক। প্রাণপণে ছুটে চলল ওরা, যেভাবেই হোক বাঁকের ওপাশে পৌঁছাতেই হবে।

দৌড়ানোর ফাঁকে রোজারোর কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকাল এলিজাবেথ। এগিয়ে আসছে মোটরবাইকটা, মাস্টারসনের নিস্তেজ পড়ে থাকা শরীরটাকে পাশ কাটানোর সময় হঠাৎ নড়ে উঠলেন তিনি। শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে হাতের লাঠিটা তুলে ধরলেন প্রফেসর, তারপর আরোহীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ঘ্যাঁচ করে লাঠিটা ঢুকিয়ে দিলেন বাইকের সামনের চাকার ফ্রেমের ভেতর। সাথে সাথে উল্টে গেল বাইক, রাস্তায় পড়ে আরোহীদের নিয়েই হেঁচড়ে এগোলো খানিকটা। কংক্রিটের গায়ে ইস্পাতের ঘষায় আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠতে দেখা গেল। তারপর ফুয়েল ট্যাংক ফেটে যেতেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

রোজারো তাড়া দিল সবাইকে। "তাড়াতাড়ি!"

বাইকের গর্জনে গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গিয়েছিল। তারপরও কেউ চলে আসার আগেই পেরিয়ে যেতে হবে জায়গাটা। বাঁক ঘুরে রাস্তা ধরে এগোতে থাকলো তারা। প্রায় মাইলখানেক সামনে নতুন রঙ আর বাতির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দাঁড়ানো পলিসিয়া হোটেল চোখে পড়তেই গতি বেড়ে গেল ওদের।

হাঁটতে হাঁটতে গা থেকে ধুলো-ময়লা যথাসম্ভব ঝেড়ে ফেলল সবাই। কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখা গেল, লোকজন তেমন একটা নেই এখানে। কয়েকজন ড্রাইভার ঘোরাঘুরি করছে লবিতে, ডেস্কের পেছনে বসে আছে কয়েকজন স্টাফ। তারা খুব একটা পাত্তা দিল না ওদের।

সামনের কাউন্টারের দিকে এগোলো রোজারো। "ব্যবহার করার মতো কোনও ফোন পাওয়া যাবে এখানে? আমি...নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর হয়ে কাজ করছি আমরা।"

লবির একটা দরজার দিকে ইশারা করল লোকটা। "প্রেস রুম...ওইদিকে।"

"স্পাজিবো," ধন্যবাদ দিল রোজারো।

সবাইকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। বর্গাকার ঘরের মাঝখানে একটা নিচু টেবিল। দিস্তা দিস্তা কাগজ, প্যাড, কলম, স্টেপলার ইত্যাদি হাবিজাবি জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে টেবিলটা। তবে সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক ব্যাপার হচ্ছে-একপাশের দেয়ালে সারি করে আটকানো কতগুলো টেলিফোন।

"সেন্ট্রাল কমান্ডের সাথে কথা বলছি আমি। সতর্কবার্তা জারি করবে ওরা, উদ্ধার করবে সবাইকে।" একটা রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো রোজারো। সাময়িক উত্তেজনা কেটে যেতে, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল এলিজাবেথ। শরীর কাঁপছে ওর, মাথার ভেতর ঝড় বয়ে-চলেছে, চোখ বেয়ে নেমেয়ে পানির ধারা। মাস্টারসনের জন্য না শুধু, ভাবছে বাবার কথাও।

রিসিভার কানে ঠেকানো অবস্থাতেই মুখ দিয়ে হতাশাজনক একটা আওয়াজ করল রোজারো, ইতিমধ্যে কুঁচকে উঠেছে ভ্রূ।

"কী হলো?" প্রশ্ন করল লুকা।

চিন্তিতভঙ্গিতে মাথা দোলালো মেয়েটা। "ফোনের জবাব দিচ্ছে না কেউ।"

রাত ১২:৫০
ওয়াশিংটন ডি.সি.

টান দিয়ে লকার রুমের দরজা খুলে ফেলতেই পেইন্টার দেখতে পেলেন, একটা পিস্তলের নল তাকিয়ে আছে সোজা তার কপাল বরাবর। ক্যাট...তাকে দেখতে পেয়ে নামিয়ে নিলো হাতের অস্ত্র।

"কী খবর সবার?" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলেন ডিরেক্টর।

"এখনও পর্যন্ত ভালোই বলতে হবে।"

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী এক সিগমা এজেন্ট। ক্যাটের পিছু নিয়ে ভেতরের রুমে চলে এলেন পেইন্টার। সারি সারি লকার আর বেঞ্চ রাখা আছে এখানে, একপাশে বাথরুমে যাওয়ার দরজা।

একটা বেঞ্চে বসে আছেন ম্যালকম। সাশাকে কোলে নিয়ে মেঝেতে বসে আছে লিসা। নীল চোখদুটো মেলে পেইন্টারের দিকে তাকাল বাচ্চাটা।

ওকে ক্যাটের কোলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিসা। রক্তাক্ত কাপড় পাল্টে গোসল সেরে নিয়েছে ও, পরিষ্কার একটা কাপড় পরে আছে এখন। সাশার কানে কানে কিছু একটা বলল ক্যাট, মুচকি হাসি খেলে গেল বাচ্চাটার ঠোঁটে।

পেইন্টারের বাড়িয়ে দেয়া হাতে লুটিয়ে পড়ল লিসা। এক মুহূর্ত চুপ থাকার পর মুখ খুললো, "কী হয়েছে?"

পেইন্টার একবার ভাবলেন, বলবেন না। তারপরই বদল করলেন সিদ্ধান্ত, এখন আর লুকোছাপার কিছু নেই। "শেন।"

ডারপা প্রধানের নাম শুনে ক্যাট আর ম্যালকমও চোখ ফেরালো তার দিকে।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন পেইন্টার। "শুয়োরটা মেরে ফেলেছে তাকে।" বলতে বলতে গুলি খেয়ে শেনের মাটিতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠল তার চোখে।

"হে ঈশ্বর...," আঁতকে উঠল লিসা, আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পেইন্টারকে।

"সাশাকে নিতে নিচে আসছে ম্যাপলথোর্প।" বলে ঘড়ি দেখলেন পেইন্টার।

"ফেইল-সেফ?" জানতে চাইলো ক্যাট।

"চার মিনিট বাকি।" তিনি প্রার্থনা করলেন, সব কিছু ঠিকঠাকভাবেই ঘটে। ইতিমধ্যে গ্যাসের মিষ্টি গন্ধে বেশ ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস।

"এই ঘরটাকে আগুন থেকে বাঁচাতে চাইলে তো... কোনওমতেই গোলাগুলি করা যাবে না এখানে," চিন্তিতস্বরে বলল ক্যাট।

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। "বাষ্পীভূত সি-ফোর! এক্সপ্লোসিভের মতো কাজ করে গ্যাসটা। এটাকে জ্বালাতে হলে বৈদ্যুতিক স্ফূলিঙ্গ দরকার, আগুন না।"

এবার মুখ খুললো লিসা। "তাহলে এখানে বসে তো কিছু করা সম্ভব না আমাদের পক্ষে!"

সবাইকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলেন পেইন্টার। চাইছেন, পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকুক সবাই। কী ঘটবে, আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, নিজের লোকদের কারও এক চুল পরিমাণ ক্ষতি হতে দেবেন না তিনি।

"এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র করণীয় কাজ হচ্ছে- লুকিয়ে থাকা।"

হলওয়ে ধরে ছুটে চলেছেন ম্যাপলথোর্প, পেছনেই আসছে তার কমান্ডো টিম।

তিনি আগেও অনেক অপারেশনে কাজে লাগিয়েছেন এদের। ভয় কাকে বলে তা জানেই না সাবেক ব্রিটিশ এস.এ.এস. আর দক্ষিণ আফ্রিকান কমান্ডো ফোর্সের এই লোকগুলো। অপহরণ, খুন, ধর্ষণ-এমন কোনও কাজ বাদ নেই, যা তার জন্য করেনি এরা। অপরাধ করার পর ট্রেইল মুছতে খুবই দক্ষ এই কমান্ডো টিমের সদস্যরা।

হলওয়ের প্রান্তে একটা ঘরের দিকে ইশারা করল সামনে থাকা কমান্ডো। দরজার উপর লকার রুম লেখা লেবেল সাঁটা আছে। লোকটার হাতে ধরে থাকা ইলেকট্রনিক ট্র্যাকারটাও এই ঘরের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

ট্রেন্ট ম্যাকব্রাইড আগেই বলেছিলেন, এখনও কাজ করছে বাচ্চাটার গায়ে থাকা মাইক্রোচিপ ট্রান্সমিটার। যেখানেই লুকিয়ে রাখা হোক, খুঁজে ওকে পাওয়া যাবেই।

হাত নেড়ে সামনের কমান্ডোকে সরে যেতে ইশারা করলেন ম্যাপলথোর্প। তারপর তাকালেন হাতঘড়ির দিকে। ফেইল-সেফ প্রোগ্রাম চালু হতে আর মিনিট

তিনেক বাকি। পেইন্টার যদি অগ্নিঝড়টা বন্ধ না ও করেন, তারপরেও মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার জন্য অসম্ভব কিছু না। হলওয়ের একপ্রান্তে একটা ইমারজেন্সি এক্সিট চোখে পড়েছে একটু আগেই, কাছাকাছি কোনও একটা গ্যারেজে উন্মুক্ত হয়েছে পথটা।

লকার রুমের দরজার সামনে পৌঁছতেই ভেতর থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পেলেন ম্যাপলথোর্প।

অবশেষে...

দরজার বাইরে একটা প্যাডলক, তবে সেটা কোনও সমস্যা না। বোল্ট কাটার হাতে এগিয়ে এল এক কমান্ডো। লকটা কেটে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগল না।

"তাড়াতাড়ি করো," হাত নেড়ে তাড়া দিলেন ম্যাপলথোর্প, হাতে খুব বেশি সময় নেই আর।

সামনে থাকা কমান্ডো হ্যান্ডেল ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা। সাথে সাথে দেয়ালে আটকানো টেপ রেকর্ডার, রেডিও ট্রান্সমিটার আর একটা টেজার গান-এর দিকে চোখ পড়ল ম্যাপলথোর্পের। দরজার পাল্লার সাথে টেপ দিয়ে বাঁধা ছিল টেজার গানের ট্রিগার।

ফাঁদ!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট লাগালেন ম্যাপলথোর্প।

সাথে সাথে পেছনে টেজার গান ফায়ার করার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

তার চেঁচিয়ে ওঠা গলার আওয়াজ ছাপিয়ে পপ করে একটা শব্দ ভেসে এল কমান্ডোদের কানে। গ্যাসের চুলায় আগুন ধরালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি। সাথে সাথে আগুনের একটা গোলক ভেসে উঠল দরজার মুখে, দপ করে চারপাশে ছড়িয়ে গেল আগুনটা। পালানোর চেষ্টারত ম্যাপলথোর্প আর কমান্ডোরা নিমিষেই হারিয়ে গেল আগুনে গোলকের ভেতর।

ছিটকে উড়ে গিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে আছড়ে পড়লেন ম্যাপলথোর্প। অবশ্য ততোক্ষণে তাকে মানুষ বলে চেনার উপায় নেই, জ্বলন্ত একটা মশাল যেন!

মেঝেতে আছড়ে পড়ে গায়ে লবণ দেয়া জোঁকের মতো মোচড়াতে লাগলেন তিনি। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা... কয়েক মুহূর্ত পর সবকিছু গ্রাস করে নিলো নীরবতা।

নিচের ফ্লোরে, জিম লকার রুমে বসে উপরের তলার মেডিকেল লকার রুমের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেলেন পেইন্টার। বিস্ফোরণের আওয়াজটাও স্পষ্ট কানে গেল তার।

জানতেন, মেয়েটার ট্র্যাকারের সিগন্যাল অনুসরণ করবেন ম্যাপলথোর্প। তাই সেফ হাউজ থেকে হেলিকপ্টারগুলোকে বিভ্রান্ত করে দেয়া, জিপসীদের আনা কোবরা ট্রান্সসিভারগুলোর একটা ব্যবহার করেন তিনি, ফাঁদ পাতেন উপরতলার মেডিকেল

লকার রুমে। আগেরবারের মতো এবারও, মেয়েটার ট্র্যাকারের সিগন্যাল সফলভাবেই নকল করতে পেরেছে ট্রান্সমিটারটা।

ম্যাপলথোর্পকে চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে সেই সিগন্যাল।

লোকটার এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু কোনও ছাপ ফেলল না পেইন্টারের মনে। এখনও মাথায় ভাসছে গুলি খেয়ে শেনের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যটা। সেই সাথে দু'জন স্টাফকেও গুলি করেছে শয়তানগুলো। ঘড়ি দেখলেন পেইন্টার। সেকেন্ডের কাঁটা বারোর ঘরে পৌঁছাতে আর মাত্র দুই সেকেন্ড বাকি। দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। চোখের পলকে কাঁটাটা পেরিয়ে গেল বারোর ঘর, সেই সাথে ফুরিয়ে গেল ফেইল-সেফ প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারণ করা সময়ও। তবে কিছুই ঘটলো না। সব আগের মতোই সুনসান।

ফেইল-সেফ সেট করার পর, ক্যাটদের নিচে পাঠিয়ে মেক্যানিকাল সেকশনে গিয়েছিলেন পেইন্টার। তারপর ম্যানুয়ালি বন্ধ করে দেন বৈদ্যুতিক ফুলকি ছড়ানোর সিস্টেম। ম্যাপলথোর্পকে ভয় দেখানোর জন্য গ্যাসটা ছড়িয়ে পড়া জরুরী ছিল। কিন্তু আর যাই হোক, ওরকম কয়েকটা শয়তানকে মারার জন্য নিজের লোকদের জীবন বলি দিতে পারেন না পেইন্টার। তাই টেজার গান দিয়ে উপরতলায় ফাঁদ পাতেন তিনি, আর পিশাচটাকে টেনে নিয়ে যান ফাঁদের দিকে।

অবশেষে সফল হয়েছে তার প্ল্যান। একূল-ওকূল, দুই ই রক্ষা পেয়েছে।

মারা গেছে ম্যাপলথোর্প, সেই সাথে পটল তুলেছে কমান্ডোদের বেশিরভাগ। এখন বাকিদের লেজ গুটিয়ে পালানো শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার।

তার দিকে ঝুঁকে এল লিসা, "আগুন ছড়িয়ে পড়বে না তো?"

ওর কথা জবাব দিতেই যেন মাথার উপরে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার। সিলিং থেকে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল পুরো রুমে।

"ঝামেলা শেষ তো?" আবারও প্রশ্ন করল লিসা।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পেইন্টার। "হ্যাঁ।"

তবে মুখে সায় দিলেও, মন থেকে একটা বিষয় উপলব্ধি করতে পারছেন তিনি- এখানকার ঝামেলা শেষ হয়েছে ঠিকই, তবে অন্য কোথাও এখনও অনেক কিছুই ঘটার বাকি।

সকাল ১০:৫৩
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

আস্তে আস্তে নেমে আসছে হ্যাঙ্গারের গায়ে বসানো দরজাটা। তীরবেগে সেদিকে ছুটে চলেছে গ্রে, যেভাবেই হোক ঢুকতে হবে ভেতরে। ধমাধম বুকের খাঁচায় বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, সেই শব্দ ছাপিয়ে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড থেকে করতালির আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। যেন কোনও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে ও, আর পেছন থেকে তাকে

উৎসাহ যোগাচ্ছে সবাই। এখন শুধুমাত্র গ্রে'র প্রথম হওয়াই পারে, সবার উচ্ছ্বাসটুকু বাঁচিয়ে রাখতে।

শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে কোনওমতে দরজার নিচ দিয়ে শরীরটা গলিয়ে দিল গ্রে, পিছলে এগোতে লাগল মেঝে ধরে। দরজাটা বেশ পুরু। মাঝামাঝি পৌঁছতেই কমে এল ওর গতি। মরিয়া হয়ে মেঝেতে পা দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল। অবশেষে যখন দরজার পাল্লা মেঝে স্পর্শ করল, গ্রে'র পা তখন দরজার পেরিয়ে মাত্র এক ইঞ্চি সামনে।

পা নাড়ানো থামিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে। উত্তেজনায় কাঁপছে গোটা শরীর। উপরে তাকাতেই বিশাল গুহার মতো কাঠামোটা নজরে এল। পেছনে আপন গতিতে সরে চলেছে কফিনের দেয়াল। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই রিঅ্যাক্টরের শেষ সীমায় দাঁড়ানো কংকিটের দেয়ালে আটকে যাবে অর্ধবৃত্তাকার ঢাকনার খোলা প্রান্ত। চিরতরে ঢেকে ফেলবে কুখ্যাত চার নম্বর রিঅ্যাক্টরকে।

রংধনুর মতো বাঁকা হয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করছে খোলা অংশের উপর দিয়ে। এখন বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বলতে শুধু ওই কয়েক ফুট প্রশস্ত ফাঁকটা। হাইড্রোলিক ক্রেনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে।

সাথে সাথে ডান দিক থেকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। তবে কোনও গুলি ধেয়ে এল না ওর দিকে।

গ্রে বুঝতে পারল, উল্টোদিকের কন্ট্রোল বুথে কাজ করতে থাকা শ্রমিকদের শেষ ঠিকানায় পাঠাচ্ছে নিকোলাস। একটা ফর্কলিফটের আড়াল নিয়ে সামনে বাড়লো ও। খোলা মুখ থেকে প্রায় বিশ ফুট পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

"নিকোলাস," পিস্তল উঁচু করে চিৎকার করে উঠল গ্রে।

চমকে উঠে পেছনে তাকাল লোকটা।

"নড়ো না।"

আশেপাশে এক পলক চোখ বুলালেন নিকোলাস, বোঝার চেষ্টা করছেন আওয়াজের উৎস। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে শুরু করলেন সামনে। এক পা মচকে যাওয়ায় খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

এবার লোকটার ভালো পায়ের দিকে নিশানা করল গ্রে, টিপে দিল ট্রিগার। অপারেশন ইউরেনাস বন্ধ করার উপায় না জেনে তাকে মেরে ফেলা ঠিক হবে না। পায়ে গুলি আঘাত করতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন নিকোলাস। রাশিয়ান ভাষায় গালির তুবড়ি ছোটালেন মুখ দিয়ে।

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁপছে তার কণ্ঠ। গ্রে'র উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন তারপর। "মূর্খ কোথাকার! চলো পালাই এখান থেকে। আর দশ মিনিটও হাতে নেই।"

তার পেছনে বন্ধ হতে থাকা ঢাকনাটার দিকে তাকাল গ্রে। আর মাত্র ফুট চারেক জায়গা বাকি। নিকোলাস যে তাড়াতাড়ি করছে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী!

"অপারেশন ইউরেনাস বন্ধ করার উপায়টা বলো আমাকে," চেঁচিয়ে বলল গ্রে।

"এটা বন্ধ করার কোনও পথ রাখা হয়নি! এখন শুধু একটা মাত্র কাজ করতে পারি আমরা- সরে যেতে পারি এর রাস্তা থেকে...এখনই! "

"কী করেছো তা বলো।"

"হাহ! ঠিক আছে...... কনকাশন চার্জ! কফিনের সামনের দিকের পিলারে চারটা কনকাশন চার্জ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সামনের দেয়ালটা ধ্বসিয়ে দেবে ওগুলো, ছড়িয়ে দেবে তেজস্ক্রিয়তা। এগুলোকে থামানোর কোনও উপায় নেই। চলো পালাই! "

গোটা ব্যাপারটা মাথায় ঢোকাতে এক মুহূর্ত সময় লাগল গ্রে'র। এখন যদি বাইরে বেরিয়ে সবাইকে সরে যেতে বলে ও, তারপরও অনেক দেরি হয়ে যাবে।

"বাকিদের সাথে আমরা মরতে যাব কেন, বলো," বলে চললেন নিকোলাস। "পৃথিবীর একজন পথপ্রদর্শক দরকার। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দরকার। আমার মতো, তোমার মতো। একসাথে মিলে নবজাগরণ সৃষ্টি করবো আমরা।"

জেলে দেখা হওয়ার সময় পথপ্রদর্শক সম্পর্কে নিকোলাসের ভাষণ মনে পড়ল গ্রে'র। এবার লোকটার পুরো প্ল্যানটা মাথায় ঢুকেছে ওর। গোটা বিশ্ব জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চলেছে লোকটা, তারপর প্রতিবন্ধী বাচ্চাগুলোর সাহায্যে নিজে আত্মপ্রকাশ করবে ত্রাতা হিসেবে।

"আমরা যদি এখানে মারাও যাই, তারপরও পরিস্থিতি বদলাবে না। প্ল্যানটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, আমাদের...আমার মৃত্যুও আটকাতে পারবে না ঘটনাপ্রবাহকে। বোকামি করো না পিয়ার্স। তোমাকে দরকার আমার। একসাথে রাজত্ব করবো আমরা।"

কীভাবে ব্যাপারটা থামানো যায়, ভাবতে লাগল গ্রে।

আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন নিকোলাস। "ফাঁকের ওপাশে ঠিক বাইরেই সীসায় মোড়া একটা কন্ট্রোল বুথ আছে। এখন রওনা হলে সময় ফুরানোর আগেই ওখানে পৌঁছাতে পারব আমরা।" বলতে বলতে হাচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালেন নিকোলাস। তবে এক পা মচকানো, আরেক পায়ে গুলি খাওয়া অবস্থায় খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না তার পক্ষে। আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে গ্রে তো আছেই।

এতোক্ষণ নরম সুরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর নিজেকে আটকাতে পারলেন না। পিস্তল তুলে ধরলেন গ্রে'র দিকে। "ঠিক আছে বাছা! মনে হচ্ছে, মৃত্যুই আছে তোমার কপাল আজ।"

আঁতকে উঠল গ্রে। মানুষগুলোর মৃত্যু ঠেকানোর আর কোনও উপায় নেই। তবে মরতে হলে নিকোলাসকেও সাথে নেবে ও। উঁচু করল হাতের পিস্তল।

ঠিক তখনই কর্কশ আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠল হাইড্রোলিক ক্রেনের চাকা। বিশ হাজার টন ঢাকনার ভার যেন আর বইতে পারছে না ওগুলো।

নতুন করে আবার কী শুরু হলো এসব?

মৃত সৈন্যের দেহ টপকে সামনে বাড়লো কোয়ালস্কি, ইলেনার সাথে যোগ দিল কন্ট্রোল প্যানেলে। গ্রে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে দৌড় শুরু করতেই ঝড়ের বেগে বাইক ছুটিয়েছে ইলেনা। গ্রে ওকে সাহায্য করতে বললেও কোয়ালস্কির কাজ ছিল শুধু সাইডকারে বসে থাকা। স্টিলের বিশালাকায় ঢাকনাটার একপ্রান্তে দাঁড়ানো কংক্রিটের বাংকারের সামনে এসে থামে ওরা।

হাইড্রোলিক ক্রেনের কন্ট্রোল প্যানেল এটাই।

অবশ্য বিনাযুদ্ধে জায়গাটা ছেড়ে দেয়নি নিকোলাসের লোকেরা।

কোয়ালস্কি নড়ে ওঠার আগেই রাইফেল নিয়ে নাচতে শুরু করল ইলেনা। কোয়ালস্কি একটাকে খতম করতে করতে বাকি চারজনকে শুইয়ে ফেলল মেয়েটা।

তারপর ভেতরে ঢুকে কাজে লেগে গেল ও। কন্ট্রোল নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বাড়িয়ে দিল ক্রেনের গতি। আরও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ঢাকনাটা।

মেয়েটার কাঁধের উপর দিয়ে মনিটরের দিকে চোখ ফেরালো কোয়ালস্কি, হ্যাঙ্গারের ভেতরের দৃশ্য সরাসরি ধরা পড়ছে ক্যামেরায়। একেবারে স্ক্রিনের মাঝামাঝি অংশে দুটো ছোট অবয়বকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, পিস্তল তুলে ধরেছে এঁকে অপরের দিকে।

গ্রে আর নিকোলাস।

ধুর ছাই!

"ইলেনা," চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "এদিকে দেখ। মনে হচ্ছে, আমাদের হিরোর সাহায্য লাগবে।"

সামনে এগিয়েই হুড়মুড় করে ওর গায়ে ঢলে পড়ল মেয়েটা। পরনের জ্যাকেট ভিজে গেছে রক্তে। একাধিক গুলি খেয়েছে শরীরের বামপাশে। তাহলে এজন্যই রাইফেল হাতে নেচে উঠেছিল ও, ভাবল কোয়ালস্কি।

"ইলেনা... কথা বলো!"

মনিটরের দিকে ইশারা করল মেয়েটা। "কী হয়েছে, দেখাও।"

ঢাকনাটা এগোনোর গতি আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। বিশ হাজার টন, খুব একটা কম না ওজন। খুব একটা তাড়াতাড়ি তো সরানো সম্ভব না। তারপরেও, আগের তুলনায় কয়েকগুণ সামনে বাড়ছে বিশাল কাঠামোটা।

"না!" চেঁচিয়ে উঠলেন নিকোলাস।

তার কণ্ঠে একসাথে ভয় আর হতাশা, দুটোরই ছাপ ধরতে পারল গ্রে। ঢাকনাটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মানে দু'টো- প্ল্যানটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পালানোও সম্ভব হবে না লোকটার পক্ষে।

"চলো, বেরোও!" বলে পিস্তল নেড়ে নিকোলাসকে ইশারা করল গ্রে।

আচমকা নড়ে উঠলেন তিনি। এতোক্ষণ শরীরের আড়ালে ছিল অন্য হাতটা, সেটা সামনে আনতেই আরেকটা পিস্তল দেখা গেল। ট্রিগারে চেপে বসল নিকোলাসের আঙুল।

সাথে সাথে বুলেটের লাইন থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল গ্রে। তবে শেষরক্ষা হলো না, পেটে আলতো ছোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। সাথে সাথে ট্রিগার টিপে দিল গ্রে'ও।

খট্ করে একটা আওয়াজ হয়ে খুলে গেল পিস্তলের স্লাইড-গুলি শেষ।

তার এই অবস্থা দেখে উৎফুল্ল হয়ে আবারও গুলি করতে গেলেন নিকোলাস। তবে অতিরিক্ত উত্তেজনায়, একটা দৃশ্য মিস করে গেলেন তিনি। মাথার উপর থেকে বিশালাকায় একটা ক্রেনের হুক নেমে এসে আঘাত করল তার পাশের কংক্রেটের পিলারে। আগে থেকেই কালের বিবর্তনে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল পিলারটা, আঘাতের তীব্রতা সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নিকোলাসের ঠিক সামনে। চমকে উঠে মেঝেতে লুটিয়ে পোড়লেন তিনি, পায়ের উপর গড়িয়ে এসে পড়ল কংক্রিটের ভারী, বিশাল একটা টুকরো। কংক্রিটের গুড়গুড় শব্দ ছাপিয়ে হাড় ভাঙার বিশ্রী আওয়াজ কানে এল গ্রে'র।

হাত থেকে ছিটকে গেছে নিকোলাসের পিস্তল দুটো।

"বাঁচাও আমাকে!" আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

সময় নেই।

স্টিলের ঢাকনা আর কংক্রিটের দেয়ালের মাঝে তখন ফাঁক আর মাত্র এক ফুট। বেরোনোর জন্য ছুট লাগালো গ্রে। পেছন থেকে হতাশায়, রাগেচিৎকার করে উঠলেন নিকোলাস।

"জিততে পারবে না তুমি, মূর্খ! আটকাতে পারবে না কিছুই। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে!"

তাকে প্রশ্ন করার জন্য থামল না গ্রে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ফাঁক গলে বাইরে বেরোনোর কাজে। আস্তে আস্তে চেপে আসছে দেয়াল। দম ছেড়ে দিয়ে বুকটা খালি করে ফেলল গ্রে, ছোট্ট ফাঁকটায় আটকে যাচ্ছে তার সুগঠিত শরীর।

অবশেষে বেরিয়ে এল ও।

মুক্তি পাওয়ার উত্তেজনায় তার পেছনে অপেক্ষারত অবয়বটা চিনতে এক মুহূর্ত সময় লেগে গেল গ্রে'র। ততোক্ষণে সরু হয়ে আসা ফাঁকে ঢুকে গেছে মানুষটা।

"ইলেনা! না! পৌঁছাতে পারবে না তুমি!"

হাত দিয়ে মেয়েটার জ্যাকেট আঁকড়ে ধরতে চাইলো গ্রে। তবে ততোক্ষণে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে মেয়েটার ছিপছিপে দেহ।

গ্রে প্রার্থনা করল, যাতে নিরাপদে দেয়ালের ওপাশে পৌঁছাতে পারে ইলেনা। কিন্তু সেখানেও তো অপেক্ষা করছে মৃত্যু। মেঝেতে তাকাতেই দেখতে পেল, পেছনে রক্তের মোটা রেখা ফেলে যাচ্ছে মেয়েটা।

একটা মোটা কণ্ঠ ভেসে এল গ্রে'র পেছন থেকে।

"ইলেনা কোথায় গেল?" জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

প্রায় বন্ধ হয়ে আসা ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো গ্রে।

তার দিকে ঝুঁকে বলতে লাগল বিশালদেহী লোকটা, "নিকোলাসের উপর কংক্রিট ভেঙে পড়তেই, আমাকে রেখে ছুট লাগায় মেয়েটা।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গ্রে'র গলা বেয়ে। "বুঝতে পারছি, কোথায় গেছে ও।"

চিত হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন নিকোলাস। ভারী কংক্রিটের টুকরোর নিচে চাপা পড়েছে শরীরের নিচের অংশ। নড়াচড়া করার কোনোও উপায় নেই। পায়ের শব্দ পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি। ইলেনা!

মেয়েটাকে দেখে হাড় ভাঙার চেয়েও একটা তীব্র ব্যাথার ঢেউ খেলে গেল তার শরীর বেয়ে। "তুমি এখানে কেন লক্ষ্মীটি?"

তার মাথার পাশে এসে ধপ করে বসে পড়ল ইলেনা, রক্ত গড়াচ্ছে জ্যাকেট বেয়ে।

"ওহ, প্রিয়তমা!" বলে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন নিকোলাস। তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল মেয়েটা।

স্টিলের সাথে কংক্রিটের বাড়ি খাওয়ার শব্দে বুঝতে পারলেন, চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ। এক মুহূর্ত পর গুড়ুগুড়ু আওয়াজ করে নিজের উপস্থিতি জানান দিল কনকাশন চার্জগুলো। কাজ শুরু করে দিয়েছে পিলারের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা বিস্ফোরকগুলো। কয়েক সেকেন্ড পর ধ্বসে পড়ল রিঅ্যাক্টরের একপাশের দেয়াল। ছড়িয়ে পড়া শুরু করল প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয়তা। কিন্তু কঠিন স্টিলের দেয়াল ভেদ করে বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই তার একফোঁটারও। হ্যাঙ্গারের ভেতরের দেয়ালের দিকে চোখ বুলালেন নিকোলাস। পলিকার্বনেটের আস্তরণ দেয়া আছে দেয়ালের ভেতরের দিকে। ভেতরের বিভীষিকাকে ভেতরেই আটকে রাখবে জিনিসটা।

হাতড়ে হাতড়ে কোটের পকেট থেকে তেজস্ক্রিয়তা মাপার মিটারটা বের করলেন তিনি। এখানে ঢোকার সময় সাদা দেখাচ্ছিলো মনিটরটা। এখন সেই সাদাকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে নিকষ কালো।

জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি, আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন ইলেনাকে।

"কেন?" জানতে চাইলেন নিকোলাস।

অনেকগুলো প্রশ্ন লুকিয়ে আছে এই একটা কেন-র ভেতর। কেন ইলেনা বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সাথে? কেনই বা আবার ফিরে এল ভেতরে?

উত্তর দিল না মেয়েটা। মাথা নুইয়ে ওর চোখের দিকে তাকালেন নিকোলাস।

স্থির... নিষ্প্রাণ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পরিণতির কথা ভাবলেন তিনি। গোটা জীবনে এমন অনেক মৃত্যু দেখেছেন। তেজস্ক্রিয়তায় ভুগে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাওয়া... প্রক্রিয়াটা খুবই কষ্টকর।

মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ইলেনার হাতটা ধরতে চাইলেন নিকোলাস। ঠক করে মেঝেতে কী একটা যেন গড়িয়ে পড়ল মেয়েটার এক হাত থেকে। হাতড়ে হাতড়ে ওর শেষ উপহারটা তুলে ধরলেন তিনি।

একটা পিস্তল।

এজন্যই ভেতরে এসেছে ও!

শেষ বিদায় জানানোর পাশাপাশি তাকে শান্তিতে মরার সুযোগ করে দিতে।

শক্ত করে ইলেনার মাথাটা জড়িয়ে ধরলেন তিনি, মুখ নামিয়ে শেষবারের মতো চুমু খেলেন ঠান্ডা হয়ে আসা ঠোঁটজোড়ায়।

তাই মোয়ো সোলনিস্কো...

শান্তিতে ঘুমাও প্রিয়তমা।

এক হাতে ইলেনার মাথা ধরে অন্যহাতে পিস্তলটা নিজের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন নিকোলাস, টিপে ধরলেন ট্রিগার।

মৃত্যু এসে বাঁচিয়ে দিল তাকে।

১৯
সেপ্টেম্বর ১৭, সকাল ১১ টা
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে, রাস্তার সর্বশেষ চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল মঙ্ক। খনি এলাকা আর তার স্থাপনাগুলো সামনে দেখা যাচ্ছে সামনে। পুরনো পাওয়ার হাউজ আর ধাতব দালানগুলোতে মরিচা ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। জানালাগুলোর হয় ফ্রেম ভাঙা, নয়তো কাঁচ। লাল হতে শুরু করা যন্ত্রগুলোও ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

ঠিক পেছনেই অবস্থিত এক পর্বতগাত্র। সেটার আশেপাশে পুরনো জঞ্জাল আর আকরিক স্তূপ করে রাখা।

তাড়াহুড়ো করে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে মঙ্ক। সেই সাথে ভেবে অবাক হচ্ছে, খনিতে কীভাবে কী করা হয়, সে ব্যাপারে ও এতো কিছু জানলো কী করে! ওর পরিবার এরকম কোনও-

আচমকা মস্তিষ্কের মাঝে উঁকি দিল একগাদা স্মৃতি। কভারঅল পরিহিত এক বৃদ্ধ, কয়লার ধুলোয় সারা গা ভর্তি...একই লোকটাকে আবার কফিনে শোয়া অবস্থায় দেখতে পেল মঙ্ক...এক মহিলাকে কাঁদতেও দেখল...

পরক্ষণেই ব্যাথার একটা ঢেউ এসে বন্ধ করে দিল স্মৃতির আনাগোনা।

ভ্রূ কুঁচকে বাচ্চাগুলো আর মার্তাকে সাথে নিয়ে জঞ্জালের গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগল মঙ্ক। সামনেই খনির প্রধান প্রবেশ মুখ দেখে যাচ্ছে, পরস্পর সমান্তরাল এক জোড়া রেল লাইন ওর ভেতর দিয়ে হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে।

এগোতে এগোতেই একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ও।

লেক করাশয় নিচেই বিস্তৃত হয়ে আছে। এখানে ওটার প্রশস্ততা কম করে হলেও দুই মাইল হবে, লম্বায় তার তিন গুণ। ওপাশের পাহাড়ের দিকে তাকাল এরপর-যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে, সেই জায়গাটা দেখতে চাইছে।

"তাড়াতাড়ি করা দরকার।" ওকে মনে করিয়ে দিল কনস্টানটাইন।

নড করল মঙ্ক, দুই পিচ্চিকে দুই পাশে নিয়ে হাঁটছে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেটা। পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে মার্তা।

কাছাকাছি এসে সমস্যাটা দেখতে পেল ও। একটা বিশাল বড় কাঠের দেয়াল দিয়ে খনির মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মেঝে থেকে একেবারে ছাদ পর্যন্ত লম্বা ওটা, শক্ত কাঠ দিয়ে বানানো।

বাইরের জঞ্জাল আর যন্ত্রপাতির অবস্থা দেখে মনে হয়, বহুদিন এখানে কারও পা পড়ে না। কিন্তু দেয়ালের পাশে অনেকগুলো সিগারেটের টুকরা আর খালি ভদকার বোতল পড়ে থাকতে দেখল মঙ্ক। সেই সাথে বালুময় মেঝেতে বুটের ছাপও আছে। দেখে মনে হলেও, খনিটা আসলে পরিত্যক্ত নয়। অতি সম্প্রতি কেউ একজন এখানে এসেছিল।

পেছন দিকে তাকাল মঙ্ক। এখানে আসার পথে কোনও দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক বা সদ্য তৈরি হওয়া চাকার ছাপ ওর নজরে পড়েনি। তাই যে-ই এখানে থাকুক না কেন, অন্য কোনও উপায়ে আসা-যাওয়া করেছে। কনস্টানটাইন অবশ্য সেই উপায়টা আগেই বলে দিয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ এক ট্রেন যাতায়াত করে লেকের নিচ দিয়ে। ৩৩৭ নাম্বার খনি এলাকার সাথে চেলিয়াবিংস্ক ৮৮ এর সংযোগ রক্ষা করে চলছে বাহনটা। এখান দিয়ে যে প্রবেশ করে, সে নিশ্চয় ওমাথা দিয়ে বের হয়।

মঙ্ক মনে মনে প্রার্থনা করল, এদিকের প্রবেশদ্বার নিয়ে ওদের যেন খুব একটা মাথা ব্যাথা না থাকে!

কাঠের দেয়ালের গায়ে আটকানো চারকোণা ইস্পাতের দরজার দিকে এগোলো ও।

"এবার কী?" জানতে চাইলো। "নক করব?"

ভ্রূ কুঁচকে এগিয়ে গেল কনস্টানটাইন। ছিটকিনি খুলে ধাক্কা দিতেই, হাঁ হয়ে গেল দরজাটা।

কোনওরকমে নিজের রাইফেলটা দরজার দিকে তাক করল মঙ্ক, ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। "আগে থেকে বলে নেবে না!"

"এখানে কেউ আসে না," বলল কনস্টানটাইন। "জায়গাটা খুব বেশি বিপদজনক। তাই চাবিরও দরকার নেই। ভালুক আর নেকড়ে যেন না ঢোকে, সেজন্য ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেই হলো।"

"সেই সাথে দুই একটা বাঘ আটকাতে পারলেও মন্দ হয় না।" বিড়বিড় করে বলল মঙ্ক।

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল কনস্টানটাইন, ওদের ফ্ল্যাশ লাইটগুলো বের করে আনলো। একটা মঙ্কের দিকে এগিয়ে দিতেই, রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে জিনিসটা হাতে নিলো সে।

প্রধান সুড়ঙ্গে ঢুকে, আলো ফেলল মঙ্ক। বড় বড় কাঠের থাম দিয়ে সুড়ঙ্গটাকে ধ্বসে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সামনের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে ইস্পাতের রেল লাইন। অবশ্য দেয়ালের কাছেই এক জোড়া গাড়ি দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে।

সামনে অনেকগুলো পার্শ্ব সুড়ঙ্গ আছ। মঙ্কের সন্দেহ হলো, পুরো পাহাড়টাই এমন সুড়ঙ্গ দিয়ে ভর্তি। রওনা দেবার সময় পথ নির্দেশনা চাইলো মঙ্ক। "কোনদিকে যাব?"

চুপ করে রইল কনস্টানটাইন।

মঙ্ক ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে।

"আমি জানি না।" শ্রাগ করল ছেলেটা। "শুধু জানি, নিচে যেতে হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক। অন্তত একটা লক্ষ্য তো পাওয়া গেল।

ফ্ল্যাশ লাইট হাতে নিয়ে, নিচের অন্ধকারের উদ্দেশ্য রওনা দিল সে।

চারপাশের হাস্যোজ্জ্বল চেহারাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন সাভিনা। একটু বেশি বয়সী বাচ্চারা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে, কিন্তু কমবয়সীরা ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। একদম ছোট যারা, তাদের বয়স পাঁচের কম। এখনও ইমপ্ল্যান্ট সহ্য করার মতো শারীরিক অবস্থা হয়নি তাদের। এর দলটা চুপচাপ নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রতিবন্ধিতার নানা ধাপ দেখা যাচ্ছে ওদের মাঝেঃ চুপচাপ বসে থাকা, শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, একই ভঙ্গি বারবার করা।

উপস্থিত প্রায় ষাটজনের মতো বাচ্চাকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন চার শিক্ষক।

"যার যার দলের সাথে থাকো!"

চেলিয়াবিংস্ক এর পেছন দিকে অপেক্ষা করছে ট্রেনটা, সাধারণত ওটা বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। একদম ছোট বাচ্চাদের মাঝে মাঝে এই সুযোগটা দেয়া হয়। তবে আজকের এই যাত্রা অন্যরকম। আর ফিরবে না ট্রেনটা। অপারেশন স্যাটার্ন-ই তার শেষ লক্ষ্য।

"সবাই নিজ নিজ ওষুধ খেয়েছে?" জানতে চাইলো এক মহিলা।

ওষুধ বলতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত ঘুমের ওষুধ। এখন উত্তেজিতভাবে ঘোরাঘুরি করলেও, কিছুক্ষণের মাঝে বাচ্চারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। সুড়ঙ্গের অন্য পাশের যখন বোমাগুলো বিস্ফোরিত হতে শুরু করবে, তখন যেন ভয় না পায় বাচ্চারা-তাই একাজটা করা। বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে শুরু হবে অপারেশন স্যাটার্ন। লেকের পানি টানেলে ঢোকার পর যখন আবার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শুরু হবে, তখন বাচ্চাদের রক্তে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ভয়ানক বিষে পরিণত হবে। প্রায় সাথে সাথেই মারা যাবে বাচ্চারা।

একবার ভাবা হয়েছিল, বাচ্চাদেরকে লিথাল ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করলে কেমন হয়! কিন্তু এই কাজটা কারও পক্ষেই করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, হত্যাকাণ্ডের পর আবার ছোট ছোট নিষ্প্রাণ দেহগুলোকে এক করে অপারেশন স্যাটার্নের ঠিক কেন্দ্রেনিয়ে যেতে হতো। উদ্দেশ্য ছিল তেজস্ক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেহগুলোর ডিএনএ পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়া। যেন ওগুলোর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাবার সাহস কারও থাকলেও, পরীক্ষা করে কিছু না পায়।

তাই শেষ পর্যন্ত বর্তমান পরিকল্পনাটা কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কিন্তু তবুও পেছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন সাভিনা। দুই হাত এমনভাবে শক্ত করে চেপে আছেন যে সাদা হয়ে গিয়েছে গাঁটগুলো। তার ইচ্ছা হচ্ছিল এখুনি ছুটে গিয়ে এক এক করে বাচ্চাগুলোকে নামিয়ে আনেন।

মন্দের ভালো, অন্তত দশ জনকে তো বাঁচাতে পারছেন তিনি।

এটাকেই স্বান্তনা বলে ধরে নিতে হবে।

একেবারে সেরা দশজনকে আলাদা করেছেন।

সাভিনার পেছনে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ অবস্থিত অপারেশন স্যাটার্নেরপ্রধান কক্ষ, সেখানেই আছে বাচ্চারা। এখানের কাজ শেষ হলে ওই দশজনকে পাঠানো হবে মস্কোর এক নতুন জায়গায়। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোয় আসার সময় হয়েছে এই প্রজেক্টের।

এটাই হবে তার কীর্তি।

কিন্তু এমন কীর্তি গড়তে গেলেও অনেক মূল্য চুকাতে হয়।

শেষ বাচ্চাটাকে ট্রেনের তোলার পরও, বাতাসে যেন বেশ কিছুক্ষণ ভেসে রইল উচ্ছল হাসির আওয়াজ। বাচ্চারা ঝগড়া করছিল, কেউ কেউ খোলামেলা বগিতে চড়তে চায়, তো কেউ কেউ সামনের বা পেছনের বগিতে। কয়েকজন অবশ্য বড়দের অনুপস্থিতি টের পাচ্ছিলো, কিন্তু তাতে চিন্তিত না হয়ে মনে হচ্ছিলো যেন আরও বেশি উত্তেজিত হয়েছে!

একেবারে শেষ বাচ্চাটা ট্রেনে ওঠার সাথে সাথেই রওনা হয়ে গিয়েছে যানটা। এর কিছুক্ষণ পরেই, দরজা নেমে এসে বন্ধ করে দিল সুড়ঙ্গমুখ।

চারজন শিক্ষকের সবাই মাথা নত করে ফিরে আসছেন। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলা তো দূরে থাক, তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত। কেবল একটু আগে ওষুধ খেতে বলা মহিলা সাভিনার পাশ দিয়ে যাবার সময় স্বান্তনা দেবার জন্য এক হাত তুললেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই কী ভেবে নামিয়ে ফেললেন হাতটা।

"আপনার আসার দরকার ছিল না।" বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

বিনা বাক্য ব্যয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সাভিনা, কোনও কথা বলা চেষ্টা করলেন না।

ছিল...দরকার ছিল।

সকাল ১১:১৬
প্রাইপিয়াট, ইউক্রেন

লিমোজিনে বসে আছে গ্রে।

গাড়ি চালাচ্ছে রোজারো, প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে লুকা। শহর থেকে বেরোবার পথে প্রথম যে চেক পয়েন্টটা পড়ে, ঝড়ের গতিতে সেটা অতিক্রম করে এল ওরা। চেরেনোবিলের রিঅ্যাক্টর কমপ্লেক্সকে কেন্দ্রে রেখে চারপাশের ত্রিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকায় পা রাখা নিষেধ। দুটো চেক পয়েন্ট আছে পথে। একটা দশ আর অন্যটা ত্রিশ কিলোমিটারের মাথায়।

গ্রে চাইছিল, রিঅ্যাক্টরের গোলমালটা ধরতে পারার আগেই দ্বিতীয় চেক পয়েন্ট পার হয়ে যেতে। লাশ খুঁজে পেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষের বেশি সময় লাগবে না।

এর আগে, অনুষ্ঠানের স্থান থেকে প্রাইপিয়াটে ফেরার পথে, গ্রে রোজারোর সাথে ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ করেছিল। জিনিসটা ওকে দিয়েছিলেন মাস্টারসন। মেয়েটি জানিয়েছিল, কেন যেন সে সিগমার কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। তাকে বারবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে গ্রে। হোটেলে ফিরে দেখে, সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। এদিকে একটা লিমোজিনের ব্যবস্থা করে রোজারো, চুরি করে ড্রাইভারের মোবাইল ফোন।

এই মুহূর্তে শক্ত করে ফোনটাকে আঁকড়ে ধরে আছে গ্রে, ডিরেক্টর ক্রোর কাছ থেকে কলের অপেক্ষা করছে। পেইন্টারও ওয়াশিংটনে কম ঝামেলায় নেই। তবে অন্তত ম্যাপেলথোর্পের একটা ব্যবস্থা করা গেছে, সাশাও নিরাপদে আছে।

লিমোজিনের পেছনে বসে আছে এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কি। লোকটা চোট পেয়েছে কাঁধে, এই মুহূর্তে সেই ক্ষতের সুশ্রুষা করছে এলিজাবেথ।

"নড়াচড়া থামাবে!"

"ব্যাথা করছে তো!"

"আয়োডিন লাগাচ্ছি কেবল!"

"তাতে কী! ব্যাথা তো দিচ্ছে একেবারে শালার-"

মেয়েটির ধমকে শুনে পরবর্তীর শব্দগুলো আর উচ্চারণ করল না বিশালদেহী লোকটা।

কৃতজ্ঞতায় ভরে এল গ্রে'র মন। কোয়ালস্কির সাবধানী চোখে বিপদটা ধরা না পড়লে, হ্যাংগার থেকে হয়তো বেঁচে ফিরতে হতো না ওকে।

কিন্তু এখনও বিপদ কাটেনি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রে। ছোট ছোট টিলা যেন চোখের পলকেই পেছনে পড়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে আছে কিছু বার্চগাছও। ধুকপুক করার গতি কমাতেই চাচ্ছে না গ্রে'র হৃদপিণ্ড। ওর মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে শত শত সম্ভাবনা। চেরনোবিল থেকে যতোই দূরে যাচ্ছে, ততোই অন্য কোনও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিকোলাসের শেষ শব্দগুলো এখনও কানে বাজছে ওরঃ এখনও জিতে যাওনি তুমি...লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবেই মরবে।

কী বোঝাতে চাইছিল সে?

গ্রে জানে, হুমকিটা অহেতুক ছিল না। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এমনকি নিকোলাসের পরিকল্পনার নামটা-অপারেশন ইউরেনাস, বিক্ষিপ্ত করে চলেছে গ্রের মনকে। জার্মানির বিরুদ্ধে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা যুদ্ধজয় থেকে নেয়া হয়েছে নামটা। যুদ্ধটা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কিন্তু সমস্যা হলো, মাত্র একটা মুখোমুখি লড়াই-এ জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হয়নি। প্রথমে ঘটেছিল ইউরেনাস, এরপর স্যাটার্ন।

হ্যাংগার থেকে পালিয়ে আসার সময়, নিকোলাসের কথা শুনে বার বার ওই যুদ্ধের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর। আরেকটা অংশ আছে পুরো পরিকল্পনার, কিন্তু তার শুরু বা শেষ কোথায়?

অবশেষে বেজে উঠল ফোন।

"ডিরেক্টর ক্রো?" কানে ধরে বলল ও।

"কী অবস্থা ওখানে?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

"যেমনটা হবার কথা ছিল, তেমনই।"

"তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিষিদ্ধ এলাকার কয়েক মাইল দূরেই একটা বেসরকারী বিমানবন্দর আছে। সাধারণত বিশেষ আর সম্মানিত অতিথিদের জন্য জায়গাটা ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ওদের একটা জেট ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। প্রফেসর মাস্টারসনের কথা না শোনার অপরাধটা লঘু করতে চাইছে আর কি। ভালো কথা, আমি তোমাকে না জানিয়েই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছি। চেরনোবিলে ভেস্তে যাওয়া আক্রমণটার ব্যাপারে সারা বিশ্বের সব গুপ্তচর সংস্থার কানে খবর পৌঁছে গিয়েছে। সাবধানের মার নেই ভেবে সবাইকে এলাকা থেকে বের করে আনার কাজ চলছে।"

"খুব ভালো।" ডিরেক্টরের দৃঢ় কণ্ঠ শুনে নিজেকে একটু ধাতস্থ বলে মনে হচ্ছে গ্রে'র, একা নয় ও।

"খুব ব্যস্ত একটা দিন কাটিয়েছো, কমান্ডার।"

"আপনার দিনটাও শুয়ে বসে যায়নি। তবে আমার মনে হয় না বিপদ কেটে গেছে।"

"মানে?"

রাশিয়ান সিনেটরের বলা কথাগুলো ডিরেক্টরকে শোনালো গ্রে।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও।" বললেন পেইন্টার। "এখানে ক্যাট ব্রায়ান্ট আর ম্যালকম জেনিংসও আছে। লাউড স্পীকার অন করে দিচ্ছি।"

বলে চলল গ্রে। জানাল, পরিকল্পনার আরও একটা অংশ রয়েছে বলে ওর ধারণা। যে অংশটার ফল হবে ভয়াবহ। প্রাণ হারাবে আরও অনেক মানুষ!

এদিকে চুপচাপ বসে শুনছিল কোয়ালস্কি। "ওদেরকে জেলি বিনের ব্যাপারটা বলো।" গলা উঁচু করে বলল সে।

ভ্রূ কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল গ্রে। হ্যাংগারে কোয়ালস্কিকে কিছু একটা বলেছিল ইলেনা। তারপরই মেয়েটা নিকোলাসের পাশে চলে যায়। কিন্তু এখন বোঝাই যাচ্ছে, শুনতে ভুল করেনি কোয়ালস্কি।

"ওই যে," আবারও বলল লোকটা। "অষ্টআশিটা জেলি বিন।"

প্রায় ফিসফিস আওয়াজে ফোনের ওপাশ থেকে ক্যাটের শব্দ ভেসে এল। "কী বলল? চেলা-বিন?"

"নাহ, জেলি বিন!"

নড করল কোয়ালস্কি। গ্রে ওর কথা শুনেছে বলে সন্তুষ্ট। এদিকে গ্রে'র বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে এমন মুহূর্তে ওরা জেলি বিন নিয়ে কথা বলছে!

এদিকে পেইন্টার, ক্যাট আর ম্যালকম নিজেদের মাঝে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কী বলছেন তারা, তা ঠিক পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছে না গ্রে। তবে ক্যাট রক্ত দিয়ে অষ্টআশি লেখা বা এধরনের কিছু একটা বলল বলে ওর মনে হলো!

হঠাৎ কথা বলে উঠলেন ম্যালকম। উদ্দেশ্য গ্রে আর ক্যাট, দুজনকেই শোনানো। "আচ্ছা, শব্দটা আসলে চেলিয়াবিংস্ক না তো?"

"চেলিয়াবিংস্ক?" কোয়ালস্কিকে জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

কান খাড়া করল বিশালদেহী লোকটা, কিন্তু শুনে শ্রাগ করল কেবল।

কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠেই বলল গ্রে, "হতে পারে।"

একমত ক্যাটও।

দ্রুত বেগে কথা বলে উঠলেন ম্যালকম, উত্তেজিত হয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে। "নামটা আমি আগে শুনেছি। এখানকার এতো ঝামেলার কারণে শব্দটার গুরত্ব এতোক্ষণ ধরতে পারিনি।"

"গুরুত্ব? গুরুত্ব বলতে?" চাপ দিলেন পেইন্টার।

"ডা. পোকের দেহের কথা মনে আছে? চেরনোবিলে ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়ামের যে অনুপাতে সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হতো, সেই একই অনুপাতে, একই সংমিশ্রণ পাওয়া গিয়েছে লোকটার ফুসফুসে। তবে অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের সন্দেহে ফেলে দিয়েছিল। প্রথমে যেমন সোজাসাপ্টা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিলো, আসলে তেমন ছিল না। মনে হচ্ছিলো, তার দেহ যেন একাধিক তেজস্ক্রিয় উৎসের সংস্পর্শে এসেছিল। তবে চেরনোবিল থেকে বেশি মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা তার দেহে প্রবেশ করেছিল বলেই আমি নিশ্চিত।"

"এসব থেকে কী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন?" জানতে চাইল ক্যাট।

"আমার সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম আণবিক শক্তি সংগঠনের ডাটাবেসকে। ওদের কাছে সব তেজস্ক্রিয় এলাকার ম্যাপ করা আছে। কিন্তু একটা এলাকায় তেজস্ক্রিয়তা এতো বেশি আর এতো ভিন্ন ধরনের যে, কোনও একটা বৈশিষ্ট্যকে আলাদাই করা যায় না। জায়গাটার নাম চেলিয়াবিংস্ক, রাশিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত। ওখানকার ইউরাল পর্বতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম উত্তোলন করতো। পাঁচ দশক ধরে ওখানে কাউকে পা পর্যন্ত রাখতে দেয়া হয়নি। এই গত কয় বছরে নিষেধাজ্ঞাটা একটু শিথিল করা হয়েছে।" পরবর্তী বাক্যটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একটু বিরতি নিলেন তিনি। "চেরনোবিলে ব্যবহার্য জ্বালানীর গুদামঘর ছিল এই চেলিয়াবিংস্ক।"

সোজা হয়ে বসল গ্রে। "আপনার ধারণা, এই জায়গাতেই ড. পোক তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছিলেন? রিঅ্যাক্টর থেকে নয়?"

"আমার তাই ধারণা। এমনকি যে সংখ্যাটা বললে-অষ্টআশি। সোভিয়েতেরা ইউরাল পর্বতের নিচে খনি শহর স্থাপন করেছিল। নাম দিয়েছিল উপরের এলাকার নামানুসারে। এই যেমন, চেলিয়াবিংস্ক চল্লিশ, চেলিয়াবিংস্ক পঁচাত্তর।"

চেলিয়াবিংস্ক ৮৮!

তেজি ঘোড়াকে হার মানাবে বলে যেন পণ করেছে গ্রে'র হৃৎপিণ্ড। বুঝতে পেরেছে, ওদেরকে কোথায় যেতে হবে এখন।

পেইন্টারও বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। "আমি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে জানিয়ে দিচ্ছি। বলে দেব যে, একটু বাঁকা পথে এগোতে হবে তোমাদের। একঘন্টার মাঝে তোমাদেরকে জায়গামতো পৌঁছে দেবে ওরা।"

মনে মনে প্রার্থনা করল গ্রে, এখনও যেন সময় থাকে।

নয়ত মারা যাবে কোটি কোটি মানুষ!

এদিকে দ্বিতীয় চেক-পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে লিমোজিন। বিরস বদনে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রহরী ওদেরকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। "কিন্তু কমান্ডার, সময় কম বলে তোমার কাছে কোনও সাহায্য পৌঁছাতে পারব না সম্ভবত," বলে উঠলেন পেইন্টার।

লিমোজিন নিষিদ্ধ এলাকা ছেড়ে মুক্ত এলাকায় চলে এলে মুখ খুললো গ্রে, "মনে হয় না সমস্যা হবে।"

রাস্তার দু'পাশে পুরনো মডেলের একগাদা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, কম করে হলেও এক ডজন হবে। লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে সবগুলো।

রোজারোর দিকে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে কীসব যেন বলল লুকা। সাথে সাথে লিমোজিনের গতি কমিয়ে আনল মেয়েটা। সোজা হয়ে বসে, জানালা দিয়ে হাত বের করে দিল জিপসিসর্দার।

ওর ইঙ্গিতটা যেকোনও দেশের মানুষই বুঝতে পারবে।

পেছন পেছন এসো।

লিমোজিন আবার চলতে শুরু করার সাথে সাথে পিছু নিলো ট্রাকগুলোও। ডিরেক্টর ক্রো-এর মতোই, লুকা হার্নও সতর্কবার্তা জানিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

রোমানিদের ব্যাপারে বলা লোকটার একটা কথা মনে পড়ল গ্রে'রঃ আমরা সবখানেই আছি।

কথা সত্যি।

লিমোজিনের পেছনে এখন জিপসীদের এক বিশাল সেনাদল!

সকাল ১১:৩৮
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

খনির যতো ভেতরে প্রবেশ করছে, ততোই মঙ্কের মনে হচ্ছে যে, জায়গাটা পরিত্যক্ত। কোনও গলার আওয়াজ বা যন্ত্রের হুংকার কানে আসছে না। ভেবে স্বস্তি পাচ্ছে, হয়তো ওদের এখানে অনাহূত আগমন কেউ টের পাবে না। আবার কেমন যেন চাপও বোধ করছে স্নায়ুর উপর।

পার্শ্ব-সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল মঙ্ক, আহত পা-টা খুব যন্ত্রণা করছে। মানচিত্র নেই বলে, কিছুটা আন্দাজ আর কিছুটা পড়ে থাকা সিগারেটের টুকরা

অনুসরণ করে এগোতে হচ্ছে ওকে। সেই সাথে আছে বালিময় মেঝেতে আবছা বুটের ছাপ।

এই মুহূর্তে পরিত্যক্ত হলেও, সদ্যই যে খনিটা ব্যবহার করা হয়েছে তার অনেক প্রমাণ পেয়েছে মঙ্ক। তার মাঝে রয়েছে বাক্স ভর্তি বরফ-গলা পানি আর সেই পানিতে ভাসতে থাকা বিয়ারের বোতল।

কনস্টানটাইন ওর বোনকে নিয়ে পেছন পেছন আসছে। তবে পিওতর যেন একদম আঠার মতো লেগে আছে মঙ্কের সাথে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বাচ্চাটা। গায়ে জ্বর আছে এখনও, ভয়ে আকড়ে ধরে আছে দলের একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক লোকটাকে। বদ্ধ জায়গা নিয়ে ভয় পাচ্ছে না ছেলেটা, ভয় পাচ্ছে অন্ধকারকে।

মার্তা ছেলেটার প্রায় গা ঘেঁষে হাটছে। এমনকি শিম্পাঞ্জিটাও যেন অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে, মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে প্রানিটা।

যে পার্শ্ব সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটছিল ওরা, সেটা নিম্নমুখী। ওটার শেষ মাথায় এসে দেখতে পেল, সামনে একটা রেললাইন আর সেই সাথে অলস দাঁড়িয়ে থাকা একটা কনভেয়ার বেল্ট। বুটের ছাপের খোঁজে ভালোমতো মেঝেটার উপর নজর বুলাল সে। এই প্যাসেজের একদম শেষ মাথায় আলো দেখতে পেল বলে মনে হলো। পিওতরকে নিজের পাশে এনে, জ্বালিয়ে দিল ফ্ল্যাশলাইটটার সুইচ।

প্যাসেজের শেষ মাথায় আসলেই আলো দেখা গেল!

মঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াল কনস্টানটাইন।

"আর আলো জ্বালানো যাবে না," বলে বাচ্চাটার হাতে ফ্ল্যাশ লাইটটা ধরিয়ে দিল মঙ্ক। জায়গাটা দেখে পরিত্যক্ত মনে হলেও, আসলে পরিত্যক্ত না। আর তাই যারা এখানে আছে, তাদেরকে নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ দিতে চায় না সে।

মৃত রাশিয়ান স্নাইপারের কাছ থেকে পাওয়া রাইফেলটা তুলে ধরল ও। "এবার নিঃশব্দে এগোতে হবে।"

প্যাসেজের একদম দেয়াল ঘেষে এগোল মঙ্ক, ওর দেখাদেখি বাচ্চারাও। দেয়াল না ঘেঁষে, রেললাইনের উপর পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছে মার্তা।

টান টান হয়ে আছে মঙ্কের সবগুলো স্নায়ু। কান পেতে রয়েছে ক্ষীণতম আওয়াজের আশায়। কিন্তু কেবল ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল। পাশেই যে লেক করাশয়, সেটা ভোলেনি ও।

সেই সাথে নাকে এসে লাগল একটা গন্ধ। তেল, গ্রিজ আর পোড়া ডিজেলের গন্ধের সংমিশ্রণ যেন। কিন্তু বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছাতেই, আরেকটা গন্ধ পেল মঙ্ক। বিশ্রী, প্রানিজ একটা গন্ধ।

সাবধানতার সাথে বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, প্যাসেজটা একটা বিশাল গুহায় এসে শেষ হয়েছে। মানুষের হাতে তৈরি গুহাটা। চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-এর এক শতাংশ হবে আয়তনে। কিন্তু উচ্চতায় প্রায় তিন তলা সমান লম্বা।

মেঝের প্রায় পুরোটা জড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। এমনকি এক পাশে একটা বিশালাকায় ড্রিল মেশিনও আছে। দেখে মনে হচ্ছে, একদম আচমকা পরিত্যাগ করা হয়েছে জায়গাটাকে।

মন্দের ভালো, অন্তত আলোটা তো জ্বালিয়ে রেখেছে!

গুহার অন্য পাশে জ্বলছে বেশ কয়েকটা সোডিয়ামের বাতি।

"সাবধান," বলতে বলতে মঙ্ক বাচ্চাদেরকে কিছুটা পিছিয়ে থাকার ইঙ্গিত দিল। দরকার হলেই যেন এই জঞ্জালের মাঝে আত্মগোপন করতে পারে, সেই আশায়।

নিজে নিচু হয়ে এগিয়ে গেল। কাঁধের কাছে রাইফেলটা ধরে আছে। এগোচ্ছে এঁকেবেঁকে, খুব সাবধানতার সাথে পা ফেলছে। অন্য পাশে পৌঁছে দেখতে পেল, এখানেও রয়েছে কয়েকটা স্টীলের দরজা। শক্ত করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সবগুলো। খনির দরজার চাইতে এগুলোর বয়স কম বলে মনে হলো। ডানদিকে একটা ছোট তাবু দাঁড়িয়ে আছে, আকারে টোল বুথের সমান হবে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের মনিটর, কী-বোর্ড আর অনেকগুলো সুইচ দেখতে পেল মঙ্ক।

কেউ নেই এখানে।

হঠাৎ সে টের পেল, হাতে ধরা রাইফেলটা কাঁপছে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে শরীর। বড় করে শ্বাস টানল। একটু আগের বাজে গন্ধটা এখন আরও বেশি করে নাকে বাজছে। বাদিকে তাকিয়ে মঙ্ক দেখতে পেল, একগাদা যন্ত্রের পাশে কালো তেল পড়ে আছে। ঘাড় বাঁকিয়ে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করল সে।

তেল না, রক্ত।

গন্ধটার উৎস খুঁজে পেল মঙ্ক। পেছনের দেয়ালের কাছে স্তুপাকারে পড়ে আছে অনেকগুলো মরদেহ। ওদের পরণে খনি শ্রমিকদের পোষাক আর নয়তো সাদা ল্যাব কোট। দেয়ালের সাথে লেপ্টে আছে রক্তের ছোপ। ফায়ারিং স্কোয়াড ব্যবহার করে মারা হয়েছে এদেরকে!

কেউ একজন সুতোর ছেড়া অংশগুলোকে কেটে ফেলতে চাইছে!

ওর পেছন দিকে দেখা গেল কনস্টানটাইনকে, আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মঙ্ক ওকে দেখে মাথা নাড়ল, ইশারায় দেখিয়ে দিল তাবুটাকে। বাচ্চাদেরকে এই দৃশ্য দেখতে দিতে চায় না। সেই সাথে পিওতর আর কিস্কাকে যেখানে আছে, সেখানেই থাকার ইঙ্গিত দিল।

মঙ্কের সাথে সাথে বন্ধ দরজার দিকে এগোল কনস্টানটাইন। "আমি এখানে আগেও এসেছি," বলল ছেলেটা। "মাঝে মাঝে আমাদেরকে ট্রেনে চড়ার অনুমতি দেয়া হতো। এই হলো কন্ট্রোল।"

"কীভাবে কাজ করে, দেখাও তো।" বলল মঙ্ক।

কনস্টানটাইন এরিমাঝে জানিয়ে দিয়েছে যে, জেনারেল-মেজরের অপারেশন স্যাটার্ন নামের ভয়াবহ পরিকল্পনাটার ঘটনাস্থল দরজার ওপাশেই।

তাঁবুতে এসে প্রবেশ করল দুজনে। মনোযোগ দিয়ে কন্ট্রোলগুলোকে পরখ করল কনস্টানটাইন। এক মুহূর্ত পরেই, যেন উড়তে শুরু করল ছেলেটার দু'হাত। গভীর

আত্মবিশ্বাসের সাথে কয়েকটা সুইচ চালু করে দিল। যেন জন্ম থেকে এই কাজটাই করে আসছে।

কনস্টানটাইনের কাজ করার ফাঁকে জানতে চাইলো মঙ্ক, "তুমি অপারেশন স্যাটার্নের ব্যাপারে জানলে কী করে?"

বিব্রত চোখে ওর দিকে তাকাল ছেলেটা। "আমার দ্রুত হিসাব করার আর সঠিক সিদ্ধান্তটা বের করে আনার ক্ষমতার কারণে। প্রায়ই ওয়ারেনের কম্পিউটার ল্যাবে কাজ করতাম আমি।" শ্রাগ করল সে।

বুঝতে পারল মঙ্ক। "হ্যাক করেছিলে?"

আবারও শ্রাগ করল কনস্টানটাইন। "এক সপ্তাহ আগের কথা। সাশা-পিওতরের বোন, আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল। তাও মাঝরাতে! পিওতর তখন দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছিল বলে আমরা সবাই জেগেই ছিলাম।"

"কেমন ছবি?"

"এখানকার ট্রেনটার ছবি। অনেকগুলো বাচ্চা ছিল ট্রেনে, সবাই মৃত আর আগুন জ্বলছে তাদের দেহে। এই দরজার ওপাশের এলাকাটুকুও ছিল ছবিতে। তাই পরের দিন...হ্যাক করে বের করে এনেছিলাম অপারেশনের ফাইল। কী ঘটতে যাচ্ছে, কবে ঘটতে যাচ্ছে, সবই জেনে গিয়েছিলাম। কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কাউকে বিশ্বাসও করতে পারছিলাম না। সাশা তো ড. রাইভের সাথে আমেরিকায় চলে গেল, তাই পিওতরের সাথেই কথা বললাম।" মাথা নেড়ে সায় দিল ছেলেটা। "আমি জানি না পিওতর ব্যাপারটা জানতো কীভাবে...আসলে মাঝে মাঝে এমন হয় ওর সাথে!"

মঙ্কের দিকে তাকাল কনস্টানটাইন, বুঝতে পেরেছে কী না, দেখতে চাইছে।

পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, মাথা নাড়ল মঙ্ক। "কী জানতো পিওতর?" চাপ দিল সে।

"মানুষের অনুভূতি পড়তে পারে ছেলেটা। ওর মনে হয়, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। এমনকি তোমার নামও জানত সে। ওর বোন নাকি স্বপ্নে দেখে তোমার নাম জানিয়েছিল। খুবই প্রতিভাবান ওরা দুজনই।"

ছেলেটার কণ্ঠে ভয়ের ছাপ ধরতে পারল মঙ্ক।

পিওতরের দিকে একবার ফিরে তাকাল কনস্টানটাইন, এরপর আবার কাজে মন দিল। "তাই তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমরা।"

শেষ একটা সুইচ চিপে দেবার সাথে সাথে আলোকিত হয়ে উঠল মনিটরগুলো। সাদা-কালো ছবি দেখা যাচ্ছে ওতে। বিভিন্ন কোণ থেকে শুধু একটা ছোট গুহা-ই ফুটে আছে। মেঝেতে বড় একটা ইস্পাতের রিং-এর মতো দেখা যাচ্ছে।

ওটাই নিশ্চয় অপারেশন স্যাটার্নের কেন্দ্র।

একদম মাঝের পর্দার উপর নজর পড়ল মঙ্কের। খনি এলাকার ঠিক বাইরে একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে ওতে। বগিগুলো বাচ্চা-কাচ্চা দিয়ে ভর্তি। কয়েকজন বগি থেকে নেমে এসেছে, বিভ্রান্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। অন্যরা হাসছে...খেলছে...

মঞ্চের হাতা ধরে টান দিল কনস্টানটাইন, "ওরা পৌঁছে গেছে..."

উজ্জ্বল আলোতে বসে আছেন সাভিনা, দুপাশে দুজন টেকনিশিয়ান। সব কিছু ঠিক আছে কিনা, শেষ বারের মতো দেখে নিচ্ছে দুটো কম্পিউটারে ।

স্টেশনটা একটা পরিত্যক্ত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর নিচে অবস্থিত। জানালা নেই কোনও। এল.সি.ডি. পর্দাগুলো ছাড়া বাইরের দুনিয়া দেখার আর কোনও উপায় নেই ওদের। সুড়ঙ্গ আর অপারেশনের এলাকার দৃশ্য দেখাচ্ছে ওগুলো।

এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটার দিকে তাকালেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় বসে থাকতে পারছেন না। পিঠে কট করে একটা আওয়াজ হলো, কাজের চাপে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন নিতে ভুলে গিয়েছেন। অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন দৃষ্টি। দেখতে কষ্ট হচ্ছে বলে না, ব্যাথার সাথে দুশ্চিন্তাও পেয়ে বসেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে এগারোটার বেশি বাজে। এখনও নিকোলাসের কাছ থেকে কোনও খবর পাননি। অন্যরা যেন কাঁপতে থাকা হাত দেখতে না পায়, সেজন্য কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। একজন মায়ের পক্ষে দুশ্চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি শুধু এক মা-ই নন, একজন জেনারেল-মেজরও! সিঁড়ি বেয়ে উপরের লেভেলের দিকে এগোলেন তারপর। কোনও উদ্দেশ্য নেই, দাঁড়িয়ে না থাকার ইচ্ছাটাই তাকে স্থানান্তরিত করছে।

ইতোমধ্যে চেরনোবিলে একটা "অ্যাক্সিডেন্ট" হবার কথা ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তচর সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। সবাই বলাবলি করছে যে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকে মারাও গিয়েছে। জায়গাটাকে পরিত্যাগ করছে সবাই। যদি নিকোলাস নিজের কাজে সফল হয়, পরিত্যাগ করেও কোনও লাভ হবে না। হয়তো ওখানকার বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়ায় খবর পাঠাতে পারেনি তার ছেলে। আর মিনিট চল্লিশেক পরে, এখানে কাজ শুরু করে দেবেন তিনি। অপেক্ষা শুধু নিকোলাসের খবরটা পাঠাবার।

অবশ্য নিকোলাস যেমন মানুষ, তাতে হয়তো এতোক্ষণে সাফল্য উদযাপনের জন্য ইলেনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তার পাশাপাশি রাগও হচ্ছে তার।

অবশেষে উপরের তলায় এসে পৌঁছালেন তিনি। এখানে এখন টেকনিশিয়ানরা থাকে। শোবার ঘর, ব্যায়ামের জায়গা, ডাইনিং টেবিল আর সোফা ভর্তি একটা বিশাল বড় রুম আছে এই তলায়। এই মুহূর্তে অবশ্য পুরো তলাটা দখল করে আছে দশজন বাচ্চা। প্রত্যেককে চেনেন সাভিনা, এমনকি তাদের নামও জানেন।

জেনারেল-মেজর ঘরে প্রবেশ করতেই, একসাথে সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল। এই দশজনের মানসিক ক্ষমতা এতো বেশি যে, কল্পনাতেও ধরতে পারেন না তিনি।

বরিস নামের তেরো বছর বয়সী এক ছেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ছেলেটার চোখ এমন নীল যে, দেখে বরফ বলে ভ্রম হয়। এই ছেলেটার স্মৃতিশক্তি এতোটাই অসাধারণ যে, নিজের জন্মের কথাও মনে করতে পারে ও।

"আমাদেরকে কেন অন্যদের সাথে যেতে দেওয়া হলো না?" জানতে চাইলো।

দশটা বাচ্চার অনেকেই মাথা নাড়লো, প্রশ্নটা তাদেরও।

উত্তর দেবার আগে ঢোক গিললেন সাভিনা। "তোমাদের জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছো?"

কোনও জবাব না দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সবাই। উত্তরের দরকার নেই কোনও, ব্যাগ গোছানোই আছে।

"এক ঘন্টার মাঝে রওনা দেবো আমরা।" বললেন সাভিনা।

দশ জোড়া চোখ এক দৃষ্টিতে এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পেছন থেকে পদশব্দ ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, একজন টেকনিশিয়ান এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

"জেনারেল-মেজর," বলল সে। "ওপাশের তেজস্ক্রিয়তা নিরোধী দরজা নিয়ে কিছু ঝামেলা হয়েছে। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি আমরা।"

মাথা নাড়লেন তিনি, সমস্যার দিকে নজর দিলে মনটাও অন্য চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

টেকনিশিয়ানের পিছু পিছু সিঁড়ির দিকে এগোলেন সাভিনা। তবে মনে হচ্ছিল, ওই দশ জোড়া চোখ যেন এখনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকটা পালাবার জন্যই গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

"দরজা খুলে দাও!" কনস্টানটাইনকে বলল মঙ্ক।

সাথে সাথে নির্দেশটা পালন করল ছেলেটা। দুই ভাগে ভাগ হয়ে খুলতে শুরু করেছে দরজা।

দৌড়ে মঙ্কের কাছে চলে এল কনস্টানটাইন, হাঁপাচ্ছে। "পাঁচ মিনিট সময় পাবে মাত্র।" সাবধান করে দিল।

বুঝতে পেরেছে মঙ্ক। বাচ্চাদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনার জন্য এই সময়টুকুকে কাজে লাগাতে হবে। বুদ্ধিমান ছেলেটা পুরো সিস্টেম রিবুট করে দিয়েছে। তাই ক্যামেরাও এই কয় মিনিট বন্ধ থাকবে।

অন্য পাশে অবস্থিত কন্ট্রোল সেন্টার ব্যাপারটা বোঝার সাথে সাথে এই তাঁবুর বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দেবে। এর অর্থ, একমাত্র সুযোগ এটা।

দরজা খোলার সাথে সাথে কোনওক্রমে নিজের দেহটাকে ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিল মঙ্ক। কনস্টানটাইন আর মার্তাও পিছু নিলো। এমনকি বয়স্ক শিম্পাঞ্জিটা খুব দ্রুতই মঙ্ককে ছাড়িয়েও গেল।

একশ' গজ দূরে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে।

বাহনটার দিকে দৌড় দিল মঙ্ক, অবশ্য দৌড় না বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোনো বলাই ভালো। পেছন থেকে রাশিয়ানে চিৎকার করে উঠল কনস্টানটাইন। ট্রেনের সবাইকে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে ছুটতে বলছে, সেই সাথে পাগলের মতো হাত নাড়ানো তো আছেই।

"ট্রেনটা ফাঁকা করো," বলল মঙ্ক। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, চলা শুরু করা দরকার।" দুই হাতে দুটো রাইফেল নিয়ে এগোচ্ছে। প্রতিটায় আছে ষাট রাউন্ডের

ম্যাগাজিন। ট্রেন কীভাবে চালাতে হবে, সে ব্যাপারে কনস্টানটাইন ওকে কিছু জ্ঞান দান করেছে বটে। কিন্তু তা একদম অপ্রতুল।

একদম সামনের ক্যাবে উঠে, লিভারটা উপরের দিকে তুলে ধরো!

মঙ্ক ইংরেজিতে চেঁচিয়েই চলেছে, "সবাই ট্রেন থেকে নামো!" সেটাকে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছে কনস্টানটাইন।

কিন্তু তবুও এক মিনিট বিশৃঙ্খল হয়ে রইল ট্রেনের অবস্থা। বাচ্চা তো, তাই কেউ কেউ চিৎকার করছে আবার কেউ করে কাঁদছে! কয়েকজন তো ওকে আঁকড়েও ধরল। তবে ভালো খবর হলো, এই বাচ্চাদেরকে আদেশ পালন করা শেখানো হয়েছে। সেই প্রশিক্ষণ আস্তে আস্তে ওদের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

শৃঙ্খলা ফিরে আসায়, একদম শেষের ঢাকা বগিটার কাছে প্রায় বিনা বাঁধায় পৌঁছে গেল মঙ্ক। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঠে, একদম সামনের বগির দিকে এগোল। ড্রাইভারের আসনটার দুপাশে লাল আর সবুজ রঙে রাঙানো দুটি দণ্ড। সবুজটা সামনে এগোবার জন্য আর লালটা ব্রেক। একটা ড্যাশবোর্ডও আছে, ইঞ্জিনে চাপের মাত্রা আর ভোল্টেজের রিডিং দিচ্ছে।

অপেক্ষার বিলাসিতা করার সুযোগ নেই মঙ্কের। জানালা দিয়ে মুখ বাইরে বের করে চিৎকার করে উঠল, "কনস্টানটাইন!"

"আমরা তৈরি! যাও!"

এতেই চলবে।

সবুজ দণ্ডটা উপরের দিকে ঠেলে দিল মঙ্ক। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল কিছু। অনেকটা টলতে টলতে চলা শুরু করল বাহনটা।

আর মাত্র চার মিনিট বাকি আছে।

ক্যামেরা চালু হবার আগেই, সুড়ঙ্গের অন্য মাথায় ট্রেনটা নিয়ে যাওয়া দরকার। সুড়ঙ্গ থেকে বাচ্চাদের বাইরে বের করে নিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে কনস্টানটাইনকে। গিয়ার বন্ধ করে দরজা জ্যাম করার নির্দেশও ছেলেটাকে দিয়েছে মঙ্ক।

আরও একটা কাজ করতে হবে কনস্টানটাইনকে।

মাইনারদের ব্যবহার্য এক জোড়া রেডিও নিয়ে এসেছিল মঙ্ক। সুড়ঙ্গের অন্য মাথার দরজার কাছে পৌঁছাবার পর, ছেলেটাকে ওটা খোলার নির্দেশ দেবে। পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ হলে, প্রতিপক্ষকে চমকে দেবার সুবিধাটুকু পাবে ও, সেই সাথে হাতে দুটো গুলি ভর্তি রাইফেল তো আছেই। বিপদজনক পরিকল্পনা- সন্দেহ নেই। কিন্তু আর করার কি-ই বা আছে ওর? যে করেই হোক প্রধান কন্ট্রোল স্টেশনের দখল নিতে হবে।

প্রথমে ভেবেছিল খনি এলাকাটা স্যাবোটাজ করবে। কিন্তু পরিকল্পনা শুনেই সাদা হয়ে গিয়েছিল কনস্টানটাইনের চেহারা। পঞ্চাশটা বোমা- প্রতিটার সাথে রেডিও ডেটোনেটরের সংযোগ দেয়া। এমনকি এই চার মিনিটে যদি আধা কিলোমিটারও

এগোতে পারে, তবুও ওগুলো অসাবধানতার সাথে নড়াচড়া করলে যেকোনওবিপদ তো হতেই পারে।

ব্যাপারটা ওখানেই শেষ।

আস্তে আস্তে গতি বাড়ছে ট্রেনটার। মাঝে মাঝে থাকা আলোর উৎস আর সামনের ক্যাবের হালকা আলো সুড়ঙ্গের অন্ধকারের সাথে লড়াই করে হার মানছে বারবার। আচমকা দেয়ালে কিলোমিটারের মাপের চিহ্ন নজরে পড়ল মঙ্কের। কনস্টানটাইনের মতে, সুড়ঙ্গটা প্রায় চার কিলোমিটার লম্বা।

দম বন্ধ করে মনে মনে ষাট সেকেন্ড গুনলো মঙ্ক। ডান দিকের দেয়ালে লেখা "২" নজরে পড়ল।

অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে।

খুব বেশি হলে বাড়তি ত্রিশটা সেকেন্ড সময় পাবে।

খুব ভালো না হলেও, মন্দ না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে, এমন সময় বন্ধ হয়ে এল আলো। যেন ঈশ্বর নিজ হাতে সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন।

ট্রেনটাও খক খক করে উঠল। বিদ্যুৎ ছাড়া বেচারা যে আর সামনে এগোতে পারবে না!

ওর বেশ কিছুটা পেছনে, মানে ট্রেনের পেছন থেকে ভেসে এল একটা বাচ্চার ভয়ার্ত চিৎকার। শক্ত হয়ে গেল মঙ্কের দেহ, চিনতে পেরেছে কণ্ঠটা।

পিওতর।

কন্ট্রোল স্টেশনের অন্ধকার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন সাভিনা। দরজার ঝামেলার কথা বলে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে এক টেকনিশিয়ান। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পেলেন, ক্যামেরাগুলো বন্ধ হয়ে আছে!

কিন্তু কাজটা করল কে!

সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মনে। ঝামেলা আছে কোথাও। চুপচাপ বসে থাকার চাইতে, কড়া পদক্ষেপ নেয়া ভালো। আর তাই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

"এম.সি. তিনশ সাইত্রিশ।" বললেন সাভিনা। "খনি এলাকায় একটা সাব-স্টেশন আছে।"

এক টেকনিশিয়ান মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"যতদূর মনে পরে, ওখানে একটা ক্যামেরা আছে।"

আবারও মাথা নাড়লো লোকটা-চোখ বড়বড় হয়ে আছে। "টানেলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই ওটার।"

"ওটাকে মনিটরে নিয়ে এসো তো।" আদেশ দিলেন জেনারেল-মেজর।

টেকনিশিয়ানটা, যে কিনা আবার একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারও, কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মাঝেই জীবন্ত হয়ে উঠল একটা পর্দা।

বিশেষ এই ক্যামেরাটা কেবল সাদা-কালো ছবিই দেখাতে পারে। তাও তাক করে আছে যেখানে ওপাশের অপারেটরের বসে থাকার কথা, সেদিকে।

সামনে ঝুঁকে এলেন সাভিনা। খোলা দরজা দিয়ে অনেকগুলো বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে। যে বাচ্চারা ট্রেনে উঠেছিল, তারাই!

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন সাভিনা। কিন্তু যখন একটা লম্বা, কালো চুলের ছেলেকে দেখতে পেলেন, রাগে শক্ত হয়ে গেল তার চেহারা। একে চেনেন তিনি।

কনস্টানটাইন।

হচ্ছেটা কী এখানে?

সকাল থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে এখানে, তাতে তিনি লেফটেন্যান্ট বরসাকোভের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। আমেরিকান আর পলাতক তিন বাচ্চার খোঁজে বের হয়েছিল লোকটা। মনে হয়, ব্যর্থ হয়েছে সে।

তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এরা এখানে কী করছে?

বাচ্চাদের ভিড়ের দিকে ভালো করে তাকালেন তিনি, আমেরিকান আর অন্য দুজনকে দেখতে পাওয়া যায় যদি! তবে ওই দুজনের মাঝেও বিশেষ একজনকে চাচ্ছিলেন তিনি।

যে করেই হোক, বাচ্চাটাকে তার ফিরে পেতেই হবে।

ঘন, কালো অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে পিওতরের। মার্তা ওকে জড়িয়ে ধরেও শান্ত করতে পারছে না। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আগেই পেছনের বগিতে উঠে বসেছিল।

পিওতর জানে, ওকে আমেরিকান লোকটার সাথে থাকতে হবে।

কিন্তু এই দম বন্ধ করা অন্ধকার...

আঁতকে উঠল পিওতর। ওর দুঃস্বপ্ন যেন সত্য হতে চলেছে। এই স্বপ্নটা এর আগেও বহুবার দেখেছে ও। দেখেছে ওর ছায়া যেন বড় হয়ে উঠে গিলে খাচ্ছে ওকেই। একসময় অন্ধকার ছাড়া অবশিষ্ট রইল না আর কিছুই। ছায়ার হাত থেকে বাঁচার উপায় মাত্র একটাই-নিজ দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়া। ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার করতে করতে জেগে ওঠে ও।

অন্য বাচ্চারাও ওকে একটা কথা জানিয়েছে। তারাও নাকি স্বপ্নে ওর গায়ে আগুন ধরে যেতে দেখেছে! প্রথম প্রথম ভেবেছিল, মজা করছে অন্যরা। কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা গেল, সবাই অদ্ভুত চোখে বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছে। কথা বলাও কমিয়ে দিয়েছে, খেলাধুলার তো প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষকরাও রেগে উঠলেন ওর উপরে, বলছিলেন যে অন্য বাচ্চাদের শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ও!

ভয় পেয়েছিল পিওতর নিজেও। তা-ও কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখে। আর এখন তো অন্ধকার নিজেই ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলোর খোঁজে যেন প্রায় পাগল হয়ে উঠল ছেলেটা। কিন্তু নেই...এক বিন্দু আলোও নেই কোথাও!

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে আলপিনের মাথার মতো বিন্দু বিন্দু আলো ভেসে উঠল সামনে। যেন ওর ভয় টের পেয়েও কেউ এই আলোকে পাঠিয়েছে! প্রথমে দেখা গেল অল্প কয়েকটা বিন্দু, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই সংখ্যায় দ্বিগুণ, তারপর চারগুণ হয়ে উঠল সংখ্যাটা। উপরের দিকে তাকাল ছেলেটা, আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে ছাদ।

তবে সত্যটা পিওতরের অজানা নেই-ওগুলো তারা নয়।

খাঁচায় বন্দি পাখির মতো ছটফট করছে ওর হৃদপিণ্ড। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আলোক বিন্দুগুলোর আকার। জানে, এই মুহূর্তেই পালানো উচিত...কিন্তু পারছে না। উল্টো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে চোখজোড়া...সেই সাথে বড় হচ্ছে ওর ভেতরের অন্ধকারটুকুও। সেটাও আলো খুঁজছে...গিলে ফেলতে চায়।

তারার পতন হচ্ছে যেন এখন। প্রথমে একটা, দুটো। এরপর দলবেঁধে বাচ্চাটার দিকে ছুটে আসছে। ট্রেনের মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল ও, ঠিক সেই মুহূর্তে যেন প্রবল আক্রোশে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আকাশ।

অনেক...অনেক দূর থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল।

ওর রহস্য জানে শুধু মার্তা।

কেবলমাত্র ভয় পেয়েই চিৎকার করে জেগে উঠতো না পিওতর। সাথে থাকত উল্লাসও!

কোনও একটা ভয়ানক ঘাপলা আছে বাচ্চাদের ভেতর।

বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবার পরও, এম.সি. ৩৩৭-এর পাঠানো ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন সাভিনা। শব্দ নেই, কিন্তু বাচ্চারা আতঙ্কিত, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো। কেবল কনস্টানটাইনের মাঝে কোনও ভয় বা আতঙ্ক দেখতে পাননি তিনি।

পিওতরের খোঁজে একটা চোখ সবসময়ই ওদিকে রেখেছেন জেনারেল-মেজর।

দশটা বিশেষ বাচ্চা আছে তার কাছে, কিন্তু তবুও বাচ্চাটা-

আচমকা...একদম আচমকা একটা বাচ্চাকে মেঝেতে আছড়ে পড়তে দেখলেন তিনি। পাশ্ববর্তী বাচ্চাটা ঘাড় ঘুরিয়ে পড়ে যাওয়া বাচ্চাটার দিকে তাকাল। এরপর নিজেও পড়ে গেল, যেন কেউ মুগুর দিয়ে আঘাত করেছে মাথায়। একে একে সবগুলো বাচ্চায় মেঝেতে পড়ে যেতে শুরু করল!

ইঞ্জিনিয়ার লোকটাও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। "বিষটা কাজ করতে শুরু করল নাকি?"

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাভিনা, কী হচ্ছে তা নিজেই ধরতে পারছেন না। যে তেজস্ক্রিয় বস্তুটা বাচ্চাদের দেহে আছে, সেটা উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত কাজই করবে না। অথচ ওই তাঁবুর আশেপাশে কখনই বিকিরণের মাত্রা খুব একটা বেশি ছিল না। এক মুহূর্ত পর, আবার দেখা গেল কনস্টানটাইনকে। একটা ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে আছে। মেয়েটা ওর বোন, কিস্কা। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকাল ছেলেটা, চোখে ভয়।

ঠিক তখনই রহস্যটা ধরতে পারলেন সাভিনা। সুইচ টিপলে যেমন বাতি আচমকা নিভে যায়, তেমনি মুহূর্তের মাঝে কনস্টানটাইনের চোখ থেকে উধাও হয়ে গেল ভয়টুকু। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি নিয়ে ঢলে পড়ল এই ছেলেটাও।

বিষ হতেই পারে না!

কনস্টানটাইন বা কিস্কা, কেউই বিষটা খায়নি।

উপর থেকে ধুপ ধাপ শব্দ ভেসে এল। প্রথমে একটা...তারপর আরেকটা।

সেদিকে তাকালেন সাভিনা।

না...

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলেন তিনি। একেকবারে দুই ধাপ উঠছেন। তীব্র আর্তচিৎকার করে উঠল যেন পিঠটা। দমকা হাওয়ার বেগে বাচ্চাদের ঘরে প্রবেশ করলেন সাভিনা।

এই ঘরের বাচ্চারাও ঢলে পড়েছে মেঝেতে। দৌড়ে বরিসের কাছে পৌঁছালেন তিনি। পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে হৃতস্পন্দন খুঁজে পাবার চেষ্টা করলেন, একদম হালকা একটা ধাক্কা লাগল আঙুলে!

এখনও বেঁচে আছে!

বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরলেন সাভিনা। মণি বড় বড় হয়ে আছে, আলো ফেললেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালেন তিনি।

হচ্ছেটা কী এখানে?

২০
সেপ্টেম্বর ৭, রাত ২:১৭
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

দ্রুত পায়ে হল ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন পেইন্টার। ঝামেলা চান না, কিন্তু ঝামেলা তার পিছু ছাড়লে তো।

আক্রমণের পর থেকে, পুরো বাংকারটাই একদম লক-ডাউনে আছে। ম্যাপলথোর্পের আগুনে ঝলসে মৃত্যুর পর, অন্য আক্রমণকারীরা যেন পালিয়ে বেঁচেছে। ঠিক যেমনটা তিনি ভেবেছিলেন। তবে প্রত্যেককে খুঁজে বের করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পেইন্টার। সেই সাথে একেবারে সমূলে উৎখাত করবেন ম্যাপলথোর্পকে তথ্য আর রসদ দিয়ে সহায়তাকরীদেরকেও।

তবে তার আগে দরকার এখানকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা।

আহতদেরকে এরিমাঝে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মৃতদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। নিজস্ব ফরেনসিক টিম অকুস্থলে আসার আগেকিছু করার ইচ্ছা নেই ডিরেক্টরের।

এখানকার পরিস্থিতির সাথে সাথে, বিশ্বের নানা গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আসা মুহূর্মুহূ ফোনকলও সামলাতে হচ্ছে তাকে। চেরনোবিলের সন্ত্রাসী আক্রমণের ব্যাপারে জানার জন্য তাকে ফোন করছে সবাই। পেইন্টার কয়েকজনকে এটা সেটা বলে বুঝ দিচ্ছেন, তবে অধিকাংশকেই পাত্তা দিচ্ছেন না। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় নেই তার। কেবলমাত্র একজন কৃতজ্ঞ রাষ্ট্রপতির সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন তিনি। সেই কৃতজ্ঞতাবোধকে কাজে লাগিয়ে অন্যদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছেন।

কেননা আরেকটা আক্রমণের হুমকি যে সবার মাথার উপর ঝুলছে।

সেটাইকেই এখন বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

মূল সমস্যাও এখন ওটাই।

মেডিকেল লেভেলে পৌঁছে একটা রুমের সামনে এসে দাঁড়ালেন পেইন্টার। ভেতরে ক্যাট আর লিসা একটা বিছানার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিছানায় শুয়ে আছে সাশা, বাচ্চাটার কপালে ইইজি এর একটা লিড লাগাচ্ছে লিসা।

"আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

"নতুন কোনও সমস্যা হয়েছে," উত্তর দিল লিসা। "আগেরবারের মতো জ্বর এসেছে বলে মনে হচ্ছে না।"

দুপাশে দুই হাত বেঁধে দাঁড়াল ক্যাট, কপালে চিন্তার রেখা। "আমি ওকে গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম। ঘুমাতে পারছিল না বেচারী। মন দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ উঠে বসল। ঘরের

একটা ফাকা কোণের দিকে তাকিয়ে চিতকার করে উঠল পিওতর বলে। এরপর থেকেই এরকম অজ্ঞান অবস্থা।"

"পিওতর? ঠিক শুনেছ তো?"

নড করল ক্যাট। "ইউরি কাছে শুনেছিলাম, সাশার ওই নামে এক জমজ ভাই আছে। হয়তো ভ্রম হচ্ছিলো মেয়েটার।"

ওদের কথার ফাঁকে, একগাদা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে ফেলেছে লিসা। সাশার হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্ক, দুটোর উপরেই নজর রাছে ও।

"ওর মাথার টি.এম.এস. ডিভাসটা চালু আছে?" জানতে চাইলেন পেইন্টার।

"না," উত্তর দিল লিসা। "ম্যালকম এরিমাঝে এসে দেখে গিয়েছেন। টি.এম.এস.টা চালু না হলেও, কোথাও কোনও গণ্ডগোল আছে। রিডিং দেখ, মস্তিষ্কের সামনের অংশটায় অনেক বেশি কর্মকাণ্ড দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে এই যন্ত্রটা যেদিকে আছে, মানে ডান দিকে। মনে হচ্ছে যেন ওর ওই এলাকাটা, মানে টেম্পোরাল লোব-এ খিচুনি হচ্ছে। কমে গিয়েছে হৃদস্পন্দন, এমনকি রক্তচাপও কম। মনে হচ্ছে দেহ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সব রক্ত একটা অঙ্গের দিকেই পাঠাবে।"

"মস্তিষ্ক!" ধরতে পারলেন পেইন্টার।

"ঠিক, অন্য সব অঙ্গ যেন বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে।"

"কিন্তু কেন?"

"সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই।" মাথা নাড়লো লিসা। "আমি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব, কিন্তু তাতে লাভ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে করার মতো আমাদের হাতে একটা কাজই থাকবে।"

"আগে কারণটা বলো।" এবার ক্যাটের জানতে চাইবার পালা।

"টিএমএস কাজ করছে না এখন। কিন্তু ইইজি থেকে বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রটার আশেপাশের অংশের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঠিকই। যদি ওকে... মানে ওই এলাকাকে শান্ত না করা যায়, তাহলে হয়তো আপনাআপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে মস্তিষ্ক।"

সাদা হয়ে এল ক্যাটের চেহারা। "আর করণীয় কাজটা?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিসা, নিজের কাছেই যেন উত্তরটা পছন্দ হচ্ছে না। "টিএমএসটা সরাতে হবে। ম্যালকম এই মুহূর্তে জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালের এক নিউরোসার্জনের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলছেন।"

পেইন্টার এগিয়ে এসে ক্যাটের ঘাড়ে একটা হাত রাখলেন। জানেন মেয়েটা এই অল্প সময়ে সাশাকে বড় আপন করে নিয়েছিল। এখন এমন কথা শুনে...

"আমাদের ক্ষমতায় যতটা কুলায়, করব আমরা," বললেন তিনি।

মাথা নেড়ে সায় দিল ক্যাট।

কোমরে রাখা পেজারটা হঠাৎ বেজে উঠল, নাম্বারটা দেখলেন পেইন্টার। রাশিয়ান অ্যাম্বাসীর নাম্বার। এই নাম্বারটাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। গ্রে আর কয়েক মিনিটের মাঝে চেলিয়াবিংস্কে পৌঁছাবে।

পেজার থেকে চোখ তুলতেই দেখলেন, লিসা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে হাসছে। "যাও, এখানে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হলে জানাব।"

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ক্রো, হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসায় থমকে দাঁড়ালেন। ক্যাটকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটু আগে তোমার বলা কথাটা মনে হয় আমি ঠিক মতো শুনতে পাইনি।"

মুখ তুলে তাকাল ক্যাট।

"মঙ্ক বেঁচে আছে মানে?"

দুপুর ১২:২০
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

কালিগোলা অন্ধকারের মাঝেই ট্রেন থেকে নেমে গেল মঙ্ক। কব্জির কাটা অংশটুকু বগির সাথে লাগিয়ে লাগিয়ে রাস্তা আন্দাজ করছে। অন্য হাতটা মুখের সামনে ধরে রেখেছে।

ট্রেন থেকে মঙ্ক নেমে আসার ঠিক এক মুহূর্ত আগে, চিৎকার বন্ধ করেছে পিওতর। একদম হঠাত করেই বন্ধ হয়ে গেছে চিৎকার। হয়তো সে জন্যই অনেক বড় হয়ে কানে বাঁধছে নেমে আসা নীরবতাটুকু ।

পরবর্তী আকরিকের বগিতে পৌঁছে, নিজেকে টেনে উপর তুললো ও। ভালো হাতটা সামনে দুলিয়ে ডাকলো, "পিওতর?"

নিজের কাছেই কণ্ঠটাকে অনেক উঁচু বলে মনে হলো মঙ্কের। কিন্তু করার নেই কিছু, ছেলেটা ওকে অনুসরণ করেছে কিনা বা এখনও ট্রেনেই আছে কিনা, তাও ওর জানা নেই। এখন সামনে এগোবার পথ মাত্র একটাই-একটু একটু করে পিছিয়ে আসা।

আবার নেমে এসে সামনে এগোলো মঙ্ক। ডান হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনে-

-হঠাৎ করে হাতটা আঁকড়ে ধরল কেউ।

চমকে উঠল মঙ্ক, আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতো গলা ছেড়ে। ওর হাতটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে উষ্ণ, খসখসে কয়েকটা আঙুল। সেই সাথে ঈষৎ গরগর শব্দও ভেসে এল।

"মার্তা!" চিনতে পেরে অন্ধকারের মাঝেই বিশাল অবয়বটাকে জড়িয়ে ধরল মঙ্ক।

আলিঙ্গনের জবাব দিল প্রানিটাও, পুরো শরীর কাঁপছে বেচারার। তবে হাত ছাড়েনি মার্তা, উল্টো টানছে । যেন কিছু একটা দেখাতে চায়।

চুপচাপ অনুসরণ করল মঙ্ক, জানে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে প্রানিটা। নিশ্চয় পিওতরের কাছে! ধীরে ধীরে একদম শেষ বগিটার কাছে পৌঁছে গেল ও। অন্যগুলোর মতো খোলামেলা না এই বগিটা, বদ্ধ।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মার্তা।

মঙ্কও পিছু নিলো। বগির একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল বুড়ি শিম্পাঞ্জী। ওখানেই মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে পিওতর!

"পিওতর?"

কোনও উত্তর এল না।

তবে স্বস্তির সাথে মঙ্ক লক্ষ করল, ওঠা-নামা করছে ছেলেটার বুক। আহত নাকি? পড়ে গিয়েছিল? গায়ে জ্বর আছে বলে মনে হলো। আঁচমকা ছোট ছোট কয়েকটা আঙুল এসে আঁকড়ে ধরল মঙ্কের আঙুল।

"পিওতর! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," ছেলেটাকে মাথা উঁচু করতে সাহায্য করল মঙ্ক। এরপর টেনে নিলো কোলে। "চিন্তা করো না। আমি আছি তো।"

ছোট ছোট হাত দুটো আঁকড়ে ধরল মঙ্কের গলা। "যাও...," ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল ছেলেটা।

মঙ্কের মনে হলো, যেন ওর শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল পানির একটা প্রবাহ নেমে গেল। পিওতরের কণ্ঠটা ঠিক স্বাভাবিক না, অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি ভয়ার্ত বলে মনে হলো। সেই সাথে ছোট দেহটার অস্বাভাবিক কাঁপুনিও আছে। কিন্তু না, শব্দটার মাঝে অনুরোধ ছিল না। ছিল আদেশ।

খারাপ না কিন্তু বুদ্ধিটা!

উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল ও। আগের চাইতে ভারী বলে মনে হচ্ছে ছোট্ট শরীরটা। তবে ওজনের দিকে পাত্তা না দিয়ে, ওকে নিয়েই ট্রেনের সামনে চলে এল মঙ্ক। সাথে করে একটা রাইফেল এনেছিল বটে, তবে অন্যটা আগেই রেখে এসেছে সামনে।

প্রথম বগির কাছে এসে প্রশ্ন করল মঙ্ক, "তুমি কী-?"

প্রশ্নটা শেষ হবার আগেই কোল থেকে নেমে দাঁড়াল পিওতর।

"এখানেই থাকো," বলে ভেতরে প্রবেশ করল মঙ্ক। দ্বিতীয় রাইফেলটা খুঁজে বের করে কাঁধে ঝুলাল। ফিরে এসে ধরল পিওতরের হাত।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। কোন দিকে এগোবে এখন? ট্রেনটা সুরঙ্গের মাঝামাঝিতে এসে থেমে গিয়েছে। ফিরে গেলে কনস্টানটাইন আর অন্য বাচ্চাদের সাথে দেখা হবে। তবে পাগল মহিলাকে থামাতে হলে সামনে এগোবার কোনও বিকল্প নেই।

পিওতর-ও সম্ভবত তাই ভেবেছে। চেলিয়াবিংস্ক ৮৮- এর দিকে রওনা দিল সে।

মাথা নাড়ল ডাক্তার। "আমি দুঃখিত, জেনারেল মেজর। বাচ্চাদের কী হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। এর আগে ওদের এমন অবস্থা আর হয়নি।"

ঘরের অন্য কোনার দিকে তাকালেন সাভিনা। এক জোড়া নার্স আর দুজন সৈন্য মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে বাচ্চা দশজনকে। দুজন ডাক্তারকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। ডা. পেত্রভের দক্ষতা স্নায়ুবিদ্যায়, আর ডা. রোস্ট্রোপোভিচ বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষ।

ভেড়ার চামড়া নির্মিত জ্যাকেট পরে দাঁড়িয়ে আছেন পেত্রভ। এখানে যখন আসতে বলা হয়, তখন এলাকাটা ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তারা। একগাদা ট্রাক আর অন্যান্য বাহন এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

"এদের কী হয়েছে, তা বোঝার জন্য আরও অনেক যন্ত্রপাতি দরকার।" বললেন তিনি। "আমরা এরিমাঝে সেসব যন্ত্রপাতি খুলে-"

"ওসব আমি জানি। মস্কোতে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু পৌঁছাতে পারব তো?"

"আমার তাই বিশ্বাস।"

সাভিনা দরজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কথাটার মাঝে অনিশ্চয়তার ভাব টুকু তার পছন্দ হয়নি।

আবার মুখ খুললেন পেত্রোভ, তবে এবার আরেকটু জোড়ালভাবে। "পারব।"

"তাহলে প্রস্তুতি নাও।"

"জ্বি, জেনারেল মেজর।"

বাকি সব কাজের দায়িত্ব মেডিকেল দলের হাতে ছেড়ে, নিজে বাংকারের দিকে এগোলেন সাভিনা। পুরোটা সময় রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স আর সেনাবাহিনীতে থাকা তার কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন তিনি। তবে চেরেনোবিল থেকে আসা তথ্যগুলো কেমন যেন অদ্ভুত আর উল্টোপাল্টা। অনেক ধরনের উড়ো খবর শোনা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে একটা কথাই জানা গিয়েছে-তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে ওখানে।

কিন্তু নিকোলাস এমন নীরব কেন?

ইতিমধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করা ধৈর্য্যের বাঁধে একটু বেশিই চাপ ফেলছে সবকিছু। সেই সাথে যোগ হয়েছে বাচ্চাদের এই অবস্থা।

সবকিছু বাদ দিয়ে, হাতের কাজের দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত তার। চেরোনোবিলে যা-ই হোক না কেন, অপারেশন স্যাটার্ন নিজ গতিতেই চলবে। এমনকী নিকোলাস ব্যর্থ হলেও, তিনি হবেন না। শুধুমাত্র তার অপারেশনের ফলেই নড়ে উঠবে বৈশ্বিক অর্থনীতি, মারা পড়বে লাখ লাখ মানুষ। শুধু তাই না, পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়ে থাকবে কেবলই তেজস্ক্রিয়তার রাজত্ব। কিন্তু এই "বিশেষ" বাচ্চাদের সহায়তায় কিছুই হবে না তার।

বাঙ্কারে পৌঁছে দেখতে পেলেন, এখনও কালো হয়ে আছে মনিটর। কেবল মাত্র এম.সি. ৩৩৭ এর ঝিরঝিরে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। পাথুরে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট দেহগুলো পরখ করে দেখলেন তিনি, কোথাও কোনও নড়াচড়ার আভাস পর্যন্ত নজরে এল না।

টেকনিশিয়ান দুজনের দিকে ফিরলেন তিনি। "অন্য ক্যামেরাগুলো এখনও চালু হচ্ছে না কেন?"

চীফ ইঞ্জিনিয়ার উঠে দাঁড়ালেন। "কয়েক মিনিট আগে কাজ শেষ হয়েছে। এখন আপনার আদেশেরই অপেক্ষা করছি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপালে আঙুল চেপে ধরলেন সাভিনা। সবাইকে কী মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হবে নাকি? বোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "চালু করো।"

রেগে উঠে চিৎকার করে উঠতে চাইছিলেন, কিন্তু সামলে নিয়েছেন নিজেকে। ক্যামেরা বন্ধ করে দেবার আদেশ যখন দিয়েছিলেন, তখন আবার চালু করতে হবে কিনা সে ব্যাপারে কিছু বলেননি। তাই এখন চেঁচামেচি করাটা ঠিক হবে না। ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে

এম.সি. ৩৩৭-এর দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "এটা বাদে কেটে দাও অন্য সব সাবস্টেশনের পাওয়ার।"

দুই টেকনিশিয়ান কাজ শুরু করলেন, সুড়ঙ্গ আর অপারেশনের নানা দৃশ্য ভেসে উঠল অন্ধকার পর্দাগুলোতে। সব কিছু ঠিক আছে বলেই মনে হলো। কিন্তু একটা...

খনি এলাকার পাশে আর দাঁড়িয়ে নেই ট্রেনটা!

পর্দার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "সুড়ঙ্গ ধরে একটা একটা করে ক্যামেরা চালু করো। ট্রেনটা কোথায় গেল, তা জানা দরকার।"

পালিত হলো আদেশ। সুড়ঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি এসে আবার খুঁজে পাওয়া গেল ট্রেনটাকে, চুপ চাপ লাইনের উপর বসে আছে। কাছে এগিয়ে এসে দৃশ্যটা মন দিয়ে দেখলেন সাভিনা। কোনও নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না। চাইলে অবশ্য যে কেউ লুকাতে পারে, কিন্তু লুকিয়েছে বলে মনে হয় না।

"সুড়ঙ্গ ধরে এগোও," আদেশ করলেন তিনি। এই আদেশও পালিত হলো।

"থামো!" হঠাৎ কিছু একটাকে নড়তে দেখে আদেশ করলেন তিনি।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের এই জায়গাটা আলোকিত করে রেখেছে দেয়ালে আটকানো একটা মাত্র বাতি। সাভিনার চোখের সামনেই অন্ধকার থেকে কয়েকটা অবয়ব বেরিয়ে এসে আবার অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে গেল।

আমেরিকান লোকটা...চিনতে পারলেন তিনি...একটা বাচ্চার হাত ধরে আছে।

পিওতর!

সোজা হয়ে এম.সি.-৩৩৭ এর পর্দার দিয়ে তাকালেন সাভিনা। অন্য সব বাচ্চা এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। তাহলে এই বাচ্চাটা হাঁটাচলা করছে কেন?

"জেনারেল-মেজর?" তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালালো ইঞ্জিনিয়ার।

অনেক চেষ্টা করেও ব্যাপারটার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলো সাভিনার মন। মাথা নাড়লেন তিনি। যেন নিজেদের উপর কারও নজর পড়েছে বুঝতে পেরেই, আঁধারে হারিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল পর্দার দুই মানুষ। চোখে বিভ্রান্তি নিয়ে পেছন দিকে তাকাল আমেরিকান লোকটা।

বিদ্যুত ফিরে আসায় মঙ্ক বুঝতে পারল, ক্যামেরাগুলো চালু হতে আর বেশি দেরি নেই। লুকাবার উপায় নেই ভেবে, সরাসরি দেয়ালের বাতিটার দিকে এগোলো ও। ঠিক তখনই বুঝতে পারল, ওদের সাথে কেউ একজন নেই!

সাথে সাথে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে, কিন্তু নাহ! মার্তার কোনও হদীস পাওয়া গেল না। ভেবেছিল শিম্পাঞ্জিটা অন্ধকারে ওদের পিছু পিছু আসছে। ট্রেনেই রয়ে গেল নাকি? সামনের দিকেও একবার তাকাল ও, ভাবল হয়তো প্রানিটা সামনে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সামনে, দুইশো ফুট দুরে দুটো লম্বা দরজার কাছে পৌঁছে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গটা।

মার্তা কোথাও নেই।

একটা কণ্ঠ ভেসে এল দরজার কাছে লাগান স্পীকার থেকে, "সামনে এগোতে থাকো! বাঁচতে চাইলে বাচ্চাটাকে দরজার কাছে নিয়ে এসো।"

জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল মঙ্ক। বুঝতে পারছে না, সামনে যাবে নাকি পেছনে!

দুপুর ১২:৩৫
খিস্তুম, রাশিয়া

পুরনো একটা ট্রাকে বসে পথনির্দেশনা দিচ্ছে গ্রে। এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে, পাহাড়ে যাবার রাস্তায় উঠে এল গাড়ি বহরটা। রিয়ারভিউ মিররে আরও কিছুক্ষণ ভেসে রইল খিস্তুম শহর। তারপর হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। ইউরাল পর্বতমালার পূর্ব ঢালে অবস্থিত এই এলাকাটা। ওদের লক্ষ্য, চেলিয়াবিংস্ক ৮৮, এখান থেকে মাত্র নয় মাইল দূরে। খিস্তুম শহরটাও তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কাছে রয়েছে চেলিয়াবিংস্ক ৪০ নামের আরেকটা নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স, যাকে মায়াক নামেও ডাকা হয়। রাশিয়ান এই শব্দের অর্থ "বাতিঘর"। কিন্তু আফসোস, রাশিয়ান তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণের একটা মডেল হয়ে দাঁড়াতে পারেনি জায়গাটা। একটা বর্জ্য ভর্তি ট্যাংক ভর্তি বিস্ফোরিত হয়ে আশে পাশের এলাকায় আশি টন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঢেলে দেয়।

ট্রাকের আসনে একটু আরাম করে বসল গ্রে। পথেই একটা সেতু, সেটার রেইলগুলো উজ্জ্বল লাল রঙা-বিপদ বোঝাতে চাইছে। পেছনে পেছনে আসছে নানা মডেলের প্রায় এক ডজন ট্রাক। বহু ব্যবহারে জীর্ণ রঙ ধারণ করেছে সবগুলো। সামনের সীটে ওর সাথে বসে আছে লুকা আর ড্রাইভার। নিজেদের মাঝে রোমানি ভাষায় কথা বলছে দু'জন। লুকা সামনের দিকে আঙুল তুলে কিছু একটার দিকে ইঙ্গিত করতে, মাথা নাড়ল ড্রাইভার।

"খুব একটা দূরত্ব নেই আর," গ্রে'র দিকে ফিরে বলে উঠল লুকা। "সারা রাস্তাজুড়ে লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম। অনেকগুলো গাড়ি আসা-যাওয়ার খবর পাচ্ছি, পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।"

খবরটা শুনে গ্রে'র ভ্রূ কুঁচকে এল। শুনে তো মনে হচ্ছে, এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে সবাই। দেরি হয়ে গেল নাকি?

ট্রাকের পেছনে চারজন মানুষ শুয়ে আছে, অর্ধেকটা দেহ কম্বলের নীচে। সাথে আবার অস্ত্রও আছে। আর সেই অস্ত্রের বহর মুগ্ধ করে দিয়েছে গ্রে'কে। বাক্স ভর্তি অ্যাসল্ট রাইফেল, সারি করে সাজানো পিস্তল, এমনকি রকেট চালিত গ্রেনেডও আছে।

রাশিয়ান কালো বাজারে এসব অস্ত্র নাকি অহরহই পাওয়া যায়, অন্তত সেরকমটাই জানিয়েছে লুকা। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে লোক এসে যোগ দিয়েছে সেই সুদূর ইউক্রেন থেকেও। আসলেই লুকা হার্নের প্রশংসা করতে হয়। খুব দ্রুত এমন একটা আগ্রাসী সেনাবাহিনী তৈরি করে ফেলেছে লোকটা।

ওর ঠিক পেছনের ট্রাকেই আছে কোয়ালস্কি আর রোজারো। এলিজাবেথকে রেখে এসেছে তিন ব্রিটিশ এস.এ.এস. যোদ্ধার কাছে।

খুব দ্রুত এগোতে হচ্ছে ওদের। আপাতত ভূগর্ভস্থ স্থাপনাটায় আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভেতরে ঢুকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আসলে অপারেশন স্যাটার্ন যে কী, তা-ই বুঝতে পারছে না। তাই আগে থেকে কোনও পরিকল্পনা করেও নেয়া যাচ্ছে না।

তবে যেহেতু জায়গাটা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্লুটোনিয়াম আর ইউরেনিয়াম খনির ঠিক মাঝখানে, তাই সেটা তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত কিছু একটা হবার কথা।

সিনেটর নিকোলাস সলোকোভের কথা এখনও বারবার মনে পড়ছে গ্রে'র।

লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে।

গ্রে শুনেছে যে, লোকটা এখন থেকে নব্বই মাইল দূরের একটা শহর-ইয়াকেটেরিনবার্গে জন্মেছে। নির্বাচিত হয়েছেও ওই এলাকা থেকেই। তাই ধরে নেয়া যায়, এলাকাটাকে নিজের হাতের তালুর মতোই চেনে সে, জানে এখানকার সব রহস্যও। কেউ যদি কোনও তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটাতে চায়, তাহলে এই জায়গার বিকল্প নেই।

কিন্তু কী সেই ঘটনা?

এদিকে খিস্তুমে দুশ্চিন্তায় পায়চারী করছে এলিজাবেথ। মেয়েটাকে জেটের ভেতরেই রেখে গিয়েছে গ্রে'রা। বুকের উপর হাত বেঁধে, মাথা নিচু করে পায়চারী করছে ও। সিনেটর নিকোলাসের বলা কথাটা ওকেও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে।

মানুষ এমন পাগলও হয়!

টেবিলের উপরে রাখা ল্যাপটপটার দিকে তাকাল ও, কাজ করার চেষ্টা করে দেখেছে। ভেবেছিল এভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারবে। ক্যামেরা থেকে সব ছবি কপি করাও শুরু করে দিয়েছিল। রাশিয়ানদের হাতে অপহৃত হবার পর, তার ক্যামেরাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন প্রফেসর মাস্টারসন। তিনিই জেল থেকে পালাবার সময় আবার ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন জিনিসটা।

একটা একটা করে ছবি কপি হওয়ার প্রক্রিয়া দেখাচ্ছিল ল্যাপটপের পর্দায়।

হঠাৎ একটা ছবিতে চক্রের ভেতর বসিয়ে রাখা ওম্ফালোসটা দেখতে পেল এলিজাবেথ। দুশ্চিন্তার মাঝে ডুবে থাকলেও, ডেলফির নিদর্শনটা দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল মন। দুই দশক ধরে ইতিহাসবিদেরা জানে, জাদুঘরে রাখা ছোট পাথরটা আসলে নকল। আসলটা যে কোথায়, তা কেউ জানে না। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলেছিলেন যে, সম্ভবত একটা দল মন্দিরের ধ্বংস হবার পরও টিকে গিয়েছিল। এরাই পাথরটা চুরি করে।

ল্যাপটপটা আবার কাছে টেনে নিল এলিজাবেথ, এক দৃষ্টিতে ওম্ফালোসটার দিকে তাকিয়ে রইল। এই যে প্রমাণ! ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন! সাথে সাথে চেয়ারে এলিয়ে দিল দেহ। জাদুঘরের নকলটায় কী লেখা ছিল, তা মনে পড়ে গিয়েছে ওরঃ সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটা বাক্য।

স্বরস্বতী, হিন্দুদের জ্ঞানের দেবীর উদ্দেশ্যে লেখা একটা প্রার্থনা ছিল ওটা। কে বা কেন এই লেখাটা লিখেছিল, তা কেউ জানে না। তবে এক ধর্মের নিদর্শনে, অন্য ধর্মের কোনও বাক্য বা চিহ্ন পাওয়া অবশ্য তেমন অস্বাভাবিক কিছু না।

তবে এলিজাবেথ সত্যটা আন্দাজ করতে পারছে। হয়তো ওম্ফালোসের নকলটা কোনও রাস্তার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্য সব ছবিগুলোতে নজর বোলাল মেয়েটা। মোজাইকে খোদাই করা একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। ওখানে দেখাচ্ছে, একটা

বাচ্চা আর একজন মহিলা, রোমান সেনাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নিয়েছে ওম্ফালোসের নীচে। সংস্কৃত বাক্যটা লেখা ছিল ঠিক ওম্ফালোসটার নিচের দিকেই, "তিনি, যার নেই কোনও শুরু, শেষ অথবা সীমা, সেই স্বরস্বতী যেন একে সুরক্ষা দেন।" হয়তো লাষ্ট ওরাকল, বা শেষ ভবিষ্যতদ্রষ্টাকেই বোঝাচ্ছে ওটা। ভবিষ্যতদ্রষ্টার এই সম্মানিত পরম্পরা যেন মিলিয়ে না যায় তারই আবেদন সম্ভবত প্রার্থনাটা। এমনকি দেবী স্বরস্বতী বাস করেন এক পবিত্র নদীতে। অনেক ধর্মীয় চিন্তাবিদের মতে, নদীটা ইন্দুস নদী। এই নদীর ধারেই নতুন করে বসতি গড়ে তুলেছিল বিতাড়িত গ্রীকরা।

এলিজাবেথের মনে হলো, কেউ একজন ইচ্ছা করেই চিহ্নটা রেখে দিয়েছে, যেন ভবিষ্যতে কেউ চাইলে সেগুলো অনুসরণ করতে পারে। যেমনটা করেছে সে আর তার বাবা।

আসল ওম্ফালোসের ছবিটা আবার পর্দায় নিয়ে এল এলিজাবেথ। অনেকগুলো ছবি নিয়েছিল ও, এর মাঝে ফাঁদের ব্যাপারে সাবধানবাণী হিসেবে খোদাইকৃত তিন লাইনের বাক্যটাও ছিল। আসলে বাক্য একটাই, ভাষা তিনটা। একটা হরপ্পান, একটা সংস্কৃত আর অন্যটা গ্রীক। সেই ছবিটাই আবার তুলে আনল পর্দায়।

চেম্বারের দেয়ালেও এরকম করে লেখা ছিল, আগুনের চোখওয়ালা ছেলেটার ছবির নিচেই। সেটাও তুলে আনল। এই ছবির হারাপ্পানটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃত আর গ্রীক লেখার অর্ধেকটাই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এক বা দুইটা শব্দ পড়ার মতো আছে কেবল।

অতটুকুই পড়ল মেয়েটা, "বিশ্ব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে..."

খুব পরিচিত মনে হলো লাইনটাকে। পড়ার সাথে সাথে গ্রে আর অন্যরা যে হুমকিটাকে প্রতিহত করতে চাচ্ছে, তার কথা মনে পড়ে গেল ওর। কী ছিল বাকি অংশে? কেবল মাত্র হরপ্পান ভাষায় লেখা লাইনটা টিকে গিয়েছে। কিন্তু সেই লাইনটার অর্থ বের করা আর কোনও ধাঁধাঁ মেলানো খুব কঠিন।

তবে...

সোজা হয়ে বসল এলিজাবেথ, মাথা ঠেকে ঝেড়ে ফেলল সব দুশ্চিন্তা। পর্দায় ফুটে থাকা ছবি দুটোর দিকে নজর দিল। আস্তে আস্তে ওগুলোর অর্থ ধরতে পারছে ও। আগেও হরপ্পান ভাষার লাইনটাকে সংস্কৃত আর গ্রীকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল। এবারও তাই করার সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু পারবে কী?

দুপুর ১২:৪৫

প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে আছেন জেনারেল-মেজর সাভিনা মারতোভ। যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকানটা। "এখনই দরজার কাছে চলে এসো!" মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে গর্জে উঠলেন তিনি।

লোকটার লাফিয়ে ওঠা দেখে বুঝতে পারলেন, কথাটা কানে গিয়েছে।

"জেনারেল-মেজর," চেঁচিয়ে উঠল এক ইঞ্জিনিয়ার। "আর্কহ্যানজেলস মিসাইল বেস থেকে আপনার জন্য জরুরি ফোন এসেছে।"

পেছন দিকে হেলান দিয়ে হ্যান্ডসেটটা তুলে নিলেন সাভিনা। ওর কন্ট্রাক্টদের একজন ওখানেও আছে। "মারতোভ বলছি।"

"জেনারেল-মেজর, ইউক্রেন থেকে কিছু বাজে খবর এসেছে। সিনেটর সলোকভ মারা গিয়েছেন।"

বড় করে শ্বাস নিলেন সাভিনা, মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পেতে দিতে চান না। কিন্তু মনে হলো, গলার কাছে কিছু একটা যেন দলা পাকিয়ে উঠেছে! ওপাশের মানুষটা জানে না, নিকোলাস তার ছেলে।

বলে চলেছে কণ্ঠটা, "কীভাবে কী হলো, তা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ বলছে, সন্ত্রাসীরা খুন করেছে তাকে। তবে যাই হোক, তিনি যে মারা গিয়েছেন সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। ক্যামেরায় তার মরদেহ দেখা গিয়েছে। মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাকে, তার সহকারীও মৃত। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বেশি হওয়ায়, তার মরদেহ উদ্ধার করতে যেতে পারছি না আমরা। কতক্ষণ লাগবে..."

আরও কিছু কথা বলল লোকটা, কিন্তু সাভিনার কানে কিছুই ঢুকছিল না। পানিতে ভরে উঠেছে চোখ। অনেক কষ্টে সেগুলোকে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন তিনি। লোকটার কথা শেষ হলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

নিকোলাস মারা গিয়েছে!

তার একমাত্র ছেলে...মৃত!

"জেনারেল-মেজর?" নম্র কণ্ঠে জানতে চাইল ইঞ্জিনিয়ার।

কণ্ঠটা উল্টো আরও রাগিয়ে তুলল সাভিনাকে। পর্দার দিকে নজর ফেরালেন তিনি। আমেরিকানটা এখনও নড়েনি। দুঃসংবাদটা যেন আগুনে ঘি ঢালল আরও, নিজের ভেতরে ভয়ঙ্কর এক আক্রোশ জেগে উঠছে বলে মনে হলো তার। এই আমেরিকানটা সারাদিনই তাকে ঝামেলায় ফেলেছে। এখন আবার আদেশও শুনছে না।

আর না।

মনের রাগ শুকিয়ে দিল সাভিনার চোখের পানি।

হয়তো রক্ত মাংসের সন্তান মারা গিয়েছে। কিন্তু তার অন্য সন্তান, তার স্বপ্ন তো এখনও বেঁচে আছে। কিছুতেই মরতে দেবেন না ওটাকে। সাভিনার কাছ থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নেয়ার ফল ভোগ করতেই হবে পৃথিবীকে।

"যথেষ্ট হয়েছে!" বাম দিকের দুটো পর্দার দিকে ইংগিত করলেন তিনি। ওখানে অপারেশন স্যাটার্নের ছবি দেখা যাচ্ছে। একটায় ফুটে আছে আটকে রাখা বোমার দৃশ্য। অন্যটা ঘুরে আছে মেঝে বরাবর। "অপারেশন স্যাটার্ন শুরু করো! আমি নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই!"

হন্তদন্ত হয়ে যার যার জায়গায় চলে গেল ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানরা। পাগলের মতো বোতাম টেপা শুরু করল সবাই।

পর্দার দিকে তাকালেন সাভিনা। যদি লোকটা পিওতরকে তার কাছে নিয়ে না আসে, তাহলে আক্ষরিক অর্থেই ওর পাছার নিচে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন তিনি।

"আমরা তৈরি," বলে উঠল ইঞ্জিনিয়ার। "এখন শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা।"

"দিলাম আদেশ!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনিটর দুটোর দিকে তাকালেন তিনি। একটা মনিটর জুড়ে কেবল সাদা আলো দেখা গেল, দূরে হওয়া কোনও বিস্ফোরণের অস্ফুট শব্দও শুনতে পেলেন তিনি। অন্য পর্দায় দেখা গেল, মেঝে দুভাগ হয়ে গিয়েছে। উপর থেকে পাথর আর কাদা এসে পড়ছে তো পড়ছেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা লম্বা থামের রূপ নিয়ে উপর থেকে আছড়ে পড়তে শুরু করল কালো পানি।

শুরু হয়েছে অপারেশন স্যাটার্ন।

এই পৃথিবী তার কাছ থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু স্বপ্নটাকে কেড়ে নিতে পারবে না। প্রবাহিত পানির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, প্রতিশোধের ইচ্ছাটা পূরণ হতে আর বেশি দেরি নেই।

এবার আমেরিকানের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি।

এক নতুন লক্ষ্য পেয়েছে তার প্রতিশোধের নেশা।

নিজেকে মেঝে থেকে টেনে তুলল মঙ্ক। এখনও মাথা থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ বের হয়নি। বদ্ধ জায়গায় মুহূর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল, বিশাল কোনও দানব যেন হাততালি বাজাচ্ছে। নিজের দেহ দিয়ে পিওতরকে রক্ষা করার চেষ্টা করল সে।

সেই অবস্থাতেই বাচ্চাটাকে টেনে তুলল মঙ্ক। বিস্ফোরণের আওয়াজ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ ভেসে এল ওর কানে। মনে হচ্ছে যেন বিশাল কোনও ড্রাগন গর্জন করছে। তবে আওয়াজটা ঠিক চিনতে পারল মঙ্ক।

পানি প্রবাহিত হবার আওয়াজ।

টনকে টন পানি।

সাথে সাথে পুরো ব্যাপারটার অর্থ টের পেল ও- বিস্ফোরণ, আর সেই সাথে ভূগর্ভস্থ পানির ঝর্না! নিশ্চয় শুরু হয়ে গিয়েছে অপারেশন স্যাটার্ন...

লাউড স্পীকার থেকে আবারও আওয়াজ ভেসে এল।

"অস্ত্র নামিয়ে রাখো!" কারও কণ্ঠে যে একইসাথে শীতলতা আর আগুন স্থান পেতে পারে, তা এর আগে জানত না মঙ্ক। "ছেলেটাকে দরজার কাছে নিয়ে এসো। আর তাড়াতাড়ি করো। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বাড়ছে, আর বড় জোর পাঁচ মিনিট আছে তোমার হাতে। এরপর দুজনেই মারা পড়বে!"

মঙ্কের হাতে আর কোনও উপায় রইল না। রাইফেল ফেলে দিল কাঁধ থেকে। সামনের দরজাটার আড়াল পেলে, তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পাবে সে। এদিকে পিওতর এগিয়ে এসে মঙ্কের কাটা হাতটা আঁকড়ে ধরল। একসাথে শেষ কয়েকশ গজ প্রায় দৌড়ের গতিতে এগোল দুজন। সুড়ঙ্গের ভেতরে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদিকে সামনে ধীরে ধীরে খুলে চলছে দরজা। তার ওপাশে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সৈন্য।

ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

ওকে আরও দ্রুত এগোবার জন্য তাড়া দিল পিওতর, যেন সে এমন কিছু একটা জানে যা মঙ্ক জানে না। এদিকে প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে মঙ্কের মনে হচ্ছে, ওর পায়ে যেন কেউ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে। বুকের ভেতরটা চেপে ধরে আছে কেউ, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকের দিকে তাকাল সে, এখনও তেজস্ক্রিয়তা মাপার ব্যাজটা পরা আছে। উজ্জ্বল লাল বলেই মনে হচ্ছে মিটারটা, কিন্তু প্রতিটা গজ এগোবার সাথে সাথে যেন আরও অন্ধকার হচ্ছে রঙটা।

পায়ের ব্যাথা অগ্রাহ্য করে আরও দ্রুত গতিতে সামনে বাড়লো মঙ্ক।

দরজার দিকে ছুটে চলেছে দু'জন।

সামনে পৌঁছেছে কী পৌঁছায়নি, বিশাল এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সবাই। বিস্ফোরণের উৎপত্তি হয়েছে চেলিয়াবিংস্ক ৮৮- থেকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মঙ্ক, কিন্তু পিওতর টেনে নিয়ে চলল ওকে।

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সৈন্যরাও। একজন তো ভয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে দৌড় লাগাল পিওতর। শুয়ে থাকা সেনার উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হলো ছেলেটা। অন্য হাতে হতভম্ব হয়ে পাশে দাঁড়ান আরেক সৈন্যর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল। এক মুহূর্তের জন্যও না থেমে সেটা ধরিয়ে দিল মঙ্কের হাতে।

হাত বাড়িয়ে দিল ও, মসৃণভাবে অস্ত্রটা উঠে এল হাতে। একদম পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে টিপে দিল ট্রিগার। মস্তিষ্ক হয়তো স্মৃতি ভুলে গিয়েছে, কিন্তু মাংসপেশি ভুলেনি।

পাঁচ জনকেই এক নিমিষে ধরাশায়ী করে ফেলল মঙ্ক।

ম্যাগাজিন শেষ হয়ে আসায়, পিস্তলটা ফেলে দিল সে। পিওতর এরিমাঝে সামনে এগিয়ে এসেছে, হাতে আরেকটা পিস্তল। মঙ্ককে এগিয়ে দিল এটাও।

বারবার বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠছে গুহা। চিৎকার চেঁচামেচিতে ভরে উঠেছে চারপাশ। দৌড়াতে দৌড়াতে রকেট চালিত মর্টার বা গ্রেনেডের আওয়াজ শুনতে পেল মঙ্ক।

আক্রমণ হয়েছে বেসে!

কিন্তু কে করেছে?

দৌড়ে বড় দরজাটা দিয়ে কমপ্লেক্সের ভেতরে প্রবেশ করল গ্রে। প্লেনে চড়ে এখানে আসার সময় এসব কমপ্লেক্স আর শহরের ভূগর্ভস্থ শহরের ব্যাপারে পড়েছে। সোভিয়েতেরা এখানে শ্রমিকদের মনোরঞ্জনের জন্য বাদক আর ব্যান্ড দল আনত। কিন্তু তা জানার পরও এই বিশাল আকারের গুহা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না গ্রে।

এই গোলমালের জন্যও প্রস্তুত ছিল না।

প্রাথমিক আক্রমণ চালায় ছয়টা ট্রাক।

একটু নরম করে নেই আগে, বলছিল লুকা।

তর্ক করার ইচ্ছা বা মন কোনওটাই ছিল না গ্রের। হাজার হলেও এরা লুকার লোক, ওর না।

গ্রে'র মিশন কেবল একটাই।

ধোঁয়ার দেয়াল ভেদ করে এগিয়ে গেল ও। দেখতে পেল, পাঁচ তলা লম্বা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর গায়ে আছড়ে পড়ছে রকেট। লুকা ট্রাকেই আছে, কাঁধে একটা রকেট লঞ্চার। দুই দিকে আক্রমণ চালাচ্ছে দুটো ট্রাক। একটায় কোয়ালস্কি আর অন্যটায় রোজারো।

সবগুলো ট্রাক সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢোকার পর, জিপসীরা ওটার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। দুটো কাঠ ভর্তি ট্রাক আড়াআড়িভাবে রেখে দিয়েছে ওখানে। দুই ডজন অস্ত্রধারী পাহারা দিচ্ছে ব্যারিকেডটাকে, কাউকে পালাতে দিচ্ছে না।

জিপসীদের পরিকল্পনার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো গ্রে। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসা পর্যন্ত সারাটা পথ মনে হচ্ছিল, শান্ত প্রকৃতির একগাদা যানবাহন রাস্তা দিয়ে চলছে। কিন্তু নির্দেশ পাওয়া মাত্র, আচমকা দক্ষ এক সেনাদলে পরিণত হয়ে গেল সবাই! এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে, পাহাড় তার আশেপাশের এলাকা দখল করে নিতে বিন্দুমাত্র ঝক্কি পোহাতে হয়নি ওদের।

যেসব রাশিয়ান ইতোমধ্যে ভূ-গর্ভস্থ স্থাপনাটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, বেঁধে রাখা হয়েছে তাদের। তবে অবশ্যই অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেবার পর। গ্রে যখন পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে গিয়ে পৌঁছেছে, ততক্ষণে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে সামনের দলটা! পেছনে রেখে গিয়েছে ধোঁয়া আর আগুনে ভরা একটা পথ।

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সেই পথ ধরে এগোচ্ছে গ্রে। নষ্ট করার মতো একদম সময় নেই। অপারেশন স্যাটার্নকে যেকোনও মূল্য প্রতিহত করতে হবে।

লুকার লোকেরা সেই কাজেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে। যেকোনও দক্ষ সেনাদলের মতোই, তারাও আগে তথ্য জোগাড় করে তারপর কাজে নেমেয়ে। আসার পথে সামনে পড়ল কালো পোশাক পরা এক লোক। তার ইঙ্গিতে রাস্তার পাশে থমকে দাঁড়াল লুকার ট্রাকটা। লোকটার পাশেই ল্যাব কোট পরা দুজন মানুষ। মাথায় তাক করে রাখা রাইফেল, হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল লোক দুটো। বিন্দুমাত্র দয়া দেখাল না জিপসীরা, টিপে দিল ট্রিগার। দেখাবেই বা কেন? ওদের গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে বাচ্চাদের অপহরণ করে এনেছিল তো এই রাশিয়ানরাই।

রাশিয়ানদের হাতেই শুরু হয়েছে এই যুদ্ধ, জিপসীরা কেবল তার যবনিকাপাত করছে।

লোকটা লুকার হাতে একটা মানচিত্র ধরিয়ে দিল, ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে ওতে। চেলিয়াবিংস্ক ৮৮-এর রুক্ষ একটা আকৃতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে হাতে আঁকা মানচিত্রটাতে। অপারেশন স্যাটার্নের কন্ট্রোল রুম কোথায়, সেটিও গোল করে বৃত্ত এঁকে বোঝানো আছে।

লক্ষ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর, ট্রাকটাকে সেদিকে চালিয়ে দিল গ্রে। প্রথমিক আক্রমণ আকস্মিক হলেও, রাস্তার উপর অনেক জঞ্জাল জমা হয়ে গেছে। একটা দালান তো ধ্বসেই পড়েছে রাস্তার উপর!

তবে জিপসীরা আক্রমণে ঢিল দেয়নি। শুধু ট্রাক থেকেই নয়, নিচে নেমে পায়ে হেটেও আক্রমণ করছে কয়েকজন।

গ্রে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড় করালো ট্রাকটা। কোয়ালস্কি আর রোজারোও যোগ দিল ওর সাথে। এদিকে ট্রাকের পেছনে ওঠে রোমানি ভাষায় কিছু একটা বলে উঠল লুকা। উত্তর

দিল সবাই। আরও কিছু কথা আদান-প্রদান হবার পর গ্রে'র দিকে ফিরে ওকে একটা ট্রাকের পেছনে টেনে নিয়ে গেল জিপসীসর্দার।

"রাশিয়ানরা দালানের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। যতই ভেতরে যাওয়া হচ্ছে, ততোই তাদের দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা।"

কেন তা-ও জানে গ্রে। "কন্ট্রোল সেন্টারটাকে রক্ষা করতে চাইছে। এখনও যদি অপারেশন স্যাটার্ন শুরু না করে দিয়ে থাকে, তাহলে শীঘ্রই করবে। আমাদের হাতে অপেক্ষা করার সুযোগ নেই।"

এক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল লুকা। "আমার এক লোক...আহ, এই যে। এসে পড়েছে।"

ছোট একটা অবয়ব ওদের দিকে দৌড়ে এল। ঝড়ের গতিতে কথা-বার্তা শুরু করল দুই রোমানি ।

"এ হচ্ছে র‍্যাট।" লুকা পরিচয় করিয়ে দিল।

"খাসা নাম তো," ফিসফিস করে বলল কোয়ালস্কি।

"ও স্কাউট। প্রহরা নেই এমন পথ খুঁজে বের করার কাজে ওর জুরি নেই। ছোট একটা দলকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে ও, তবে দলটা পাঁচ বা ছয় জনের বেশি হলে চলবে না।" চারপাশে তাকাল লুকা। "আমরা এই কজনই যাই না কেন শুধু? ভা?"

"ভা।" একমত হলো কোয়ালস্কি।

"অন্যরা রাশিয়ানদের ব্যস্ত রাখবে," যোগ করল লুকা।

"তাহলে রওনা দেব?" জানতে চাইলো র‍্যাট।

"ভা," নিজেও রোমানি ভাষায় উত্তর দিল গ্রে।

যার যার অস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে ছোট মানুষটার পিছু পিছু এগোতে লাগল ওরা। গ্রে'র অবশ্য কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না। এগিয়ে যেতে যেতে পদাতিক বাহিনীদের দিকে ইঙ্গিত করল লুকা।

একটা হেলে পড়া দেয়ালের পাশ দিয়ে দলটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল র‍্যাট। পিছু নিয়ে গ্রে দেখতে পেল, পথটা একটা দালানের বেসমেন্টের জানালা বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে।

হঠাৎ পেছনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও। "উপরে বোমা!"

উপস্থিত জিপসীদের মাঝে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল চিৎকারটা।

চেঁচামেচিতে কান না দিয়ে এগোতে থাকল গ্রে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ওদের যেন দেরী না হয়ে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঙ্কারে স্থান নিলেন সাভিনা পিঠ, পায়ের ব্যাথা অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটার সাথে সাথে বন্ধ করে দিয়েছিলেন দরজা।

উপরে তার জন্য অপেক্ষা করছে ডা. পেত্রভের ডেকে পাঠানো পাঁচ শক্তিশালী যোদ্ধা। পরিকল্পনা মোতাবেক এই পাঁচজন যোদ্ধার পাঁচটা বাচ্চাকে পিঠে করে নিয়ে যাবার কথা। মাত্র পাঁচজন, এর বেশি না! দশজনকে নিতে চাইলেও নিতে পারবেন না তিনি। নিরাপদে

পালাতে হলে, পাঁচজনের বেশি একজনকেও সাথে নেয়া যাবে না। আমেরিকানটাকে দেখে বুদ্ধিটা পেয়েছেন তিনি। বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা সার্ভিস টানেল ধরে পালিয়েছে লোকটা, তিনিও তাই করবেন।

কিন্তু তার আগে আরও একটা কাজ করা বাকি আছে।

বাঙ্কারে ঢুকে দেখতে পেলেন, টেকনিশিয়ান আর ইঞ্জিনিয়াররা কী-বোর্ডের উপরে ঝুঁকে আছে। নিশ্চয় হার্ডড্রাইভগুলো মোছার কাজে ব্যস্ত।

"সব ঠিক আছে?"

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল ইঞ্জিনিয়ার। "ঠিক আছে। যে কাণ্ড করে রেখেছি, তাতে এখান থেকে তথ্য পেতে হলে কোনও বিশেষজ্ঞের মাসখানেকও লেগে যেতে পারে।"

"খুব ভালো," বলে পিস্তল উঁচু করলেন সাভিনা, টিপে দিলেন ট্রিগার। ইঞ্জিনিয়ারের মাথার পেছনে ঢুকল বুলেট। টেকনিশিয়ান পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু সিঁড়ির মাথায় পৌঁছাবার আগেই তাকেও শুইয়ে ফেললেন তিনি।

শত্রুদের হাতে এরা ধরা পড়লে খুব বিপদ হয়ে যাবে, সেই ঝুঁকি নিতে চান না সাভিনা।

আরও নিশ্চিত হবার জন্য পেছনের দেয়াল থেকে একটা কুঠার নিয়ে কম্পিউটার আর কী-বোর্ডের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বাদ রইল কেবল এল.সি.ডি. পর্দাগুলো। সেগুলোও ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিঠ ব্যাথার জন্য পারলেন না। আরেকবার কুঠার তুলে ধরার সামর্থ্য তার পিঠের হবে না। মাটিতে কুঠারটা ফেলে দিয়ে একদম মাঝখানের পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কালো ধারায় পানি বইছে অবিরত।

দেখুক ওরা...তাকে রাগাবার ফল দেখুক।

হাসলেন তিনি, ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

দেখুক ওরা, চোখের সামনে দুনিয়াকে ধ্বংস হতে দেখুক।

আর কেউ থামাতে পারবে না তাকে।

২১
৭ সেপ্টেম্বর, দুপুর ১:০৩
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

মস্কের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পিওতর। সৈন্যদের চিৎকার-চেঁচামেচি, গোলাগুলির আওয়াজ, আগুন আর ধোঁয়ায় সয়লাব হয়ে আছে চারদিক। তবে পিওতরকে দেখে মনে হচ্ছে, এসব দিকে কোনও খেয়াল নেই ছেলেটার।

একটা সরু দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দু'জন, অল্পের জন্য পাশ কাটিয়ে গেল এক অস্ত্রধারী রাশিয়ানকে। তারপর অন্ধকার ধরে এগোতে লাগল তারা। হলের শেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছে গেল পরবর্তী চেম্বারে।

"পিওতর, কোথায় যাচ্ছো?"

উত্তর দিল না ও।

আরেকটা সরু হলওয়েতে পৌঁছে থামল পিওতর। চারপাশে অনেকগুলো হৃদয়ের অস্তিত্ব অনুভব করছে ও। ভয়, রাগ, পালানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদির অনুভূতির ছাপ আলাদা আলাদাভাবে ধরতে পারছে প্রতিটা হৃদয়ে। আগে থেকেই বুঝতে পারছে কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে মানুষগুলো!

এটাও তার ক্ষমতা, সহানুভূতিরই একটা বর্ধিত রূপ।

ওয়ারেনে থাকার সময় প্রায়ই মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙতো পিওতরের। দেখতো-আগুনে পুড়ছে সাথে অন্যান্য বাচ্চারা। তারপর একটা ব্যাপার ঘটতো, বেশ কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারতো না বাকিরা। শিক্ষকরা মনে করতেন, পিওতরের ভয় দেখানোর কারণেই হতো এমনটা। ভয় পেয়ে নিজেদের দক্ষতা, নিজেদের আত্মবিশ্বাসে ভরসা পেতো না বাকি বাচ্চাগুলো। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভুল ছিল। সবাই জানে, অন্যের মন পড়তে পারে পিওতর। সহানুভূতি বলা হয় ক্ষমতাটাকে। তবে এটা ছাড়াও ওর আরেকটা ক্ষমতা আছে, যেটা ও নিজে আর মার্তা ছাড়া কেউ জানে না।

শুধু মন বুঝতেই পারে না পিওতর, অন্যের মনের চিন্তা-ভাবনা, ক্ষমতা ইত্যাদি নিজের ভেতর টেনে আনতেও পারে ও, পারে অন্য কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর খানিকক্ষণের জন্য বাকি বাচ্চাদের প্রতিভা নিজের ভেতর অনুভব করতে পারতো ও। কনস্টানটাইনের মতো অঙ্ক কষতে পারতো, ইলেনার মতো সত্যি-মিথ্যার তফাৎ ধরতে পারতো, সাশার মতো দূরের জিনিস দেখতে পেতো মনের পর্দায়। যতক্ষণ না শরীরে আগুনের মতো আভা দেখা যেতো, ক্ষমতাগুলো থাকতো ওর ভেতর। তারপরই জ্বালা করে উঠত শরীর।

স্বপ্নে দেখা দিতো আকাশভরা তারা, আর তারপরই তারাগুলো ঝড়ে পড়ত ওর উপর। মনে হতো যেন পিওতরের শূন্য মনের ভেতরটা পূর্ণ করে দিচ্ছে ওগুলো। তবে কখনওই স্বপ্নটা পুরোপুরি দেখতে পারেনি ও, তার আগেই ভেঙে যেত ঘুম।

এখনও একটা ঘোরের ভেতর হেঁটে চলেছে ও। মন তাড়া দিচ্ছে সামনে এগিয়ে যেতে। নিজের পরিণতি সম্পর্কে আগে থেকেই জানে পিওতর, একদিন না একদিন ঠিকই স্বপ্নের মতো আগুনে পুড়তে হবে ওকে।

এখন ঠিক সেরকমভাবেই, বাকি বাচ্চাদের অনুভূতি নিজের ভেতর অনুভব করতে পারছে পিওতর। চারপাশের কোনও একটা আওয়াজ, কোনও একটা দৃশ্য চোখ এড়াচ্ছে না তার। এড়াবে কীভাবে? বাকি সবার ক্ষমতা পাওয়ার পাশাপাশি ইন্দ্রিয়ের শক্তিও অনেকগুণ বেড়ে গেছে যে। সামনে বাঁকের আড়ালে একটা মানুষ আছে। তার মনের প্রতিটা সিদ্ধান্ত অনুভব করতে পারছে পিওতর। সাশার মতো দেখতেও পাচ্ছে দূরে থাকা লোকটাকে। কোন কোনা দিয়ে সামনে এগোবে, কোথায় যাবে, গুলি করবে কি না- এসব কথাই ভেবে চলেছে মানুষটা।

কোথায় যেতে হবে, জানে পিওতর।

মঙ্কের হাত ধরে হল ধরে সামনে এগিয়ে চলল ও।

বাম দিকের একটা টানেলে রাশিয়ান এক সৈন্য উদয় হওয়ার এক মুহূর্ত আগেই সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেটা, তার দৃষ্টি অনুসরণ করল মঙ্কের চোখও। লোকটা নজরে চলে আসতেই পিস্তল উঁচু করে টিপে দিল ট্রিগার। সময়ের সাথে সাথে পিওতরের পূর্বাভাসের প্রতি আস্থা বেড়েই চলেছে ওর।

প্রায়ান্ধকার গলি ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" আবারও জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

যেখানে তোমার থাকা দরকার, ঠিক সেখানেই। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঠিকই উত্তর দিল ছেলেটা।

আরেকটা সিঁড়ি পার হলো ওরা। হঠাৎ মঙ্ককে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল পিওতর। মাথার উপর দিয়ে বিইং আওয়াজ তুলে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। একটা ঘরে এসে পৌঁছেছে ওরা, বেশ কিছু ডেস্ক সাজিয়ে রাখা ওখানে। রাশিয়ান কয়েকটা কণ্ঠ ভেসে আসছে খুব কাছের কোনও জায়গা থেকে। নজর বাঁচিয়ে ডেস্কের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল দু'জন।

তারপর ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একটা বেসমেন্টের মতো জায়গায় নেমে এল ওরা।

মঙ্কের হাত ধরে আরও জোরে টানতে লাগল পিওতর। হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মঙ্কও, সময়ের ব্যাপারটা তার মাথায়ও আছে।

"কোথায় যাচ্ছ-?"

হলের শেষপ্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা নতুন কণ্ঠ, নিখাদ বিস্ময় মাখানো সেই কণ্ঠে। ওদের দেখে নবাগতের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, বুঝতে পারল পিওতর। অবিশ্বাসী সুরে একটা নাম ধরে ডেকে উঠল লোকটা।

"মঙ্ক!"

হলের অন্যপ্রান্তে কারও নড়াচড়া খেয়াল করতে পেরেছে গ্রে। তারপরই দু'টো মানুষের অবয়ব নজরে এল। মানুষ বলা হলেও সামনের জনের আকৃতি একেবারে ছোট, একটা বাচ্চা। মুলত এই কারণটাই পিস্তলের ট্রিগার টিপে দেয়া থেকে বিরত রেখেছে ওকে। কিন্তু পেছনের চেহারা দেখতে পেতেই বিস্ময়ে থমকে গেল ও।

কিন্তু একই কথা বলা যাবে না বাচ্চার সাথের লোকটার ক্ষেত্রে। পিস্তল উঁচু করাই ছিল। নিশানা ঠিক করার ঝামেলায় না গিয়ে সাথে সাথে ট্রিগার টেনে দিয়েছে সে। কাঁধে জোরাল ধাক্কা খেয়ে একপাক ঘুরে গেল গ্রে। লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। চিনচিনে ব্যাথা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা কাঁধ জুড়ে।

ঠিক পেছনেই ছিল কোয়ালস্কি। তাকে পড়ে যেতে দেখেই লাফিয়ে সামনে বাড়লো সে, গ্রে'র মাথাটা কোলে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল অস্ত্রধারীর উদ্দেশ্যে। "মঙ্ক, বেকুব কোথাকার! কী করলে এটা?"

এবার থমকানোর পালা মঙ্কের। দ্বিধার ঢেউ খেলে গেল তার মুখে। "কে...কে তোমরা?"

আবারও ফুঁসে উঠল কোয়ালস্কি। "কে আমরা? আমরা তোমার হতভাগা বন্ধু, ছাগল কোথাকার!"

আস্তে আস্তে কোয়ালস্কির কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে, আগুন জ্বলছে গুলি খাওয়া কাঁধে। "মঙ্ক, চিনতে পারছো না আমাদের?"

কানের উপর সেলাইয়ের দাগটায় হাত বুলালো মঙ্ক, গলায় বিস্ময়। "না...আসলেই চিনতে পারছি না।"

একসাথে বেশ কিছু প্রশ্ন ভিড় করল গ্রে'র মাথায়। মঙ্কের সাথে কী করেছে শয়তানগুলো? কোনও ওষুধের প্রভাব নাকি এটা? আর ও এখানেই বা এল কী করে? যাই হোক, পরে ভাবা যাবে এগুলো। কথাগুলো সাথে সাথে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। কাঁধে ক্ষত থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের কাছে এমন একটা ক্ষত বলতে গেলে কিছুই না।

"জানতাম...জানতাম আমি...," অস্ফুটে ফুঁপিয়ে উঠল গ্রে। কয়েক ফোঁটা পানিও গড়িয়ে পড়ল চোখের কোনা বেয়ে। "বেঁচে আছো তুমি!"

"এখানে এভাবে ঝোলাঝুলি করতে থাকলে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না," পেছন থেকে বিড়বিড় করল কোয়ালস্কি।

কথা সত্যি। মঙ্ককে ছেড়ে আস্তে করে সরে এল গ্রে।

আলিঙ্গনপর্ব শেষ হয়ে গেলে মুখ খুলল মঙ্ক। "তোমরা হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাকে। এখানে খুব খারাপ কিছু একটা চলছে, ওটা থামাতে চলেছি আমি।"

"অপারেশন স্যাটার্ন," বলে উঠল গ্রে।

মাথা নেড়ে সায় দিল মঙ্ক। "হ্যাঁ। এই ছেলেটা..."

পেছন ফিরল ও। "পিওতর গেল কোথায়?"

মঙ্কের উদ্বিগ্নতা ধরতে পারল গ্রে।

ওদের পুনর্মিলনী চলাকালীন সময়ে, কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে ছেলেটা।

দুপুর ১:১৫
খিস্তুম, রাশিয়া

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এলিজাবেথ। ভারতের লুকানো মন্দিরের মোজাইকের ছবিগুলো দেখছে ও। একটা ছবিতে চুম্বকের মতো সেঁটে আছে চোখ দু'টো-ওম্ফালোস ঘিরে তেপায়ায় বসে আছেন পাঁচজন মহিলা। আর তাদের মাঝে থাকা ডিম্বাকার পাথরটার উপরের ছিদ্রদিয়ে গলগল করে উপরে উঠছে ধোঁয়ার সারি। ধোঁয়ায় অর্ধেক শরীর ডোবানো একটা বাচ্চা ছেলের অবয়ব ভাসছে পাথরটার ঠিক উপরে।

তবে ধোঁয়াই ভাসিয়ে রাখছে না ওকে।

কনুইয়ের নিচে রাখা কাগজের দিকে চোখ ফেরালো ও। হরপ্পান, সংস্কৃত আর গ্রীক ভাষায় জগাখিচুরি থেকে লেখাটার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে ও, প্রথম অংশ বুঝতে পারলেও নিশ্চিত হতে পারছে না পরের কাজটুকু নির্ভুল হয়েছে কি না।

জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে গোটা পৃথিবী......

আবারও স্ক্রিনের দিকে তাকাল এলিজাবেথ। আলাদা আলাদা তেপায়ায় বসে আছেন মহিলারা, তবে প্রত্যেকেই এক হাত উঁচু করে রেখেছেন ধোঁয়ায় ভাসতে থাকা বাচ্চাটার উদ্দেশ্যে। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এল ওর কাছে।

ওই মহিলারাই হচ্ছেন ছেলেটার অবলম্বন।

আবারও কাগজে লেখা লাইনটার দিকে তাকাল ও। এবার দুটো অংশের ভেতর যোগসূত্রটা ধরতে পেরেছে।

জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে গোটা পৃথিবী......অনেকে যদি এক না হয়।

এটা একটা সতর্কবার্তা। বিশাল আগুনের রূপ নিয়ে এমন একটা কিছু আসবে যা জ্বালিয়ে দেবে গোটা পৃথিবীকে, এই ব্যাপারটারই সতর্কবার্তা দিয়েছে লেখাটা। গ্রে'র বলা কথাটা মনে পড়ল এলিজাবেথের। ইউরাল পর্বতমালায় তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণসংক্রান্ত কোনও প্রজেক্ট বা এই ধরণের কিছু একটা বিপদের কথা বলেছিল সে, যার ফলে মৃত্যুঝুঁকিতে আছে লাখ লাখ মানুষ।

তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের কথা ভাবল এলিজাবেথ। মাশরুম আকৃতির গোলাকার আগুন... মাঝখানে কেন্দ্র গঠন করে চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া ধোঁয়া।

...অনেকে যদি এক না হয়।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে স্ক্রল করল ও, মোজাইক আঁকা ছবিটা ছাড়িয়ে নেমে এল আরও নিচে। আরেকটা ছবি আছে ওখানে।
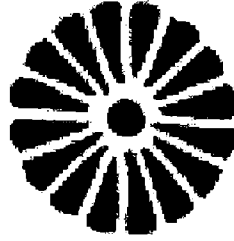
চক্র চিহ্ন।

ছবিটায় আঙুল বুলালো এলিজাবেথ। এই চিহ্নটাও একই দিকনির্দেশ করছে। চারদিক থেকে মাঝখানে এসে একসাথে মিলিত হয়েছে প্রতিটা আলাদা আলাদা ভাগ।

...অনেকে যদি এক না হয়।

আবার স্ক্রিনে স্ক্রল করল ও, এবার উপরের দিকে। পাঁচজন মহিলা, শক্তি যোগাচ্ছেন একটা বাচ্চা ছেলেকে।

দৃশ্যটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল এলিজাবেথ। কাঁপা হাতে গ্রে'র রেখে যাওয়া স্যাটেলাইট ফোনটা তুলে ধরল সে। কিছু জানতে পারলে ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো-কে ফোন করতে বলে গেছে গ্রে।

তবে, এখনও দ্বিধা রয়েই গেছে। ওর তো ভুলও হতে পারে। একবার ভাবল, নিশ্চিত না হয়ে ফোন করার দরকার নেই। তবে সাথে সাথে আরেকটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লুকোচুরি খেলেছেন তার বাবা আর প্রফেসর মাস্টারসন, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জট আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। ভুল হোক আর ঠিক হোক, লুকোচুরি আর না।

বাবার মতো একই ভুল করতে পারে না এলিজাবেথ।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পেইন্টারের নাম্বারটা ডায়াল করল ও।

বিকেল ৩:১৮
ওয়াশিংটন ডি.সি.

অপারেশন চেম্বারের পাশের একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো। ভেতরে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল থেকে আসা নিউরোলজিতে দক্ষ

এক সার্জারি টিম অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লিসা আর ম্যালকমও আছেন তাদের সাথে। বেডের পাশের টেবিলে ট্রে-তে ছুরি-কাঁচিসহ আরও অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা। চালু করে দেয়া হয়েছে বেডের পাশে দেয়ালে আটকানো বেশকিছু মনিটর।

বেডের একেবারে মাঝখানে, অপারেশনের পোশাক পরে নিশ্চল শুয়ে আছে সাশা। মাথার এক পাশে কামিয়ে ফেলা হয়েছে ওর। কয়েক ধরণের অ্যান্টিসেপটিক জাতীয় মলম লাগিয়ে রাখা হয়েছে কানের পেছনে আটকানো ডিভাইসটার গোড়ায়। বেডের উপরে ঝোলানো অপারেশন ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে স্টিলের ডিভাইসের গায়ে।

রুমের একপাশে জানালার ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাট, উদ্বিগ্নতায় ছেয়ে আছে চেহারা। তার চিন্তার কারণ জানেন পেইন্টার। গত কয়েক ঘন্টায় করা বেশকিছু টেস্টের ফলাফল খুব একটা ভালো আসেনি। সাশার মাথার ভেতর যা চলছে, তা আস্তে আস্তে ডিভাইস সংলগ্ন এলাকার মস্তিষ্কে খুব খারাপ প্রভাব ফেলছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সবাই, এখনই অপারেশনটা করার উপযুক্ত সময়। নয়তো পরে ধকল সইতে পারবে না সাশার দুর্বল শরীর।

অপারেশনের আগের সব ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ফেলেছেন প্রধান নিউরো সার্জন। সফলতার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। ডিভাইসটা সরিয়ে ফেলা মুটামুটি সহজ কাজ না হলেও অসম্ভব কিছু না।

কাল অমন একটা রাত কাটাবার পর, আজ সারাদিনে এটাই ছিল সবার জন্য একমাত্র স্বস্তিদায়ক খবর।

এমন সময় পেইন্টারের পকেটে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। একবার ভাবলেন ধরবেন না। তারপর কী ভেবে হাত ঢোকালেন পকেটে। কলার আইডি দেখে বুঝলেন রাশিয়ার খিস্তুম নামের শহর থেকে করা হয়েছে কলটা। জানালা থেকে সরে গিয়ে ফোন কানে ঠেকালেন ডিরেক্টর।

"পেইন্টার ক্রো বলছি।"

"ডিরেক্টর," একটা মেয়ে কণ্ঠ ভেসে এল। প্রথম শব্দটা শুনেই কণ্ঠের মালিককে চিনতে পারলেন তিনি-এলিজাবেথ। ভয়ে হোক আর উত্তেজনায় হোক, মেয়েটার গলার কাঁপুনি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"কী হয়েছে এলিজাবেথ?"

"যদিও নিশ্চিত হতে পারিনি, তবে একটা ব্যাপার ধরতে পেরেছি আমি...মানে অনুবাদ করেছি আর কী। যাই হোক..."

ধৈর্য্য ধরে ওর মুখ থেকে পুরো কাহিনী শুনলেন পেইন্টার। মাথায় সাজিয়ে নিলেন প্রাচীন মোজাইকে লুকিয়ে রাখা গূঢ় ভবিষ্যৎবাণীটুকু।

"অজ্ঞান, ঘোরলাগা অবস্থায় তেপায়ায় বসেছিলেন পাঁচজন ওরাকল। নিজের পুরো অস্তিত্ব দিয়ে ছেলেটাকে সহায়তা করছিলেন তারা। জানি কেমন যেন শোনাচ্ছে, তবে আমি নিশ্চিত-একমাত্র ওই ছেলেটার পক্ষেই সম্ভব, বিপদ থেকে

সবাইকে উদ্ধার করা। আর কেন যেন মনে হচ্ছে, ইউরাল পর্বতে ঘটতে যাওয়া ব্যাপারটার সাথে এর কোনও সম্পর্ক আছে।"

মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে সাশার দিকে চোখ পড়ল পেইন্টারের। অজ্ঞান, ঘোরলাগা অবস্থায় থাকা ওরাকল...এখন সাশা যে অবস্থায় আছে, ঠিক তেমন।

ক্যাট বলেছিল, জ্ঞান হারানোর আগে ওর ভাইয়ের নাম ধরে ডেকে উঠেছিল বাচ্চাটা।

একটা বাচ্চা ছেলে, যে সবাইকে উদ্ধার করতে পারে বিপদ থেকে।

মিলে যাচ্ছে সব।

ততোক্ষণে হাতে একটা ছুরি তুলে নিয়েছেন প্রধান সার্জন। অপারেশন শুরু করতে চলেছেন তিনি।

না!

ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়ালেন পেইন্টার, জোড়ে চাপড় বসালেন অপারেশন সেন্টারের দরজায়।

বিপরীত পাশ থেকে তাকে ডেকে উঠল ক্যাট। "কী হয়েছে, ডিরেক্টর?"

ব্যাখ্যা করার মতো সময় নেই এখন। দরজা খুলে যেতেই ঝড়ের বেগে অপারেশন রুমে ঢুকলেন তিনি। "থামো! জায়গা ছেড়ে নড়বে না কেউ!"

দুপুর ১:১৪
দক্ষিণ ইউরাল পর্বতমালা

"জেনারেল-মেজর, নিচের বাঙ্কারে থাকাই আপনার জন্য নিরাপদ হবে," সাভিনা মারতোভকে সতর্ক করল একজন রাশিয়ান সৈন্য। তার চাইতে একমাথা উঁচু লোকটা, সারা গায়ে কিলবিল করছে পেশী।

ড. পেত্রভকে বয়ে নিয়ে এল আরেক সৈন্য। গুলি খেয়েছেন ডক্টর, পা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রক্তের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমাগত চিৎকার বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। আরেকজন সৈন্য রাইফেল হাতে এগিয়ে গেল সামনে। জিপসীদের অতর্কিত আক্রমণ সামলানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

"যান জেনারেল-মেজর। আমরা যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখবো ওদের," সিঁড়ির দিকে হাত তুলে আবারও বলল পেশীবহুল লোকটা।

"বাচ্চাগুলো..." মুখ খুললেন সাভিনা। "গুলি করো সবাইকে।" নিজের কণ্ঠই অবিশ্বাস্য ঠেকছে তার কাছে। তবে এতো বছরের সাধনা অন্য কারও হাতে পড়ুক, এটা মেনে নেয়া সম্ভব না কোনওমতেই।

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল লোকটার চোখদু'টো।

তবে মনেপ্রাণে সে একজন সৈন্য। কর্তার আদেশ পালন করাই তার একমাত্র কাজ। মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন সাভিনা। দৃশ্যটা ঘটতে দেখা তার পক্ষে সম্ভব না। ভাবতেই পা কাঁপছে ঠকঠক করে। আস্তে আস্তে নেমে এলেন সিঁড়ির শেষমাথায়। ঘরের দরজাটা চার ইঞ্চি পুরু স্টিলের তৈরি। এখানে বসেই উপরের ধ্বংসযজ্ঞ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবেন তিনি। এক পলক তাকালেন মাথার উপর আটকানো মনিটরগুলোর দিকে। একেবারে মাঝেরটায় দেখাচ্ছে-বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ফোকর বেয়ে কলকল করে নেমে আসছে বিষাক্ত পানির ধারা।

উপর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

বাচ্চাগুলো...

মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে বাঙ্কারের উদ্দেশ্যে এগোলেন তিনি।

কিন্তু সামনে আচমকা একটা অবয়ব উদয় হলো, পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ছেলে।

পিওতর।

সরাসরি সাভিনার দিকে তাকিয়ে আছে পিওতর। আলো তার পেছনদিক থেকে আসছে বলে, চেহারা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। তবে তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে পিওতর। কুটিল, লোভী একটা হৃদয় ধারণ করে আছেন এই মহিলা।

"পিওতর," তাকে দেখে ডেকে উঠলেন সাভিনা। গলায় আশা আর ভয় দুটো অনুভূতিই কাজ করছে একসাথে।

পিওতরের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি। এক পা সামনে এগোল ছেলেটাও। সাভিনার বুক চিরে ঠিকরে বেরোনো হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি অনুভব করতে পারছে পিওতর। মাথার ভেতর যেন ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আওয়াজটা।

নিজের ভেতর এতোকাল ধরে পুষে রাখা রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট উন্মাদ করে দিয়েছে যেন পিওতরকে। আজ আর একা নয় ও, অলক্ষ্যে থেকে ওকে সঙ্গ দিচ্ছে তার বন্ধুরা। সবার ক্ষমতা হাতের মুঠোয় অনুভব করতে পারছে পিওতর।

দু'হাত বাড়িয়ে সাভিনার হৃদয়টাকে নিজের মুঠোয় কল্পনা করল ও। যেন ছোট একটা পাখি বসে আছে হাতদুটোর ভেতর। তিরতির করে কাঁপছে ওটার ডানা। কল্পনায় পাখিটার ঘাড় চেপে ধরল পিওতর। মুচড়ে দিতে লাগল ছটফট করতে থাকা ছোট আকৃতিটাকে।

ওর ক্ষমতাকে দুর্বল ভেবেছিল সবাই। কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি, শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে কতটা বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে ও। পিওতরের চোখদুটোর ভেতর যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে সবগুলো বাচ্চার চোখ, অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। হঠাৎ বহুকাল আগের একটা ঘটনা ভেসে উঠল চোখের সামনে-একটা অন্ধকার চার্চে বসে আছে ও, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সামনে। একটা বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই মহিলা। তার হৃদয়টাকেই এখন হাতের মুঠোয় ধরে আছে পিওতর। দৃশ্যটা মনে পড়তেই আরও হিংস্র হয়ে উঠল ও। বছরের পর বছর ধরে মনে জমিয়ে রাখা ভয়, শঙ্কা, রাগকে একত্র করে ছুরির মতো

একটা আকৃতি কল্পনা করল, আর তারপর সেই অনুভূতির ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল হাতে ধরে রাখা হৃৎপিণ্ডে।

পিওতরের এই আগ্রাসী ক্ষমতার আবহ পৌঁছে গেল সাভিনার অন্তরে। মনে হতে লাগল কেউ যেন শক্ত মুঠোতে খামচে ধরছে তার বুকের ভেতরটা। শ্লথ হয়ে আসতে শুরু করল হৃৎপিণ্ডের গতি। অব্যক্ত যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে এল সাভিনার।

কষ্ট হচ্ছে পিওতরের-ও। এতোকাল ধরে জমানো রাগ, ক্ষোভ প্রকাশ পাওয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে মন। পানির ঢল নামল দু'চোখে। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। নয়তো ঠিকই দেখতে পেতো, কাতরানোর এক ফাঁকে তার দিকে পিস্তল তুলে ধরেছেন সাভিনা।

গুলির আওয়াজে ভেঙে খানখান হয়ে গেল আশেপাশের নীরবতা।

সাভিনার হৃদয়টা নিজের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে সম্বিত ফিরল পিওতরের। চোখ মুছে সামনে তাকাল ও। মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন সাভিনা, গুলি লেগে উড়ে গেছে মুখের একপাশ। খুব বীভৎস দৃশ্যটা। তার পেছনদিকে, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক। ধোঁয়া বেরুচ্ছে হাতে উদ্যত পিস্তলের নল থেকে।

অসীম উচ্ছ্বাস নিয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল টেকো লোকটা।

"পিওতর!"

ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরল মঙ্ক। অক্ষতই মনে হচ্ছে ছোট্ট শরীরটা, তবে খুব গরম হয়ে আছে।

তার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বাকিরা।

উপরে এতোক্ষণ ভালোই গোলাগুলি চলছিল। অজ্ঞান কিছু বাচ্চাকে গুলি করতে যাচ্ছিলো রাশিয়ান সৈন্যরা। তাদের পৌঁছাতে আর আধা মিনিট দেরি হলেই শেষ হয়ে যেত সব।

এখন জায়গাটা পুরোপুরি জিপসীদের নিয়ন্ত্রণে আছে। বাচ্চাগুলোর দেখভালও করছে তারা।

"এটাই কী সেই জায়গা?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

পিওতরকে কোলে নিয়েই বাকি সবার সাথে বাঙ্কারে ঢুকল মঙ্ক। দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ঘুর্ণিঝড় বয়ে গেছে গোটা কন্ট্রোল প্যানেলের উপর দিয়ে। মাথার উপর একসারি মনিটর ছাড়া ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে সব যন্ত্রপাতি।

মাঝের স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল মঙ্ক। ওটাই অপারেশন স্যাটার্নের কেন্দ্র। ছাদের একটা ফুটো দিয়ে কলকল করে নেমে আসছে পানির স্তম্ভ। ইতিমধ্যে বেশ গভীর হয়ে উঠেছে মেঝেতে গড়াতে থাকা পানির স্তর।

"ওদের কাজ হয়ে গেছে," হতাশকণ্ঠে বলে উঠল মঙ্ক। "অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা।"

আরেকটা স্ক্রিনে কনস্টানটাইন আর বাচ্চাগুলোকে ফেলে আসা সেই টানেলটা চিহ্নিত করল সে। নেতিয়ে পড়ে আছে সবগুলো বাচ্চা। তেজস্ক্রিয়তা কী ওদের নাগালে পেয়ে গেছে?

গ্রে পকেট থেকে একটা স্যাটেলাইট ফোন বের করতেই, বাকি দু'জনের দিকে তাকাল মঙ্ক-কোয়ালস্কি আর রোজারো। কাউকেই চিনতে পারছে না সে। কারা এরা? আসলেই যদি বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে কিছুই মনে পড়ছে না কেন ওর?

ঠিক তখনই নড়ে উঠল পিওতর। হাত উঁচু করে মাঝের মনিটরের দিকে ইশারা করল।

"কী করছে ও?" ফোনটা কানে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মঙ্কের কাছেও নেই।

"পিওতর?"

একদৃষ্টে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

বামদিকের মনিটরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। "হেই! ট্রেনটা দেখি চলা শুরু করেছে ওখানে!"

ঘাড় ফেরালো মঙ্ক। আস্তে আস্তে গড়ানো শুরু করেছে ট্রেনের চাকা। লোহায় লোহা ঘষা খাওয়ায় বৈদ্যুতিক ফুলকি দেখা গেল ট্র্যাকে। তার মানে, এখনও পাওয়ার আছে ওই টানেলে।

"এটা কী এই বাচ্চাটা করছে?" জানতে চাইলো কোয়ালস্কি। "ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চালাচ্ছে ট্রেনটা?"

"না।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মঙ্ক। "কেউ একজন আছে ওখানে।"

"কে?" অবাক গলায় প্রশ্ন করল গ্রে।

মনিটরে স্পর্শ করল পিওতরের একটা হাত। মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে নিজেরসহ বাকি সব বাচ্চারদের কাছে থেকে পাওয়া ইচ্ছাশক্তির পুরোটা ব্যবহার করতে লাগল ও। নিজেকে কল্পনা করল ওই টানেলে, চলতে থাকা ট্রেনের ভেতর। আরেকটা হৃদয় ওর জন্যই অপেক্ষা করছে সেখানে। মহৎ, আন্তরিক একটা হৃদয়।

অবশেষে তাকে খুঁজে পেয়েছে পিওতর। মঙ্কের কোলে ঝুলতে ঝুলতেই নিজের হাতদুটো একসাথে কাপের মতো করে ধরল সে, ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসতে থাকা সেই হৃদয়টাকে অনুভব করল হাতের আলতো ছোঁয়ায়। মনের সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত আবেগ দিয়ে ডুবিয়ে দিল হৃদয়টাকে। এটাই দরকার ছিল ওর, এটার জন্যই অপেক্ষা করছিল ও এতোক্ষণ।

ট্রেনে বসা মার্তা আর মঙ্কের কোলে থাকা পিওতর পরস্পর যুক্ত হলো এক আদিম বাঁধনে।

পিওতরের মতো মার্তারও সহানুভূতি বুঝতে পারার ক্ষমতা আছে, ব্যাপারটা জানতো না রাশিয়ানরা।

একই ধরণের প্রতিভাধারী হওয়ায় ওদের দু'জনের মাঝে আলাদা একটা টান আছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে, একটা গোপনীয়তাও লুকানো আছে দু'জনের ভেতর।

একেবারে প্রথমবার দেখা হওয়ার সময় থেকেই তারা দু'জন জেনে গিয়েছিল সেই গোপন সত্যিটাঃ একসাথে মরবে ওরা।

অপারেশন স্যাটার্ন-এর কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে ট্রেনটা।

"কে আছে ট্রেনে?" জিজ্ঞেস করল গ্রে। "তার সাথে কী যোগাযোগ করা সম্ভব?"

পিওতরকে উঁচু করে ধরে রেখেছে মঙ্ক, যাতে মনিটরে হাত স্পর্শ করে রাখতে পারে ছেলেটা। ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল ও। "মনে হয়, পিওতর ইতিমধ্যে সেটা করে ফেলেছে। আর ও খুব ভালো করেই জানে, কীভাবে ট্রেনটা চালাতে হয়।"

"কিন্তু ট্রেনে আছেটা কে?"

"এক বন্ধু।"

বামদিকের স্ক্রিন থেকে মাঝের স্ক্রিনে চলে এল ট্রেনটা, তারপরই ব্রেক কষে থেমে গেল। ফুলকি ছিটকে উঠল চাকা থেকে। এটাই অপারেশন স্যাটার্ন-এর কেন্দ্র। সামনের বগি থেকে টলতে টলতে নেমে দাঁড়াল খাটো একটা অবয়ব।

"বানর নাকি?" আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল কোয়ালস্কি।

"উঁহু, বানর না," রোজারো তার ভুলটা শুধরে দিল। "শিম্পাঞ্জী।"

"ওর নাম মার্তা," বলে উঠল মঙ্ক।

ওর কণ্ঠে ব্যাথার ছাপ লক্ষ্য করল গ্রে। কারণটাও সহজেই অনুমেয়-এতক্ষণে ওখানে নিশ্চয়ই তেজস্ক্রিয়তা প্রাণঘাতী পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শিম্পাঞ্জীটার হাবভাবেও তার প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে- নড়াচড়া করছে খুব ধীরে, পিছলে যাচ্ছে পা, টলছে ক্রমাগত।

"কী করতে চাইছে ও?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

আস্তে করে জবাব দিল মঙ্ক। "আমাদের সবাইকে বাঁচাতে চাইছে!"

শারীরিকভাবে না হলেও, মানসিকভাবে মার্তার সাথেই আছে পিওতর। তার নিজের ইন্দ্রিয়ের সাথে মিশে গেছে প্রানিটার অনুভূতি। অপরপক্ষে, নিজের সাথে পিওতরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে মার্তাও। ব্যাপারটা সাহস আর শক্তি দুটোই যোগাচ্ছে তাকে।

মার্তার চোখ দিয়ে গোটা দৃশ্যটা অনুভব করছে পিওতর। উপর থেকে কলকল শব্দে বিষাক্ত পানির ধারা নেমেছে, জ্বালা করছে শরীর। বদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে পচা একটা গন্ধ। সবমিলিয়ে অসহ্য একটা পরিবেশ।

তারা দু'জনই একসাথে অনুভব করছে পুরো ব্যাপারটা।

মেঝেতে গড়াতে থাকা কালো পানির স্তরের দিকে তাকাল মার্তা। যেভাবেই হোক, এটাকে ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে হবে।

একটা মাত্র উপায়ই আছে।

কনস্টানটাইন আগেই পিওতরকে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়েছিল। জানিয়ে দিয়েছিল এক্সপ্লোসিভ চার্জ, রেডিও ট্রান্সমিটার, সাইলো ডোর ইত্যাদি সম্পর্কেও।

বিশেষ লিভারটার ব্যাপারেও বলেছিল ছেলেটা।

আর পিওতরের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগের প্রেক্ষিতে এখন মার্তাও জানে সবকিছু সম্পর্কে। যন্ত্রপাতির মাঝে বিশেষ ধাতব দণ্ডটা দেখতে পেল ও। একমাত্র

এটার মাধ্যমেই সাইলো ডোরটা বন্ধ করা যাবে, বাইরের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকানো যাবে বিষাক্ত পানির স্রোত।

পিওতর অনুভব করতে পারল, আস্তে আস্তে ভয়ের একটা পর্দা ঘিরে ধরছে মার্তাকে।

তুমি পারবে, মার্তা...

শিউরে উঠল প্রানিটা। সারা গা জ্বালাপোড়া করছে, রোমগুলো পাইন কাঁটার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তবে তাকে সাহস যোগাচ্ছে পিওতর।

কোনওমতে লিভারটার কাছে পৌঁছালো ও। মেঝের সাথে আনুভূমিকভাবে কাত হয়ে আছে দণ্ডটা। এটাকে টান দিয়ে খাড়া উপরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। দণ্ডের উপরের প্রান্তের নিচে এক কাঁধ ঢুকিয়ে দিল মার্তা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল হ্যান্ডগ্রিপ। তারপর পা দিয়ে যত জোরে সম্ভব ঠেলা দিল মেঝেতে।

কিন্তু একচুলও নড়ল না জিনিসটা।

আরও জোরে ঠেলা দিল ও। পিওতর অনুভব করতে পারল, আড়ষ্টতায় ছেয়ে যাচ্ছে মার্তার কাঁধ। কুঁকড়ে আসছে হাত-পায়ের পেশি।

পিওতরের দু'হাতের মাঝে প্রবল গতিতে ধুকপুক করছে ওর জীবনপ্রদীপ।

মার্তা...আরও জোরে...

তবুও নড়ছে না লিভারটা।

মঙ্ক দেখতে পেল, লিভার নিয়ে ধুঁকছে শিম্পাঞ্জীটা। ইতিমধ্যে যথেষ্ট দুর্বল গেছে ও। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে পিওতরও।

"নড়ছে না কেন?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

"জোর লাগা ব্যাটা বানর কোথাকার!" বিড়বিড় করে উঠল কোয়ালস্কিও।

মনিটরের দিকে আরেকটু ঝুঁকলো মঙ্ক। টানেলটা আগেই পেরিয়ে এসেছে ও, সেই দৃশ্যটা কল্পনা করতে লাগল। ঠিক তখনই মাথা ঘুরে উঠল ওর। চোখের সামনে এক পলকের জন্য দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল কয়েকটা ছবি।

...খনি শ্রমিকের পোষাক পরা এক লোক...মালবাহী বগি...ধুলোমাখা একটা মুখ, সেই মুখে খেলা করছে উজ্জ্বল হাসি...একটা বাচ্চা ছেলে...বাবা।

পরের দৃশ্যটুকু মনে করর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল মঙ্ক। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মাথাটা। আগে-পরে কিছুই নেই। কিন্তু হঠাৎ এই দৃশ্যটা দেখার মানে কী? নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু লুকানো আছে এখানে।

আবারও ছবিটার কথা মনে করল ও। শ্রমিকের পোষাক পড়া লোকটা মালবাহী বগিটা চালাচ্ছিলো, সে ওটাকে থামাচ্ছিলো একটা-

"হ্যান্ডব্রেক!" চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক।

লিভারটার ছবি ওর মনে গেঁথে আছে। হ্যান্ডগ্রিপের শেষে আরেকটা ছোট দণ্ড ছিল।

পিওতরের দিকে তাকাল মঙ্ক। ছেলেটার কানে ফিসিফিস করে উঠল সে। "মার্তাকে অবশ্যই হ্যান্ডব্রেকটা ছাড়াতে হবে। তারপর কাজ করবে লিভারটা।"

তবে স্ক্রিনের দিকেই তাকিয়ে রইল পিওতর, যেন শুনতে পায়নি কথাগুলো।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মঙ্কের দিকে এগিয়ে এল রোজারো। "শিম্পাঞ্জী আর ও যোগাযোগ করছে কীভাবে? সংকেতের মাধ্যমে?"

"না। আমার মনে হয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবে। এক্ষেত্রে কোনও সংকেতের প্রয়োজন হয় না ওদের। আগেও এমনটা করেছে ওরা, তবে মাঝে এতোটা দূরত্ব ছিল না আর কী!"

"তাহলে তোমাকেও ওই পদ্ধতিতেই যোগাযোগ করতে হবে।"

ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল মঙ্ক, যেন পাগলের প্রলাপ বকছে ও।

রোজারোকে সমর্থন দিল গ্রে। "রোজারো নিউরোলজিতে এক্সপার্ট। ওর কথামতো কাজ করো।"

"তুমি যা বলছে, অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগের ব্যাপারটা, এর পুরোটাই সংবেদনশীলতা আর স্পর্শানুভূতির উপর নির্ভরশীল। তোমাকেও ওইভাবেই এগোতে হবে। এমন কিছু করো যাতে ছেলেটার মনোযোগ তোমার প্রতি আকর্ষিত হয়।" ব্যাখ্যা করল রোজারো।

মার্তা আর পিওতরের কথা চিন্তা করল মঙ্ক। তারা প্রায় সবসময়ই একে অপরের সাথে গা ঘেঁষে থাকতো, স্পর্শ করতো একজন আরেকজনকে। প্রানিটার স্পর্শই স্বস্তি দিতো পিওতরকে।

দু'হাতে ভালো করে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল মঙ্ক। মার্তাও এভাবেই সবসময় জড়িয়ে ধরতো ওকে। বাচ্চাটার ধীর হয়ে আসা হৃৎস্পন্দন নিজের বুকে অনুভব করল মঙ্ক। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ব্যাখ্যা করল পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে।

মনেপ্রাণে একটা কথাই বারবার উচ্চারণ করতে লাগল ও।

আগে হ্যান্ডব্রেকটা ঘোরাও...

মার্তাকে একমনে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে পিওতর। ঠিক তখনই খুব কাছে আরেকটা শক্তিশালী হৃদয়ের ডাক অনুভব করল ও, তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছে হৃদয়টা। মন দিয়ে কথাটা শুনল পিওতর।

আবারও মার্তার দিকে মনোযোগ ফেরাল ও। বুঝিয়ে দিল, কী করতে হবে এখন।

কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে প্রানিটা।

আর একটু...

কাঁপতে কাঁপতে হাতটা আরেকটু প্রসারিত করল মার্তা, লিভারের গোড়ায় থাকা হ্যান্ডব্রেকটার নাগালও পেয়ে গেল। লম্বা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরল ছোট ধাতব দণ্ডটাকে, মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে দিল ব্রেক। তারপর আবার লিভার নিয়ে নিয়ে

কসরত শুরু করল। এবার যেন একটু নড়ে উঠল জিনিসটা। তবে মার্তার বর্তমান শক্তির পক্ষে যথেষ্ট শক্ত ওটা। সমস্ত শক্তি একত্র করে হাত চালালো ও।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে অবশেষে নড়ে উঠল পাষাণ ধাতব দণ্ড।

আটকে রাখা নিঃশ্বাসটুকু ছেড়ে দিয়েই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মার্তা।

"পেরেছে ও," গ্রে'র গলায় উচ্ছ্বাস।

মনিটরে দেখা যাচ্ছে-আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে মেঝের ফোকর। স্টিলের ভারি আইরিসের পাল্লা আটকে যাচ্ছে শক্তভাবে। আর বাইরের পরিবেশে মিশতে পারবে না বিষাক্ত লেকের পানি। মাইনিং চেম্বারেই আটকে থাকবে সবটুকু।

তবে যতক্ষণ না গোটা চেম্বার ভরে যাচ্ছে, বন্ধ হবে না উপর থেকে পানি ঝরা। দেখতে দেখতে পানির তোড়ে টানেলের ভেতর দিকে ভেসে গেল হতভাগা শিম্পাঞ্জীটার দেহ। তবে ট্রেনের কাছে পৌঁছে কোনওমতে হাচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও। শরীর টেনে উঠে গেল একটা বগির ছাদে। তারপর শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল টানেলের ছাদের দিকে।

হতভাগা প্রানিটার জন্য হাহাকার করে উঠল গ্রে'র মন।

"আরে ওই ব্যাটাকে বের কর না ভাই...বের কর ওখান থেকে!" চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। উত্তেজনায় থাবা বসিয়ে দিল ভাঙা কন্ট্রোল প্যানেলের বোর্ডে।

কিন্তু আর কিছুই করার নেই। দরজা জ্যাম হয়ে আছে, পানিতে ভরে যাচ্ছে টানেল। কোনওদিক দিয়েই কারও পক্ষে মার্তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব না। দেয়াল খুঁড়ে রাস্তা বের করতে গেলে তেজস্ক্রিয়তা বাগে পেয়ে বসবে ওদেরকেও। তাছাড়া, অনেকক্ষণ আগেই প্রানঘাতী মাত্রায় বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে মার্তা।

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো রোজারো। নিষ্ঠুর দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না।

টলতে টলতে ট্রেনের ছাদে লুটিয়ে পড়ল প্রানিটা। জানে, কী ঘটতে যাচ্ছে ওর ভাগ্যে।

পিওতরকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মঙ্ক, কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল চোখের কোণ বেয়ে।

তার বাহুডোরে কাঁপছে ছেলেটাও। এখনও যোগাযোগ ধরে রেখেছে মার্তার সাথে।

মার্তার সাথেই আছে পিওতর। পানির উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সাথে ওকে পাল্লা দিয়ে ঘিরে ধরছে ভয়ের পর্দা। জানে, পানিই হচ্ছে ওর খুনী। কল্পনায় পিওতরকে জড়িয়ে ধরল শিম্পাঞ্জীটা, ঠিক যেভাবে জড়িয়ে ধরতো আগে। একসাথে মিলিত হলো দুটো হৃদয়।

পিওতর...

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মার্তা...

আস্তে আস্তে পানির কালো চাদর গ্রাস করে নিলো সব। ট্রেন পেরিয়ে ডুবে যেতে লাগল মার্তার দেহ।

পিওতর অনুভব করল, কালো একটা চাদর ঘিরে ধরছে তাকে। অনেকগুলো আলো জ্বলছে সেই নিঃসীম শুন্যতায়। স্বপ্নে দেখা সেই তারাগুলো...একটা উজ্জ্বল সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে সব।

স্কুলে একজন শিক্ষক তাদের কক্ষপথে গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের বিষয়ে পড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তারার ব্যাপারটা বুঝতে পারল পিওতর। তারাগুলো হচ্ছে অন্য সব বাচ্চা, আর সূর্যটা ও নিজে। সবার ক্ষমতাকে নিজের ভেতর ধারণ করে আছে ও। এখন আর অন্য তারাদের কোনও শক্তি নেই। পিওতরের আলোর উপরই ভরসা সবার। আর ক্ষমতা আদান-প্রদানের সীমা পিওতর অনেক আগেই অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন আর তাদের নিজেদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার কোনও পথ খোলা নেই। আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে বাকি তারাগুলো।

তবে তাদেরকে বাঁচানোর একটাই মাত্র উপায় আছে।

এজন্যই মার্তার কাছে তাকে টেনে এনেছে নিয়তি।

ওর সাহায্য চাই পিওতরের।

না...মার্তা...

তোমাকে অবশ্যই করতে হবে কাজটা, পিওতর...

ধীরে ধীরে মার্তার হাতদুটো ঘিরে ফেলল পিওতরের কাঁপতে থাকা হৃদয়টাকে। ওর চারদিকে ঘিরে আসা অসীম শুন্যতার মাঝে যেন এক পশলা আলো ছড়িয়ে দিল হাতদুটো।

পিওতর...

মার্তা জানে, বাকিদের বাঁচাতে হলে একটামাত্র পথই খোলা আছে। সূর্য আর তারাগুলোর মাঝে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে ওকে। যেন সূর্য থেকে তারাগুলোতে সঞ্চারিত হয় আলোকরশ্মি। তাহলেই তারায় তারায় আবারও ছড়িয়ে পড়বে সূর্যের ক্ষমতা।

ধীরে ধীরে সব ভয়ের উর্ধ্বে চলে গেল মার্তার মন। পুরো ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শুধু একটাই বিষয় কামনা করতে লাগল প্রানিটা।

আর তারপর...অন্ধকার গ্রাস করে নিলো সবকিছু।

সূর্যের আলো পুরোপুরি নিভে যাওয়ার আগে একটা নির্দিষ্ট তারার দিকে মনোযোগ দিল পিওতর। অন্য তারাগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওটা।

সাশা।

ফিসফিস করে বোনের কানে শেষ একটা কথা বলল পিওতর...খুব গোপন একটা কথা।

পানির এক ঝটকায় ট্রেনের ছাদ থেকে ভেসে টানেলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল মার্তার শরীর। সেই সাথে মঙ্কের বাহুডোরে নেতিয়ে পড়ল পিওতরও। মনিটর থেকে খসে এল ছেলেটার হাত।

আস্তে করে ওকে মেঝেতে শুইয়ে দিল মঙ্ক। "পিওতর?"

নিস্তেজভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। নড়ছে না চোখের মণি। হৃৎস্পন্দন দেখার জন্য বুকে হাত দিল মঙ্ক, মৃদু একটুখানি কাঁপন ধরা পড়ল।

উপরতলা থেকে আবছাভাবে কতগুলো কণ্ঠ ভেসে এল। জেগে উঠেছে বাকি বাচ্চাগুলো।

নড়ে উঠল গ্রে। "রোজারো, কোয়ালস্কি, উপরে যাও। সাহায্য করে ওদের।"

টানেলের শেষপ্রান্তে নড়াচড়া লক্ষ্য করল মঙ্ক। জেগে উঠেছে নিচে থাকা বাচ্চাগুলোও। কিস্কা-কে নিয়ে এগিয়ে এল কনস্টানটাইন।

সবাই ঠিক আছে।

"পিওতরের কী হলো?" জিজ্ঞেস করল গ্রে।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মঙ্ক। কোলে নিল ছেলেটার মাথা। যদিও নিঃশ্বাস চলছে, তবুও বুঝতে পারছে, নিজের ভেতর আর নেই পিওতর।

পিওতর...কেন?

এগিয়ে এসে মঙ্কের কাঁধে হাত রাখল গ্রে। "হয়তো শকের কারণে...সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে..."

মনে প্রাণে একই প্রার্থনা করছে মঙ্কও। বাচ্চাদের কোলাহল ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। উপলব্ধি করতে পারছে, বন্ধুদের জন্য কত বড় আত্মত্যাগ করতে হয়েছে ছেলেটাকে...মার্তাকে।

পাশে বসে পড়তেই গ্রে'র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মঙ্ক।

নতুন এই লোকটাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে ওর। বন্ধু হোক, আর যে ই হোক, মন থেকে ওর প্রতি একটা টান অনুভব করতে পারছে মঙ্ক। এমন একজন বলে মনে হচ্ছে, যাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে ও।

তাই আবার পিওতরকে জড়িয়ে ধরার সময় নেমে আসা চোখের পানি লুকানোর কোনও চেষ্টা করল না মঙ্ক। বন্ধুর সামনে লজ্জার কিছু নেই।

২২
২৮ সেপ্টেম্বর, বিকাল ৪:২১
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ন্যাশনাল মলের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁবু আর ওয়াগনের ফাঁক দিয়ে সামনে এগোলেন পেইন্টার ক্রো। নতুন-পুরনো ঝালরওয়ালা কাপড়ে তৈরি তাঁবুগুলোতে জিপসী সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। ওয়াগনগুলোর আকার আকৃতিতেও বিস্তর ফারাক দেখা যাচ্ছে। তিন চাকার একেবারে ছোট খুপড়ি থেকে শুরু করে বিশালাকায় চিমনিওয়ালা কেবিনও আছে। রঙচঙ মাখানো কারুকাজ করা চাকায় ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সবগুলো।

দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে রোমানিরা জমায়েত হয়েছে এখানে। চারদিকে কোলাহল-ঘোড়ার ডাক, বাচ্চাদের ছুটাছুটি, বাঁশির আওয়াজ সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড।

তার জীবন বাঁচানোর জন্য জিপসীদের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ধন্যবাদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন প্রেসিডেন্ট। তবে প্রেসিডেন্টের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি পুরো পৃথিবীকে আশু দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটা কৌশলে চেপে যাওয়া হয়েছে।

সরু গলি দিয়ে সামনে এগোলেন পেইন্টার। আশেপাশে বেশ কিছু পর্যটকদেরও দেখা যাচ্ছে। আর স্থানীয় অধিবাসীরা তো আছেই। জিপসীদের সাজিয়ে বসা পসরার চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে লোকজন।

একেবারে মাঝের দিকে বড় একটা ওয়াগন নজরে পড়ল পেইন্টারের, এতোক্ষণ এটাই খুঁজছিলেন তিনি। খোলা দরজার সামনে লুকার সাথে বসে কথা বলছে গ্রে। কমান্ডারের এক হাত এখনও একটা স্লিং-এ বেঁধে কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একটু দূরে কয়েকজন জিপসীর সাথে ছুরি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করছে রোজারো। সাঁই করে মেয়েটার হাত থেকে উড়ে গেল একটা ছুরি, টার্গেটের একেবারে মাঝখানে থাকা আরেকটা ছুরিকে ফেলে দিয়ে নিজে গেঁথে গেল সেই জায়গায়।

রাস্তার অন্যপাশে এলিজাবেথ আর কোয়ালস্কিকে দেখে খানিকটা অবাক হলেন পেইন্টার। ভারত থেকে ফিরেই মেয়েটা যোগ দিয়েছে তাদের সাথে। ভারতে আর্কিওলজিস্টদের একটা গ্রুপের সাথে ডুবে যাওয়া প্রাচীন গ্রীক মন্দিরটার ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিল ও। আশা করা হচ্ছে, গিরিখাতের মাঝখান থেকে আবারও উদ্ধার করা যাবে মূল্যবান স্থাপনাটা।

ডান দিকে ফিরতেই ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের সামনে ঝোলানো ব্যানারটা নজরে পড়ল পেইন্টারের। বিশাল ব্যানারে, পাহাড়ের পাদদেশে একটা গ্রীক মন্দিরের ছবি ছাপা, মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে একটা এপসিলন অক্ষর। অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ডেলফির ওরাকল সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীর ঘোষণা করছে ব্যানারটা। মাসখানেক আগে থেকেই টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। তবে বেশিরভাগ টিকিট রোমানিরাই কিনে নিয়েছে। নিজেদের অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অত্যন্ত আগ্রহী তারা।

পেইন্টারকে দেখে উঠে দাঁড়াল লুকা। ঢোলা প্যান্ট আর ফুলহাতা শার্ট পরে আছে লোকটা, পায়ে গলিয়েছে কালো রঙের বুট। কোমরে জিপসীদের ঐতিহ্যবাহী বেল্ট। "আহ, ডিরেক্টর ক্রো! স্বাগতম!"

মাথা নিচু করে বো করলেন পেইন্টার। অভ্যর্থনার জবাবে ধন্যবাদ দিলেন রোমানি ভাষায়, "নাইস টুকে।"

উঠে দাঁড়িয়েছে গ্রে-ও। কোয়ালস্কির মতো সাদাসিধা পোষাক পরে আছে সে-ও; জিন্স আর জ্যাকেট। রাশিয়া থেকে ফেরার পর, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিভিন্ন মিটিং আর সৎকারকর্ম শেষে সবাই মিলিত হয়েছে এখানে। অবশ্য পেইন্টার আগে থেকেই ছিলেন, প্রতি রাতে জিপসীদের কোলাহল দেখতে আসতেন তিনি। কী অদ্ভুত জীবনব্যবস্থা, কী অদ্ভুত রীতিনীতি!

তবে আজকের ব্যাপারটা অন্য দিনের থেকে আলাদা।

একটা টেবিলে বসল সবাই।

"মিটিং কেমন হলো?" জানতে চাইলো গ্রে। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এল লুকা, একই প্রশ্ন তারও।

সবেমাত্র স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা মিটিং শেষ করে ফিরেছেন পেইন্টার। গ্রে সেটার ব্যাপারেই জানতে চাইছে। সরকারী কয়েকজন উচপদস্থ লোক, রাশিয়ান দুতাবাসের কর্মী আর কয়েকটা মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মিটিং-এ। উদ্ধার করা সাতাত্তর জন বাচ্চার ভাগ্য নির্ধারণ করাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়।

"বাচ্চাগুলোর দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপাতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রাশিয়ানরা। গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইছে তারা। মাইনিং টানেলে ছড়িয়ে পড়া লেক করাশয়ের বিষাক্ত পানি নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বাইরের বিশ্বের জন্য সেরকম কোনও চিন্তার বিষয় নয় ওটা। মেঝের সাইলো ডোর ঠিক সময়েই বন্ধ করা হয়েছিল।"

স্বস্তি দেখা গেল গ্রে'র চোখেমুখে। "আর বাচ্চাগুলো?"

আজ সকালেও হাসপাতাল ঘুরে এসেছেন পেইন্টার। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের পুরো একটা ওয়ার্ড ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাদের জন্য। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দিনরাত খেটে চলেছে নিউরো সার্জনের টিম। একে একে প্রত্যেকের মাথায় বসানো টি.এম.এস. ডিভাইস সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে তারা। সুস্থ আছে সবাই।

"এখনও বাচ্চাগুলোর মাঝে প্রতিভা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পর্যায়ে," ব্যাখ্যা করলেন পেইন্টার। "তবে ডিভাইস সরিয়ে ফেলায় প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ তীব্রভাবে ফিরে এসেছে ওদের মাঝে। কিন্তু ডাক্তাররা আশাবাদী, ঠিকমতো চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে সবাই।"

লুকার দিকে তাকালেন পেইন্টার। হতাশায় ঢেকে গেছে জিপসীসর্দারের চেহারা। অবশেষে মুচকি হেসে বোমাটা ফাটালেন ডিরেক্টর, "আরেকটু উন্নতি হলেই জিপসীদের মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হবে বাচ্চাগুলোকে। আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন মিটিং-এ বসা সবাই।"

উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে ধুম করে টেবিলে কিল বসিয়ে দিল লুকা। "সাবাশ!"

তার এই আকস্মিক গর্জনে ভয় পেয়ে গেল কেবিনের পাশে বেঁধে রাখা কয়েকটা ঘোড়া, হ্রেষারবে করে উঠল প্রানিগুলো।

আরও আধাঘন্টা কথা বলার পর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই।

কোয়ালস্কির কনুই ধরে বাইরে বেরিয়ে এল এলিজাবেথ।

"তো, অবশেষে ফিরলে তুমি," ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি। তারপর একহাতে মাথা চুলকাতে লাগল। ইতস্তত করছে, পরের কথাটা বলা ঠিক হবে কি না।

"তুমি কী...ইয়েহ, মানে...আমরা কী...?"

ওর কণ্ঠে দ্বিধা অনুভব করতে পারল গ্রে। মুচকি হেসে পেইন্টারকে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল সে। নিজেও এগিয়ে গেল খানিকটা।

"কী বলতে চাচ্ছো, জো?" ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

দম আটকে, চোখ বন্ধ করে অবশেষে কথাটা বলেই ফেলল কোয়ালস্কি। "আমার সাথে ডেটিং-এ যাবে?"

মুচকি হেসে শ্রাগ করল মেয়েটা। "তার মানে, দ্বিতীয় ডেটিং-এ যেতে চাও?"

বিস্ময়ে বিশালদেহী লোকটার চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। "মানে?"

"একসাথে ভ্রমণ করা, কিডন্যাপ হওয়া, পৃথিবী রক্ষা করা...এগুলোকে ডেটিং বলবো না তো কী?"

মাথা চুলকালো কোয়ালস্কি। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে একটু দেরি হচ্ছে। "মানে তুমি রাজি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল এলিজাবেথ। "তবে সিগারেট উপহার দিতে হবে কিন্তু।"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি খেলে গেল তার মুখে। "পুরো একবস্তা আনবো...উফ, ধুর!" কথার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের জুতোর দিকে তাকাল সে। বেখেয়ালে ঘোড়ার লাদিতে পা দিয়ে ফেলেছে।

"আমার নতুন জুতো জোড়া!"

ওর হাত ধরে টান দিল মেয়েটা। "চলো দেখি, কোথাও পরিষ্কার করা যায় কিনা।"

"সবেমাত্র পালিশ করে এনেছিলাম!..." কথা বলতে বলতে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল দু'জন।

"যাক...কোয়ালক্ষিরও একটা গতি হয়ে গেল।" মাথা নাড়ল গ্রে।

গ্রে-কে সাথে নিয়ে স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের দিকে এগোতে লাগলেন পেইন্টার। পাহাড়সমান কাজ জমে আছে তাদের দু'জনের জন্যই। এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে সিগমা হেডকোয়ার্টার। আবার গুছিয়ে আনতে হবে সব।

তবে রাজনৈতিকভাবে বেশ অনেকটাই এগোনো গেছে। ম্যাপলথোর্প আর ম্যাকব্রাইডের সাথে সংশ্লিষ্ট, বেঁচে থাকা একমাত্র জেসন-ড. জেমস চেন ধরা পড়েছেন। জেরার মুখে জেসনদের ভেতর ঘনীভূত হয়ে আসতে থাকা দুর্নীতি সম্পর্কে মুখ খুলেছেন তিনি। ব্যাপারটা বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সমূলে উৎখাত করা হবে সব।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ভেতর ম্যাপলথোর্পেরপ্রভাব বিস্তার সম্পর্কেও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সবকিছুর সমাধান হবে।

ডারপার নবনিযুক্ত প্রধানের সাথে গতকাল কথা হয়েছে পেইন্টারের। প্রেসিডেন্ট নিজে তাকে ওই পদটা নেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সবিনয়ে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। সিগমাকে এখনও অনেক কিছু দেয়ার আছে তার। শেন ম্যাকনাইট আর আর্চিবাল্ড পোক-এর স্মৃতিবিজড়িত সংস্থাটাকে কীভাবে ছাড়বেন তিনি!

হাঁটার ফাঁকে গ্রে'র দিকে ফিরলেন পেইন্টার। "শুনলাম আগামীকাল ছুটি নিয়েছো, হাসপাতালে যাবে নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "ক্যাটের সঙ্গ দরকার।"

পরেরদিন সন্ধ্যা ছয়টায় মঙ্কের মাথায় সার্জারি হওয়ার কথা। সব ধরণের প্রস্তুতি নেয়া সম্পন্ন হয়েছে। ওয়ারেনে ওকে গিনিপিগ বানাতে চেয়েছিল রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা। কী যেন একটা চিপ বসিয়েছিল ওর মাথায়। আর সেই অপারেশন করার সময় মস্তিষ্কের সেরেব্রাল করটেক্সের খানিকটা কেটে ফেলে দিয়েছে শয়তানগুলো। ফলশ্রুতিতে আগের সব স্মৃতি মুছে গেছে ওর মগজ থেকে। নিউরোলজিস্টরা ঠিক করে বলতে পারছেন না, আবার পুরনো সবকিছু ও মনে করতে পারবে কি না। সার্জারির পর সেটা বোঝা যাবে।

"ও কী ক্যাটকেও চিনতে পারছে না?" জিজ্ঞেস করলেন পেইন্টার।

মাথা নাড়লো গ্রে। "না। তবে এই অবস্থায় ক্যাটকে যথাসম্ভব ওর কাছে থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা। এমন অবস্থায় কোনও কারণে শক পেলে হয়তো ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না ওর মস্তিষ্ক। তবে তারপরও কয়েকজন নার্সের সাথে মঙ্ককে দেখতে গিয়েছিল মেয়েটা। নিজেও নার্সের ছদ্মবেশ নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বললেও ওকে চিনতে পারেনি মঙ্ক।"

তাহলে শুধু একটা কাজই করতে পারি আমরা-প্রার্থনা।"

২৯ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৬:২১
জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল

জেগে উঠেছে মঙ্ক। চোখ খুলতেই উজ্জ্বল আলোয় যেন জ্বলে যেতে চাইলো চোখের মণি। প্রাণপণে গলায় উঠে আসা বমি ঠেকাল ও। কয়েকবার পিটপিট করার পর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল চোখের দৃষ্টি।

নার্সের নীল পোষাক পরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বেডের পাশে। "জ্ঞান ফিরেছে তাহলে, মিস্টার কক্কালিস। দয়া করে ব্যস্ত হবেন না। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিন।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলা।

মাথা ঘোরা এখনও থামেনি। মনে হচ্ছে যেন কেউ ড্রাম পেটাচ্ছে মাথার ভেতর। বুঝতে পারল, হাসপাতালের একটা কেবিনে আছে ও। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেল, দেয়ালে আটকান বিভিন্ন মনিটরে নিজের শারীরিক অবস্থা দেখাচ্ছে। হাতে লাগানো নল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢুকছে স্যালাইন।

কয়েকজন ডাক্তার এসে তার চোখ, জিহ্বা ইত্যাদি দেখতে চাইল। মিনিট দশেক যাবত আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর চলে গেল সবাই। একটু পর আরেকজন মানুষ ঢুকল ঘরে।

লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও।

"গ্রে...," নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠল মানুষটা। উজ্জ্বল হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি।

মঙ্ক বুঝতে পারছে, কী আশা করছে সবাই। কিন্তু না। রাশিয়ার সেই টানেলে পরিচয় হওয়া থেকেই মানুষটার নাম মনে করতে পেরেছে ও।

আরেকজন মেয়ে এসে তার পাশে বিছানায় বসল। কাধ পর্যন্ত ছাঁটা লালচে চুল, পরনে ঢোলা ব্লাউজ আর জিন্স। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সবুজ চোখজোড়া তাকিয়ে রইল মঙ্কের দিকে। কিন্তু তাকেও চিনতে পারছে না ও।

"বুঝতে পেরেছি আমি," কাতরে উঠল মেয়েটা।

"ওকে বিশ্রাম নিতে দেয়া উচিত এখন। চলে এসো।" বলে মেয়েটাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্রেক করল গ্রে। "আবার সকালে আসব আমরা। তাছাড়া, বাচ্চাটাকেও বাড়িতে নিতে হবে। সারাদিন তো এখানেই ছিল।"

কথার প্রেক্ষিতে গ্রে'র পেছনদিকে তাকাল মঙ্ক। দোলনায় একটা বাচ্চা শুইয়ে রাখা। কম্বলে জড়ানো মাথাটা কামানো, বন্ধ হয়ে আছে চোখজোড়া। ঘুমাচ্ছে ও।

বাচ্চাটার দিকে সেঁটে রইল মঙ্কের দৃষ্টি। হঠাৎ কয়েকটা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে।

...মোটা আঙুল জড়িয়ে ধরে রেখেছে ছোট কয়েকটা আঙুল...একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাঁটছে ও...ক্লান্ত হয়ে পড়েছে...জিরিয়ে নিয়ে আবার হাটছে...কেঁদে উঠছে বাচ্চাটা...কোলে দুলিয়েঘুম পাড়াচ্ছে তাকে...ছোট ছোট পায়ে ওর বুকে লাথি কষাচ্ছে...ডায়াপার বদলাচ্ছে মঙ্ক...

আবার হারিয়ে গেল দৃশ্যগুলো। তবে সবগুলো ছবির পেছনে একটা উজ্জ্বল ঝলক দেখতে পেল মঙ্ক।

"ও...ওর নাম..." কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে আর মেয়েটা। "পেনেলোপ।"

চমকে উঠল মেয়েটা। বাচ্চাটার দিকে একপলক তাকিয়েই ঘাড় ঘোরালো বিছানায় উঠে বসা মঙ্কের দিকে। উজ্জ্বল হয়ে এল সবুজ চোখজোড়ার দৃষ্টি। "মঙ্ক..."

এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। চুম খেলো কপালে।

আরেকটা অনুভূতি মনে করতে পারল মঙ্ক।

দারুচিনির গন্ধ...নরম ঠোঁট...

মেয়েটার নাম জানে না মঙ্ক, কিন্তু মন থেকে একটা টান অনভব করতে পারছে ওর প্রতি। নাম মনে করতে না পারলে কী হবে, একটা ব্যাপার ঠিকই বুঝতে পারছে সে। মেয়েটা ওকে ছেড়ে চলে গেলে শূনতায় ভরে থাকবে গোটা জীবনটাই।

সন্ধ্যা ৭:০১

মঙ্ক আর ক্যাটকে ব্যক্তিগত কথা বলার সুযোগ করে দিতেই, হাসপাতালের করিডোরে বেরিয়ে এল গ্রে। নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল কেবিনের দরজা। আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে ওর। হল ধরে বাচ্চাদের ওয়ার্ডের দিকে এগোতে লাগল গ্রে। আইডি কার্ড দেখাতেই পথ ছেড়ে দিল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড।

কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা বিশেষ ঘরের দিকে এগোলো ও। দরজা খোলাই আছে। ভেতর থেকে কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আস্তে করে নক করে ভেতরে ঢুকল গ্রে। ভেতরে একটা খাট, আর একজোড়া চেয়ার-টেবিল। একটা বাচ্চার পক্ষে যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা রাখা হয়েছে ঘরটায়।

হাতে একটা চার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড. লিসা কামিংস।

টেবিলে বসে একমনে কিছু একটা আঁকছে সাশা। মাথার একপাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

"মি. গ্রে!" ওকে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল বাচ্চাটা। গ্রের মতোই, প্রায়ই ভাইকে দেখতে এই ঘরে আসে ও।

জানালার পাশে একটা হুইলচেয়ারে বসে আছে পিওত্‌র। শুন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। নিষ্প্রাণ একটা পুতুলের মতো দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

"কোনও উন্নতি?" লিসাকে প্রশ্ন করল গ্রে।

"খুব একটা না।" জবাব দিল লিসা। "তবে এখন চামচে করা খাওয়ানো যাচ্ছে ওকে। ডাক্তারদের ধারনা, আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে ওর মন।"

গ্রেপ্রার্থনা করল, যেন সত্যি হয় ডাক্তারদের ধারণাটা। পৃথিবীকে দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছে ছেলেটা।

"সাশা, তোমার ঘরে ফিরে যাও।"

"দাঁড়াও," বলে গ্রে-কে ছেড়ে পিওতরের দিকে ছুট লাগালো মেয়েটা। "আরেকটু থাকি।"

"পিওতরকে শুভরাত্রি বলো, তারপর আমরা ফিরে যাবো তোমার ঘরে।" আবারও তাড়া দিল লিসা।

ভাইয়ের গালে একটা চুমু খেলো মেয়েটা। তারপর আবার দৌড়ে এল গ্রে'র কাছে।

"পিওতর না ওটা," বিষণ্ণ সুরে বলল ও। "অন্য কেউ। কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি।"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো গ্রে। ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি করেছে মেয়েটা- হাসছে, খেলছে। তবে ওর ধারণাটা ভুল বলা যাবে না। ডাক্তাররাও একই আশঙ্কা করছেন। যদিও বা সুস্থ হতে পারে, তবুও আগের থেকে সম্পূর্ণ বদলে যাবে পিওতর। আগের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হবে ও।

"সাশা," কপট রাগ করার ভান দেখালো লিসা।

"দাঁড়াও! মি. গ্রে'র জন্য একটা জিনিস আছে আমার কাছে।" বলে কাগজের স্তুপ ঘাটতে লাগল মেয়েটা।

মুচকি হাসলো লিসা। "একেবারেই ঘুমাতে চায় না দুষ্টু মেয়েটা।"

খাতা থেকে একটা পৃষ্টা ছিঁড়ে গ্রে'র দিকে এগিয়ে দিল সাশা। "এই যে, এটা।"

হাতে নিয়ে কাগজটার দিকে তাকাল গ্রে। খুব সুন্দর করে একটা সার্কাসের জোকারের ছবি এঁকেছে মেয়েটা। তার মানে, অন্তত ছবি আঁকার প্রতিভাটা হারিয়ে যায়নি ওর ভেতর থেকে।

ওর কানে কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল সাশা। "মরতে যাচ্ছো তুমি।"

চমকে উঠে মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল গ্রে, দুষ্টুমিমাখা হাসি খেলা করছে ঠোঁটজোড়ায়। হাবভাব দেখে কথাটাকে হুমকি না, বরং কৌতুক বলেই মনে হলো তার।

সাশার কাঁধে একটা হাত রাখল ও। "আমরা সবাই একদিন না একদিন মারা যাব, সাশা। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।"

"উফ! সাবধানে থেক তুমি। তোমাকে সতর্ক করার জন্যই আমি এঁকেছি ওটা।" কাগজটার দিকে ইশারা করল মেয়েটা।

হাত ধরে টেনে ওকে দরজার দিকে নিয়ে গেল লিসা। "অনেক হয়েছে, ঘুমাতে হবে এখন।"

"দাঁড়াও, আরেকটু!"

"একটুও না।"

লিসার টান উপেক্ষা করে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তারপর চলে গেল পাশের ঘরে।

সাশা চলে যেতেই পিওতরের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। মাইনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এখনও চোখে ভাসছে যেন। তার বন্ধু, মঙ্ককে ডুবে যাওয়া থেকে

বাঁচিয়েছে সাশা। আর পিওতর তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে ওদের সবার কাছে। মাঝখানে আবার ঘটে গেল কতগুলো ঘটনা।

কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না এগুলো।

হয়তো এটাই ছিল নিয়তির বিধান।

নিকোলাসের কথা মনে পড়ল গ্রে'র। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, মুহাম্মাদ(সঃ) এর মতো পথপ্রদর্শক তৈরি করতে চেয়েছিল উন্মাদ লোকগুলো। পিওতরের দিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

টেরই পায়নি, লক্ষ্যের দিকে কতটা এগিয়ে গিয়েছিল ওরা। হয়তো ছাড়িয়ে গিয়েছিল নিজেদের উদ্দেশ্যকেও।

হাতে ধরা কাগজটার দিকে চোখ ফেরালো গ্রে। হাসছে রঙচঙে জোকারটা। কিন্তু এটা কী?

ভালোভাবে তাকাতেই খেয়াল করল, জোকারের ছবি ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে কাগজের অন্যপাশে আঁকা ছবিটার কাঠামো।

একটা চাইনিজ ড্রাগন!

ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল গ্রে'র শিরদাঁড়া বেয়ে। তার শার্টের নিচে গলায় ঝোলানো লকেটে ঠিক এরকমই একটা আকৃতি আছে। এক নিষ্ঠুর, রহস্যময়ী আততায়ীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।

দরজার দিকে তাকাল গ্রে। লকেটটা কী কোনওভাবে সাশার চোখে পড়ে গিয়েছিল?

না। ওরকম হতেই পারে না।

তবে?

ওকে সতর্ক করছিল মেয়েটা। জোকারের ছবি দেখিয়ে না, কাগজের উল্টোপাশে ড্রাগনের চিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করছিল ও।

ঘরের নিঃশব্দতায় একটা ভয় দানা বেঁধে উঠতে লাগল গ্রে'র মনে। গলা দিয়ে আপনাআপনিই একটা নাম বেরিয়ে এল।

"শেইচান।"

শেষ কথা

জানালার কাঁচ ভেদ করে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। নতুন এই থাকার জায়গায় এখনও সেরকমভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি ও।

জানালার কাঁচে দেখতে পাচ্ছে নিজের দেহের প্রতিফলন। কিন্তু মন থেকে উপলব্ধি কতে পারছে একটা কথা, আসলে এটা ও নয়। জানালার বাইরে গাছ থেকে পাতা খসে পড়ছে।
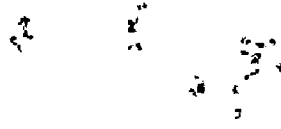
এখন আর কোনওরকম ভয় কাজ করে না ওর মনে। আস্তে আস্তে কল্পনায় একটা চেহারা গঠন করে ঝরে পড়া পাতাগুলো।
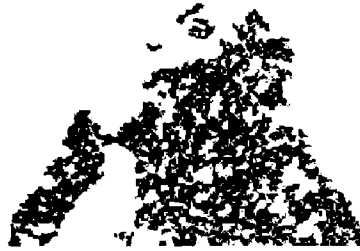
এখনও সেই অন্ধকার, সেই শূন্যতা অনুভব করতে পারে ও। সেই তারাগুলো, নিভে যেতে থাকা সেই সূর্য। তবে পুরোপুরি নিভে যাবার আগে শেষ একটা কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিল সূর্যটা। নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখা আলোটুকু একটা বিশেষ তারায় সঞ্চারিত করে দিয়েছিল সে। সেই এলোতেই এখন উদ্ভাসিত হচ্ছে বিশেষ তারাটা।

আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে আসে ঝড়া পাতায় গঠিত চেহারাটা।

হয়তো দিন গড়ানোর সাথে সাথে মন থেকে মুছে আসবে এই মুখটা। কিন্তু সেই অসহ্য স্মৃতি কী ভোলা সম্ভব?

দুঃস্বপ্নের দিন শেষ। এখন আরেকটা নতুন স্বপ্ন দেখে পিওতর।

মাঠে, পাহাড়ে, বনে ছুটে বেড়াচ্ছে একটা ছেলে। চোখে-মুখে উপচে পড়ছে খুশি।

বুঝতে পারে, ছেলেটা ও নিজে।

একদিন আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবে ও।

খুব বেশি দূরে নেই সেই দিনটার।

লেখকের বক্তব্যঃ সত্যি নাকি কল্পনা

ড. আর্চিবাল্ড পোক-এর মতো, সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে আমারও বেশ আগ্রহ কাজ করতো। কোত্থেকে আসে আদিম এই অনুভূতি? সেই চিন্তাধারা থেকেই জন্ম হয় এই উপন্যাসের। এবার পাঠকদের সাথে কিছু ব্যাপার পরিষ্কার করে নিই।

ডেলফির ওরাকলঃ ওরাকল সম্পর্কিত গবেষণায় বেশ অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমি। আসলে এই মহিলারা কীভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন, এ ব্যাপারে অনেক বিতর্ক প্রচলিত রয়েছে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, প্রাচীন বিশ্বের অনেক হাওয়া বদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তাদের সেই ভবিষ্যৎবাণী। গ্রীক বর্ণ এপসিলন আর মন্দিরের মেঝের ফাটল দিয়ে বের হওয়া হাইড্রোকার্বন গ্যাসের ব্যাপারটা সত্যি। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়তে পারেন উইলিয়াম জে. ব্রড-এর লেখা দ্য ওরাকলঃ দ্য লস্ট সিক্রেটস অ্যান্ড হিডেন মেসেজ অফ অ্যানশিয়েন্ট ডেলফি বইটা।

দ্য জেসনসঃ আমেরিকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন বিজ্ঞানীদের এরকম একটা গোপন সংস্থার অস্তিত্ব আসলেই বিদ্যমান। আলাদা আলাদা সেক্টরে কাজ করছেন এ সংস্থার বিজ্ঞানীরা। আরও জানতে চাইলে পড়তে পারেন অ্যান ফিঙ্কবেইনার-এর লেখা দ্য জেসনসঃ দ্য সিক্রেট হিস্টোরি অফ সায়েন্স'স পোস্টওয়ার এলিট বইটা।

প্রজেক্ট স্টারগেটঃ উপন্যাসে উল্লেখিত সিআইএ-র তত্ত্বাবধানে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আওতায় ঘটা এই প্রোগ্রামের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ফলাফল, সবই সত্যি।

মস্তিষ্কের গঠনঃ উপন্যাসে মানবমস্তিষ্কের নমনীয়তার ব্যাপারে কিছু কথা উল্লেখ করেছি আমি। বিশেষ ডিভাইস ব্যবহার করে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথাও বলা হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। তাত্ত্বিকভাবে এর পুরোটাই সত্যি। এই ব্যাপারে বিশদ জানতে চাইলে সংগ্রহ করতে পারেন নরমান ডইজ-এর লেখা দ্য ব্রেইন দ্যাট চেঞ্জেস ইটসেলফঃ স্টোরিজ অফ পার্সোনাল ট্রায়াম্ফ ফ্রম দ্য ফ্রন্টিয়ার্স অফ ব্রেইন সায়েন্স বইটা।

মানুষ কী আসলেই ভবিষ্যৎ দেখতে সক্ষম? নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের উত্তরঃ হ্যাঁ। উপন্যাসে উল্লেখিত জুয়াড়ি আর সেচ্ছাসেবকদের ভবিষ্যৎদর্শন পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারগুলো সত্যিই ঘটেছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ সত্যই প্রায় তিন সেকেন্ড আগে থেকে ঘটনার পূর্বাভাস করতে সক্ষম। কীভাবে হয় এটা? এই প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যায়নি, তবে ভারতের সেই গণিতবিদ মহিলা আর রিকশাচালকের অস্তিত্ব

আসলেই ছিল। আরও জানতে চাইলে ঘাঁটতে পারেন ওশো-র লেখা ইনটুইশনঃ নোয়িং বিয়ন্ড লজিক বইটা।

ভারত আর জিপসীঃ রোমানিদের আসলে শেকড় লুকিয়ে ছিল ভারতে, ব্যাপারটা সত্যি। রোমানি পতাকায় চক্র চিহ্ন থাকার ব্যাপারটাও সত্যি। ভারতের গোত্র ব্যবস্থায় "অচ্ছুৎ" নামের নিকৃষ্ট একটা দলের অস্তিত্ব আছে। তবে কালের বিবর্তনে গ্রীকরাই অচ্ছুৎ রূপ লাভ করেছে, এই ঘটনায় বিতর্ক আছে। এ ব্যাপারে দু'হাজার তিন সালের জুন মাসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা প্রতিবেদন আছে, যার নাম ইন্ডিয়া'স আনটাচেবলস।

আর হ্যাঁ, কখনও যদি তাজ মহল দেখতে ভারতে যান, তাহলে দীদার-এ-তাজ হোটেলে অবশ্যই ঢুঁ মারবেন কিন্তু। হোটেলের উপরতলায় ঘুরতে থাকা একটা রেস্টুরেন্ট আসলেই আছে। আর সেখানকার গোলগাপ্পা বা পানিপুরির স্বাদ অদ্বিতীয়।

রাশিয়ার তেজস্ক্রিয় দুর্যোগঃ উপন্যাসে উল্লেখিত ধ্বংসপ্রায় প্রাইপিয়াট শহর আর ঢাকনায় আবৃত রিঅ্যাক্টর-এর বর্ণনা, সবই সত্যি। ইউরাল পর্বতমালা আর তৎসংলগ্ন মাইনিং টাউন, আসানভ জলাভূমি ইত্যাদি সবই বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। চেলিয়াবিংস্ক আর লেক করাশয়, এখনও মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তায় ভরা। তাই কনস্টানটাইনের কথামতো, ওখানে পিকনিক করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না।

যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রঃ উপন্যাসে বেশ কিছু অপ্রচলিত অস্ত্র আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার উল্লেখ করেছি আমি, যেমন-সনিক ফ্লেয়ার, তেজস্ক্রিয় বিষ, ভারতের নমনীয় তলোয়ার, বৈদ্যুতিক টেজারগান, মোবাইল ফোনের ছদ্মবেশে থাকা পিস্তল ইত্যাদি সবকিছু অস্তিত্বই বর্তমানে বিদ্যমান।

প্রতিবন্ধিতাঃ এখনও পর্যন্ত বাচ্চাদের মাঝে প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়ার আসল কারণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, তবে এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান একটা বিষয়-প্রতিবন্ধিদের মাঝে দেখতে পাওয়া বিশেষ প্রতিভার ব্যাপারটা সত্যি।

এ ব্যাপারে আরও জানতে চাইলে ড. টেম্পল গ্রান্ডিন-এর থিংকিং ইন পিকচার্সঃ মাই লাইফ উইথ অটিজম বইটা পড়ার আহ্বান রইল। এছাড়াও ড্যানিয়েল ট্যামেট-এর বর্ন অন এ ব্লু মানডেঃ ইনসাইড দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি মাইন্ড অফ অ্যান অটিস্টিক স্যাভান্ট বইটাও অনেক সাহায্য করেছে আমাকে।

উপন্যাসে টেম্পল গ্রান্ডিনের একটা বিখ্যাত লাইন উল্লেখ করেছি আমিঃ

যদি কোনওভাবে পৃথিবী থেকে প্রতিবন্ধিতা পুরোপুরিভাবে দূর করে দেয়া যেত, তাহলে এখনও কোনও গুহার সামনে বসে আগুন পোহাতো মানুষের পূর্বপুরুষ।

কথাটুকু ব্যবহারের অনুমতি দেবার তার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ডেলফির ওরাকলের ব্যাপারে সক্রেটিস-এর আরেকটা বাণী উল্লেখ করেছি আমিঃ

মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ বরগুলো আসে উন্মাদনার রূপ নিয়ে,যা নিজেই এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ।

প্রতিবন্ধিতার সাথে প্রতিভার সম্পর্ক প্রমাণের জন্য আমি বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির নাম নিচে উল্লেখ করছি। জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল উক্ত সবার মাঝেই।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন
জেন অস্টিন
লুডউইগ ভ্যান বিটোভেন
এমিলি ডিকেনসন
টমাস আলভা এডিসন
এলবার্ট আইনস্টাইন
হেনরি ফোর্ড
থমাস জেফারসন
ফ্রাঞ্জ কাফকা
মাইকেল অ্যাঞ্জেলো
মোজার্ট
আইজ্যাক নিউটন
মার্ক টোয়েন
নিকোলা টেসলা
নস্ট্রাডামুস
এখন বাকিটা আপনারাই বিচার করুন।

নির্ঘন্ট

১ টেকটোনিক প্লেটঃ ভূতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে ভূত্বক প্রধানত সাতটি বড় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র গতিশীল কঠিন প্লেট দ্বারা গঠিত, এগুলোই টেকটোনিক প্লেট।

২ ওম্ফালোসঃ গ্রীক পুরাণ অনুসারে পৃথিবীর নাভি রূপে পরিগণিত অর্ধডিম্বাকৃতির পাথর।

৩ লরেল গুল্মঃ এক ধরণের ছোট লতানো উদ্ভিদ।

৪ ফেনলঃ এক ধরণের অজৈব রাসায়নিক যৌগ।

৫ ব্যাটারিং রামঃ দরজা ভাঙায় ব্যবহৃত বিশেষ হাতুরি।

৬ হ্যালুসিনোজেনিকঃ হ্যালুসিনেশন ঘটাতে সক্ষম, এমন ঔষধি পদার্থ।

৭ কোয়ারেন্টাইনঃ জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সংক্রামিত ব্যাক্তি না জিনিসকে আলাদা করে রাখার পদ্ধতি।

৮ ক্রোবারঃ ভারী কিছু উত্তোলনে ব্যবহৃত যন্ত্র।

৯ স্লেজহ্যামারঃ হাতুরি।

১০ আইসোটোপঃ একই মৌলিক পদার্থের অণুর ভিন্ন ভিন্ন পারমাণবিক অবস্থা।

১১ টেজারঃ বৈদ্যুতিক তীর ছুঁড়তে সক্ষম অস্ত্র।

১২ রেসপিরেটরঃ কৃত্রিম শ্বসন যন্ত্র।

১৩ সারকোফ্যাগাসঃ কফিন।

১৪ এমআরআইঃ চৌম্বকক্ষেত্র আর রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে প্রানিদেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

১৫ নিউরোমডিউলেশনঃ মস্তিষ্কের এক নিউরন থেকে অন্য নিউরণে তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়া।

১৬ ইলেকট্রোডঃ বিদ্যুত পরিবহণ করে এমন যন্ত্র।

১৭ হ্যাজার্ডঃ বিপজ্জনক চিহ্ন, যা তেজস্ক্রিয়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

১৮ ট্রাঙ্কুলাইজারঃ অজ্ঞান করতে ব্যবহৃত হয়, এমন বস্তু।

১৯ ডোসিমিটারঃ তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক মিটার।

২০ স্কীট শুটিংঃ চলন্ত বস্তুকে গুলি করার একটা খেলা।

২১ কনকাশন চার্জঃ বিশেষ ধরণের বিস্ফোরক।

২২ স্প্রিংকলারঃ অগ্নিনির্বাপণে ব্যবহৃত ঝরনা, যা বিশেষত ঘরের সিলিং-এ লাগানো হয়।

২৩ ডেরিকঃ ভারী কিছু তুলতে ব্যবহৃত ক্রেনের মতো যন্ত্র।

২৪ আইভি লাইনঃ সরাসরি শিরাপথে খাবার বা ওষুধ পৌঁছাবার পদ্ধতি।

২৫ কেমোথেরাপিউটিকঃসাধারণত যে সমস্ত ওষুধ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়

২৬ এপিনেফ্রিনঃ একধরনের হরমোন।